ইংরাজ-বর্জ্জিত ভারতবর্ষ।

পিয়ের-লোটির ফরাসী হইতে

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক

ভাষান্তরিত।

১৩৩৩ সন

মূল্য ১ৗ৵৹ টাকা।

প্রকাশক—
শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
ইণ্ডিয়ান্ পাব্লিশিং হাউস্
২২, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

কান্তিক প্রেস
২০, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা
শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত

সূচী।

ইংরাজ-বর্জ্জিত ভারতবর্ষ

ভারতের অভিমুখে—যাত্রা-পথে।

লোহিত সমুদ্রে, মধ্যাহ্ন। আলোক, আলোক, এত আলোক যে এই আলোক দেখিয়া বিমুগ্ধ হইতে হয়, বিস্মিত হইতে হয়; যেন এক প্রকার আধো-আঁধার হইতে বাহির হইয়া চোখ্ আরও খুলিয়া গিয়াছে, আরও স্পষ্ট করিয়া দেখিতে পাইতেছি। আধুনিক জাহাজের সাহায্যে এই পরিবর্ত্তনটা খুব দ্রুতভাবে সংঘটিত হয়। এই সকল জাহাজের উপর এখন আর বাতাসের কোন হাত নাই; এই সকল জাহাজ, উত্তর দেশের শরৎকাল হইতে, আমাদিগকে হঠাৎ এইখানকার চির-গ্রীষ্মের মধ্যে আনিয়া ফেলে, ঋতুর ক্রম-সংক্রমণ আদৌ উপলব্ধি হয় না।

জল ঘোর নীল; রূপার ঝালরগুলা যেন ঝিক্‌মিক্ করিতেছে—নাচিয়া বেড়াইতেছে। মনে হইতেছে যেন আকাশ,পৃথিবী হইতে আরও দূরে সরিয়া গিয়াছে, মেঘগুলা যেন আরও সুস্পষ্ট আকার ধারণ করিয়া শূন্যে ঝুলিতেছে; আকাশের গভীরতা ক্রমেই প্রকাশ হইয়া পড়িতেছে; দূরত্বের মধ্যে জাহাজ যতই অগ্রসর হইতেছে, ততই আকাশকে আরও বেশী করিয়া উপলব্ধি করিতেছি।

আরও আলোক, ক্রমাগতই আলোক। বাস্তবিকই নেত্র যেন বিস্ফারিত হইয়া, বেশী বেশী রশ্মি, বেশী বেশী রং গ্রহণ করিতেছে।...তবে কি, নেত্র ইহার পূর্ব্বে ভাল করিয়া কিছুই দেখিতে পাইতেছিল না?—না জানি কোন্ তিমির-রাজ্য হইতে এই মাত্র বাহির হইয়াছে। ঘোর নিস্তব্ধতার মধ্যে, কাহারও আদেশের অপেক্ষা না করিয়া, এই যে শুভ্র আলোক-উৎ-

সবের আয়োজন—স্বর্ণাভ আলোক-উৎসবের আয়োজন চতুর্দ্দিকে দেখা যাইতেছে—এ কিসের উৎসব ?…

এইখানে,—এই প্রাচ্য ভুখণ্ডের প্রাচীন সমাধিক্ষেত্রের উপর, বিলুপ্ত মানব-সঙ্ঘের এই ধূলি রাশির উপর, এই বিষাদময় উৎসব অবিরাম চলিতেছে ; কেবল, উত্তর দেশের অভিমুখে গেলে, এ সব ভুলিয়া যাইতে হয় ; তাহার পর, এই সব প্রদেশে ফিরিয়া আসিলেই আবার সেই একই দৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়, আবার বিস্ময়ে মন অভিভূত হইয়া পড়ে। সেই একই উষ্ণ ও অবসাদক্লান্ত উপসাগরের উপর—সেই একই প্রস্তরময় কিংবা বালুকাময় পুরাতন তটভূমির উপর,—সেই সব ধ্বংসাবশেষের উপর,—এবং যে সকল মৃত প্রস্তর-স্তূপ বাইবেল-বর্ণিত জাতিসমূহের গূঢ় রহস্যকে, পূর্ব্বপুরুষদিগের ধর্ম্মসমূহের গূঢ় রহস্যকে আগলাইয়া রহিয়াছে, সেই সব প্রস্তর স্তূপের উপর—এই আলোক-রশ্মি অবিরাম পতিত হইতেছে। আমাদের কল্পনা, এই বিষাদময় আলোকের উৎসবকে দূর অতীতে লইয়া গিয়া, প্রাচীন পৌরাণিক কাহিনীর সহিত উহাকে একসূত্রে বাঁধিয়া দেয় ; তাই মনে হয়, এই আলোক-উৎসব যেন অনাদি কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, এবং ইহার বুঝি শেষ নাই।…

কিন্তু, বাইবেল-বর্ণিত এই অতীত,—যাহার আপেক্ষিক প্রাচীনতায় আমাদের বিভ্রম উপস্থিত হয়, যাহার উপর আমাদের এত বিশ্বাস,—জগতের ভীষণ অতীতের তুলনায় এই অতীতটা সে দিনের বলিলেই হয়। এই সমস্ত আলোক, যাহা আমাদের নিকট এত উজ্জ্বল বলিয়া মনে হয়, যাহাতে আমাদের নেত্রের মত্ততা উপস্থিত হয়, উহা আমাদের ক্ষুদ্র সূর্য্যের ক্ষণস্থায়ী ক্রিয়ামাত্র ; এই সূর্য্য আমাদের এই ক্ষুদ্রতম পৃথিবীর উপর আলো দিতে দিতে ধীরে ধীরে একদিন নির্ব্বাপিত হইবে ; এখন সূর্য্য সেই নির্ব্বাণের পথেই চলিয়াছে। আমাদের পৃথিবী, পাছে শীতল হইয়া পড়ে এই ভয়ে, সূর্য্যের খুব কাছে-কাছে রহিয়াছে ; আরও তাহার ভয়, পাছে সেই ভীষণ অন্ধ-

কারের মধ্যে গিয়া পড়ে—যেখানে অপেক্ষাকৃত বড় গ্রহ্‌গুলা ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। আকাশের এই নীলিমা, যাহার উপর চির-পরিবর্ত্তনশীল বিচিত্র-আকারের মেঘগুলা অবিরাম খেলা করিয়া বেড়াইতেছে এবং যাহা অতলস্পর্শ গভীর বলিয়া আমাদের মনে প্রতিভাত হয়, উহা একটা পাতলা অবগুণ্ঠন মাত্র; আমাদের চোখকে ভুলাইবার জন্য, কালো অন্ধকারকে আমাদের নিকট হইতে লুকাইয়া রাখিবার জন্য, এই নীল অবগুণ্ঠন আমাদের সম্মুখে প্রসারিত রহিয়াছে; এ সমস্ত আসলে কিছুই নহে; আসল কথা, ঘোর কৃষ্ণবর্ণ অন্ধকার উহার অন্তরালে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। এই অন্ধকারই নিত্য পদার্থ, এই অন্ধকারই সর্ব্বাধিপতি; ইহার আদি নাই, অন্ত নাই; অনাদি কাল হইতে, ঐ কৃষ্ণবর্ণ শূন্যের মধ্য দিয়া, নিস্তব্ধভাবে কত শত জগৎ স্বকীয় কক্ষ হইতে চ্যুত হইতেছে, এই কৃষ্ণবর্ণ মহাশূন্য কখনও তাহাদিগকে আটকায় নাই,—কখনও তাহাদিগকে আটকাইবে না।

আকাশ ও সমুদ্রের এই সমস্ত উজ্জ্বল নীলিমার মধ্য দিয়া এখনও ৭।৮ দিন চলিতে হইবে, তাহার পরেই আমার যাত্রা শেষ হইবে, আমার গন্তব্যস্থানে আমি উপনীত হইব। ধর্ম্মের পীঠস্থান, মানব-চিন্তার লীলাভূমি—সেই ভারতবর্ষে আমি এখন যাইতেছি; আমার ভয় হইতেছে পাছে সেখানে গিয়া কিছুই না পাই—পাছে সেখানে গিয়া আবার প্রতারিত হই। আত্মবিনোদনেব জন্য, কিংবা শুধু একটা মনের খেয়ালে এবার আমি সেখানে যাইতেছি না; আর্য্য-জ্ঞানের রত্নভাণ্ডার যাঁহাদের হস্তে, তাঁহাদের নিকট এবার চিত্তশান্তি যাচ্ঞা করিতে যাইতেছি। খৃষ্ট-ধর্ম্মের আশা-ভরসা আমার চিত্ত হইতে তিরোহিত হইয়াছে; আত্মার অনির্দ্দেশ্য দীর্ঘস্থায়িত্বের উপর তাঁহাদের যে বিশ্বাস আছে, খৃষ্টধর্ম্মের আশ্বাসের পরিবর্ত্তে সেই কঠোরতর বিশ্বাসটি যদি তাঁহারা আমাকে দিতে পারেন, —তাই জানিবার জন্যই আমি তাঁহাদের নিকট যাইতেছি·····

এই সময়ে সূর্য্য অস্ত হইতেছে। কি চমৎকার দৃশ্য! এই সূর্য্য—

আমাদের এই নিজস্ব সূর্য্য,—যে সূর্য্য, অনাদিকাল হইতে ঘুরিতে ঘুরিতে, আমাদিগকে তাহার দিকে নিয়ত আকর্ষণ করিতেছে—আর এক মুহূর্ত্ত পরেই অন্য অগণ্য সূর্য্যের মধ্যে হারাইয়া যাইবে। এই সেই অস্তাচলের অধিত্যকা—সেখানে নৈশ আকাশের স্বচ্ছতার মধ্য দিয়া, আমরাও ঘুরিতে ঘুরিতে সেই মহারাত্রির অভিমুখে—সেই অন্তহীন তমোরাশির অভিমুখে এখনি গমন করিব। এক্ষণে সায়াহ্নের কুহক-জালে আচ্ছন্ন হইয়া, এই অস্তমান সূর্য্যের তাম্র পাটল প্রভা নিরীক্ষণ করা যাক্। পূর্ব্বদিকে, সমুদ্রের ঊর্দ্ধে, দিগন্তের উচ্চদেশে, জনশূন্য উজাড় রক্তবর্ণ প্রস্তরের একটি পর্ব্বত-মালা, জ্বলন্ত অঙ্গারের ন্যায় লাল হইয়া উঠিয়াছে। এই পর্ব্বতগুলি—সেনাই, সের্ব্বাল ও হোরেব্। আবার সেই মূসার সময়কার পৌরাণিক কাহিনীর প্রভাব আমাদের মনকে অধিকার করিল—সেই সকল কাহিনী, যাহা বংশপরম্পরাক্রমে, ধর্ম্মভাবের যেন একটা ভূমি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছে।

কিন্তু এই জ্বলন্ত শিখরগুলি নির্ব্বাপিত হইতে আর বড় বিলম্ব নাই। সূর্য্য জলরাশির পশ্চাতে ঢলিয়া পড়িল, সায়াহ্নের ক্ষণিক মায়া-দৃশ্য অন্তর্হিত হইল; সন্ধ্যার ধূসরতার মধ্যে, সিনাই, সের্ব্বাল, ও হোরেব, বিলুপ্ত হইল,—বিলীন হইল। আর উহাদিগকে দেখা যায় না;—আসলে উহারা কি? ধরাপৃষ্ঠে কতকগুলি পাথর একস্থানে আটকাইয়া পড়িয়াছে এই মাত্র; কিন্তু বাইবেলের "exodus"-পরিচ্ছেদের কবিত্ব-প্রভাবে, উহাদিগকে আমরা কল্পনায় অত্যন্ত বাড়াইয়া তুলিয়াছি!

অনন্ত রাত্রি—প্রশান্ত রাত্রি আসিয়া এখনি সকল পদার্থের যথাযথ পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিবে। এখনি, অনন্ত আকাশে, সৌররাজ্যের যাত্রী-দল দেখা দিয়াছে। উহাদের মধ্যে কাহারও যদি পদস্খলন হয়, তাহা হইলে সকলেই ঐ অন্ধকারাচ্ছন্ন অগাধ শূন্যের মধ্যে পতিত হইবে, আমরাও পতিত হইব—এই ভাবটা আবার আমার মনে জাগিয়া উঠিল। সূর্য্য

আমাদিগকে ক্রমাগত টানিতেছে—কিন্তু আমাদের এই ক্ষুদ্র গ্রহদের কি দুর্দ্দশা, সূর্য্যের অভিমুখে ছুটিয়া চলিয়াছে অথচ কস্মিন কালেও সেখানে পৌঁছিতে পারিবে না ; এই সকল সূর্য্যেরা তবু কতকটা স্বাধীনভাবে শূন্যের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, কিন্তু আমাদের গ্রহগণ, পেঁচাল গতি অনুসরণ করিয়া ক্রমাগতই সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে ছুটিতেছে।

মধ্য আকাশ হইতে দিগন্ত পর্য্যন্ত,কোথাও একটি মেঘ নাই, আকাশে চমৎকার স্বচ্ছতা। এক্ষণে আমাদের নেত্রসমক্ষে সেই অসীম শূন্য উদ্‌ঘাটিত, যেখানে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অসংখ্য জগৎ ক্রমশ পতিত হইতেছে, অগ্নিময়-বৃষ্টিবিন্দুবৎ ক্রমাগত পতিত হইতেছে ; যাই হোক্, কিন্তু নিশার আগমনে, তারকা-খচিত আকাশ হইতে আমাদের জন্য মধুর শান্তি নামিয়া আসিল।

মনে হয় যেন উপর হইতে, সোৎকণ্ঠ স্নেহ আসিয়া আমাদের অন্তরাত্মার উপর অল্পে অল্পে স্নিগ্ধছায়া বিস্তার করিতেছে······আহা, যাঁহাদের নিকটে আমি এখন যাইতেছি সেই ভারতের তত্ত্বজ্ঞানীরা এই স্নেহযত্ন, এই অনুকম্পার সত্যতা সম্বন্ধে যদি আমার ধ্রুব বিশ্বাস জন্মাইয়া দিতে পারেন!

সিংহলে।

অনুরাধপুর।

এই ত সেই ভারতবর্ষ ; সেই অরণ্য ; সেই জঙ্গল।

দিনের অভ্যুদয়ে, শাখা-পল্লবময়, তৃণ-গুল্মময় একটি নূতন জগৎ যেন আমার সম্মুখে উদ্‌ভাসিত হইল। চির-হরিতের অসীম সমুদ্র, অনন্ত রহস্য, অনন্ত নিস্তব্ধতা দিগন্তের শেষ সীমা পর্য্যন্ত আমার পদতলে প্রসারিত হইল।

সাগর-সম্ভূত ক্ষুদ্র একটি দ্বীপের ন্যায়, ধরণী-সমুত্থিত এই ক্ষুদ্র শৈল-শিখর হইতে, আমি এই হরিতের নীরব অসীমতা সন্দর্শন করিতেছি। এই সেই মেঘাম্বরা ভারতভূমি, অরণ্য-সঙ্কুলা ভারতভূমি—জঙ্গলাকীর্ণা ভারত-ভূমি; সিংহল মহাদ্বীপের কেন্দ্রবর্ত্তী এই সেই স্থান, যেখানে গভীর শান্তি বিরাজিত,—যাহা তরুশাখার দুর্মোচনীয় জটিল বন্ধন-জালে সর্ব্বদাই সুরক্ষিত। এই সেই স্থান, যেখানে প্রায় দ্বিসহস্র বৎসরাবধি, অনুরাধপুর নামক একটি পরমাশ্চর্য্য নগর, ঘননিবিড় শাখাপল্লবের নৈশ-অন্ধকারের মধ্যে একেবারে নির্ব্বাপিত।

বৃষ্টি-ঝটিকার উদ্ভব-ক্ষেত্র সেই নীলাকাশ ভেদ করিয়া, দিবার অভ্যুদয় হইতেছে। এই সময়ে আমাদের ফরাসীদেশে দ্বিপ্রহর রাত্রি। ধরণী পুরন্ধ্রী, সূর্য্যালোকের সাহায্যে, সেই ধ্বংস-রাজ্যের চিত্রটি আর একবার আমাদের সম্মুখে ধারণ করিতে উদ্যত হইয়াছেন—সেই ধ্বংসরাজ্য, যাহা চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া একেবারে ধূলিসাৎ হইয়া গিয়াছে।

এখন সেই অদ্ভুত নগরটি কোথায়? * * * জাহাজের মাস্তল-মঞ্চ হইতে বৈচিত্র্যহীন সাগর-মণ্ডল যেরূপ দৃষ্ট হয়, আমি সেইরূপ এখান হইতে চারি দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতেছি;—কুত্রাপি মনুষ্যের চিহ্নমাত্রও দেখিতে পাইতেছি না। কেবলই গাছ—গাছ—গাছ। গাছের মাথা-গুলি সারি সারি চলিয়াছে—সব এক সমান—সব প্রকাণ্ড। সেই তরু-পুঞ্জের উত্তাল তরঙ্গভঙ্গ, সীমাহীন দূরদিগন্তে মিলাইয়া গিয়াছে। ঐ অদূরে কতকগুলি হ্রদ দেখা যাইতেছে, যেখানে কুম্ভীরগণের একাধিপত্য, এবং যেখানে সায়ংকালে বন্যহস্তিগণ দলে দলে আসিয়া জলপান করে।" ঐ সেই অরণ্য—ঐ সেই জঙ্গল, যেখান হইতে বিহঙ্গগণের প্রাভাতিক আহ্বান-সঙ্গীত সমুত্থিত হইয়া আমার অভিমুখে প্রবাহিত হইতেছে। কিন্তু সেই পরমাশ্চর্য্য নগরটির চিহ্নমাত্রও কি আর দেখিতে পাইব না? * * *

কিন্তু এ কি দেখি ?—কতকগুলি ছোট ছোট পাহাড়—অতীব অদ্ভুত, তরুসমাচ্ছন্ন, অরণ্যের ন্যায় হরিৎবর্ণ—কিন্তু একটু যেন বেশী সুষমা-বিশিষ্ট ;—কোনটা বা পিরামিডের ন্যায় চূড়াকার, কোনটা বা গম্বুজাকার—ইতস্ততঃ সমুত্থিত ; আর সমস্ত পদার্থ হইতে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হইয়া, পল্লবপুঞ্জের মধ্য হইতে মস্তক উত্তোলন করিয়া রহিয়াছে।

* * * এইগুলি পুরাতন মন্দিরসমূহের চূড়াদেশ—প্রকাণ্ড "দাগোবা"। খৃষ্টের দুই শতাব্দী পূর্ব্বে এইগুলি নির্ম্মিত হয়। অরণ্য ইহাদিগকে ধ্বংস করিতে পারে নাই—স্বকীয় হরিৎ-শ্যামল শব-বসনে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে মাত্র ;—উহাদের উপর, অল্পে অল্পে, মৃত্তিকা, শিকড়, ঝোপ-ঝাড়, লতাগুল্ম ও কপিবৃন্দ আনিয়া ফেলিয়াছে।

বৌদ্ধধর্ম্মের প্রথম যুগে যেখানে ভক্তগণ আরাধনা করিত, এই "দাগোবা"গুলি তাহারই মুখ্য নিদর্শন ; সেই স্থান—সেই পুণ্য নগরীটি আমার নিম্নদেশে পল্লব-মণ্ডপ-তলে প্রচ্ছন্ন হইয়া নিদ্রা যাইতেছে।

আমি যে ক্ষুদ্র পাহাড় হইতে চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিতেছি, ইহাও একটি পবিত্র দাগোবা। যিনি যীশুর ভ্রাতা ও অগ্রদূত, সেই মহাপুরুষের লক্ষ লক্ষ ভক্তবৃন্দ, তাঁহার মহিমার উদ্দেশেই, এই মন্দিরটি নির্ম্মাণ করে। প্রস্তর-খোদিত কতিপয় হস্তী ও পৌরাণিক দেবমণ্ডলী ইহার তলদেশ আগ্‌লাইয়া রহিয়াছে। পূর্ব্বে, প্রতিদিনই এখানে ধর্ম্মসঙ্গীতের কলধ্বনি শ্রুত হইত, এবং উহাই তখন প্রার্থনা ও আরাধনার শান্তিময় আনন্দাশ্রম ছিল।

"অনুরাধপুরে অসংখ্য দেবালয়, অসংখ্য অট্টালিকা। উহাদের গম্বুজ, উহাদের মণ্ডপ-সকল সূর্য্যকিরণে সমুদ্ভাসিত। রাজপথে, ধনুর্বাণধারী এক দল সৈন্য ; গজ অশ্ব রথ, লক্ষ লক্ষ মনুষ্য, অবিরত যাতায়াত করিতেছে। তাহার মধ্যে বাজিকর আছে, নর্ত্তক আছে, বিভিন্ন দেশের বাদক আছে। এই বাদকদিগের ঢাক প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিত।"

কিন্তু এখন এখানে কেবলই নিস্তব্ধতা, তিমির-ছায়া, হরিৎময়ী রজনীর পূর্ণ আবির্ভাব। মানুষ চলিয়া গিয়াছে, অরণ্য ইহার চারি দিক বেষ্টন করিয়াছে।

পৃথিবীর সুদূর অতীতে, সেই আদিম মহারণ্যের উপর যেরূপ প্রশান্ত-ভাবে প্রভাতের অভ্যুদয় হইত, এই সদ্যোবিনষ্ট নগরীর ধ্বংসাবশেষের উপর এক্ষণে সেইরূপ প্রশান্ত প্রভাত সমুদিত।

* * * *

ভারত-মহাদেশে পদার্পণ করিবার পূর্ব্বে, সিংহল দ্বীপের কোন সদাশয় পরম-কৃপালু মহারাজার নিকট হইতে প্রত্যুত্তরের অপেক্ষায় আমাকে কিছুদিন এখানে থাকিতে হইল। আমি তাঁহার বাটীতে অতিথি হইয়া থাকিব, এইরূপ কথা ছিল। যতদিন না সেই উত্তর পাই, ততদিন এই স্থানেই থাকিব, স্থির করিলাম; কেন না, উপকূলবর্ত্তী সার্ব্বজাতিক নগর-গুলির প্রতি আমার আন্তরিক বিতৃষ্ণা।

যে পথটি ধরিয়া আমি এখানে আসিয়াছি, তাহার আলোচনা ও উদ্যোগ-আয়োজন অনেকদিন হইতেই চলিতেছিল। এই স্থানের শোভা সৌন্দর্য্য উপভোগের পক্ষে এই পথটিই সর্ব্বাপেক্ষা অনুকূল।

"কান্দি" হইতে পূর্ব্বাহ্ণেই ছাড়িতে হইল। এই কান্দি নগর প্রাচীন সিংহল-রাজদিগের রাজধানী ছিল। যাত্রার আরম্ভভাগে, সুপারি-নারিকেল-ভূয়িষ্ঠ প্রদেশের মধ্য দিয়া চলিতে লাগিলাম। বিষুব-রেখাবর্ত্তি-প্রদেশ-সুলভ প্রাকৃতিক প্রাচুর্য্য আমার সম্মুখে এক্ষণে পূর্ণরূপে উদ্‌ঘাটিত হইল। তাহার পর অপরাহ্ণে, দৃশ্যের পরিবর্ত্তন হইল। নারিকেল ও সুপারির প্রসারিত শাখা-পক্ষরাজি অল্পে অল্পে দৃষ্টিপথ হইতে তিরোহিত হইল। আমরা এইক্ষণে নাতি-উষ্ণ-প্রদেশ-সীমায় আসিয়া পড়িয়াছি। এখানকার অরণ্য, অনেকটা অস্মদ্দেশের অরণ্যের ন্যায়।

অজস্রধারে বৃষ্টি পড়িতেছে; বৃষ্টির জল উষ্ণ ও সুরভিত; ভিজা

মাটির রাস্তা দিয়া আমাদের ক্ষুদ্র ডাক-গাড়ীটি চলিয়াছে; প্রায় প্রতি পাঁচ মাইল অন্তর ঘোড়া বদ্‌লি হইতেছে; আমরা ঘোড়াদের ইচ্ছামত চলিয়াছি। ঘোড়া চার-পা তুলিয়া ছুটিতেছে, মাঝে মাঝে লাথিও ছুঁড়িতেছে। অনেক-বার গাড়ী হইতে আমাদিগকে লাফাইয়া পড়িতে হইয়াছে, দুই একটা "অ-ভাঙ্গা" বুনো ঘোড়া সমস্ত ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া ফেলিতে উদ্যত;—উহারা গাড়ী টানার কাজে সবেমাত্র শিক্ষানবিশী আরম্ভ করিয়াছে। এই দুষ্ট ঘোড়াদের ক্রমাগত বদ্‌লি করা হইতেছে; ইহাদের চালাইবার জন্য দুই জন ভারতবাসী নিযুক্ত। এক জন রাশ ধরিয়া থাকে, আর এক জন তেমন তেমন বিপদ উপস্থিত হইলে, ঘোড়ার মাথার উপর লাফাইয়া পড়িবার জন্য সর্ব্বদাই প্রস্তুত। আর এক জন তৃতীয় ব্যক্তি আছে, সে ভেঁপু বাজায়; ভেঁপু বাজাইয়া শ্লথ-গতি গরুরগাড়ীগুলাকে পথ হইতে সরাইয়া দেয়; অথবা, নারিকেল-কুঞ্জ-প্রচ্ছন্ন কোন গ্রামের মধ্য দিয়া যখন গাড়ী চলে, তখন গ্রামবাসীদিগকে সতর্ক করিয়া দেয়। আট ঘণ্টার মধ্যে আমাদিগকে যথাস্থানে পৌছাইয়া দিবে, এইরূপ কথা ছিল। কিন্তু অবিশ্রান্ত বৃষ্টি হওয়ায়, আমাদের ক্রমাগত বিলম্ব হইয়া যাইতেছে।

সন্ধ্যার দিকে, গ্রামের বিরলতা ও অরণ্যের নিবিড়তা ক্রমশই বাড়িতে লাগিল। কিয়ৎকাল পূর্ব্বে, একদল মানুষ যাইতেছে, দেখিয়াছিলাম। মহাপ্রভাবশালী তরুকুঞ্জের মধ্যে উহারা কি ক্ষুদ্র!—উহারা যেন তাহাদের মধ্যে হারাইয়া গিয়াছে। এখন আমাদের ভেঁপুওয়ালার কোন কাজ নাই। লোক নাই ত কাহার জন্য ভেঁপু বাজাইবে?

তালজাতীয় তরুগণ এইবার স্পষ্টরূপে অন্তর্হিত হইয়াছে। দিবাবসান-সময়ে যাত্রা আরম্ভ করিলে মনে হয় যেন, এই অনন্ত গ্রীষ্মের মধ্যে আমাদের য়ুরোপীয় পল্লীগ্রামের কোন বিজন বনময় প্রদেশে আসিয়া পড়িয়াছি। তবে, এখানকার অরণ্যগুলি অপেক্ষাকৃত বিশাল, এবং ইহার লতা-গুল্ম-বন্ধন-জাল আরও জটিলতর। কিন্তু সময়ে-সময়ে যখন

শেয়ালকাঁটার গাছ দেখিতে পাই, সরোবরে রক্তপদ্ম প্রস্ফুটিত দেখি, কিংবা যখন দেখি,—একটি অপূর্ব্ব প্রজাপতি আমার যাত্রা-পথের সম্মুখ দিয়া উড়িয়া যাইতেছে, আর বিচিত্র উজ্জ্বল রঙ্গের কোন একটি পাখী তাহার অনুসরণ করিতেছে, তখন উহা বিদেশভূমিকে আবার স্মরণ করাইয়া দেয়। কিন্তু পরক্ষণেই আবার, আমাদেরই সেই পল্লীগ্রাম, আমাদেরই সেই অরণ্যভূমি—এইরূপ বিভ্রম উপস্থিত হয়।

সূর্য্যাস্তের পর, গ্রাম পল্লী আর দেখা যায় না, মনুষ্যের চিহ্নমাত্র দেখা যায় না। কবোষ্ণ বৃষ্টিজলের স্নেহ-স্পর্শ উপভোগ করিতে করিতে, গভীর অরণ্যের অফুরন্ত পথ দিয়া আমরা অবিরত ছুটিয়া চলিয়াছি। চারি-দিকেই গভীর নিস্তব্ধতা।

ক্রমে অন্ধকার হইতে লাগিল; তাহার সঙ্গে সঙ্গে এই নিস্তব্ধতাকে ঈষৎ রূপান্তরিত করিয়া কীট-সঙ্গীত সমুত্থিত হইল। আর্দ্র অরণ্য-ভূমির উপর সহস্র সহস্র ঝিল্লীর পক্ষ-স্পন্দন-জনিত অনুরণন-ধ্বনি উচ্চ হইতে উচ্চতর গ্রামে উঠিতে লাগিল। পৃথিবীর আরম্ভকাল হইতে প্রতিরাত্রিই এই সঙ্গীত ধ্বনিত হইয়া আসিতেছে। * * *

ক্রমে ঘনঘোর অন্ধকার; আকাশ মেঘাচ্ছন্ন; ঘণ্টার পর ঘণ্টা কতক্ষণ ধরিয়া আমরা অবিরত ছুটিয়া চলিয়াছি। ক্রমে চারিদিকের দৃশ্য ঘোরতর গম্ভীরভাব ধারণ করিল। লতাবন্ধন-জালে আপাদ-জড়িত দুই সারি বৃক্ষের মধ্য দিয়া আমরা চলিয়াছি। নগর-উপবনে যেরূপ একজাতীয় বড়-বড় বৃক্ষ দেখা যায়, সেইরূপ বৃক্ষ একটার পর একটা আসিতেছে—তাহার আর শেষ নাই।

কতকগুলি স্থূলকায় কৃষ্ণবর্ণ পশু অন্ধকারের মধ্যে অস্পষ্ট লক্ষিত হইতেছে। তাহারা আমাদের পথরোধ করিয়া ছিল। এই বুনো গরুগুলা নিতান্ত নিরীহ ও নির্ব্বোধ; চীৎকার শব্দ করিয়া দুই চারিবার চাবুক আস্ফালন করিবামাত্রই উহারা ইতস্ততঃ সরিয়া পড়িল। আবার পথের

সেই বৈচিত্র্যহীন শূন্যতা; আবার সেই নিস্তব্ধতা—যাহা কেবল ঝিল্লীর আনন্দ-রবে মুখরিত।

অরণ্যের এই মহা-নিস্তব্ধতার মধ্যে, নৈশজীবনের স্পন্দন ও বিকাশ বেশ অনুভব করা যায়। এই অরণ্য কত শত মৃগের বিচরণভূমি;—কেহ বা শত্রুভয়ে সতর্ক হইয়া চারি দিক নিরীক্ষণ করিতেছে, কেহ বা আহার-অন্বেষণে প্রবৃত্ত। একটু ছায়া নড়িলেই না জানি কত মৃগের কান খাড়া হইয়া উঠে—কত মৃগের চক্ষু-তারা বিস্ফারিত হয়। * * * এই রহস্যময় বনপথটি বরাবর সিধা চলিয়াছে; ইহা ম্লান ধূসরবর্ণ, আর ইহার দুইধারে কৃষ্ণবর্ণ তরু-প্রাচীর। উহার সম্মুখে, পশ্চাতে, চতুর্দ্দিকে যোজন-ব্যাপী দুর্ভেদ্য জটিল শাখাজাল বিস্তৃত হইয়া অরণ্য-ভূমিকে কিরূপ পীড়ন করিতেছে, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়।

রজনীর অন্ধকারে আমাদের চক্ষু এখন অভ্যস্ত হইয়াছে; তাই স্বপ্নের মত অস্পষ্ট কখন-কখন দেখিতে পাই, ইঁদুর-জাতীয় একপ্রকার জীব মখ্‌মল-কোমলপদ-বিক্ষেপে নিঃশব্দে গর্ত্ত হইতে বাহির হইয়াই আবার অন্তর্হিত হইতেছে।

অবশেষে প্রায় ১১টায় সময় দেখা গেল, স্থানে স্থানে অল্প অল্প আগুন জ্বলিতেছে, ভগ্নাবশেষের দীর্ঘায়তন গুরুভার প্রস্তর-ফলকসমূহ পথের দুইধারে বিকীর্ণ; এবং গাছের মাথা ছাড়াইয়া, দাগোবা-সমূহের প্রকাণ্ড ছায়া-চিত্র আকাশপটে অঙ্কিত। এগুলি যে পর্ব্বত নয়—ভূগর্ভনিহিত নগরের মন্দির-চূড়ামাত্র—তাহা আমি পূর্ব্ব হইতেই জানিতাম।

আজ রাত্রে, এইখানকার একটি কুটীরে আশ্রয় লইলাম। নন্দন-কাননের ন্যায় সুন্দর একটি ক্ষুদ্র বাগানে এই কুটীরটি অবস্থিত। যাইবার সময় ল্যাণ্ঠানের আলোকে দেখিতে পাইলাম, ফুল ফুটিয়াছে।

* * * *

এক্ষণে প্রভাত হইয়াছে। আমি যে স্থানে আছি, তাহার নীচে,

অরণ্যের মধ্যে বিহঙ্গগণের জাগরণ-কোলাহল শুনিতেছি। আমি এই মন্দির-চূড়ার উপরে, জঙ্গল-সুলভ তৃণ-গুল্মে পরিবেষ্টিত। আমি আসিয়া চামচিকাদিগের শান্তিভঙ্গ করিয়াছি—তাহারা এক্ষণে প্রভাতের আলোকে চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। ইহারা ধ্বংশ-স্থানেরই জীব; ইহাদের ডানাগুলা ছাইরঙ্গের। আর, কতকগুলি কাঠবিড়ালী তরুপল্লবের অন্তরাল হইতে আমাকে নিরীক্ষণ করিতেছে; উঁহাদের কি চটুলতা! কি শোভন গতিভঙ্গি! বড়-বড় গাছগুলা এই মৃত নগরের শবাচ্ছাদনরূপে বিরাজমান। কিন্তু উহাদের মধ্যে কতকগুলি বৃক্ষ, আমার পাদদেশে, বসন্তোৎসবের সাজসজ্জায় সুসজ্জিত;—রক্তবর্ণ, পীতবর্ণ, গোলাপী বর্ণের ফুল সকল ফুটিয়া রহিয়াছে। এই সকল সুন্দর পুষ্পিত তরুশিরের উপর পর্জ্জন্যদেব তাড়াতাড়ি এক-পস্‌লা বৃষ্টি বর্ষণ করিয়াই দূরত্বের করাল-গর্ভে মিলাইয়া গেলেন। কিন্তু প্রচণ্ড সূর্য্য শীঘ্রই আবার মেঘ ও বৃষ্টির পশ্চাতে উদিত হইয়া আমার মস্তককে উত্তপ্ত করিয়া তুলিল। যেখানে কতকগুলি মনুষ্যের বসতি আছে,—সেই অরণ্যের নিম্নস্থ একটি ছায়াময় প্রদেশে—হরিৎ-শ্যামল রাজ্যের মধ্যে এইবার আমরা প্রবেশ করিব। এখানকার একটি বৃক্ষশাখার সোপান দিয়া আমি নীচে নামিতেছি।

* * * *

নীচে, লোহিত মৃত্তিকার মধ্যে, আঁকা-বাঁকা সর্পের মত অদ্ভুতাকার শিকড়জালের মধ্যে, এই ধ্বংস-জগৎটি অবস্থিত। ধ্বংসাবশেষের ভাঙ্গা-চুরা দ্রব্য সকল বিশৃঙ্খলভাবে এক স্থানে স্তূপাকার হইয়া রহিয়াছে।

শত শত দেবতার ভগ্ন প্রতিমা, প্রস্তরময় হস্তী, যজ্ঞবেদিকা, কল্পনা-প্রসূত কত কি মূর্ত্তি—সেই মহাধ্বংসের সাক্ষ্য দিতেছে। প্রায় দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে মালাবার-প্রদেশবাসী আক্রমণকারীরা এই সুন্দর নগরটিকে ভূমিসাৎ করে।

এই সকল দ্রব্য সামগ্রীর মধ্যে যাহা কিছু সর্ব্বাপেক্ষা পবিত্র ও পূজার্হ,

সেই সমস্ত, একালের বৌদ্ধেরা, অবিনশ্বর দাগোবার চারিধার হইতে ভক্তি-ভাবে সযত্নে কুড়াইয়া রাখিয়াছে। উহারা ভগ্ন-মন্দিরের সোপান-ধাপের দুইধারে পুরাতন দেবতাদিগের ভগ্ন প্রতিমাগুলি সারি-সারি সাজাইয়া রাখিয়াছে। এক্ষণে পুরাতন যজ্ঞবেদিকাগুলি বিলুপ্তমুখশ্রী ও অঙ্গহীন হইলেও, তাহাদেরই যত্নে কোন প্রকারে ভূমির উপর খাড়া রহিয়াছে। এখনও ভক্ত বৌদ্ধেরা ভক্তিসহকারে প্রতিদিন প্রাতে এই বেদীগুলি সুন্দর ফুল দিয়া সজ্জিত করে, এবং তাহার উপর ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র পূজা-প্রদীপ জ্বালাইয়া রাখে। তাহাদিগের চক্ষে অনুরাধপুর পুণ্যতীর্থ; অনেক দূর হইতে যাত্রিগণ এখানে আসিয়া সমবেত হয়, এবং শান্তিময় তরু-ছায়াতলে বাস করিয়া পূজা অর্চনা করে।

গুরুভার প্রস্তর-ফলক-সমূহ সারি সারি পড়িয়া রহিয়াছে; মন্দিরচূড়া হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া স্তম্ভশ্রেণীগুলি ক্রমশঃ বনের মধ্যে মিলাইয়া গিয়াছে;— এই সমস্ত নিদর্শনের দ্বারা সুবৃহৎ ভজনা-শালার আয়তন ও রচনা-প্রণালী কতকটা অনুমান করা যায়। অসংখ্য বহির্দালান পার হইয়া তবে সেই ভজনা-শালায় উপনীত হওয়া যায়। যক্ষ রক্ষ গন্ধর্ব্ব প্রভৃতি নিকৃষ্ট দেবতারা ঐ দালানগুলির রক্ষিরূপে অবস্থিত। দেবতাদের এই পাষাণ-প্রতিমাগুলি চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া ভূতলে পড়িয়া রহিয়াছে। ইহা ছাড়া, আরও শত শত ভগ্ন-চূর্ণ মন্দির ও প্রাসাদের চিহ্ন সর্ব্বত্রই দৃষ্ট হয়। বৃক্ষকাণ্ডের সহিত অসংখ্য প্রস্তর-স্তম্ভ এই অরণ্য-গর্ভে নিহিত; এবং সকলে মিলিয়া এক সঙ্গে আবার সেই অনন্ত অসীম হরিৎ-রাজ্যে মিলাইয়া গিয়াছে

অস্মৎ-যুগের প্রারম্ভে, রাজকুমারী—"সঙ্ঘমিত্রা", যিনি একজন মহা-যোগিনী ছিলেন—তিনি মহাবোধি-বৃক্ষের একটি শাখা—(যাহার তলায় বসিয়া বুদ্ধদেব বৌদ্ধত্ব প্রাপ্ত হন) ভারতের উত্তর-খণ্ড হইতে আনাইয়া এইখানে রোপণ করিয়াছিলেন। সেই শাখাটি এক্ষণে একটি প্রকাণ্ড

বৃক্ষে পরিণত হইয়াছে; এবং বটবৃক্ষের নিয়মানুসারে তাহার শাখা প্রশাখা হইতে অসংখ্য শিকড় নামিয়াছে। এই বৃক্ষের চতুষ্পার্শ্বে পুরাতন বেদিকাসমূহ স্থাপিত; তাহার উপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পূজাপ্রদীপ দিবা-রাত্রি জ্বলিতেছে, এবং নানাবিধ সুগন্ধি কুসুম বিকীর্ণ রহিয়াছে। প্রতিদিনই এইখানে টাট্‌কা ফুল ছড়াইয়া দেওয়া হয়।

যখন দেখি, এই অরণ্যের মধ্যে, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দ্বারপথগুলি সাদা মার্ব্বেল পাথরে নির্ম্মিত ও ভাস্করের সূক্ষ্ম-কারুকার্য্যে আচ্ছন্ন; যখন দেখি, স্বাগত-স্মিতমুখে দেবতারা কত কত সোপান-ধাপের উপর দাঁড়াইয়া আছেন; যখন দেখি, এই দ্বারপথগুলি দিয়া কোথাও উপনীত হওয়া যায় না, তখন মনোমধ্যে একটা অভূতপূর্ব্ব বিষাদের ভাব উপস্থিত হয়।

গৃহগুলি সম্ভবতঃ কাঠের ছিল। কিন্তু এত শতাব্দীর পর, তাহাদের কোন চিহ্নমাত্রও নাই। কেবল সোপানের ধাপ ও দ্বারদেশগুলি রহিয়া গিয়াছে। এক্ষণে এই বিলাসময় সুসমৃদ্ধ দ্বারপথগুলি বরাবর প্রসারিত হইয়া গাছের শিকড়, লতা-গুল্ম ও মৃত্তিকায় গিয়া শেষ হইয়াছে।

কিয়ৎ বৎসর হইতে, অনুরাধপুরের এক কোণে, একটি ক্ষুদ্র গ্রাম বসিয়াছে। সেখানে কতকগুলি লোক বাস করে। গ্রামটি তেমন বর্দ্ধিষ্ণু নয়—উহা একটি গোপ-পল্লী মাত্র। ভগ্নাবশেষ নগরটির ন্যায় এই গ্রামটিও তরুশাখায় আচ্ছন্ন। সুতরাং এখানেও সেই বিষাদের রাজত্ব। সে সকল ভারতবাসী এই ধ্বংস-নগরে আসিয়া আবার বাস করিতেছে, তাহারা অরণ্যের বৃহৎ বৃক্ষগুলিকে ছেদন করে নাই; পরন্তু, আগাছা ও কণ্টক গুল্ম প্রভৃতি কাটিয়া সাফ্ করিয়া, দিব্য শাদ্বলভূমি বাহির করিয়াছে। সেখানে এখন তাহাদের গো মহিষ ছাগল প্রভৃতি পালিত পশুগণ ছায়াতলে সুখস্বচ্ছেন্দ চরিয়া বেড়ায়। মন্দিরসংলগ্ন ভূমিতে বিচরণ করে বলিয়া সেখানকার লোকেরা ইহাদিগকে পরম পবিত্র বলিয়া মনে করে

যে সকল ভারতবাসী এই পবিত্র ভগ্নাবশেষের মধ্যে জীবনযাপন করে,

এই সকল ভগ্নপ্রাসাদসংলগ্ন পুষ্করিণীতে স্নান করে, তাহাদের বিশ্বাস, রাজা ও রাজকুমারদের "ভূত" সন্ধ্যার সময় এখানকার চারি দিকে ঘুরিয়া বেড়ায়; এই জন্য তাহারা জ্যোৎস্না-রাতে বড়-বড় দাগোবার ছায়াতলে কিছুতেই দাঁড়াইতে চাহে না।

তা ছাড়া, এই সুচ্ছায় স্থানটিকে তপস্যা ও ধ্যান ধারণার অনুকূল, পবিত্র আশ্রম বলিয়া উপলব্ধি হয়। দেবালয়-সুলভ একটি শান্তির ছায়া এই সকল পথের উপর, এই সকল গালিচা-বৎ তৃণভূমির উপর বিরাজমান। একজাতীয় বড়-বড় ফুল ইহার উপর বৃষ্টিবিন্দুর ন্যায় ঝরিয়া-ঝরিয়া পড়িতেছে।

দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বেকার ভগ্ন পাষাণমূর্ত্তিদিগের সম্মুখে, অরণ্যের মধ্যে, ছোট-ছোট প্রদীপ অষ্ট প্রহর জ্বলিতেছে; বহু পুরাতন পাষাণের উপর টাট্‌কা ফুল প্রতিদিন নিত্য-নিয়মিত স্থাপিত হইতেছে—এই দৃশ্যটি কি মর্ম্মস্পর্শী!

ভারতবর্ষে, দেবতাদিগকে ফুলের তোড়া উৎসর্গ করা হয় না; পরন্তু যূথী জাতি মল্লিকা মালতী প্রভৃতি শুভ্রবর্ণ ও সুগন্ধি পুষ্পরাশি পূজা-বেদিকার উপর অজস্র বিকীর্ণ হইয়া থাকে,—তাহার উপর দুই-চারিটি বঙ্গদেশীয় গোলাপ ও রক্তজবাও ছড়াইয়া দেওয়া হয়।

এই পূজোপহার ভগ্ন চূর্ণ মন্দিরের প্রস্তর-ফলকের উপর স্থাপিত হয়—যে প্রস্তরফলকগুলি ধীরে-ধীরে মৃত্তিকা-গর্ভে ক্রমশঃ বিলীন হইয়া যাইতেছে।

সিংহলে।

২। শৈল-মন্দির।

যে অরণ্যের মধ্যে ভগ্নাবশেষগুলি নিহিত, সেখান হইতে বাহির হইয়া, জঙ্গলের সম্মুখে আসিয়া পড়িলাম। এইখানকার শৈল-মন্দিরে পূর্ব্বতন দেব-দেবীর মূর্ত্তিগুলি অক্ষত রহিয়াছে। এই পরিত্যক্ত বন-ভূমির দূর দিগন্তে, এই শৈল-মন্দিরের ন্যায়, আরও অনেক শৈলপিণ্ড ইতস্ততঃ দৃষ্ট হয়। না জানি, পুরাকালের কোন্ প্রলয়-প্লাবনের প্রভাবে এইগুলি সমুদ্ভূত হইয়াছিল। ঠিক্ মনে হয়, যেন ধরণীর মুখ কালো হইয়া স্থানে স্থানে ফুলিয়া উঠিয়াছে। এই গোলাকার মসৃণ শৈলপিণ্ডগুলি কি করিয়া এখানে আসিল, চতুর্দ্দিকস্থ ভূমি হইতে তাহার কোন ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না; মনে হয়, যেন এক-একটা প্রকাণ্ড পশু যুথ-ভ্রষ্ট হইয়া তৃণভূমির উপর একাকী বসিয়া আছে।

বৃহদাকার কোন জন্তু-বিশেষ ও বৌদ্ধমন্দিরের "দাগোবা"—এই দুয়ের সম্মিলনে যেন এই মন্দিরটি নির্ম্মিত;—শ্যামল স্তূপের উপর সৌধ-ধবল ক্ষুদ্র একটি "দাগোবা" যেন স্থাপিত হইয়াছে। যেন হাতী তাহার কালো পিঠের উপর চূড়াকার একটা হাওদা বহন করিতেছে।

আমরা পৌঁছিয়া দেখিলাম, জঙ্গলটি অস্তোন্মুখ সূর্য্যের কিরণতলে প্রসারিত; চারি দিক নিস্তব্ধ; মন্দিরের সমীপে জন-প্রাণী নাই; ভূমির উপর চামেলী প্রভৃতি এক রাশি ফুল ছড়ানো রহিয়াছে; ফুলগুলি শুখাইয়া গিয়াছে, কিন্তু এখনও তার গন্ধ যায় নাই। এইগুলি পূর্ব্বদিনের পূ[illegible]। দেবতারা এখানেও যে বিস্মৃত নহেন, এই পুষ্পাঞ্জলিই তাহার সাক্ষী।

কোন বৃহদাকার জন্তুর ন্যায় এই শৈলমণ্ডলের গঠন-ভঙ্গী; উহার পাদ দেশ সরোবরের জলে বিধৌত; সরোবরটি কুম্ভীরের আবাস ও পঙ্কজ-শোভিত;

নিকটে আসিলে লক্ষ্য করা যায়, উহাদের মসৃণ গাত্রে কতকগুলি অস্পষ্ট উৎকীর্ণ-চিত্র মুদ্রিত রহিয়াছে। এত সূক্ষ্ম ও অস্পষ্ট যে, ছায়ার ন্যায় দৃষ্টিপথ হইতে ক্রমাগত সরিয়া সরিয়া যায়। কিন্তু চিত্রগুলি এরূপ নিপুণভাবে অঙ্কিত যে, প্রকৃত বলিয়া ভ্রম হয়। হস্তীর শুণ্ড, কর্ণ, পদ, অঙ্গাদির গঠন—ইহাই চিত্রের বিষয়। শৈলের প্রস্তরগুলি স্বভাবতই এমন আশ্চর্য্যভাবে বিন্যস্ত ও তাহাদের গায়ের এরূপ স্বাভাবিক রং যে, উহাতে হস্তীর গঠন ও বর্ণ যেন পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত হইয়াছিল। কেবল, শিল্পী অতি অপূর্ব্ব কৌশলে উহাদিগকে আপন কাজে লাগাইয়াছে,এইমাত্র। স্থানে স্থানে, এই গোলাকার শৈলের ফাটলে ফাটলে, ছোট-ছোট গাছের চারা বাহির হইয়াছে। পুরাতন চামড়ার রংএর মত এই শৈল-প্রস্তরের রং---এই রংএর গায়ে এই চারাগুলি এত পরিস্ফুট ও উজ্জ্বল দেখাইতেছে যে, সত্যকার উদ্ভিজ্জ বলিয়া মনে হয় না। 'পেরিউয়িঙ্কল্'এর গাছ খুব লাল, 'হিবিসকাস'ও খুব লাল, সুপারীর চারাগুলি অত্যন্ত সবুজ। মনে হয়, যেন খাগড়ার ডাঁটার উপর পালকের থোপ্না ঝুলিতেছে।

শৈলমণ্ডলের পশ্চাদ্দেশে একটি প্রাচীন ধরণের ছোট বাড়ী প্রচ্ছন্ন। উহার মধ্যে মন্দির-রক্ষক বৌদ্ধ-পুরোহিতেরা বাস করে। উহাদিগের মধ্যে এক জন, আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য বাহির হইয়া আসিলেন ;— যুবা পুরুষ, বৌদ্ধ পুরোহিতের অনুরূপ পীত রংএর বহির্বাসে গাত্র আচ্ছাদিত, কেবল একটি স্কন্ধ ও একটি বাহু অনাবৃত। দেবালয়ের দ্বার উদ্ঘাটন করিবার জন্য এক ফুটের অধিক লম্বা, কারুকার্য্যে অলঙ্কৃত একটি চাবি তাঁহার সঙ্গে। ইঁহার মুখ সুন্দর ও গম্ভীর, ইঁহার চোখ দুটিতে যোগিজন-সুলভ রহস্যময় ধ্যানের ভাব যেন পরিব্যক্ত। হস্তে চাবিটি লইয়া যখন ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিলেন, তখন সূর্য্যের কনক-কিরণ তাঁহার উপর পতিত হওয়ায় মনে হইল, যেন আমাদের 'পিটার'-মুনির তাম্রপ্রতিমাটি রক্ত বর্ণে রঞ্জিত না হইয়া, পীতবর্ণে রঞ্জিত হইয়াছে। লাল

'পেরি-উইঙ্কলে'র ঝোপের মধ্য দিয়া শৈল-খোদিত একটা সিঁড়ি বাহিয়া. আমরা উপরে উঠিলাম। চতুর্দ্দিকের জঙ্গল-পরিধিটি যেন আরও বর্দ্ধিত হইল।

মুখ্য শৈলখণ্ডের মধ্য-পথে কঠোর শৈল-গর্ভ ভেদ করিয়া, পাথর কাটিয়া দেবালয়টি নির্ম্মিত। প্রথমে একটি গহ্বর; সেখানে প্রস্তর-বেদিকার উপর, যূথী জাতি মল্লিকা প্রভৃতি টাট্‌কা ফুল বিকীর্ণ রহিয়াছে। গহ্বরের শেষ সীমায় দেবালয়ের প্রবেশ-দ্বার। দুইটি তাম্রকবাটে দ্বারটি রুদ্ধ। উহাতে, কারুকার্য্যবিশিষ্ট একটি প্রকাণ্ড তালা লাগানো আছে।

ঝনৎকার-সহকারে ধাতব কবাটদ্বয় উদ্‌ঘাটিত হইবামাত্র, রং-করা কতকগুলি বড়-বড় পুতুল বাহির হইয়া পড়িল। বহুমূল্য সুগন্ধি-নির্য্যাসের চৌবাচ্চা যেন সহসা অনাবৃত হইল। প্রতিদিন, গোলাপ-নির্য্যাসে ও চন্দন-রসে ভূমি পরিসিক্ত ও যূথী-জাতি-মল্লিকা প্রভৃতি সুগন্ধি শুভ্র পুষ্প-স্তবকে সমাচ্ছন্ন হওয়ায়, তত্রস্থ বায়ু সুরভিত ও কুট্টিম-তল একেবারে সাদা হইয়া গিয়াছে। যে দেবতারা এই সুড়ঙ্গ-গর্ভের অন্ধকারে বাস করেন, তাঁহারা এই সুরম্য সুমধুর সৌরভের মধ্যে নিত্য নিমগ্ন।

এই দেবালয়ে অনেকগুলি পুত্তলিকা; কক্ষটি আলমারীর ন্যায় সংকীর্ণ, কুষ্টে-সৃষ্টে ৪।৫ জনের দাঁড়াইবার স্থান হয়। দেবীগুলি ১২ ফুট উচ্চ, শৈলপ্রস্তরের মধ্য হইতেই খুদিয়া বাহির করা, এবং বিবিধ সাজসজ্জায় বিভূষিত। বৌদ্ধপুরোহিতের পরিচ্ছদের ন্যায় ইঁহাদের মুখ পীতবর্ণ, এবং ইঁহাদের মুকুটগুলি খিলানে গিয়া ঠেকিয়াছে। মধ্যস্থলে অতিমানুষ-বিরাট-আকারের একটি বুদ্ধমূর্ত্তি সেই পরিচিত চিরধ্যানের ভঙ্গীতে আসনস্থ। পুত্তলিকার আকারে ছোট ছোট দেবতারা ইঁহার সমীপে ঘেঁসাঘেঁসি বসিয়া আছেন। আর যে বিরাট দেবীমূর্ত্তিগুলি মণ্ডলাকারে চারি দিকে অবস্থিত, উঁহারা যেন এই পুতুলগুলির দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া আছে। উঁহাদের অলঙ্কারগুলি খুব উজ্জ্বল, রং এখনও বেশ টাটকা রহিয়াছে,

প্রস্তরময় পরিচ্ছদগুলি লাল নীল রংএ রঞ্জিত। এ সব সত্ত্বেও, ঐ আয়ত-নেত্র মহোদয়গণকে পুরাকালের লোক বলিয়াই মনে হয়।

আমি এখানে হঠাৎ আসায়, এই দেবতাদিগের গুহায় আজ একটু আলোক প্রবেশ করিয়াছে; দেবতারা, সম্মুখস্থ বিমুক্ত দালানের মধ্য দিয়া—যেখানে তাঁহাদিগের পূর্ব্ব শতাব্দীর ভক্তগণ বাস করিতেন—সেই জঙ্গলের দূরদিগন্তদেশ পর্য্যন্ত এক্ষণে অবলোকন করিবার অবসর পাইলেন।

আমি তাঁহাদের মুখ-পানে একবার চাহিয়া দেখিলাম, পরক্ষণেই মন্দির-রক্ষক পুরোহিতেরা দেবালয়ের সেই পুণ্য-কক্ষটি আবার বন্ধ করিয়া দিল; শৈলগহ্বরবাসী দেবতারা স্বকীয় সুরভিত অন্ধকার ও নিস্তব্ধতার মধ্যে আবার নিমগ্ন হইলেন।

আমি বিদেশী—আমার নিকটে, বৌদ্ধদিগের এই সকল সাঙ্কেতিক মূর্ত্তি, বৌদ্ধধর্ম্মের শান্তি, এখনও প্রহেলিকাবৎ দুর্জ্ঞেয়।

আমি চলিলাম। পীতবসনধারী রক্ষকেরাও স্বকীয় আশ্রম-নিবাসে ধীরে ধীরে প্রস্থান করিলেন।

এই অপূর্ব্ব মন্দিরপুরোহিতদিগের আর কোন পার্থিব চিন্তা নাই। দেবালয়ে ফুল সাজানই উঁহাদের একমাত্র কাজ। এই বিজন আশ্রমে থাকিয়া, সুখ-দুঃখ-বিবর্জ্জিত হইয়া, যাহাতে দীর্ঘকাল জীবনযাপন করিতে পারে, এবং এই নশ্বর জীবনের পরেও যাহাতে জন্ম-বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া ব্যক্তিত্বহীন ঘোরতমসাচ্ছন্ন অনন্তের মধ্যে আপনাকে বিলীন করিতে পারে,—ইহাই তাহাদের একমাত্র আশা।

ঐই শৈল-মন্দিরের জঙ্গল ত্যাগ করিয়া, যখন আবার সেই অরণ্য-সুপ্ত অনুরাধপুরে প্রবেশ করিবার জন্য যাত্রা করিলাম, তখন সূর্য্য অস্তোন্মুখ। রাত্রিকালে ধ্বংসাবশেষের মধ্যে বিচরণ করিয়া, কল্য প্রভাতেই আবার এখান হইতে প্রস্থান করিব।

“ 'চন্দ্র'-পথ ও 'রাজ'-পথ—এই দুটি রাস্তা সব-চেয়ে বড়।

বালুকাচ্ছন্ন রাস্তাটি আয়তনে উহাদের চতুর্থাংশ। "'চন্দ্র'-পথের দুই ধারে এগারো হাজার কোঠা বাড়ী দৃষ্ট হয়। সদর-দরজা হইতে দক্ষিণের দ্বার পর্য্যন্ত দূরত্বে আট ক্রোশ; এবং উত্তর-দ্বার হইতে দক্ষিণ-দ্বার পর্য্যন্ত ঠিক আর আট ক্রোশ।"

অরণ্যের বৃক্ষতলে কত রাশি-রাশি প্রস্তর, প্রাচীন ধরণের কত পাষাণ-প্রতিমা—তার আর শেষ নাই। কিরীট-ভূষিত দেব দেবী; কুম্ভীরের দেহ, হস্তীর শুণ্ড ও পক্ষীর পুচ্ছবিশিষ্ট বিকটাকার বিবিধ মূর্ত্তি। আর, থামের পর থাম চলিয়াছে;—কতকগুলি স্তম্ভ শ্রেণীবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান, কতকগুলি ভগ্ন ও স্বস্থান-ভ্রষ্ট। তা ছাড়া, ভগ্ন-গৃহের কত যে দেহলী, তার আর সংখ্যা নাই। দ্বারদেশের সোপান-ধাপের প্রত্যেক ধারে এক-একটি ক্ষুদ্র স্মিতাননা দেবী-মূর্ত্তি, লতা পাতা শিকড়-জালের মধ্যে আসিবার জন্য যেন ইঙ্গিতে আহ্বান করিতেছে। এই সকল গৃহের গৃহস্বামীরা সেই তমসাচ্ছন্ন পুরাকালে অতীব আতিথেয় ছিলেন, সন্দেহ নাই; কিন্তু বহু শতাব্দী হইতে ইহাদের ভস্ম পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়াছে।

কনক-রাগ-রঞ্জিত সায়াহ্নে, আমার আবাস-গৃহ হইতে বহুদূরে, রাজাদের প্রাসাদ-অঞ্চলে গিয়া উপস্থিত হইলাম। সেখানে বৃহৎ ভিত্তি-বেষ্টন ও প্রস্তরখোদিত সোপান-ধাপ ভিন্ন আর কিছুই অবশিষ্ট নাই। চারিদিকে শ্মশানের নিস্তব্ধতা। একটি কীটের শব্দ নাই, একটি পাখীর ডাক নাই। ঐইখানে একটি বৃহৎ চতুষ্কোণ পদ্ম-পুষ্করিণীর ধারে আমি বিশ্রাম করিতেছি। পুষ্করিণীর ধার পাথর দিয়া বাঁধানো; ইহা গজরাজদিগের স্নানাগার। অরণ্যের মধ্যে এইটুকুই তরুশূন্য মুক্ত পরিসর।

এই পুষ্করিণীর জলে ক্রমাগত বুদ্‌বুদ্ উঠিয়া এক একটা চক্র রচনা করিতেছে; এই কবোষ্ণ জলের মধ্যে সর্প কুম্মের সহিত যে সকল কুম্ভীর বাস করে, তাহাদের নিশ্বাসবায়ুতে ঐই জলবুদ্‌বুদগুলি উৎপন্ন হইতেছে।

এই অঞ্চলের মধ্যে ঝোপ-ঝাড় কিছুমাত্র নাই। অরণ্যস্থিত ধ্বংস-রাজ্যের দূর প্রান্ত পর্য্যন্ত চারি দিকে আমার দৃষ্টি অবাধে সঞ্চরণ করিতেছে। পশ্চিম দিগন্তে হঠাৎ যেন একটা আগুন জ্বলিয়া উঠিল। গাছের ফাঁকে রশ্মি প্রবেশ করিয়া আমার চক্ষু যেন ঝলসিয়া দিল;—উহা অস্তমান সূর্য্য ভিন্ন আর কিছুই নহে। পৃথিবীর যে অক্ষাংশবৃত্তে আমরা অবস্থিত, তাহাতে শীঘ্রই রাত্রি আসিয়া পড়িবে।

আরও বেশী দেখিবার জন্য আমি তাড়াতাড়ি আরও দূরে চলিয়া গেলাম। আজ সন্ধ্যায় যতক্ষণ পারি ভ্রমণ করিব; কেন না, আজ এখানে আমার শেষ দিন।

দিবাবসানে, আমি যে নূতন ভূভাগে প্রবেশ করিলাম, তাহা আমার নিকট অতীব রমণীয় বলিয়া বোধ হইল। ভূমির মৃত্তিকা সুকুমার, একটু শুষ্ক, একটু বালুকাময়, ছোট ছোট তৃণে আচ্ছন্ন; শৈশবে যে অরণ্য-ভূমির সহিত আমি পরিচিত ছিলাম, ইহা কতকটা সেইরূপ। ইহা ছাড়া আরও কতকগুলি জিনিস দেখিয়া জন্মভূমি বলিয়া আমার যেন আরও বিভ্রম উপস্থিত হইল। সেই সেখানকারই মত কৃষক ও গোমেষাদির পদক্ষুণ্ণ মেঠো পথ; আমাদের দেশের ওক্‌গাছের ন্যায়, ঘন-শ্যামল-ক্ষুদ্র-পল্লব-যুক্ত ও ধূসরবর্ণের শাখা-প্রশাখা-বিশিষ্ট সেই তরুগণ, সেই মেঠো নিস্তব্ধতা, সেই সন্ধ্যার বিষণ্ণতা * * কিন্তু এই ভগ্নাবশেষগুলি, এই বৃহৎ প্রস্তরগুলি, নিত্য নিয়ত আমার নেত্র-সমক্ষে থাকায়, বিশেষতঃ এই পাষাণ-প্রতিমাগুলির রহস্যময় মুখশ্রী আমার মনে সতত জাগরূক থাকায়, এই স্বদেশসম্বন্ধীয় বিভ্রমটি অধিকক্ষণ স্থায়ী হইতে পারে না।

ক্রমশঃ অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছে। যে সকল নিঃসঙ্গ বুদ্ধ-মূর্ত্তি ধ্যানাসনে উপবিষ্ট হইয়া স্মিতমুখে শূন্যের দিকে চাহিয়া আছে, তাহাদের ছায়াও যেন এই অন্ধকারে ভয়-বিচলিত হইয়া উঠিয়াছে।

এখান হইতে ফিরিয়া, কুকুর ও নেকড়েবাঘদিগের মধ্য দিয়া এক্ষণে

যে প্রদেশে প্রবেশ করিতেছি, উহা যেন আরও বিষাদ-মধুর—একেবারেই যেন আমাদের দেশের মত। এই চতুর্দ্দিকস্থ ভারতীয় অরণ্যের ভাবটি যদিও আমার অন্তরের অন্তস্তলে গূঢ়ভাবে জাগিতেছে, তবু যেন আমার মনে হইতেছে, আমি Saintonge কিংবা Aunisএর ওকৃবৃক্ষের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছি; তাই আমি এই অরণ্যের মধ্য দিয়া বিশ্রদ্ধভাবে চলিতেছি।

আমার বিশ্বাস ছিল, আমি এখানে সম্পূর্ণ-রূপে একাকী, তাই হঠাৎ আমার পার্শ্বে একটি প্রকাণ্ড মনুষ্যমূর্ত্তি দেখিয়া আমি শিহরিয়া উঠিলাম। তাহার হস্তদ্বয় কটিদেশে লগ্ন ও মস্তক আনতঃ—বুদ্ধের এই পাষাণ-প্রতিমাটি দুই সহস্র বৎসর হইতে এইখানেই বসিয়া আছে!

তাহার মুখের কাছে আসিয়া, অন্ধকারের মধ্যে দেখিলাম, সেই তার চির-নত দৃষ্টি, সেই তার চিরন্তন স্মিত-হাস্য!

এই সময়ে বিশেষতঃ এই চন্দ্রালোকে, যখন মন্দিরের চূড়াগুলি জঙ্গলের সুদূরপ্রান্ত পর্য্যন্ত, স্বকীয় ছায়া প্রসারিত করে, তখন কি এক পবিত্র ধর্ম্মভাব-রঞ্জিত শান্তিরসের আবির্ভাব হয়। আজ এই সন্ধ্যাকালে চন্দ্রমা সুনীলকিরণ বর্ষণ করিতেছেন। আজ একটি রাত্রি আমি এই অরণ্যে যাপন করিলাম, আর সৌভাগ্যক্রমে আজিকার রাত্রিতেই দিগ্বিদিক্ স্বর্গীয় আলোকে প্লাবিত হইল। আমাদের জুলাই মাসের তরল স্বচ্ছ উষ্ণরাত্রির কথা মনে পড়িতেছে। কেবল প্রভেদ এইমাত্র:—মনে হয়, এখানে গ্রীষ্মকালের যেন অন্ত নাই। গাছের ফাঁকে-ফাঁকে, পদক্ষুণ্ণ-পথবিশিষ্ট সুন্দর শাদ্বল-ভূমির উপরে—আকাশের যে অংশ তরুশাখায় ঢাকা পড়ে নাই, সেই নভোদেশে—এমন কি সর্ব্বত্রই এখন আলোকে আলোকময়!

এই সময় কীটদিগের সুতীব্র নৈশ সঙ্গীতে চতুর্দ্দিক অনুরণিত হইলেও, যতই আমি অরণ্য-গভীরে প্রবেশ করিতেছি, ততই যেন নিস্তব্ধতার মধ্যে ক্রমশঃ মগ্ন হইয়া যাইতেছি।

আমি এখানে একাকীই বিচরণ করিতেছি। জ্যোস্নালোকে যে ছায়া দেখিয়া এখানকার লোকেরা ভয় পায়, আমি সেই মন্দির-চূড়ার প্রকাণ্ড ছায়ার অভিমুখে একাকীই অগ্রসর হইতেছি। পুরোহিত ও রাজাদিগের অপছায়ার ভয়ে, আমার পথ-নেতা আমার সঙ্গে আসে নাই। যখন আমি এখানকার একটি মন্দিরে আসিয়া পৌঁছিলাম, তখন উহার প্রকাণ্ড দাগোবার নিকট যাইবার উদ্দেশে, যে পার্শ্বে জ্যোৎস্না পড়িয়াছে, আমার স্বাভাবিক প্রবৃত্তির উচ্ছ্বাসে,—আমি সেই অংশটিই আপনা হইতেই বাছিয়া লইলাম।

এই পরিসর-স্থানটুকু প্রেতাত্মার বিচরণভূমি বলিয়াই যেন বোধ হয়। চারি দিকেই সারি সারি স্তম্ভ। এইখানে বিচরণ করিতে করিতে হঠাৎ একটা পাথরের টালির উপর পা পড়ায়, সেই শব্দে চারি দিক প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। তখন দেখিলাম, ভগ্নাবয়ব দেবদেবীর মূর্ত্তির মধ্যে, বেদিকা প্রভৃতির ভগ্নাবশেষের মধ্যে আমি আসিয়া পড়িয়াছি;—সমস্তই নীল আলোকে প্লাবিত।

নিস্তব্ধ অনুরাধপুরের মধ্যে, এখানকার নিস্তব্ধতায় কি যেন একটু বিশেষত্ব আছে; এখানকার লোকদিগের ন্যায় ভয়গ্রস্ত হইয়া আমি থমকিয়া দাঁড়াইলাম; দাগোবার চারি দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতে—সেই ভীতিজনক ছায়াময় প্রদেশে প্রবেশ করিতে আমার আর সাহস হইল না।

যাহা হউক, যে সকল রাজা—যে সকল পুরোহিত এই মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা এখন কোথায়?—কোন্ নির্ব্বাণের মধ্যে, কোন্ ধূলিরাশির মধ্যে তাঁহারা এখন অবস্থিত? তবে সেই দূর দেশ হইতে তাঁহাদের অপচ্ছায়া এখানে আসিবে কি করিয়া?

তা ছাড়া আমার মনে হইতেছে, যে ধর্ম্মে তাঁহারা বিশ্বাস করিতেন, সেই বৌদ্ধ ধর্ম্ম এখন মৃত,—এখানকার ভগ্নাবশেষের মধ্যে—পুত্তলিকা-দিগের পুরাতন ভস্মের মধ্যে উহা বিলীন হইয়া গিয়াছে।

ত্রিবঙ্কুর-মহারাজের রাজ্যাভিমুখে।

এখন সন্ধ্যা। এই সময়ে সূর্য্যাস্তের পরেই সুস্নিগ্ধ প্রশান্তি ও মধুর শৈত্য কোথা হইতে যেন সহসা আবির্ভূত হয়। কিয়ৎকালের জন্য আমি এই ক্ষুদ্র অনাদৃত পলঙ্কটা-গ্রামে বিশ্রাম করিতেছি। এইখানেই আজ রাত্রি-যাপন করিতে হইবে।

এই দিবাবসানসময়ে, এই তরুতলে, এই নিস্তব্ধতার মধ্যে, আমি আজ সর্ব্বপ্রথমে বাস্তবিকই দূরদেশে আসিয়াছি বলিয়া অনুভব করিতেছি।

আমি ফ্রান্স্ হইতে ডাক-জাহাজে করিয়া, হরিৎ-শ্যামল আর্দ্রভূমি সিংহলদ্বীপে প্রথম উপনীত হই। সেইখানে সপ্তাহকাল থাকিয়া, পরে উপকূলগামী একটা জঘন্য জাহাজে উঠিয়া, গতরাত্রে ম্যানার-উপসাগর পার হইয়াছি। সেইখানকার সমুদ্র যেন অষ্টপ্রহর টগ্‌বগ্ করিয়া ফুটিতেছে। তাহার পর, সমস্তদিন শকটে আরোহণ করিয়া, খুব শীঘ্র এই গ্রামে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। ত্রিবঙ্কুরাধিপতি আমার তত্ত্বাবধানের জন্য একটি লোক পাঠাইয়াছিলেন। তিনি আমার জন্য, সুনিবিড় তরুপল্লবের ছায়াতলে একটি ছোট শাদা বাড়ী ঠিক্ করিয়া রাখিয়াছেন—সেইখানে আমাকে লইয়া গেলেন।

আগামী কল্য গরুর গাড়ি করিয়া ত্রিবঙ্কুর-রাজ্যের অধিকারভুক্ত একটি প্রদেশে উপনীত হইব। সেইখান হইতে আমার যাত্রা আরম্ভ হইবে। লোকে এই প্রদেশটিকে "থয়রাৎ-মহল"ও বলিয়া থাকে। আমার এই প্রদেশটিকে সুখশান্তির আশ্রম বলিয়া মনে হয়। বর্ত্তমানশতাব্দীসুলভ বিলাসবিভবের সহিত ইহার কোন সম্পর্কই নাই;—পার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশসমূহ হইতে একেবারে বিচ্ছিন্ন, লোকবিরল, তাল নারিকেল প্রভৃতি তরুমণ্ডপের ছায়াতলে অবস্থিত।

রাত্রি হইয়া আসিতেছে; গ্রীষ্মকালের অতি সুন্দর রাত্রি, কিন্তু চন্দ্রহীন। সেই লোকটি ব্রাহ্মণমন্দিরের দীপালোক দেখাইবার জন্য আমাকে শকটে করিয়া লইয়া গেল। এই মন্দিরটি "তৃণবল্লী"-নামক পার্শ্ববর্ত্তী নগরে অবস্থিত। দাক্ষিণাত্যের মন্দিরগুলির মধ্যে ইহা সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। শকটের বাহনেরা সহজ দুল্‌কি-চালে চলিতেছে। আমরা রহস্যময় তরুপুঞ্জের মধ্য দিয়া চলিয়াছি; আমাদের মস্তকোপরি শ্যামল পল্লবজাল প্রসারিত; সেই সকল বৃক্ষের শাখাপ্রশাখা হইতে শিকড় বিস্তৃত হইয়া আবার তাহাদের সহিত যেন মিলিবার চেষ্টা করিতেছে। তরঙ্গিত শিকড়-জাল সুদীর্ঘ কেশগুচ্ছের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে। পল্লবপুঞ্জের উপরে, পল্লবের ফাঁকে-ফাঁকে আকাশের অযুত তারা, এবং নিম্নতলে—এমন কি, তৃণভূমির উপরেও—অসংখ্য জোনাকি ঝিক্‌মিক্‌ করিতেছে। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে, প্রাত সন্ধ্যায়, আতসবাজির স্ফুলিঙ্গবৎ এই কীটগুলি জ্বলিতে থাকে। তারকা ও জোনাকির স্ফুলিঙ্গজ্যোতি এরূপ পরস্পরের সহিত মিশিয়া গিয়াছে যে, উহার মধ্যে কোন্‌টি জ্যোতিষ্ক ও কোন্‌টি জ্যোতিরিঙ্গণ, তাহা নিরূপণ করা দুষ্কর।

সিংহলের অবসাদজনক আর্দ্রবায়ু ত্যাগ করিয়া, এইখানে আবার স্বাস্থ্যকর শুষ্কবায়ুর মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছি। ফ্রান্সের গ্রীষ্মকালীন সুন্দর রাত্রির মত, এখানে আবার সেইরূপ সুখস্পর্শ অনিল, নিশ্বাসের সহিত গ্রহণ করিতেছি; এবং জুন্‌মাসে ফ্রান্সের পল্লীগ্রামে যেরূপ শুনা যায়, এখানেও সেইরূপ ঝিল্লীসঙ্গীত চারিদিক হইতে শুনিতেছি। কিন্তু এই সকল পথে যে পথিকলোকের সহিত সাক্ষাৎ হইতেছে, তাহারা আমাদের চক্ষে অদ্ভুত; —এই সকল তাম্রমূর্ত্তি পথিকেরা নিঃশব্দে খালি-পায়ে চলিয়াছে। তাহাদের স্কন্ধের উপর মল্‌মলের উত্তরীয়। মধ্যে-মধ্যে, দূর হইতে যখন ঢাক্‌-ঢোলের শব্দ অথবা শানাইযন্ত্রসমুত্থিত আর্ত্তনাদের আলাপ শুনিতে পাই, তখনি ঠিক বুঝিতে পারি, এটি পৃথিবীর কোন্ বিভাগ; তখনি ইহাকে ভারতবর্ষ বলিয়া,

ব্রাহ্মণের দেশ বলিয়া চিনিতে পারি; আর তখনি বুঝিতে পারি, আমাদের দেশ হইতে এই স্থানটি কতটা দূর।

তরুতিমিরের মধ্যে, ছোট ছোট শাদা বারাণ্ডাওয়ালা বাড়ী পথের দুইধারে দেখা দিতে শুরু করিয়াছে; যেখানে আমাদের যাইবার কথা, সেই তৃণবল্লী-নগরে ইহারই মধ্যে আমরা আসিয়া পড়িয়াছি। পথের দুইধারে তালজাতীয় বৃক্ষশ্রেণী;—ভঙ্গুর বৃন্তের উপর ভর করিয়া আকাশে যেন কালো-কালো পাখা বিস্তার করিয়া আছে। এই তরুপথটি যেখানে শেষ হইয়াছে, সেইখানে একটি ছায়াচিত্র অঙ্কিত দেখিলাম। এই ছায়া-চিত্রটি একটু বিশেষ-ধরণের, অতীব নয়নাকর্ষক। ইহা একটি প্রকাণ্ড মন্দির। ভারতবর্ষে যে কখনো আসে নাই, সে-ও ইহাকে মন্দির বলিয়া চিনিতে পারে; কেন না, চিত্র-প্রতিমূর্ত্তি-আদি দেখিয়া, পূর্ব্ব হইতেই উহাদের আকারসম্বন্ধে সকলেরই কিছু-না-কিছু অস্পষ্ট ধারণা থাকে। কিন্তু ঈদৃশ প্রকাণ্ড মন্দির সহসা নৈশগগনে সমুত্থিত দেখিব, ইহা কখন কল্পনা বা প্রত্যাশা করি নাই। ইহা যেন রাশীকৃত দেবমূর্ত্তির একটা প্রকাণ্ড স্তূপ; ইহার চূড়াদেশও বিকটাকার মূর্ত্তিতে আকীর্ণ। অসংখ্য-তারকাদীপ্ত আকাশপটের উপর এই ছায়চিত্রের কৃষ্ণবর্ণ-রেখাপাত হইয়াছে।

একটু পরেই আমাদের গাড়ি, একটি প্রস্তরময় খিলানমণ্ডপের মধ্য দিয়া সেকেলেধরনের গুরুভার সমচতুষ্কোণ স্তম্ভশ্রেণীর মধ্যে প্রবেশ করিল। মন্দিরের এই অগ্রবর্ত্তী প্রদেশটি অতিক্রম করিয়া, আবার যখন আমাদের মস্তকোপরি তারকা-মণি-খচিত গগনাম্বর প্রসারিত হইল, তখন দেখিলাম, একটা বিপুল ঘেরের সম্মুখে আসিয়া পড়িয়াছি। তাহার সীমা লঙ্ঘন করিবার আমাদের অধিকার নাই। সেই প্রকাণ্ড মন্দিরস্তূপটি একেবারে আমাদের সম্মুখে—খুব নিকটে। সেই বিসদৃশপরিমাণযুক্ত মহাভারাক্রান্ত প্রকাণ্ড মন্দিরচূড়ার নিম্ন দিয়া একটি পথ গিয়াছে—তাহার মধ্যে আমাদের

প্রবেশাধিকার নাই। কিন্তু সেই প্রবেশপথের মুখটি এত বড় যে, সেখান হইতে অভ্যন্তরস্থ দেবমণ্ডপের সুদূর পশ্চাদ্ভাগ পর্য্যন্ত আমার দৃষ্টিগোচর হইতেছে। সেই পবিত্র অন্ধকারের মধ্যে, মন্দিরমণ্ডপের দুই ধারে অসংখ্য রহস্যময় দীপাবলী সারি-সারি সজ্জিত। সেখান হইতে দেখিতে নিষেধ নাই; কিন্তু তাহাও বেশিক্ষণের জন্য কিংবা খুব নিকটে গিয়া দেখা নিষিদ্ধ।

এই সুদূরপ্রসারিত প্রবেশপথের প্রত্যেক দিকে মণ্ডলাকারে-বিন্যস্ত স্তম্ভশ্রেণীর নিম্নে, ছোট-ছোট মশালের আলোকে, দেবতাদের ব্যবহারের জন্য ফুলের দোকান, মালার দোকান, মিষ্টান্নের দোকান বসিয়াছে। এই মশালের আলোকে, দোকানদারদিগকে এবং মন্দিরের প্রস্তরময় তলদেশটি বেশ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। সেই প্রস্তরে বিকটাকার বিবিধ মূর্ত্তি, অদ্ভুতাকার জীবজন্তুর মূর্ত্তি খোদিত, কিন্তু সেই মূর্ত্তিগুলি ক্ষয়গ্রস্ত ও বিলুপ্তমুখশ্রী। ঐ সকল দোকানদারেরাও দেবমূর্ত্তিবৎ অচল। উহাদের শ্যামল নগ্নগাত্র ঐ সকল লাল পাথরের উপর ঠেস দিয়া রহিয়াছে; নেত্রগুলি জ্বল্‌জ্বল্ করিতেছে; এবং উহাদের রমণীসুলভ সুদীর্ঘ কৃষ্ণ কেশগুচ্ছ স্কন্ধের উপর লতাইয়া পড়িয়াছে। উপরে থামগুলির মাথায়, খিলানমণ্ডলের সমীপবর্ত্তী স্থানে অন্ধকার একাধিপত্য করিতেছে।

মণ্ডপের সুদূর পশ্চাদ্ভাগ পর্য্যন্ত আমি অলক্ষিতভাবে এখান হইতে সমস্ত দেখিতেছি। অফুরন্ত সারি সারি স্তম্ভ অস্পষ্টরূপে উপলব্ধি হইতেছে। ক্ষীণপ্রভ দীপাবলী ঘনঘোর অন্ধকারের মধ্যে কোথায় যেন হারাইয়া গিয়াছে। সুদূর প্রান্তে শুভ্রবসন মনুষ্যমূর্ত্তিসকল বিশৃঙ্খলভাবে চলাফেরা করিতেছে। এবং ঐ স্থানটি স্তুতিপাঠে ও গানকীর্ত্তনে মুহুর্মুহু অনুরণিত হইতেছে।

যে নিষিদ্ধ দ্বার দিয়া আমি লুকাইয়া দেখিতেছি, তাহার গঠন অতি অপূর্ব্ব;—একেবারেই বাস্তুবিদ্যার অপরিজ্ঞাত। দ্বারের প্রকোষ্ঠটি খুব

বড়। কিন্তু এতাদৃশ প্রকাণ্ড গগনস্পর্শী চূড়ার তুলনায়, মন্দিরের দ্বারটি বড়ই নীচু, এমন কি গুপ্তপথ বলিয়াও মনে হইতে পারে; মনে হয়, উহা যেন সুরঙ্গপথের দ্বার—রহস্যরাজ্যের প্রবেশপথ!

জীবনের মধ্যে এই সর্ব্বপ্রথম ব্রাহ্মণদিগের একটি মন্দির দেখিয়া আমার মনে হইল, আমি এমন একটা কিছু দেখিলাম, যাহা পৌত্তলিকতার বিষাদ-অন্ধকারে আচ্ছন্ন;—ভীষণ বৈরভাবাপন্ন লোকের দ্বারা পূর্ণ। আমি এইরূপ দেখিব বলিয়া প্রত্যাশা করি নাই; আর ইহাও ভাবি নাই, মন্দিরে আমার প্রবেশনিষেধ হইবে। আমি কতকটা আশা করিয়াছিলাম, ভারতবর্ষে গিয়া, মহাপূর্ব্বপুরুষগণ-অবলম্বিত ধর্ম্মের অন্তস্তলে কিঞ্চিৎ জ্ঞানালোক প্রাপ্ত হইব। কিন্তু এখন আমার সেই চিরপোষিত আশা অতীব শূন্যগর্ভ ও নিতান্ত "ছেলেমানুষি" বলিয়া মনে হইতেছে।

আহা! খৃষ্টধর্ম্মের মধ্যে কেমন একটি মন-ভুলানিয়া মধুময় শান্তির ভাব বিরাজিত—সেই ধর্ম্ম, যাহার দ্বার সকলেরই নিকট অবারিত এবং যাহা শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তিদিগেরও হিতসাধনে সতত নিযুক্ত।...

এখন আমাকে সকলে এইরূপ আশ্বাস দিতেছে, ভারতবর্ষের অন্য প্রদেশে, দেবালয়ের মধ্যে এতটা দারুণ কঠোরতা লক্ষিত হইবে না, এমন কি—সেখানকার দেবালয়ে হয় তো আমি প্রবেশ করিতেও অনুমতি পাইব। যাহা হউক, এইবার এইখান হইতে সরিয়া পড়াই ভাল—বেশিক্ষণ থাকাটা সুবুদ্ধির কাজ নহে। কিন্তু যদি ইচ্ছা করি, গাড়িতে থাকিয়া আস্তে-আস্তে এই বৃহৎ মন্দিরের চারিদিক্ প্রদক্ষিণ করিতে পারি—তাহাতে কোন বাধা নাই।

মন্দিরের ঘেরটা সমচতুষ্কোণ,—এত বৃহৎ যে, ইহার মধ্যে একটা নগরের সমাবেশ হইতে পারে। ইহার চতুঃসীমার মধ্যস্থল হইতে একটি প্রকাণ্ড স্তূপ সমুত্থিত—উহার নিম্নদেশে একটি দ্বার ফুটানো আছে। এই সকল মূক প্রাচীর—যাহার ধার দিয়া আমরা নিস্তব্ধ

অন্ধকারের মধ্যে চলিয়াছি,—উহা দুর্গপ্রাচীরের ন্যায় কঠোরভাবে খাড়া হইয়া আছে। যে বিজন পথটি আমরা অনুসরণ করিতেছি, উহা সেই পবিত্র গণ্ডিরই সামিল,—যাহার মধ্যে নীচজাতীয় লোকের প্রবেশ নিষিদ্ধ। এইখানে আর-একপ্রকার প্রকাণ্ড স্তূপের পাশ দিয়া আমরা চলিয়া গেলাম—উহা দৈবক্রমে ঐস্থলে আট্‌কাইয়া পড়িয়াছে। উহাও দেখিতে দেবমন্দিরের ন্যায়—কতকগুলি বিরাট্‌ চাকার উপর স্থাপিত; পর্ব্ব-উৎসবের দিনে দেবতাদিগকে হাওয়া খাওয়াইবার জন্য সহস্র-সহস্র লোক এই রথগুলিকে টানিয়া লইয়া যায়; রথের চাকা বসিয়া গিয়াছে, তাই আজ্‌ রাত্রে দেবতারা মর্ত্ত্যদিগেরই ন্যায় এইখানেই নিদ্রা যাইবেন।

আমাদের দুই ধারে সারি-সারি তালজাতীয় উচ্চবৃক্ষ—উহাদের কালো-কালো পাখা ঝুঁকিয়া রহিয়াছে; যে সময়ে আমরা এই তরুবীথির মধ্য দিয়া চলিয়া আসিলাম, সেই সময়ে ভক্তির প্রচণ্ড উন্মত্ত উল্লাস চারিদিকে উচ্ছ্বসিত হইতেছিল,—সেই সময় ধর্ম্মের কতকগুলি বিশেষ অনুষ্ঠানের উদ্যোগ চলিতেছিল। এই প্রশান্ত সুন্দর রাত্রিতে, গহ্বর-গভীর ঢাকের শব্দ, তূরীর পৈশাচিক নিনাদ আমাদের পশ্চাতে শুনা যাইতেছে; সে এরূপ বিকট শব্দ যে, শুনিয়া সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠে।

এখনো আমরা পলঙ্কটাগ্রামে। মশকপতঙ্গাদি তাড়াইবার জন্য তাম্রমূর্ত্তি ভৃত্যগণ সমস্ত রাত বড়-বড় হাতপাখায় আমাকে বাতাস করিয়াছে।

এক্ষণে এই বহুপুরাতন সৌধধবল ক্ষুদ্র বাড়ীর মধ্যে অরুণ-কিরণ প্রবেশ করিয়াছে; হাস্যময়ী ঊষার প্রভায় গৃহটি উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে। সূর্য্যোদয়ে সূর্য্যের দীপ্যমান মহিমার মধ্যে আমি জাগ্রত হইলাম।

শিশিরসিক্ত বারণ্ডাটি এখনো বেশ ঠাণ্ডা। এটি সুন্দর বসিবার স্থান। বারণ্ডাটি সৌধপ্রলেপে তুষারশুভ্র। উহার মোটা-মোটা খাটো-খাটো অসমান (অনিচ্ছাকৃত) থামগুলি চামেলি-লতায় ঘেরা।

চতুর্দ্দিকে মাঠ-ময়দান, গ্রাম্য নিস্তব্ধতা, বিমল প্রাভাতিক শান্তি। যদিও অত্রস্থ প্রকৃতিসুন্দরী একটু তাপদগ্ধা, শরতের প্রভাবে শুষ্কতানিবন্ধন একটু অবসাদক্লিষ্টা, তথাপি এখানকার আলোকরশ্মি দক্ষিণফ্রান্সের সুন্দরতম প্রভাতকিরণের ন্যায় দিব্য প্রশান্ত। এখানে বড় বড় তালজাতীয় বৃক্ষ নাই; অথবা সিংহলের ন্যায় উদ্দাম উদ্ভিজ্জের প্রাচুর্য্য নাই। অস্মদ্দেশীয় অরণ্যের ন্যায় এখানকার বৃক্ষগুলি অনতি-উচ্চ ও বিরলপল্লব। ছিন্নতৃণ মাঠ-ময়দান, ফলের বাগান, ছাঁটা-ঘাসের উপর অঙ্কিত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পায়ে-চলা পথ, দূরে বৃক্ষশাখার মধ্য হইতে পরিদৃশ্যমান চূন্‌কামকরা ছোট-ছোট প্রাচীর, সুধাধবল ছোট-ছোট বাড়ী—এই সকল আমি অবলোকন করিতেছি, এবং আমার শৈশবের সুপরিচিত দৃশ্যগুলি আবার আমার চতুর্দ্দিকে দেখিয়া বিস্মিত হইতেছি।

যে চড়াইপাখি আমাদের গৃহছাদে নীড় নির্ম্মাণ করে, সেই নিতান্ত গ্রাম্য পাখীগুলাও এখানে আছে দেখিতেছি। কেবল এইমাত্র প্রভেদ, ভারতের জীবজন্তুমাত্রেরই মানুষের উপর যেরূপ অগাধ বিশ্বাস, ইহাদেরও তদ্রূপ; মানুষ নিকটে গেলে উহারা পলায় না।

আমি দেখিতে পাইতেছি, স্বদেশসাদৃশ্যজনিত বিস্ময় যেন আমার জন্য এদেশে স্থানে স্থানে সঞ্চিত রহিয়াছে। এই ভরপূর শীতের সময়ে, আমাদের গ্রীষ্মদেশের শোভাসৌন্দর্য্য এখানে সম্ভোগ করিতেছি।...

আমি যে ভারতবর্ষে আছি, এই জ্ঞানটি আমার অন্তরের অন্তস্তলে জাগরূক থাকিলেও, যখনি আমি এখানকার কোন অনাদৃত জনবিরল স্থানে আসিয়া উপস্থিত হই, তখনি একপ্রকার মধুর বিস্ময়সহকারে, জন্মভূমিসম্বন্ধীয় বিবিধ বিভ্রমের হস্তে আপনাকে ছাড়িয়া দিই।

এই সকল ছোট-ছোট শাদা প্রাচীর, চামেলি-লতা, হল্‌দে-রং-ধরা ঘাস, শরৎঋতুসুলভ বিচিত্র রং— এই সমস্ত স্বদেশকে স্মরণ করাইয়া দেয় ও মন ব্যাকুল হইয়া উঠে। তখন সেই Aunis,—সেই La Saintonge-র

মাঠ-ময়দান, আঙুর পাকিবার সময়ে,—সেই কনকোজ্জ্বল-ঋতুকালে, Pleron-দ্বীপের সেই শান্তিময় বাড়ীগুলি, আমার মনে পড়ে।

কিন্তু আবার, মধ্যে মধ্যে অনেক ছোটখাটো জিনিষ পথিমধ্যে উপস্থিত হইয়া আমার এই স্বপ্নের ব্যাঘাত করে। ঐ দেখ, ছয়বৎসর-বয়স্কা একটি ছোট বালিকা, আমাকে একটা সংবাদ দিবার জন্য, নিজগ্রাম হইতে প্রেরিত হইয়া এইখানে আসিয়াছে। ইহার কালো রহস্যময় চোখদুটি দীর্ঘায়ত; ইহার নাক্ ফুঁড়িয়া চুনি-বসানো একটি সোনার মাকৃড়ি আছে; চুনিগুলি দেখিতে শোণিতবিন্দুর ন্যায়।

দূরে, আমাদের বাড়ীর সংলগ্ন শান্তিময় প্রাকৃতিক দৃশ্যটিকে উদ্বেজিত করিয়া কি-একটা অদ্ভুত জিনিষ গাছের মধ্য হইতে বাহির হইয়াছে; —ব্রাহ্মণিক দেবালয়ের একটি কোণ,—দেবতা ও রাক্ষসাদির মন্দিরস্থ একটি কোণ। মন্দিরটি বিষ্ণুদেবের—গাছপালায় ঢাকা পড়িয়াছে।

তরুগণের ছায়াসত্ত্বেও, মধ্যাহ্নের সূর্য্য আমাদের এই শাদা বাড়ীটির উপর বাস্তবিকই একটু অতিরিক্ত-পরিমাণে আলোক ও উত্তাপ বর্ষণ করিতেছে।

ছোট-ছোট ফলবাগানের উপর আলো পড়িয়াছে—খুঁব উজ্জ্বল আলো পড়িয়াছে। আমাদের সেপ্টেম্বরমাসের দীপ্ততম মধ্যাহ্নও এখানে হার মানে।

চারিদিক্ই নিস্তব্ধ। মেঠো-ঘাসের পথে আর কোন পথিক নাই। বড়-বড় হাতপাখাগুলা এখন ঘুমাইতেছে; যে সকল ভারতীয় ভৃত্য ঐ সকল পাখা ব্যজন করিয়া থাকে, তাহারাও ঘুমাইতেছে। সব চুপ্চাপ্। কোথাও টুঁ শব্দ নাই। কেবল কতকগুলা দাঁড়কাক—যাহাদের দিবানিদ্রা নিষিদ্ধ—তাহারাই আমার কামরায় প্রবেশ করিয়া আমার চারিদিকে কা-কা-শব্দ করিতেছে। এই সকল নিস্পন্দ পদার্থের মধ্যে, উহাদেরি

নাচুনি-চালের পদশব্দ এবং উড়িবার পক্ষসঞ্চালনশব্দ ভিন্ন আর কিছুই শোনা যায় না।...

হঠাৎ মনে পড়িল—খৃষ্টজন্মোৎসবের দিন আসন্ন; অমনি এখানকার এই চিরনির্ম্মল আকাশ—চীরগ্রীষ্মঋতু আমার কল্পনার উপর যেন ঘনঘোর বিষাদ ঢালিয়া দিল।

এইবার একে-একে আমার যাত্রার গাড়িদুটি আসিয়া পৌঁছিল। এখান হইতে ত্রিবঙ্কুরে যাইতে প্রায় দুইদিন লাগিবে। সেইখানে যাইবার জন্য আমার মন উৎসুক হইয়া উঠিয়াছে। এই দেশীয় শকটগুলি সুদীর্ঘ "কফিনে"র (শবাধার) ন্যায়। পিছন দিক্ দিয়া উহাতে ঢুকিতে হয়; এবং পর্য্যটনকালে বাধ্য হইয়া উহার মধ্যে শুইয়া থাকিতে হয়। উহাদের বৃষবাহনেরা দুল্‌কিচালে নাচিতে নাচিতে চলে। আমার গাড়ির বৃষযুগল শাদা; উহাদের শিং নীলরঙে রঞ্জিত। ভৃত্যদের গাড়ির বৃষদুটি কাপশ রঙের; এবং উহাদের শিং তাঁবা দিয়া বাঁধানো।

এখনও সূর্য্য অস্ত যায় নাই। ইত্যবসরে, আমাদের চারিটি নিরীহ শান্ত অলস বৃষ তৃণভূমির উপর সটান শুইয়া পড়িয়াছে।

ত্রিবঙ্কুর-রাজ্যে।

তিনঘটিকার সময় এখান হইতে যাত্রা করিলাম। এখন সূর্য্যের তাপ আরও প্রখর হইয়া উঠিয়াছে। শকটের ভিতরে মাদুর ও শতরঞ্জি পাতা। ছাদ এত নীচু যে, সিধা হইয়া বসিবার যো নাই; কাজেই, আহত ব্যক্তির ন্যায় পা ছড়াইয়া শুইয়া রহিলাম। গাড়ির বলদেরা দুল্‌কি-চালে নাচিতে-নাচিতে চলিতে লাগিল। এইভাবে দুইরাত্রি অবিরাম চলিলে আমার নিদ্রার বিলক্ষণ ব্যাঘাত ঘটিবে। ঘণ্টায়-ঘণ্টায় আমার বাহন ও বাহক বদলি হইবে। সমস্ত পথটায়, ডাকের গাড়ির বন্দোবস্ত আছে।

এখন যেখানে আমি আছি—এই পূর্ব্বভারত, আর যেখানে যাইতেছি—সেই ত্রিবঙ্কুররাজ্য, এই উভয়ের মধ্যবর্ত্তী এই যে যাতায়াতের পথ—এটি দক্ষিণদিক্ দিয়া চলিয়া গিয়াছে। এই সুখের "খয়রাৎ-মহলে" এখনও রেলপথ হয় নাই যে, তদ্দ্বারা পরান্নজীবিদিগের আমদানি হইবে, কিংবা উহার ধনধান্য বিদেশে চলিয়া যাইবে। উত্তর দিক্ দিয়া, খালপথে নৌকাযোগে, ক্ষুদ্ররাজ্য কোচিনের সহিত উহার যোগাযোগ আছে। এই খাল-বিল অনেকগুলি। তা ছাড়া, আত্মরক্ষণ-উপযোগী ইহার কতকগুলি প্রাকৃতিক সুবিধা ও আছে,—তদ্দ্বারা বাহিরের সংস্পর্শ হইতে স্থানটি সুরক্ষিত।

ইহার পশ্চিমে বন্দরহীন সমুদ্র, দুরধিগম্য সৈকতবেলাভূমি—যাহার উপর ফেনময় তরঙ্গরাজি অবিরাম ভাঙিয়া পড়িতেছে। যাহা ভারতের একপ্রকার মেরুদণ্ড বলিলেও হয়,—সেই "ঘাটের"র গিরিমালা পূর্ব্বদিকে অবস্থিত;—উহার শৈলচূড়া, উহার অরণ্য, উহার ব্যাঘ্রাদি হিংস্রজন্তু, কতকটা প্রহরীর কার্য্য করিতেছে।

আমার গাড়ীর বলদদুটি কখন দুল্‌কি-চালে, কখন বা ছুটিয়া চলিতেছে। যেই একটা গ্রাম পার হইতেছি, অমনি আবার দীর্ঘপথ আরম্ভ হইতেছে—বৈচিত্রহীন, অফুরন্ত। সূর্য্য জ্বলন্ত কিরণ বর্ষণ করিতেছে। পথের দুই ধারে যে বৃক্ষগুলি সারি-সারি চলিয়াছে, উহা দেখিতে কতকটা আমাদের আখ্‌রোট্ ও "অ্যাশ্"-গাছের মত। যেগুলিকে আখ্‌রোট্-গাছের মত বলিতেছি উহা আসলে তরুণ বটবৃক্ষ,—কালসহকারে প্রকাণ্ড হইয়া উঠিবে। শিকড়ের জটা স্থানে-স্থানে বাহির হইতে সুরু করিয়াছে; উহার ফ্যাঁকড়াগুলি মাটির দিকে নামিতেছে; তাহা হইতে আবার নূতন ফ্যাঁকড়া বাহির হইয়া চারিদিকে বিস্তৃত হইবে।

এই দুই-সারি বৃক্ষের মধ্য দিয়া আমরা সুবিস্তৃত কান্তারভূমি অতিক্রম করিয়া চলিয়াছি। মধ্যে-মধ্যে বিরলসন্নিবেশ তাল-নারিকেল দৃষ্ট হইতেছে।

দেখিবার জন্য ও নিশ্বাস ফেলিবার জন্য গাড়ির পার্শ্বদেশে ছোট্ট-ছোট

রুদ্ধ-জান্‌লা আছে। পশ্চাদ্ভাগে ছোট একটি গোল দরজা, তাহার মধ্য দিয়া, মাথা হেঁট করিয়া, এই সচক্র শবাধারের মধ্যে প্রবেশ করিতে হয়।

আমার গাড়ির প্রায় গা ঘেঁষিয়া, ঠিক পিছনে, আমার চাকরবাকরদিগের ও জিনিষপত্রের গাড়িটি চলিয়াছে। যে দুইটি দীর্ঘকায় নিরীহ বলদ ঐ গাড়ি টানিতেছে, উহারা আমার খুব নিকটবর্ত্তী; আমি গাড়ির মধ্যে শুইয়া সর্ব্বদাই দেখিতে পাই, বলদ-দুটি যেন আমার পা ছুঁইয়া রহিয়াছে। উহারা কি নিরীহ জানোয়ার! চালক উহাদের শুধু নাকে দড়ি দিয়া চালাইতেছে; পাছে অনিচ্ছাক্রমেও কাহারো অনিষ্ট হয় তাই যেন উহাদের শিং-দুটিও পিছনদিকে পিঠের দাঁড়ার উপর বাঁকিয়া পড়িয়াছে। গাড়ির চালক নগ্নপ্রায়, তাম্রবর্ণ; আশ্চর্য্যরূপে দেহভার রক্ষা করিয়া, সঙ্কীর্ণ যুগকাষ্ঠের উপরে উবু হইয়া বসিয়া, বাহুদুটি হাঁটুর উপর রাখিয়াছে; আর, একটা বেতের চাবুক দিয়া বলদদিগকে প্রহার করিতেছে; কিংবা বানরগুলা রাগিলে যেরূপ শব্দ করে, সেইরূপ মুখের শব্দ করিয়া উহাদিগকে উত্তেজিত করিতেছে।

কান্তারভূমি, একটার-পর-একটা ক্রমাগত আসিতেছে; যতই অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতেছি, ততই যেন কষ্টকর—এমন কি—অসহ্য হইয়া উঠিতেছে। দূর-দূরান্তরে, কোথাও বা ছোটখাটো ধানের ক্ষেত, কোথাও বা ছোটখাটো কার্পাসের ক্ষেত দেখা যাইতেছে; নতুবা আর সমস্তই মরু—কেবলই মরু—সায়াহ্নসূর্য্যের বিষাদম্লান কিরণচ্ছটায় আলোকিত।

দিগন্তগগনে "ঘাটে"র গিরিমালা অঙ্কিত; উহা যেন ত্রিবঙ্কুরবাজ্যের প্রাকারাবলী। আজ আমরা রাত্রে, একটি যার-পর-নাই সঙ্কীর্ণ সুঁড়িপথ দিয়া ঐ প্রাকার উল্লঙ্ঘন করিয়া যাইব।

সিংহলের বৃষ্টিবর্ষা ও হরিৎ-শ্যামল ক্ষেত্রাদি দেখিয়া-আসিয়া তাহার পর এই সকল শুষ্কভূমি দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়—উহাতে একটি তৃণও জন্মায় না। শাদাটে রঙের গুঁড়ি—এইরূপ কতকগুলি অদ্ভুত

তালজাতীয় বৃক্ষ ইতস্তত একাকী দণ্ডায়মান ;—উহাদিগকে উদ্ভিজ্জরাজ্যের সামিল বলিয়াই মনে হয় না। সোজা, মসৃণ, প্রকাণ্ড-উচ্চ খোঁটার মত, তলদেশ স্ফীত, তাহার পরেই চরকা-কাঠির ন্যায় হঠাৎ সরু হইয়া ঊর্দ্ধে উঠিয়াছে। উহাদের অতিদীর্ঘ কাণ্ডের অগ্রভাগে, জ্বালাময় গগনের উচ্চদেশে, শুষ্ক-কঠোর ছোট ছোট একএকগুচ্ছ তালপত্র রহিয়াছে। এই শুষ্কশীর্ণ তরুদিগের ছায়া-চিত্রগুলি, বরাবর রাস্তার দুইধারে, বিষাদম্লান দিগন্তরেখা পর্য্যন্ত—স্থানে স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। দুই-সারি তরুণ বটবৃক্ষের মধ্য দিয়া এই যে পথটি গিয়াছে, ইহার মধ্যে জনমানব দৃষ্টিগোচর হয় না। মনে হয়, যেন এই পথটি ধরিয়া চলিলে আমরা কোথাও গিয়া উপনীত হইব না। অবসাদজনক উত্তাপ, তালে-তালে অল্প-অল্প ঝাঁকানি, ক্রমাগত গাড়ির একঘেয়ে ক্যাঁচ্‌কোঁচ্‌ শব্দ। এই সবে আমার তন্দ্রা আসিল—আমার চিন্তাপ্রবাহ ক্রমশ তমসাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল।

প্রায় ৫ ঘটিকার সময় রাস্তার উপর দিয়া অদ্ভুত-ধরণের চারিজন পথিক চলিয়া গেল। আমার চক্ষু এখনো তন্দ্রাবেশে প্রায় অর্দ্ধনিমীলিত ; তা ছাড়া, এই একঘেয়ে পথে কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না—তাই হঠাৎ যখন চারিটি মনুষ্যমূর্ত্তি দেখিলাম, তখন ইহাই একটি গুরুতর ঘটনা বলিয়া আমার নিকট প্রতিভাত হইল। ইহারা দীর্ঘকায় পুরুষ—লম্বা পা ফেলিয়া দ্রুত চলিতেছে ; নগ্ন গাত্র, একটা শাদা ও লালরঙের ধুতি-পরা, মাথায় একটা লাল পাগ্‌ড়ি। এই বিজন কান্তারের মধ্য দিয়া এই অজ্ঞাত ব্যক্তিগণ, এইরূপ উজ্জ্বলবেশে, এত দ্রুতপদে, না জানি কোথায় যাইতেছে ?

পরে, অল্পে অল্পে, ধীরে ধীরে, এই "ঘুপ্‌সি" দম্‌-আট্‌কানিয়া শয্যা-কক্ষের মধ্যে নিদ্রাদেবী আবির্ভূত হইয়া আমার সংজ্ঞা হরণ করিলেন —চারিদিকে কি হইতেছে, আমি আর কিছুই জানিতে পারিলাম না।

একঘণ্টা পরে, সন্ধ্যার সময়, জাগিয়া-উঠিয়া মুমূর্ষু দিবসের অন্তিম ছবিটি দর্শন করিলাম।

দেখিলাম, "ঘাটের" গিরিমালা হঠাৎ যেন আমার পার্শ্ববর্ত্তী হইয়াছে— যেন এক লম্ফে ৪॥০ ক্রোশ পথ লঙ্ঘন করিয়া আসিয়াছে। পশ্চিমদিকের সমস্ত সমভূমি এই গিরিমালায় অবরুদ্ধ।

অস্তমান সূর্য্যের লোহিত কিরণে দিগন্তপট এখনো অনুরঞ্জিত। ঐ লোহিত দিগন্ত-পটের উপর, এই সুনীল গিরিকায় কেমন পরিস্ফুটরূপে প্রকটিত। উহার শৈলচূড়াগুলির আকার ভারতবর্ষীয় ধরণের; দেখিতে কতকটা মন্দিরাদির চূড়া ও গম্বুজের মত।

সরু-সরু খুঁটির মত তালগাছ, আর কঠোরদর্শন মুসব্বর-তরু— এখানকার এই একমাত্র বৃক্ষ, মৃত্তিকা হইতে ঊর্দ্ধে উঠিয়াছে; যাহা-কিছু আলো এখনো অবশিষ্ট আছে, সেই আলোকে, ম্লানাভ সোনালি-রঙের আকাশের গায়ে, তাহাদের কালো-কালো কাঠিগুলা সর্ব্বত্র প্রসারিত।

হঠাৎ অন্ধকার হইয়া পড়িল। এই অন্ধকার একটু বিষাদরঞ্জিত, কেন না, আজ রাত্রে চাঁদ উঠিবে না।

প্রভাত পর্য্যন্ত এই সঙ্কীর্ণ শবাধারের মধ্যে ঝাঁখানি খাইতে খাইতে কিছুই স্পষ্ট দেখিতে পাই নাই; চক্ষের সমক্ষে সবই যেন বিশৃঙ্খলভাবে প্রতিভাত হইতেছিল।

পথে যাইতে যাইতে, অন্য গরুর গাড়ি যখনি আমাদের সম্মুখে আসিয়া পড়ে, তখনি গোকণ্ঠের ঘন্টিকাধ্বনি ও লোকজনের কি ভয়ানক চীৎকারই শুনিতে পাওয়া যায়! সেই গাড়িগুলা এত মন্থরগতি যে, আমাদের পথ হইতে সরিয়া যাইতেও তাহাদের অনেক বিলম্ব হয়। মধ্যে মধ্যে বাহন ও চালক "বদ্‌লি" করিবার জন্য, কোন গ্রামের নিকট আমাদের গাড়ি আসিয়া থামিতেছে। গ্রামগুলি রাস্তার ধারে অবস্থিত। গাড়ি হইতে অস্পষ্টরূপে, নিদ্রিত ব্রাহ্মণদিগের আবাস-কুটীর দেখা যাইতেছে; সম্মুখে,

দেয়ালের কুলুঙ্গিতে, ভূতপ্রেত তাড়াইবার জন্য, ছোট-ছোট নারিকেল-তৈলের প্রদীপ জ্বালাইয়া রাখা হইয়াছে।

ভৃত্যেরা আমাকে অভিবাদনপূর্ব্বক জাগাইয়া দিল। এখন প্রভাত; শীতল শান্ত উষার ইহাই মধুরতম মুহূর্ত্ত। আমরা এখন নাগরকৈল-গ্রামে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। আজ সমস্তদিন এইখানে থাকিয়া, সূর্য্যাস্ত-সময়ে আবার যাত্রা আরম্ভ করিব। যে পর্ব্বতমালা গতকল্য আমাদের সম্মুখে, অস্তমান সূর্য্যের কিরণ-উদ্ভাসিত লোহিতগগনে অঙ্কিত দেখিয়াছিলাম, আজ তাহা আমাদের পিছনে পড়িয়াছে। এখন দিগন্তদেশ ম্লান-পাটলবর্ণে রঞ্জিত। রাত্রিতে আমরা এই পর্ব্বতমালা পার হইয়া আসিয়াছি,—এখন আমরা ত্রিবঙ্কুররাজ্যে। এই বারাণ্ডা-ওয়ালা বাড়ীটি একটি পান্থশালা; ইহার সম্মুখে আমাদের গাড়ি আসিয়া থামিল। শুভ্রবসনধারী একজন ভারতবাসী দুই হস্তে স্বকীয় ললাট স্পর্শ করিয়া আমার সম্মুখে নতশির হইলেন। ইনি পান্থশালার অধ্যক্ষ। মহারাজের আদেশানুসারে, ইনি আমার বাসের জন্য এই বাড়ীটি ঠিক করিয়া রাখিয়াছেন।

ভারতীয় অন্যান্য গ্রামের পান্থশালার ন্যায়, এ পান্থশালাটিও সাদাসিধা একতালা গৃহ। তিন-চারিটি শাদা-ধব্‌ধবে চূনকাম-করা কামরা—পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, প্রায় খালি, শুইবার জন্য শুধু কতকগুলি বেতে-ছাওয়া খাট পাতা। সূর্য্যের প্রখর-উত্তাপ-প্রযুক্ত গৃহের ছাদ গৃহ হইতে চারিদিকে খানিকটা বাহির হইয়া আসিয়াছে, আর কতকগুলো মোটা-মোটা খাটো থাম ঐ ছাদকে ধারণ করিয়া আছে।

তাহার পর স্নান; স্নানের পর প্রাতরাশ। এই সময়ে, ব্যগ্রতা-বিরহিত ভৃত্যেরা তালপত্রের পাখা দিয়া আমাকে অলসভাবে বাতাস করিতে লাগিল। তাহার পর মধ্যাহ্নের বিষণ্নতা; আলোক-উদ্ভাসিত মহা-নিস্তব্ধতা। মধ্যে মধ্যে কাকেরা আমার কক্ষ-কুট্টিমের তক্তার উপর আসিয়া নাচিয়া বেড়াইতেছে।

দুই ঘটিকার সময় ত্রিবঙ্কুর-মহারাজের দেওয়ানের নিকট হইতে পত্র পাইলাম। তিনি লিখিয়াছেন:—আমার যাত্রাপথের ধারে, নৈজেতা-বারে-নামক একটি গ্রামে, আমার ব্যবহারের জন্য একটি ঘোড়ার গাড়ী প্রস্তুত থাকিবে। সেখানে যাইতে হইলে, এখান হইতে ১১টা রাত্রে ছাড়িতে হইবে। কিন্তু আমি এখনি ছাড়িব বলিয়া স্থির করিলাম। আজ রাত্রেই সেইখানে গিয়া পৌঁছিব। সূর্য্যাস্তকাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া তাহার পর যাত্রা করা—এবং প্রভাত পর্য্যন্ত গাড়িতেই নিদ্রা যাওয়া—ইহাই এখানকার প্রচলিত রীতি। কিন্তু আমি তাহা করিলাম না।

আমি যাত্রা করিতে উদ্যত হইলাম। এই সময়ে সূর্য্যের প্রখর উত্তাপ। পান্থশালার অধ্যক্ষ আমাকে দুই হাতে সেলাম করিতে লাগিল। নীরব যাচ্ঞা মুখে প্রকটিত করিয়া, তাম্রবর্ণ ভৃত্যবর্গ আমার গাড়ির সম্মুখে সারি দিয়া দাঁড়াইল। উহাদের মধ্যে একটি নগ্নপ্রায় দরিদ্র বৃদ্ধা ছিল। ভারতের প্রায় সমস্ত পান্থশালাতেই, স্নানাগারের জলাধারে জল ভরিয়া রাখাই ইহাদের কাজ। ত্রিবঙ্কুরের রৌপ্যমুদ্রা, আজ এই সর্ব্বপ্রথম, এই সব লোকদিগকে আমি নিজহাতে বিতরণ করিলাম। এই ক্ষুদ্র মুদ্রাগুলি, মোটা-মোটা ঝক্‌ঝকে গুটিকার মত। আমাদের বলদেরা, এই অবসাদজনক উত্তাপের মধ্যে দুল্‌কি-চালে চলিতে লাগিল।

ক্রমে ক্রমে, অপেক্ষাকৃত শাখাপল্লববহুল প্রদেশে—এমন কি, স্বকীয় উদ্ভিজ্জ প্রাচুর্য্যে সিংহলেরও সমকক্ষ—এরূপ একটি প্রদেশে উপনীত হইলাম। এই জঙ্গলটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুষ্পবৃক্ষে পরিপূর্ণ। উচ্চ তালবৃক্ষের কাণ্ডগুলি গতকল্য পীতাভ ও শুষ্ক দেখিয়াছিলাম; আজ দেখি, এখানে প্রচুর পত্রভূষণে সুশোভিত। বড় বড় হরিৎ-শ্যামল শাখা-পক্ষ বিস্তার করিয়া, নারিকেল-তরুপুঞ্জ আবার আবির্ভূত হইয়াছে। ভূতল পর্য্যন্ত শিকড়কুন্তল বিস্তার করিয়া, মার্গপার্শ্বস্থ বটবৃক্ষগুলি আমাদের মাথার উপর ছত্রাকারে প্রসারিত। দেখিলে মনে হয়, এই প্রদেশটিতে তরুসমাচ্ছন্ন বিজনতা

ও দুর্ভেদ্য জটিল অরণ্য ভিন্ন বুঝি আর কিছুই নাই। কিন্তু এখন ছায়াময় পথে অনেক লোকজন দেখা যাইতেছে। আমাদেরই মত, গরুর গাড়ি চড়িয়া কতকগুলি লোক যাইতেছে। গরুর পাল লইয়া রাখাল এবং দ্রব্যসামগ্রীভরা চুপ্‌ড়ি মাথায় করিয়া অগণ্য স্ত্রীলোক সারি-সারি চলিয়াছে।

ইতস্তত একএকটি ছোট প্রস্তরমন্দির ;—বহু পুরাতন—খিলান চ্যাপ্‌টা-পাথরে গঠিত ; ইহাদিগকে মিশরদেশীয় স্মৃতিমন্দিরের ক্ষুদ্র নমুনা বলিয়া মনে হয়।

আবার, প্রকাণ্ড বটবৃক্ষের তলে, মুসলমান ফকিরের একটি সমাধিস্থান ; উহা শুধু বার্দ্ধক্যের বলে পূজাস্পদ হইয়া উঠিয়াছে। উহা টাট্‌কা ফুলের মালায় সজ্জিত। আর, একটি গজমুণ্ডধারী গণেশমূর্ত্তি দেখিলাম ; সেঁউতি ও গোলাপের মালা গাথিয়া, কোন ভক্তজন উঁহার কণ্ঠে পরাইয়া দিয়াছে।

ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়—অথবা আমার চক্ষেরই ভ্রম—রাস্তায় এতগুলি স্ত্রীলোক দেখিলাম, কিন্তু উহাদের মধ্যে একটিকেও দেখিতে ভাল নয়, অথচ পুরুষেরা অধিকাংশই দেখিতে সুন্দর। পুরুষের মুখে তাম্রবর্ণ যেরূপ মানাইয়াছে, রমণীর মুখে সেরূপ মানায় নাই। পুরুষের ওষ্ঠস্থূলতা পুরুষের গোঁফে ঢাকিয়া যায়, কিন্তু স্ত্রীলোকদিগের অনাবৃত ওষ্ঠের স্থূলতা আরও বেশি বলিয়া মনে হয়। যাহাদের দেহগঠন গ্রীশীয় রমণীমূর্ত্তির ন্যায় অনিন্দ্যসুন্দর—এরূপ কতকগুলি বালিকা ছাড়া প্রায় আর সকলেরই উদরদেশ অকালবৈরূপ্য প্রাপ্ত হইয়াছে। তা ছাড়া, এমন কোন বস্ত্রাবরণও নাই, যাহাতে ঐ অধোলম্বিত উদর কোনপ্রকারে ঢাকিয়া রাখা যাইতে পারে। উহারা নাক ফুঁড়িয়া সোনার নথ ও কান ফুঁড়িয়া কানবালা পরিয়া থাকে। কানবালাগুলি ওজনে এত ভারি যে, উহাতে কান একেবারে ঝুলিয়া পড়ে। তবে কিনা, উহারা 'পারিয়া'-রমণী ; উচ্চশ্রেণীর

মহিলারা মাল-বোঝাই গরুর গাড়িতে কখনই যাতায়াত করে না। এই উচ্চশ্রেণীর স্ত্রীলোকদিগকে কিন্তু এখনও আমি দেখি নাই।

রাস্তায় এই মজুর-রমণীদিগের জন্য দূরদূরান্তরে একএকটি বিরামস্থান স্থাপিত হইয়াছে। নিরেট পাথরের বেদী, উচ্চতায় একমানুষ-সমান,—এই বেদীর উপর উহারা নিজ-নিজ বোঝা নামাইয়া রাখে। তাহার পর, আবার যখন ঐ বোঝাগুলি মাথায় উঠাইয়া লয়, তখন তাহাদিগকে ভূমি পর্য্যন্ত আর মাথা নোয়াইতে হয় না।

চারিদিকে কি রমণীয় নিস্তব্ধতা! এই সকল বিহঙ্গনীড়বৎ তরুপ্রচ্ছন্ন বিরল গ্রামগুলির মধ্যে কি স্বর্গীয় প্রশান্তি!

একটি বটবৃক্ষের তলে, মহাদেবের একটি পুরাতন মূর্ত্তির সন্নিকটে, বেগ্নি-রঙের পরিচ্ছদ-পরা, শাদা লম্বাদাড়ি, ইরাণীর ন্যায় মুখশ্রী, একটি লোক শান্তভাবে বসিয়া কি একটা গ্রন্থ পাঠ করিতেছে; ইনি একজন প্রধান-পাদ্রি—একজন সিরিয়াদেশীয় প্রধান-পাদ্রি! প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয়, এই রহস্যময় ব্রাহ্মণ্যের দেশে একি অদ্ভুত দৃশ্য!

কিন্তু একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলেই প্রতীতি হইবে, ইহাতে বিস্মিত হইবার কোন কারণ নাই। আমি পূর্ব্বেই জানিতাম, ত্রিবঙ্কুর-মহারাজের রাজ্যে প্রায় পাঁচলক্ষ খৃষ্টানপ্রজার বসতি। এই সকল খৃষ্টানদের পূর্ব্ব-পুরুষগণ যে সময়ে এখানে গির্জ্জা প্রতিষ্ঠা করে, য়ুরোপ তখনও পৌত্তলিক-ধর্ম্মাবলম্বী। ইহারা 'সেণ্ট-টমাসে'র শিষ্য বলিয়া পরিচয় দেয়। সেণ্ট-টমাস্ প্রথম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। কিন্তু সম্ভবত ইহারা 'নেষ্টোরীয়'-সম্প্রদায়ের খৃষ্টান, সিরিয়াদেশ হইতে আসিয়াছে। এই সম্প্রদায়ের কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা বরাবর এখানে পাদ্রি-প্রচারক পাঠাইয়া থাকে। অন্তত. ইহারা যে বহুপুরাতন, লোকপূজ্য মহৎ বংশ হইতে প্রসূত, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তা ছাড়া রাজ্যের উত্তরপ্রদেশে কগুলি ইহুদিও আছে। 'জেরুসেলেমে'র মন্দির দ্বিতীয়বার ধ্বংস

হইবার পর, উহারা এদেশে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করে। ইহাদিগকে কিংবা খৃষ্টানদিগকে কেহ কখন উৎপীড়ন করে নাই। কেন না, এদেশে ধর্ম্মসম্বন্ধীয় মতসহিষ্ণুতা সর্ব্বকালেই বিদ্যমান। এই স্থানটি মনুষ্যরক্তপাতে যে কখন কলুষিত হইয়াছে, এরূপ একটি দৃষ্টান্তও প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

আমাদের বলদেরা দুল্‌কি-চালে অনবরত চলিয়াছে। সন্ধ্যার সময় সূর্য্য অস্ত গেল। সেই সঙ্গে সিংহলের ন্যায় এখানকার বাতাসও গ্রীষ্মদেশ-সুলভ আর্দ্রতায় পূর্ণ হইল। কবোষ্ণ বৃষ্টিধারার পরম মিত্র নারিকেল-বৃক্ষগুলি, অন্যান্য বৃক্ষকে অপসারিত করিয়া ক্রমে ক্রমে এখানে নিজ প্রভুত্ব বিস্তার করিয়াছে। আমরা এখন, সুবৃহৎ-শাখাবৃক্ষ-বিস্তারিত অফুরন্ত তালবৃক্ষের খিলানমণ্ডপতলে প্রবেশ করিয়াছি। ইহা পশ্চিমভারতের উপকূলবর্ত্তী প্রদেশের—মালাবার-উপকূলের শত-শত যোজন পর্য্যন্ত প্রসারিত। 'ঘাট'-পর্ব্বতমালার অনুবন্ধী ক্ষুদ্র গিরিসমূহের পাদদেশ দিয়া আমরা যতই চলিতেছি, ততই শৈলচূড়াসমূহে, শৈলবিলম্বিত অরণ্যে, ঝটিকাসঙ্কুল নিবিড় জলদজালে, অত্রত্য নভোমণ্ডল ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিতেছে।

চারিঘণ্টা ধরিয়া অনবরত ঝাঁকানি খাইতেছি, তাহার সঙ্গে তালে-তালে বলদেরা দুল্‌কি-চালে চলিতেছে। শুইয়া-শুইয়া আমি শ্রান্ত-ক্লান্ত-অবসন্ন; আর সহ্য হয় না। কি করি, আমার এই শবাধারের সম্মুখস্থ রন্ধ্রপথ দিয়া গলিয়া বাহির হইলাম এবং চালকের পার্শ্বে, যুগকাষ্ঠ-আসনের উপর, বানরেরা যেভাবে বসে, সেইভাবে একটু বসিলাম। দিবালোক অনেকটা কমিয়া আসিয়াছে। এই সকল মেঘের মধ্যে, এই সকল তালগাছের মধ্যে, সন্ধ্যা সবেমাত্র দেখা দিয়াছে। মার্গস্থ বটবৃক্ষের হরিৎ-শ্যামল সুরঙ্গপথ আমাদের সম্মুখ দিয়া বরাবর সমান চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু স্থানে স্থানে, অরণ্যের মধ্যে, সন্ধ্যাছায়ায়, কতকগুলি পদার্থ অতীব অদ্ভুত কিম্ভূত-কিমাকার বলিয়া মনে হইতেছে। মনে হইতেছে, যেন কতকগুলা

শ্যামল-কায় বিকটাকার গঠনহীন পশু, কখন বা একাকী নিঃসঙ্গ, কখন বা দলে দলে একত্র, অথবা পরস্পর উপর্য্যুপরি সমারূঢ় রহিয়াছে। এইগুলা শৈলস্তূপ ভিন্ন আর কিছুই নহে, কিন্তু কি অদ্ভুত, বিচিত্র! এই শৈলস্তূপগুলি স্থূলচর্ম্মী পশুদিগের ন্যায় বর্ত্তুল ও তাহাদিগের চর্ম্মের ন্যায় মসৃণ ও চিক্‌চিকে। উহাদের পরস্পরের মধ্যে যেন কোনপ্রকার যোগসূত্র নাই; প্রত্যেকেই যেন পৃথক্‌ভাবে এখানে অধিষ্ঠিত। কোন সাধারণ হত্যাকাণ্ডের পর, হতব্যক্তিদিগের দেহগুলি যেরূপ ভাবে থাকে, উহারা সেইরূপ নিষ্পেষিত, বিনিক্ষিপ্ত, ছিন্নবিচ্ছিন্ন ভাবে রহিয়াছে। সেই সঙ্গে, মোটা-মোটা গাছের ডাল, মোটামোটা গাছের শিকড়গুলা হস্তিশুণ্ডের সাদৃশ্য ধারণ করিয়াছে।...যেন অত্যন্ত প্রকৃতিদেবী স্বকীয় শৈশবদশায়, বিবিধ শৈশব-চেষ্টার বিকাশকালে, নির্জ্জনে কোন জন্তুবিশেষের আকার লইয়াই ব্যাপৃত ছিলেন। যেন হস্তিমূর্ত্তির কল্পনা-অঙ্কুরটি বহুকাল হইতে এইখানে বিদ্যমান। এমন কি বিধাতা যখন গোড়ায় এই শৈলগুলি নির্ম্মাণ করেন, তখনও বোধ হয় তাঁহার চিন্তার মধ্যে এই কল্পনাটি গূঢ়ভাবে বিদ্যমান ছিল।

বাস্তবিকই মনে হয়, হস্তী কিংবা হস্তীর ভ্রূণনিচয় যেন এখানে সর্ব্বত্রই দেখিতেছি। আমাদের চতুর্দ্দিকে, অরণ্যের অন্ধকার যতই ঘনাইয়া উঠিতেছে, ততই যেন এইরূপ সাদৃশ্য আমাদের মনে অধিকতররূপে প্রতিভাত হইতেছে;—আমাদের মনকে যেন একেবারে অধিকার করিয়া বসিতেছে।

এখন আটটা রাত্রি। ঝটিকা আসন্ন বলিয়া আশঙ্কা হইতেছিল, কিন্তু জানি না, কি করিয়া সমস্ত আবার কোথায় বিলীন হইয়া গেল। স্বচ্ছ আকাশ, তারাময়ী রজনী। ঝিল্লী ও শলভগণ উল্লাসভরে গান করিতেছে। কীটগণের হর্ষকোলাহলে সমস্ত তরুপল্লব অনুরণিত।

আমাদের সম্মুখে মশালের আলো দেখা যাইতেছে। তরুপল্লবের মধ্য দিয়া একদল লোক আমাদের অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। ঢাকঢোল ও

করতালের ধ্বনি, এবং মনুষ্যকণ্ঠনিঃসৃত ঐকতান গান শুনিতে পাওয়া যাইতেছে।

ইহাঁরা বরযাত্রীর দল ;—বট ও তাল গাছের নীচে দিয়া মহাসমারোহে চলিয়াছে। ইহাদের মধ্যে একজন, রাজা কিংবা দেবতার ন্যায় পরিচ্ছদ পরিধান করিয়াছে ঃ—সোণালী জরির লম্বা জামাজোড়া, মাথায় সোণার মুকুট।

ইহা একটি বিবাহের উৎসব ; বর স্বীয় আত্মীয়বর্গকে লইয়া, ধর্ম্মবিধি অনুসারে, রাস্তা দিয়া যাত্রা করিতেছে।

এখন এগারটা। আমার শকটের মধ্যেই আমি নিদ্রা গেলাম। আমার ভৃত্য শকটের একটি ক্ষুদ্র জান্‌লা খুলিয়া, হাত-লণ্ঠনের আলোয় একখানা পত্র আমার সম্মুখে আনিয়া ধরিল। সেই পত্রে ত্রিবাঙ্কুররাজচিহ্ন মুদ্রাঙ্কিত ঃ—দুইটি হস্তী ও একটি সামুদ্রিক শঙ্খ। এক্ষণে আমরা 'নৈজতাবরে'-গ্রামে আছি! এই পত্রখানি দেওয়ানের নিকট হইতে আসিয়াছে। তিনি এই পত্রযোগে, মহারাজের পক্ষ হইতে, আমাকে স্বাগতসম্ভাষণ করিয়াছেন, আর গাড়ি প্রস্তুত আছে, এই কথা জানাইয়াছেন। দেশীয় শকট হইতে বাহির হইয়া, এই শোভন-সুন্দর ঝাঁকুনিহীন গাড়িতে উঠিলাম। আহ্লাদের বিষয়। দুইটি উৎকৃষ্ট অশ্ব আমাকে লইয়া দীর্ঘপদ-বিক্ষেপে দুল্‌কি-চালে চলিতেছে, ইহাতেই আমার আনন্দ। মহারাজের চিহ্নিত পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া 'কোচোয়ান' স্বকীয় আসনে বসিয়া আছে ;—তাহার দীর্ঘ চাপ্‌কান, জরির পাগ্‌ড়ি, অন্ধকারে ঝক্‌মক্ করি-তেছে। পিছনের পায়দানে দুইজন চটুল সহিস্ ; উহারা গাড়ির আগে-আগে এইরূপ ভাবে দৌড়িয়া চলে, যেন উহাদের উড়িবার একজোড়া ডানা আছে। তা ছাড়া, পথের অগণ্য গরুর গাড়ি সরাইয়া দিবার জন্য উহারা কি ভয়ানক চীৎকার করে! একটা ছোট সিন্দুকের ভিতরে ক্রমাগত ঝাঁকানি খাইয়া, তাহার পর খোলা গাড়িতে তারা দেখিতে

দেখিতে সারি-সারি তাল-নারিকেলের মধ্য দিয়া সহজভাবে ও দ্রুতগতি চলিতে কি উন্মাদক আনন্দ! রজনীর সুমধুর বায়ুরাশি ভেদ করিয়া, সমস্তক্ষণ পুষ্পসৌরভ আঘ্রাণ করিতে করিতে আমরা যেন অফুরন্ত কোন একটি পরী-উদ্যানের মধ্য দিয়া চলিয়াছি।

আবার বাদ্যধ্বনি; আবার মশালের রক্তিম অনলশিখা। এত অধিক রাত্রি, আর এই ঘোর নিস্তব্ধ সময়, তবু এখনো আর একদল বরযাত্রী এই পথ দিয়া চলিয়াছে। এবার বরটি অশ্বারূঢ়! উহার জরির জামাজোড়া অশ্বের পশ্চাদ্ভাগ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। বেশভূষায় বরটিকে রাজার মত দেখিতে হইয়াছে। এখন রাত্রি প্রায় একটা। যে সকল তালবৃক্ষের পরস্পর-বিজড়িত শাখাপক্ষপুঞ্জ আমাদের মাথার উপর দিয়া ছুটিয়া চলিয়াছিল, এক্ষণে হঠাৎ যেন তাহাদের গতিরোধ হইল। এটি অরণ্যের একটি ফাঁকা জমি। আমরা ক্রমে একটা পাকা-রাস্তার উপরে আসিয়া পড়িলাম।

মনে হইতেছে, যেন এই রাজপথটি গভীর নিদ্রায় মগ্ন। চন্দ্রহীন রাত্রে, গ্রীষ্মপ্রধান দেশে, তারকারাজি যে শীতল-শান্ত ভস্মাভ আলোক বিকীর্ণ করে, সেইরূপ আলোকে এই রাস্তাটি আলোকিত। যে সকল বাড়ী দিবসে ধব্‌ধবে শাদা দেখাইবার কথা, এই রাত্রিকালে তাহারা একটু যেন নীলাভ বলিয়া মনে হইতেছে। বারাণ্ডার ঊর্দ্ধে আর একটি তলা আছে, তাহাতে মিশ্রধরণের ছোট-ছোট থাম; এবং কৌণিক খিলানের আকারে, ত্রিপত্রের আকারে, ঝালোরের আকারে খুব ছোট-ছোট রন্ধ্র-গবাক্ষ। নীচে, রুদ্ধদ্বারের দুই পার্শ্বে, দেয়ালের কুলুঙ্গিতে, ভূতপ্রেতের প্রবেশ-নিবারণার্থ সলিতা-বিশিষ্ট ছোট-ছোট প্রদীপ জোনাকির মত মিট্‌মিট্‌ করিয়া জ্বলিতেছে।

কতকগুলি পরিচিত জীবজন্তু নিস্পন্দভাবে সিঁড়ির ধাঁপের উপর শুইয়া আছে। উহাদের প্রতি কে-যেন-কি অনিষ্টাচরণ করিবে, এইরূপ কোন অনির্দ্দিষ্ট আশঙ্কায়, উহারা যেন মানব-আবাসের যতদূর-সম্ভব

নিকটবর্ত্তী স্থানে আশ্রয় লইয়াছে।—গরু, ভ্যাড়া, ছাগল, ঘোড়া, এই সকল জীব জন্তু। আমাদের গমনকালে উহারা জাগিয়া উঠিল না। বালুকাময় রাস্তা দিয়া আমাদের গাড়ি চলিয়াছে। গাড়ির চাকার মৃদু শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দ শুনা যাইতেছে না। এই সকল বাড়ী, নিদ্রিত পশুর পাল, নিস্পন্দ পদার্থসমূহ, যেন কোন দূরবর্ত্তী রং-মশাল-আলোকের আভার ন্যায়, একপ্রকার অস্পষ্ট নীল আলোকে পরিস্নাত।

আমাদের সম্মুখে একটা প্রকাণ্ড ঘের, একটা উত্তুঙ্গ তোরণ—শ্রেণীবদ্ধ লণ্ঠনের আলোকে দেখা যাইতেছে। এই তোরণের মধ্য দিয়া একটা বিস্তৃত জনশূন্য তরুবীথি সিধা চলিয়া গিয়াছে। প্রাচীরের উর্দ্ধে তালবৃক্ষাদি ও প্রাসাদের ছাদ, এবং দূরপ্রান্তে, তরুবীথির কেন্দ্রস্থলে ও পশ্চাদ্ভাগে, ব্রাহ্মণ্যিক মন্দিরের চূড়াসকল দেখা যাইতেছে। স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে, এইবার আমরা ত্রিবঙ্কুর-মহারাজের রাজধানী—প্রকৃত 'ত্রিবন্দ্রম'-নগরে প্রবেশ করিতেছি। পূর্ব্বে যেখানে নিদ্রিত-জীবজন্তু-সমাচ্ছন্ন নীলাভ রাজপথ দেখিয়াছিলাম, উহা ইহারই সংলগ্ন উপনগরমাত্র।···

আমি জানিতাম না, এই পুণ্য ঘেরের মধ্যে কেবল উচ্চবর্ণের হিন্দু-দিগেরই বাসাধিকার আছে। আমি মনে করিয়াছিলাম, বুঝি আমার গাড়ি পূর্ব্বোক্ত বৃহৎ তোরণের মধ্য দিয়া প্রবেশ করিবে; কিন্তু তাহা না করিয়া হঠাৎ ডানদিকে ফিরিল; আবার আমরা তরু-অন্ধকারে নিমজ্জিত হইলাম। আরো দূরে লইয়া-গিয়া, নানা রাস্তা অনুসরণ করিয়া, উপবনের অলিগলির মধ্য দিয়া, অবশেষে উদ্যানমধ্যস্থিত একটা সুন্দর অট্টালিকার সম্মুখে আমাকে আনিয়া উপস্থিত করিল। কিন্তু হায়! অট্টালিকার মুখশ্রীটি ভারতীয়-ধরণের নহে।

এইখানেই আমার জন্য ঘর নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এইখানেই, মহারাজার পক্ষ হইতে আমার প্রতি যার-পর-নাই আদর অভ্যর্থনা ও আতিথ্য বিতরিত হইবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, উহার বাহ্য 'কাঠাম'টি—আতিথ্যের

স্থানটি—য়ুরোপীয়-ধরণের। বরাবর ইহাই আমার নিকট অসঙ্গত ও বিসদৃশ বলিয়া মনে হয়। আমার মনে হয়, এই পরমাশ্চর্য্য প্রাচীন হিন্দুস্থানের উদার হৃদয়ের ইহাই একটি মার্জ্জনীয় ত্রুটি।

ত্রিবঙ্কুরে এই-যে প্রথম রাত্রি আমি অতিবাহিত করিতেছি, এই রাত্রির শেষভাগে আমার ছাদের উপর একটা ভীষণ কোলাহল উপস্থিত। হুড়াহুড়ি, দৌড়াদৌড়ি, তাহার পর লড়ালড়ি। আমার নিবাসগৃহ চারিদিকে খোলা, —এই মনে করিয়া আমার মনের মধ্যে সর্ব্বদাই একটা অস্পষ্ট উদ্বেগের ভাব ছিল। এখন যেন আমি আধো-ঘুমন্ত অবস্থায় দেখিতে পাইলাম, কতকগুলা বড়-বড় বিড়াল লম্ফঝম্ফ দিয়া কর্কশস্বরে চীৎকার করিতেছে। রাত্রির নিস্তব্ধতাহেতু ও গৃহের মধ্যে কাঠের কাজ অধিক থাকায়, বেশি শব্দ হইতেছে বলিয়া মনে হইতেছিল। আসলে উহা পার্শ্ববর্ত্তী স্থানের বন-বিড়ালের পদশব্দ ভিন্ন আর কিছুই নহে। সমস্তদিন উহারা উদ্যানস্থ বৃক্ষের উপরে নিদ্রা যায়; রাত্রিকালে শিকারে বাহির হইয়া আত্মবিনোদন করে এবং ধৃষ্টতাসহকারে মনুষ্যরাজ্য আক্রমণ করে।

অতি প্রত্যূষে, ত্রিবন্দ্রমে আমার মনে একটা বিষাদের ভাব আসিয়া উপস্থিত হইল। ঊষার প্রথম প্রারম্ভেই, ভীষণ একটা শোকসূচক কোলাহল উত্থিত হইল। শব্দটা যেন একটু দূর হইতে আসিতেছে,—ব্রাহ্মণ্যের সেই পূতভূমি হইতে আসিতেছে বলিয়া মনে হইল। হাজার-হাজার লোক একসঙ্গে চীৎকার করিয়া উঠিতেছে; উহা যেন সমস্ত মানব-মণ্ডলীর আর্ত্তনাদ; বিশ্বমানব যেন জাগ্রত হইয়াই আবার সেই চিরন্তন পৃথিবীর দুঃখকষ্ট অনুভব করিতেছে—মৃত্যুচিন্তার ভারে নিষ্পেষিত হইতেছে। তাহার পরেই, বিহঙ্গেরা নব-ভানুকে অভিবাদন করিতে প্রবৃত্ত হইল; কিন্তু বসন্তকালে উহারা আমাদের ফল-বাগানে যেরূপ মৃদু-লঘু-ধরণে সুমধুর প্রভাতী গাহিয়া থাকে, ইহাদের সঙ্গীত সেরূপ নহে।

এখানে. 'নকুলে' টিয়াপাখীর স্থূল কণ্ঠস্বরে—বিশেষত কাকের শোক-

বিষাদময় চীৎকারে, ছোট-ছোট পাখীর কলধ্বনি আচ্ছন্ন হইয়া যায়। প্রথমে, সঙ্কেতস্বরূপ পৃথক্‌ভাবে তুইএকটা কা-কা-শব্দ সুরু হয়, তাহার পর শত-কণ্ঠে—সহস্রকণ্ঠে কা-কা-শব্দের ভীষণ সমবেত-সঙ্গীত বাহির করিয়া, কাকেরা পূতিগন্ধি শবদেহের জয়ঘোষণা করে।......কাক, কাক, সর্ব্বত্রই কাক, ভারতভূমি কাকে আচ্ছন্ন; বরাবর দেখিতেছি,—ত্রিবঙ্কুরে, এই চিত্তবিমোহন শান্তিময় রাজ্যে,—ঊষার আরম্ভ হইতেই উহাদের চীৎকারে তালতরুমণ্ডপ পূর্ণ হইয়া উঠে, এবং যাহারা উহার সুন্দর পত্রপুঞ্জের নীচে বাস করে ও জাগ্রত হয়, তাহাদের আনন্দ-উচ্ছ্বাস সহসা স্তম্ভিত হইয়া যায়। কাকেরা যেন এই কথা বলে:—"সমস্ত মাংস কখন্ পচিয়া উঠিবে, তাহারই প্রতীক্ষায় আমরা এখানে আছি, আমাদের খাদ্য নিশ্চিত মিলিবে, আমরা সমস্তই আহার করিব।"......

তাহার পর, তাহারা চারিদিকে উড়িয়া যায়, আর তাহাদের সাড়াশব্দ থাকে না। আবার মনুষ্যের দূর-কোলাহল শ্রুত হয়;—অতীব প্রবল, অতীব গভীর; বেশ বুঝিতে পারা যায়, অসংখ্য ব্রাহ্মণ কোন বৃহৎ মন্দিরে সমবেত হইয়া স্বকীয় দেবতাকে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতেছে। তাহার পরেই, 'ত্রিবন্দ্রম'-নগর যে তালকুঞ্জের মধ্যে অবস্থিত, তাহার চারিদিক্ হইতে ঢাক-ঢোল, করতাল-শঙ্খের মিশ্রিত কল্লোল এখানে আসিয়া পৌঁছে। অরণ্যের মধ্যে যে সকল ছোট-ছোট দেবালয় ইতস্তত বিকীর্ণ রহিয়াছে,—সেই সকল মন্দিরে ইহাই দিবসের প্রথম পূজা।

অবশেষে সূর্য্যের উদয় হইল। সম্পূর্ণ-অবারিত এই সকল গৃহে সূর্য্য-রশ্মি প্রবেশ করিল। অত্রত্য গৃহ ও নৈশপদার্থের মধ্যে স্তম্ভ ও পাতলা 'চিক্' ভিন্ন আর কোন অন্তরাল নাই। এই আলোকে, এই সুন্দর চমৎকার আলোকে, এই সুমধুর সময়ে, ঊষার সমস্ত বিষণ্ণতা কোথায় যেন অন্তর্হিত হইল। আমি উদ্যানে নামিলাম।

তাল-বনের মধ্যস্থলে একটি ফাঁকা জায়গায় এই উদ্যানটি অবস্থিত।

ইহার মধ্যে কত শাদ্বলভূমি, কত গোলাপি-রঙের ফুলের বৃক্ষ, কত পর্ণতরু (Fern); উত্তপ্ত আর্দ্রস্থানেই এই পর্ণতরুগুলি জন্মায়। এরূপ অপূর্ব্ব পত্রপুঞ্জ ভারতবর্ষ ভিন্ন আর কোথাও দেখা যায় না। এইজাতীয় সর্ব্বপ্রকার বৃক্ষই এখানে আছে। কোন কোন পাতায় ফুলের মত রং; কোনটা ঘোর লাল, কোনটা বেগ্‌নি, কোনটা ফিঁকে-রক্তবর্ণ; কোনটায় সরীসৃপ-জাতীয় জীবদিগের পৃষ্ঠের ন্যায় ডোরাকাটা; আবার কোনটার গায়ে, প্রজাপতির পাখায় যেরূপ থাকে, সেইরূপ চোখ আঁকা।

প্রাতে ৭টায়—যে সময়ে তরুবীথিমণ্ডপতলে নিশার শৈত্য একেবারে চলিয়া যায় নাই—সেই সময়েই এখানকার লোকদিগের দেখাশুনা করিবার, লোক-লৌকিকতা করিবার সময়।—অস্মদ্দেশীয় রীতির সম্পূর্ণ বিপরীত! আমি সংবাদ পাইলাম, কাল এই সময়ে, রাজার সহিত পরিচিত হইবার জন্য, আমাকে ব্রাহ্মণগণ্ডির মধ্যে প্রবেশ করিতে হইবে।

মধ্যাহ্নের কাছাকাছি,—এত তালবৃক্ষ, এত ছায়া সত্ত্বেও, ঊর্দ্ধ-গগনাবলম্বী সূর্য্যের প্রচণ্ড উত্তাপে জীবনপ্রবাহ যেন সহসা স্তম্ভিত হইয়া গেল। সর্ব্বত্রই ঘুমন্ত ভাব, সর্ব্বত্রই নিস্পন্দতা; সেই চিরন্তন বায়সেরাও নিস্তব্ধ,—পত্রপুঞ্জের নীচে ভূতলে উপবিষ্ট।

আমার বারণ্ডা হইতে যে রাস্তাটি দেখিতে পাইতেছি, উহা হরিতের নৈশ অন্ধকারে মিলাইয়া গিয়াছে; সন্ধ্যা পর্য্যন্ত উহা লোকশূন্য থাকিবে। এখনও দুইচারিজন পথিক দৃষ্টিগোচর হইতেছে; উহারা নিজ নিজ কুটীরে ফিরিয়া যাইতেছে; ভারতবাসী অথবা ভারতবাসিনী; পরিধানে একইরকম লালধুতি; উজ্জ্বলশ্যামবর্ণ তাম্রাভ গাত্র—নগ্নপদে নিঃশব্দে চলিতেছে। লোকদিগের লাল্‌চে-রঙের কাপড়; এবং উহারা লালমাটির উপর দিয়া চলিতেছে; এদিকে তালপুঞ্জের অত্যুজ্জ্বল হরিদ্বর্ণ;—এই বৈপরীত্য-সংযোগে লালরঙের আরো যেন খোল্‌তাই হইয়াছে। কখন-কখন, কোন নিঃশব্দ গুরুপদক্ষেপে পথভূমি কাঁদিয়া উঠিতেছে। উহা হস্তীর পদক্ষেপ।

মহারাজার হস্তিগণ, কোনো মেঠো কাজ সমাধা করিয়া, চিন্তামগ্ন হইয়া ফিরিয়া আসিতেছে; উহারা হস্তিশালায় গিয়া এইবার নিদ্রা যাইবে। ইহার পর, আর কিছুই শুনা যায় না। কেবল যে সকল জীব স্বকীয় স্বাভাবিক গতির উন্মত্ত উচ্ছ্বাসে সর্ব্বদাই চঞ্চল, সেই তরুনিবাসী চটুল কাঠবিড়ালীরা চারিদিক্‌কার নিস্তব্ধতায় সাহস পাইয়া আমার কক্ষে প্রবেশ করিয়াছে।

সায়াহ্নে, যখন মনুষ্যের চেষ্টা-উদ্যম আবার আরম্ভ হইল, তখন আমার গৃহ হইতে বাহির হইয়া মহারাজার গাড়িতে আমি আরোহণ করিলাম। অশ্বদিগের দ্রুতগতিতে আমার মনে যেন একটা শৈত্যবিভ্রম উপস্থিত হইল।

এখন, ত্রিবন্দ্রম-নগরের আর-এক নূতন বিভাগ আমার চতুষ্পার্শ্বে প্রসারিত। এখন আর বৃক্ষের আধিপত্য নাই,—শাদ্বলভূমি উহাদের স্থান অধিকার করিয়াছে,—কতকগুলি বালুকাকীর্ণ সুন্দর বীথি প্রস্তুত হইয়াছে। আধুনিক-ধরণের রাজধানীতে যে সকল দ্রষ্টব্য বস্তু থাকা আবশ্যক, সে সমস্তই উদ্যানসমূহের অভ্যন্তরে বিকীর্ণ রহিয়াছে:—মন্ত্রণাভবন, আতুরাশ্রম, কর্জ্জ-কুঠী, বিদ্যালয়। এ সব জিনিস তত বেসুরো-বেখাপ্পা বলিয়া মনে হইত না,—যদি একটু ভারতীয়-ধরণে গঠিত হইত; কিন্তু, আমাদের এই বর্ত্তমান যুগে, পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই এই একই প্রকারের রুচি-দোষ দৃষ্ট হয়। এ ছাড়া, এখানে প্রটেস্‌টাণ্ট, ল্যাটিন ও সিরিয়া সম্প্রদায়ের বিবিধ খৃষ্টান গির্জ্জাদিও আছে। এই সিরিয়া সম্প্রদায়ের গির্জ্জাগুলি সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন এবং উহাদের সম্মুখভাগের আকৃতিটি নিতান্ত সাদাসিদা-ধরণের। কিন্তু সে যাহাই হোক, এ সমস্ত দেখিতে আমি ত্রিবঙ্কুরে আসি নাই। এখন আমি বুঝিতেছি, ব্রাহ্মণভারতের—রহস্যগভীর ভারতের সংস্পর্শে আসা কতটা কঠিন,—যদিও সেই জীবন্ত ভারত, সেই অপরিবর্ত্তনীয় ভারত আমার খুব নিকটেই রহিয়াছে বলিয়া

আমি অনুভব করিতেছি এবং উহার মহারহস্য আমার চিত্তকে সততই বিক্ষুব্ধ করিতেছে।

নগরের এই নব অঞ্চলটির বাহিরে, যে সুবিস্তৃত পরিসরের মধ্যে সমস্ত নীচজাতীয় হিন্দুরা বাস করে, তাহার উপর তালতরুর হরিৎ খিলান প্রসারিত। বাঁশের ছোট-ছোট বাড়ী, পাথর ও খড়-পাতার ছোট-ছোট পুরাতন দেবালয়, সেই চিরন্তন নারিকেলপুঞ্জের মধ্যে অর্দ্ধপ্রচ্ছন্ন; এই স্থানটি ছায়ার রাজ্য এবং ইহার বীথিগুলি তমসাচ্ছন্ন উদ্ভিজ্জের ঢাকা-বারণ্ডা-পথ বলিয়া মনে হয়।

কেবল একটিমাত্র রীতিমত রাস্তা আছে, সেই রাস্তা দিয়া, নক্ষত্র-পরিদৃশ্যমান একটা মুক্তস্থানে আসিয়া পড়িলাম এবং এই রাস্তা দিয়াই ব্রাহ্মণদিগের পবিত্র গণ্ডির দ্বারদেশে উপনীত হওয়া যায়। এই রাস্তাটি বণিক্‌বীথি; নিস্তব্ধপ্রায় এই যে নগর, ইহার যাহা-কিছু চলাচল, যাহা-কিছু কোলাহল সমস্তই এইখানে কেন্দ্রীভূত। সায়াহ্নের এই সময়ে, এই রাস্তাটি লোকাকীর্ণ; এইখানে ঘোড়াদিগকে একটু আস্তে-আস্তে চালাইতে হইল। লোকদিগকে দেখিলে মনে হয়, যেন সব দেবমূর্ত্তি, এমনি সুন্দর মুখশ্রী, এমনি শোভন-গম্ভীর দাঁড়াইবার ভঙ্গি, এমনি সুগভীর অতলস্প চোখের দৃষ্টি।

এই লোকদিগের বাহু ও গাত্র যেন তাম্রধাতুতে খোদা—গঠন-উৎকর্ষে ও সুচারু ভঙ্গিমায় পুরাতন গ্রীসের উৎকীর্ণ-চিত্রমূর্ত্তির সদৃশ।

সূক্ষ্মরুচি ও মহাগৌরবান্বিত উন্নতপদবীর ব্রাহ্মণেরা সাজসজ্জা তুচ্ছ করিয়া, নিকৃষ্টবর্ণের লোকদিগের অপেক্ষা—এমন কি, পারিয়াদিগের অপেক্ষাও স্বল্পপরিচ্ছদে যাতায়াত করিতেছে। শাদা কাপড়ের ধুতি কোমরে জড়ানো এবং তাহাই নগ্নবক্ষের উপর, চাপ্‌রাসের মত বক্রভাবে গিয়া কাঁধের উপর পড়িয়াছে; সেই নগ্নবক্ষে ছোট একটা শণ-সূতার দড়ি ভিন্ন আর কিছুই নাই; ইহাই বর্ণভেদের বাহ্যচিহ্ন; জন্মাবধিমাত্রই

পুরোহিত উহা গলায় বাঁধিয়া দেয়; উহা কস্মিন্‌কালেও ত্যাগ করিবার জো নাই; এই পবিত্র যজ্ঞসূত্র ব্রাহ্মণের জীবন-মরণের সাথী। উহাদের ললাটদেশে, গভীর কৃষ্ণবর্ণ নেত্রদ্বয়ের মাঝখানে স্বকীয় ইষ্টদেবতার সাঙ্কেতিক নাম অঙ্কিত থাকে, ধর্ম্মানুষ্ঠানের অঙ্গস্বরূপ এই চিহ্নটি প্রতিদিন প্রাতঃস্নানের পরে উহাদিগকে নূতন করিয়া সযত্নে ললাটে অঙ্কিত করিতে হয়। একটা লাল ফোঁটা ও তিনটা শাদা রেখা—ইহাই শৈবদিগের সাম্প্রদায়িক চিহ্ন; বৈষ্ণবদিগের একপ্রকার শাদা ও লাল রঙের ত্রিশূল-রেখা, যাহা ভ্রূদ্বয়ের মধ্যস্থল হইতে আরম্ভ করিয়া কেশ পর্য্যন্ত উত্থিত হয়। এই সাঙ্কেতিক চিহ্নগুলি আমাদিগের নিকটে নিতান্তই একটা প্রহেলিকা।

স্ত্রীলোক খুব অল্প কিংবা নাই বলিলেই হয়—যদিও প্রথমদৃষ্টিতে, গ্রন্থিবদ্ধ বা স্কন্ধের উপরে বিলম্বিত সুচিক্কণ দীর্ঘ কেশগুচ্ছ দেখিয়া পুরুষ-দিগকে স্ত্রীলোক বলিয়া সর্ব্বত্রই ভ্রম হয়। যে সকল স্ত্রীলোক দেখা যায়, তাও আবার অতি নীচবর্ণের—তাহাদের মুখশ্রী রাস্তার মজুর-রমণীদিগের ন্যায় নিতান্ত ইতরধরণের। অবশ্য ব্রাহ্মণদিগের পত্নী ও কন্যাগণ এই পবিত্র গণ্ডির মধ্যে বাস করে। সন্ধ্যার সময় উহারা দলে দলে চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায়।

এই সমস্ত বাড়ী,—যাহা গতরাত্রে, নীলাভ-প্রশান্ত-কিরণ-তলে, নিদ্রা-মগ্ন ও নিমীলিতনেত্র বলিয়া মনে হইয়াছিল—এক্ষণে উহা জীবন-উদ্যমে পূর্ণ। এখন উহাতে বাজার বসিয়াছে; ফল, শস্য-দানা, রঙিন ফুলের ছাপ-দেওয়া মিহি কাপড়; সোনার মত ঝক্‌ঝকে পিতলের সামগ্রী:—এই পিতলের সামগ্রীর মধ্যে, বহুডালবিশিষ্ট পাতলা-গঠনের প্রদীপ—খুব উচ্চ পায়ার উপর বসানো—(যেরূপ 'পম্পে'তে দেখিতে পাওয়া যায়); বিবিধপ্রকার পূজার বাসন ও পাত্র, এবং হস্তীর উপর আরূঢ় দেবদেবীর মূর্ত্তি।

তাহার পর, আমার প্রদর্শকমহাশয় আমাকে কতকগুলি কুম্ভকারের কর্ম্মস্থান দেখাইলেন। এই সকল কারখানা বর্ত্তমান মহারাজার স্থাপিত। এখানে সুন্দর প্রাচীন-ধরণে মৃৎপাত্রাদি প্রস্তুত হয়। আর কতকগুলি কারখানা দেখিলাম, যেখানে রাজপুতানা ও কাশ্মীরপ্রচলিত রঙের অনুকরণে পশমের গালিচাদি তৈয়ারি হয়। অবশেষে কতকগুলি শিল্পশালা দেখিলাম, যেখানে ধৈর্য্যশালী খোদকেরা নিকটস্থ অরণ্যহস্তীদিগের দন্ত খুদিয়া দেবদেবীর ছোট-ছোট সুন্দর মূর্ত্তি অথবা চামরের ও ছাতার ডাণ্ডি নির্ম্মাণ করিতেছে।

কিন্তু এ সব দেখিবার জন্য আমি ত্রিবঙ্কুরে আসি নাই। রাজপ্রাসাদ-গণ্ডির বাহিরে ও নিষিদ্ধপ্রবেশ বৃহৎ দেবালয়ের অভ্যন্তরে যে সকল ব্যাপার হইয়া থাকে—যাহা নিতান্তই ভারতীয়—যাহা ভারতের একেবারে নিজস্ব-জিনিস—কেবল তাহাই দেখিবার জন্য আমার মন নিয়ত আকৃষ্ট হয়।...

ত্রিবঙ্কুরে একটি পশু-উদ্যান আছে; আমাদের য়ুরোপীয় রাজধানী-সমূহের পশু-উদ্যানগুলির ন্যায় এটিও সযত্নরক্ষিত;—ইহাতে হরিণদিগের বিচরণভূমি আছে, কুম্ভীরের চৌবাচ্চা আছে:—এইরূপ স্থান অতি বিরল; শ্বাসরোধী নিবিড় তালপুঞ্জের ছায়া হইতে বাহির হইয়া এই স্থানটিতে আসিয়া অরণ্য ও জঙ্গলের দূরদৃশ্য একটু দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে কতকগুলি শাদ্বলভূমি আছে, তাহার চারিধারে দুর্লভ গাছের চারা ও বড় বড় বিদেশী ফুলের গাছ লাগানো হইয়াছে। এই অংশটি এমনি ভাবে নির্ম্মিত যে, এখানে বেশ নিরাপদে বিচরণ করা যায়; কেন না, এখানকার তৃণাদি উদ্ভিজ্জ সযত্নে ছাঁটা, এবং যে সকল ব্যাঘ্রসর্পাদি হিংস্রজন্তু এখান হইতে হদ্দ ছয়সাতক্রোশ দূরে, জঙ্গলের মধ্যে মুক্তভাবে বিচরণ করে—এখানে তাহারা পিঞ্জরবদ্ধ। সূর্য্য এখন আর জগৎকে দগ্ধ করিতেছে না—রাত্রিও আসিয়া পড়ে নাই; এই অল্পস্থায়ী মনোহর সময়টিতে একদল ঐক্যতানবাদক, উদ্যানের দ্বারহীন চারিদিক্-খোলা

একটি ক্ষুদ্র বিনোদমন্দিরে বাজাইবার জন্য উপস্থিত হইয়াছে। উহারা সকলেই ভারতবর্ষীয়; উহারা য়ুরোপীয় সুর অতি বিশুদ্ধভাবে বাজায়। উদ্যানের বালুকাকীর্ণ সুঁড়িপথগুলিতে, শ্রোতৃবর্গের মধ্যে—কতকগুলি পাত্‌লা-পাত্‌লা নগ্নগাত্র ব্যক্তি অবস্থিত; শ্বেতজাতীয় দুই-চারিটি খোকা-খুকি—(শ্বেতজাতির মধ্যে দুইচারিজনমাত্র এখানে আছে) রং খুব ফ্যাকাসে—ভারতীয় ধাত্রীর ক্রোড়ে অবস্থিত। তা ছাড়া, দেশীয় শিশুও কতকগুলি ছিল—রাজাদের ছেলে; কিন্তু কি দুঃখের বিষয়, এখন তাহারা আর নিজেদের জাতীয় পরিচ্ছদ পরিধান করে না, পরন্তু উদ্ভট-অদ্ভুত পাশ্চাত্যপুতুলের ছদ্মবেশ ধারণ করে; তাম্রবর্ণসত্ত্বেও এই নরপুত্তলিকাগুলি অতি সুন্দর, আর চোখগুলিও খুব বড়-বড় ও কালো মখমলের মত। এই পশু-উদ্যানটি একটু উচ্চভূমির উপর অধিষ্ঠিত হওয়ায়, দূরস্থ ভারতসমুদ্র অল্প অল্প দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু এ সমুদ্রে জাহাজ নাই; অন্য দেশে সমুদ্র বাহ্যজগতের সহিত গতিবিধির পথ বলিয়াই পরিচিত; কিন্তু এ অঞ্চলের সমুদ্রটি একেবারেই অব্যবহার্য্য ও মনুষ্যের প্রতিকূলাচারী;—যোগ নিবদ্ধ করা দূরে থাকুক, বাহ্যজগৎ হইতে উহা যেন এই দেশকে আরও বেশি পৃথক্ করিয়া রাখে। কেন না, এই উপকূলের কোথাও একটি বন্দর নাই; এমন কি, একখানি নৌকাও নাই, ধীবরও নাই, কেবল চারিদিকে দুর্লঙ্ঘ্য বীচিমালা। ত্রিবন্দ্রমের এই 'সৌখীন' দিবাবসান-সময়ে, যখন কেবলমাত্র দুইচারিটি বেচারি খোকা-খুকির জন্য ঐকতানবাদ্য বাদিত হয়, তখন ঐ দূরস্থ সমুদ্রের উপচ্ছায়া প্রবাসীর মনে কষ্ট ও বিষাদের ভাব আরো যেন বাড়াইয়া তুলে।

এক্ষণে সূর্য্যদেব অস্ত গেলেন—বড় শীঘ্র অস্ত গেলেন:—ক্ষণেকের জ্বলন্ত মহিমা; দেখিলে মনে হয়, যেন রক্তবর্ণ ভূমির উপর গোলাপি রংমশালের আলো, এবং তৃণপুঞ্জের উপর—দিগন্তব্যাপী দুর্ভেদ্য বনভূমির উপর—সবুজ রংমশালের আলো পতিত হইয়াছে। তাহার পর অতি শীঘ্র

(সহসা বলিলেও হয়) রাত্রির আবির্ভাব হইল। এখানে দীর্ঘবিলম্বিত গোধূলি নাই—ঠিক্ সেই একই সময়ে রাত্রি আসিয়া পড়ে—আমাদের দেশের ন্যায় এই সময়টি ঋতুর উপর কোন প্রভাব প্রকটিত করে না। উদ্যানে রাত্রিটা যেন আরো বেশি করিয়া দেখা দিয়াছে—কেন না, ইহার ঝোপ্‌ঝাড়ের সুঁড়িপথে, তালপুঞ্জের নীচে—চতুর্দ্দিকের সকল স্থানই ইহারই মধ্যে ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন। এই সময়ে ব্রহ্মার মন্দির হইতে একটা কোলাহল উত্থিত হইল; আর সমস্ত অন্যান্য ইতস্ততোবিকীর্ণ মন্দির হইতে, প্রাতঃকালের ন্যায়, আবার শঙ্খঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। নারিকেল-তৈল-সিক্ত শতসহস্র প্রদীপ বনভূমিতলে প্রজ্বলিত হইল এবং এই লাল আগুনের আলোকচ্ছটা অন্ধকারাচ্ছন্ন পথসমূহে প্রসারিত হইল।

প্রাতঃকাল, সাতটা; রাজাদিগের সহিত দস্তুরমত দেখাসাক্ষাৎ করিবার ও তাঁহাদের অভ্যর্থনা গ্রহণ করিবার ইহাই নির্দ্দিষ্ট সময়। যে সময়ে, চিরনিদাঘ ত্রিবঙ্কুরের দীপ্যমান প্রখর সূর্য্যরশ্মি দিগন্ত হইতে সুদীর্ঘ সরলরেখায় প্রসারিত হইয়া, পত্রাবরণ ভেদ করিয়া, তালকুঞ্জের মধ্যে প্রবেশ করিল এবং নারিকেল ও সুপারি তরুর শিখরদেশ স্বর্ণাভ গোলাবি-রঙে রঞ্জিত করিল,—সেই সময়ে, আমি মহারাজার অতিথিস্বরূপে, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য গাড়িতে উঠিলাম। প্রথমে তালজাতীয় তরুমণ্ডপের নীচে দিয়া আমাদের গাড়ি চলিতে লাগিল; একটু পরেই, একটা প্রকাণ্ড সিংহদ্বারেরর সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। এখানে পৌঁছিবার প্রথম রাত্রেই, যে তোরণটি পার হইয়াছি বলিয়া মনে করিয়াছিলাম,—ইহা সেই তোরণ। ইহার ভিতর দিয়া একটা চতুষ্কোণ প্রাচীরের মধ্যে আসিয়া পড়িলাম। ইহা যেন একটি নগরের মধ্যে নগর। ইহার মধ্যে নীচজাতীয় লোকেরা প্রবেশ করিতে পায় না।

এইবার আমার গাড়ি তোরণের মধ্য দিয়া একেবারে সিধা চলিয়া

গেল। সেইখানে কতকগুলি অস্ত্রধারী সৈনিক তোরণ রক্ষা করিতেছিল। প্রবেশ করিবামাত্র পুণ্যস্থানের বিবিধ নিদর্শন আমার দৃষ্টিপথে পতিত হইল। আমরা একটা বিস্তীর্ণ সরোবরের ধার দিয়া চলিতে লাগিলাম। সেই সরোবর-জলে আ-কটি-মজ্জিত হইয়া ব্রাহ্মণেরা প্রাতঃস্নান করিতেছে; প্রাচীন প্রচলিত পদ্ধতি অনুসারে পূজার মন্ত্রাদি পাঠ করিতেছে; উহাদের লম্বিত কেশগুচ্ছ বাহিয়া জলবিন্দু ঝরিতেছে; উহাদের আর্দ্র গাত্র সূর্য্যকিরণে, অভিনব পিত্তলসামগ্রীর ন্যায় ঝিক্‌মিক্ করিতেছে;—মনে হইতেছে, যেন উহারা কতকগুলি জলদেবতা। উহারা স্বকীয় ধ্যানে এমনি নিমগ্ন,—আমাদের গাড়ি উহাদের পার্শ্ব দিয়া চলিতেছে, সৈনিকগণ আমাদের সম্মানার্থ তূরীনাদ করিতেছে, জয়ঢাক পিটাইতেছে, তথাপি সেদিকে উহাদের দৃক্‌পাত নাই।

ইতরসাধারণের অপ্রবেশ্য এই ঘেরটির মধ্যে রাজপরিবারবর্গের নিবাসগৃহ, পাঠশালাসমূহ, আর সেই সর্ব্বপ্রধান মন্দিরটি অধিষ্ঠিত—যাহা আর চারিটি বিরাট্ অট্টালিকার উপর—সেই দেবমন্দিরের গগনভেদি-চূড়াচতুষ্টয়ের উপর—আধিপত্য করিতেছে। এই প্রাসাদের সম্মুখভাগের আকৃতি ও প্রাসাদপ্রাচীরের বহির্ভাগটি যেন একটু বিষাদময়। প্রাসাদ-দ্বারের উপর দুইটি যুগল কাল্পনিক মূর্ত্তি অধিষ্ঠিত; এই মূর্ত্তি-দুটি ভারতীয়-ধরণের। আরো কিছু দূরে, পূর্ব্বদিকের শেষপ্রান্তে, কতকগুলি 'দ্রাগন'-মূর্ত্তি অধিষ্ঠিত—উহা স্পষ্ট চীনদেশীয় বলিয়া মনে হয়।

সমস্তই অতি উজ্জ্বল বর্ণে রঞ্জিত; এবং বহুবর্ষাবধি ধূলিরাশি সঞ্চিত হইয়া উহাদিগকে 'পোড়া-পোড়া' ও আরক্তিম করিয়া তুলিয়াছে। কেন না, পথগুলির ন্যায়, এদেশে ধূলিও লাল।

মহারাজার প্রাসাদদ্বারের সম্মুখে, অশ্বারোহী রক্ষিগণ আবার আমার সম্মানার্থ স্কন্ধ হইতে অস্ত্রাদি নামাইয়া লইল। সৈনিকগুলিকে দেখিতে খুব জাঁকালো, বেশ কায়দা-দোরস্ত, লাল পাগ্‌ড়ি-পরা; এবং উহারা

আধুনিক নিয়মানুসারে, 'পুনঃপুনঃ আওয়াজকারী' নবপ্রচলিত বন্দুকের যথাযথ প্রয়োগ ও চালনা করিতে পারে।

মহারাজা স্বয়ং অভ্যর্থনার জন্য দ্বারদেশে আসিয়া উপস্থিত। আমার ভয় ছিল, পাছে আমার সম্মুখে য়ুয়োপীয়-বৃহৎ-কোর্ত্তাধারী কোন রাজমূর্ত্তির আবির্ভাব হয়। কিন্তু না—মহারাজা সুরুচির পরিচয় দিয়া খাঁটি ভারতীয় বেশেই আসিয়াছিলেন।—শাদা রেশমের পাগ্‌ড়ি, মখ্‌মলের পরিচ্ছদ—বোদামগুলি স্বচ্ছ হীরকের।

যে দরবারশালায় প্রথম আমার অভ্যর্থনা হইল, উহার কুট্টিমতল চীন-বাসনের দ্রব্যে মণ্ডিত; চাঁদোয়া হইতে কতকগুলি বেলোয়ারি ঝাড়-লণ্ঠন ঝুলিতেছে; মধ্যস্থলে খোদাই-কাজ-করা একটা রৌপ্য-সিংহাসন, উহার চারিধারে কালো-রঙের আস্‌বাব্;—পুরু আব্লুস্-কাঠে খোদাই-কাজ-করা ভারতীয়-ধাঁচার কালো আরাম-কেদারা; কি করিয়া এরূপ মূল্যবান্ কঠিন কাষ্ঠে খোদাই-কাজ করা যাইতে পারে—এ কেবল আশিয়া-খণ্ডের লোকেরাই জানে।

ফরাসী-সরকারের একটি সম্মানভূষণ মহারাজকে প্রদান করিবার ভার আমার উপর অর্পিত হইয়াছিল;—এই সহজ কাজটি সম্পন্ন করিয়া, তাঁহার সহিত য়ুরোপের বিষয় লইয়া কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিলাম। এই য়ুরোপদর্শন তাঁহার পক্ষে অসম্ভব; কেন না, বর্ণাশ্রমপ্রথার দুর্লঙ্ঘ্য শাসনে, ভারতবর্ষ ছাড়িয়া তাঁহার কোথাও যাইবার যো নাই। প্রধানত সাহিত্যের বিষয় লইয়াই তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা চলিল; কেন না, মহারাজা মার্জ্জিতরুচি ও সুশিক্ষিত। পরে, তিনি হস্তিদন্তের আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য বিচিত্র দ্রব্যসামগ্রী দেখাইবার নিমিত্ত, আমাকে একটি উচ্চ শিল্পাগারে লইয়া গেলেন। এই শিল্পসামগ্রীগুলি তিনি সযত্নে সংগ্রহ করিয়াছেন। এইবার বিদায়কাল উপস্থিত হইল; আমি মহারাজার নিকট বিদায় লইলাম।

আবার সেই তালজাতীয় তরুপুঞ্জের হরিৎ অন্ধকারের মধ্য দিয়া আমার

গাড়ি চলিতে লাগিল। এই অমায়িক রাজার সহিত, আর-একটু গভীর-ভাবে বিবিধ বিষয়ের আলোচনা করিতে পারিলাম না বলিয়া দুঃখ রহিয়া গেল। কেন না, আমাদের মনের গঠন ও তাঁহার মনের গঠন ভিন্ন হইবারই কথা।

যে কয়েকদিন আমি এখানে থাকিব, তাহার মধ্যে অবশ্যই আবার আমাদের দেখাসাক্ষাৎ হইবে। কিন্তু এই প্রথম সাক্ষাৎকারেই আমি বুঝিয়াছি, এখানকার বৃহৎ মন্দিরটির ন্যায়, তাঁহার মনের অন্তরতম প্রদেশটিও আমার নিকট দুর্ভেদ্যরহস্যরূপেই থাকিয়া যাইবে। আমাদের উভয়ের মধ্যে, কি জাতি, কি কুল, কি ধর্ম্ম,—সকল বিষয়েই মূলগত পার্থক্য বিদ্যমান। তা ছাড়া, আমাদের ভাষা এক নহে। বাধ্য হইয়া একজন তৃতীয় ব্যক্তিকে আমাদের মধ্যে রাখিতে হয়;—ইহাই ত একটা বিষম বাধা; দোভাষী যতই সাহায্য করুক না কেন, তবু যেন আমাদের মধ্যে একটা পর্দ্দার ব্যবধান থাকিয়া যায়; এইজন্য আমাদের কথাবার্ত্তা বেশিদূর অগ্রসর হইতে পায় না,—একস্থানে সহসা থামিয়া যায়।

দুইতিনদিনের মধ্যে, আমি মহারাণীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে পাইব। মহারাণী পৃথক্ প্রাসাদে থাকেন। ইনি মহারাজের পত্নী নহেন,—ইনি তাঁহার মাতুলানী। ত্রিবঙ্কুরের প্রধান গোষ্ঠীবর্গ যে জাতির অন্তর্গত, সে জাতিটি বহু প্রাচীন; উহা এক্ষণে ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশ হইতে একেবারে অন্তর্হিত হইয়াছে। এই জাতির মধ্যে, কেবল পত্নীর দিক্ দিয়াই লোকের নাম, উপাধি ও সম্পত্তি উত্তরবংশে সংক্রামিত হয়। তা ছাড়া পত্নীর স্বেচ্ছামত স্বামিপরিত্যাগের অধিকার আছে।

রাজপরিবারের মধ্যে, অভিজাতা প্রধানা মহিলার জ্যেষ্ঠকন্যা—'মহারাণী' এবং জ্যেষ্ঠপুত্র—'মহারাজা' হইয়া থাকেন। কিন্তু বর্ত্তমান মহারাণী কিংবা তাঁহার ভগিনীগণের সেরূপ কোন বংশসূত্র না থাকায়, বর্ত্তমান রাজবংশ শীঘ্রই বিলুপ্ত হইবার কথা।

এই রাজত্বে, মহারাজার সন্তানদিগের কোন উত্তরাধিকারস্বত্ব নাই; শুধু অধিকার নাই তাহা নহে—"রাজকুমার" কিংবা "রাজকুমারী" এই উপাধিলাভেও তাহারা বঞ্চিত।

এই 'নায়ের'জাতীয় মহিলাদিগের মুখশ্রী অতীব সুন্দর। অস্মদ্দেশীয় কুমারীদিগের ন্যায় উহারা কেশের কিয়দংশ ফিতা দিয়া বাঁধিয়া রাখে, এবং অবশিষ্ট অংশ একপ্রকার গোলাকৃতি "চাপাটির" আকারে রচনা করিয়া তাহাই মস্তকের চূড়াদেশে ধারণ করে; তাহার কতকটা সম্মুখভাগে ও কতকটা পার্শ্বদেশে কপালের দিকে ঝুলিয়া পড়ে;—দেখিলে মনে হয়,—কোঁচ্‌কানো-কিনারা একপ্রকার টুপি যেন বেশ একটু ঢং করিয়া মাথায় পরিয়াছে। কিন্তু-উহাদের কেশরচনায় যেরূপ বিলাসলীলা প্রকাশ পায়, উহাদের দেহের সমস্ত সাজসজ্জায় তেম্‌নি আবার তাপসসুলভ একটা কঠোর গাম্ভীর্য্য দেদীপ্যমান।

এখন সূর্য্যের প্রখর তাপ কমিতে আরম্ভ হইয়াছে; এই অপরাহ্ণ চারঘটিকার সময় গায়ক-বাদকের দল আসিয়া পৌঁছিল; তাহারা দলে-দলে গরুর গাড়িতে আসিয়াছে। মহারাজা নিজ প্রাসাদের গায়ক-বাদকদিগকে কিয়ৎকালের জন্য আমার নিকট পাঠাইয়াছেন।

উহাদের মুখাবয়ব-রেখা সূক্ষ্ম ও সুকুমার, সমস্ত মুখশ্রী কলা-গুণিজন-সুলভ। নিঃশব্দে নগ্নপদে উহারা প্রবেশ করিল;—মার্জ্জারবৎ মখমল-কোমল-পদসঞ্চারে প্রবেশ করিল। দস্তুরমত সম্মানপ্রদর্শনার্থ একটু নতশির হইয়া, তাহার পর ভূতলে গালিচার উপর উপবেশন করিল। মাথায় ক্ষুদ্র জরির পাগ্‌ড়ি; উহাদের গাত্র—পুরাকালীন গ্রীসীয়-ধারণে—রেশমি বস্ত্রে আচ্ছাদিত;—উদরের একপার্শ্ব অনাবৃত রাখিয়া উহা স্কন্ধের উপর দিয়া লুটাইয়া পড়িয়াছে। বাহুদ্বয় ধাতব বলয়ে বিভূষিত। উহাদের ফিন্‌ফিনে পাত্‌লা পরিচ্ছদের মধ্য হইতে আতর-গোলাপের গন্ধ ভুরভুর্ করিয়া বাহির হইতেছে।

উহারা তাম্রতন্ত্রীযুক্ত বড় বড় বাদ্যযন্ত্র সঙ্গে আনিয়াছে :—সে এক-প্রকার বিরাট্ "ম্যাণ্ডলিন্" কিংবা "গিতার্"। যন্ত্রগুলির ডাণ্ডি বাঁকিয়া-গিয়া একপ্রকার বিরাট্-আকৃতি জন্তুবিশেষের মস্তকে পর্য্যবসিত হইয়াছে। এই "গিতার্"-গুলি বিভিন্নপ্রকারের এবং উহা হইতে বিভিন্নপ্রকারের স্বর নিঃসৃত হইবার কথা। কিন্তু সকলগুলিরই স্বরকোষ প্রকাণ্ড এবং স্বরের রেস্ বৃদ্ধি করিবার জন্য যন্ত্রগুলির গায়ে ফাঁপা তুম্বসকল রহিয়াছে ;—মনে হয়, যেন একটি তরুকাণ্ডের গায়ে বড়-বড় ফল ফলিয়া রহিয়াছে। এই যন্ত্র-গুলি রং-করা, গিল্‌টি-করা, হাতীর-দাঁতের কাজ-করা, বহু পুরাতন, সম্পূর্ণরূপে শুষ্কীকৃত, শব্দযোনি ও বহুমূল্য দুর্লভ জিনিষ। কেবলমাত্র উহাদের বিচিত্র আকৃতি ও অদ্ভুত গঠন দেখিয়াই আমার মনে রহস্যময় ভাব—ভারতসংক্রান্ত রহস্যময় ভাব জাগিয়া উঠিল। বাদকেরা হাসিমুখে যন্ত্রগুলি আমাকে দেখাইতে লাগিল। উহাদের মধ্যে কতকগুলি যন্ত্র অঙ্গুলীর দ্বারা, কতকগুলি ছড়ের দ্বারা ও কতকগুলি ঝিনুকের দ্বারা বাজাইতে হয়। আর-একপ্রকার যন্ত্র আছে—তাহার তারের উপর কালো ডিম্বাকার একটুক্‌রা আবলুশ্-কাষ্ঠ বুলাইয়া বাজাইতে হয়। বাদনের কি সূক্ষ্ম ভেদ! এই সকল সূক্ষ্মভেদ আমাদের পাশ্চাত্য সঙ্গীতবিদ্যার অগোচর!

তা ছাড়া, কতকগুলি "টম্‌টম্"বাদ্য আছে,—সেগুলি বিভিন্ন সুরে বাঁধা। আবার, কতকগুলি বালক-গায়ক আসিয়াছে ; উহাদের পরিচ্ছদ বিশেষরূপে জম্‌কালো ও বিলাস-জম্ভৃত। আমার জন্য, সঙ্গীতকার্য্যের যে অনুক্রম-পত্র ছাপা হইয়াছে, উহার একখণ্ড আমার হস্তে উহারা অর্পণ করিল। গায়ক-বাদকদিগের শ্রুতিমধুর অদ্ভুত নাম উহাতে লেখা রহিয়াছে—সকল নামগুলিই প্রায় দ্বাদশ-পদাক্ষরের।

পাঁচটা বাজিল। গায়ক-বাদকের দল সব-সুদ্ধ প্রায় পঁচিশ জন। উহারা গালিচার উপর আসীন। যে বৈঠকখানা-ঘরে উহারা বসিয়াছে, সেই ঘরের মধ্যে এখনি যেন সন্ধ্যার ছায়া পড়িয়াছে। দোলার দোলনবৎ অলসভাবে

"পাঙ্খা" চলিতেছে। এইবার সঙ্গীতের আলাপ সুরু হইবে; কেন না, যন্ত্রের অগ্রপ্রান্তস্থ পশুমূর্ত্তিগুলা খাড়া হইয়া উঠিয়াছে। এই প্রকাণ্ড যন্ত্রগুলি হইতে না-জানি-কি ভয়ানক শব্দ—এই "টম্‌টম্"-গুলি হইতে না-জানি-কি ভীষণ কোলাহলই সমুত্থিত হইবে। আমি প্রতীক্ষা করিয়া আছি—একটা তুমুল শব্দ শুনিব বলিয়া প্রস্তুত হইয়া আছি। গায়কবাদকদিগের পশ্চাদ্ভাগে একটা খিলানাকৃতি দ্বার উন্মুক্ত; তাহার পরেই একটা শাদা প্রবেশ-দালান। সেই দালানে অস্তমান সূর্য্যের একটি কনকরশ্মি প্রবেশ করিয়া মহারাজার একদল সৈন্যের উপর নিপতিত হইয়াছে। শোভার্থ সজ্জিত এই সৈনিকমূর্ত্তিগুলি মাথায় লাল পাগ্‌ড়ি পরিয়া, রক্তিম সূর্য্যালোকে দণ্ডায়মান। এদিকে, গায়কবাদকের দল ঘোর-ঘোর অস্পষ্ট ছায়ার মধ্যে নিমজ্জিত।

উহাদের সঙ্গীত কি আরম্ভ হইয়াছে? হাঁ, বোধ হয় আরম্ভ হইয়াছে। কেন না, দেখিতেছি, উহারা গম্ভীরভাব ধারণ করিয়াছে। কিন্তু কৈ, কিছুই ত শুনা যাইতেছে না।...না না—ঐ যে...একটি ক্ষুদ্র তার-গ্রামের সুর—কদাচিৎ শ্রুতিগ্রাহ্য—"লোহেন্‌গ্রিন্"-গীতিনাট্যের উদ্ঘাটক আলাপ-চারীর ন্যায় অতি-বিলম্বিত লয়ে বাদিত হইতেছে। পরে, উহা "দুন্"-লয়ে বাজিতে লাগিল, তান-পল্লবে জটিল হইয়া উঠিল; কিন্তু শব্দের মাত্রা, আদৌ বৃদ্ধি না পাইয়া, শুধু ছন্দোময় গুঞ্জনে পরিণত হইল। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই, এই সকল শক্তিমান্ তন্ত্রীসমূহ হইতে নিঃশব্দপ্রায় সঙ্গীত বাহির হইতেছে!—যেন করপুট-বন্দী মক্ষিকার গুন্‌গুন্‌শব্দ, যেন জান্‌লা-শাসির গায়ে পতঙ্গের ঘর্ষণশব্দ অথবা যেন Dragon-fly মক্ষিকার কাতরধ্বনি বলিয়া মনে হয়। উহাদের মধ্যে একজন মুখের মধ্যে একটি ছোট ইস্পাতের জিনিষ রাখিয়া তাহার উপর গণ্ডদেশ ঘর্ষণ করিয়া ফোয়ারার জলোচ্ছ্বাসের ন্যায় একপ্রকার ছন্‌ছন্ শব্দ বাহির করিতেছে। একটা বৃহৎ "গিতারের" উপর এবং অন্যান্য বিচিত্র যন্ত্রের উপর বাদক যেন অতি

ভয়ে-ভয়ে ও সন্তর্পণে হাত বুলাইয়া প্রায় একই সুর ক্রমাগত বাহির করিতেছে। পেচকের চাপা কণ্ঠস্বরের ন্যায়, ক্রমাগত হুহু!—হুহু!—এইরূপ শব্দ নির্গত হইতেছে। আবার সুদূর সমুদ্রতটের উপর বীচিভঙ্গ-শব্দের ন্যায় একপ্রকার চাপা আওয়াজ কোন-এক যন্ত্র হইতে বাহির হইতেছে। একপ্রকার "টম্‌টম্"-জাতীয় যন্ত্র আছে, তাহার কিনারার উপর বাদক অঙ্গুলীর আঘাত করিয়া বাজাইতেছে।...তাহার পর, হঠাৎ অতর্কিতপূর্ব্ব কতকগুলি ঝাঁকানি আরম্ভ হইল, কিন্তু তাহার প্রচণ্ড প্রকোপ মুহূর্ত্তদ্বয়স্থায়ী। সেই সময় "গিতার্"-তন্ত্রীগুলি যার-পর-নাই সজোরে কম্পিত হইতে থাকে এবং 'টম্‌টম্'গুলি হইতেও তখন গম্ভীর চাপা আওয়াজ বাহির হইতে থাকে। কোন ফাঁপা মাটির উপর গুরুপদক্ষেপে হাতী চলিয়া গেলে যেরূপ শব্দ হয়, উহার সেইরূপ শব্দ; অথবা কোন গূঢ়মার্গ অন্তর্ভৌম জল-প্রবাহনিঃসৃত কল্লোলের ন্যায়;—কিন্তু শীঘ্রই সমস্ত প্রশমিত হইল। আবার সেই পূর্ব্ববৎ নিঃশব্দপ্রায় বাদনক্রিয়া।

একজন ব্রাহ্মণযুবক—যার চোখদুটি অতি সুন্দর—সে ভূমির উপর আসনবদ্ধ হইয়া বসিয়া আছে; তাহার জানুর উপর একটি জিনিষ রহিয়াছে। অন্যান্য দ্রব্যাদি যেরূপ সুশোভন ও সুরুচিসূচক, এ জিনিষটা ঠিক তার বিপরীত। ইহা নিতান্ত রূঢ় গ্রাম্যধরণের। একটা সামান্য মাটির হাঁড়ি, তাহার মধ্যে কতকগুলো নুড়ি। হাঁড়ির বৃহৎ মুখটা তাহার নগ্ন সুবক্র বক্ষের উপর স্থাপিত। ঐ মুখের কিয়দংশ যে পরিমাণে খুলিয়া রাখিতেছে কিংবা বুকে চাপিয়া বন্ধ করিতেছে, তদনুসারে তন্নিঃসৃত শব্দেরও তারতম্য হইতেছে। এবং অঙ্গুলীর দ্বারা সেই হাঁড়িটা এত তাড়াতাড়ি বাজাইতেছে যে, দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। উহার শব্দ কখন লঘু, কখন গভীর, কখন খট্‌খটে। এক-এক সময়ে যখন নুড়িগুলা নড়িয়া উঠে, তখন শিলা-বৃষ্টির ন্যায় পট্‌পট্‌শব্দ শ্রুত হয়। পূর্ব্বোক্ত শব্দময় নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া যখন কোন একটি "গিতার্" হইতে স্বতন্ত্রভাবে তান উত্থিত হয়, তখন কোন

স্বর হইতে স্বরান্তরে গড়াইয়া যাইবার সময় ধ্বনিটা যেন আর্ত্তনাদ করিয়া উঠে। সেই আবেগময় তানটি সজোরে পূর্ণস্বরে বাদিত হয় এবং তীব্র যাতনায় যেন একেবারে অধীর ও সংক্ষুব্ধ হইয়া উঠে। তখন টম্‌টম্‌গুলির বাদ্য, এই কম্পমান আর্ত্তনাদকে আবৃত না করিয়া, একপ্রকার রহস্যময় তুমুল শব্দ বাহির করিতে থাকে। উহা মানবহৃদয়ের দুঃখযাতনার পরাকাষ্ঠা এরূপ তীব্রভাবে প্রকাশ করে—যাহা আমাদের উচ্চতম পাশ্চাত্য-সঙ্গীতের সাধ্যাতীত।···

—"হস্তীরা আসিয়া পৌঁছিয়াছে"—একজন বলিয়া উঠিল। আমি মুগ্ধ হইয়া সঙ্গীত শুনিতেছিলাম—এই বাক্যে আমার সেই মোহ ছুটিয়া গেল।···হাতী আবার কোথা হইতে আসিল?—ও! মনে পড়িয়াছে; ·· ভারতীয় সাজসজ্জায় সজ্জিত হাওদা-সমেত একটি হস্তী দেখিবার জন্য আমি ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলাম; এবং তদনুসারে আমার জন্য রাজার হস্তিশালা হইতে হস্তী সজ্জিত করিয়া আনিবার আদেশ হয়।

সঙ্গীত থামিয়া গেল। কেন না, হাতী দেখিবার জন্য এখন আমাকে ঘরের বাহির হইতে হইবে। বাড়ীর দ্বারদেশ পার হইয়াই হঠাৎ দেখিলাম —আমার সম্মুখে তিনটা বড়-বড় হস্তী দণ্ডায়মান। অস্তমান সূর্য্যের আলোকে উদ্ভাসিত এই তিনটা হাতী দ্বারদেশের সন্নিকটে আমার জন্য এতক্ষণ অপেক্ষা করিতেছিল। উহাদের সর্ব্বশরীর সাজসজ্জায় এরূপ আবৃত যে, সম্মুখে আসিয়া প্রথমে আর কিছুই লক্ষ্য হয় না;—লক্ষ্য হয় শুধু উহাদের সুদীর্ঘ আত্মরক্ষণের অস্ত্র দন্তদ্বয়, উহাদের কালো-ফুট্‌কি-যুক্ত গোলাপি-রঙের প্রকাণ্ড শুণ্ড, আর উহাদের কর্ণদ্বয়—যাহা হাতপাখার ন্যায় ক্রমাগত আন্দোলিত হইতেছে। সবুজ ও লাল রঙের দীর্ঘ পরিচ্ছদ; স্তম্ভযুক্ত হাওদা, ঘণ্টিকার হার এবং জরির টুপি—যাহা উহাদের বিস্তৃত ললাট পর্য্যন্ত নাবিয়া আসিয়াছে। তিনটা হাতীই প্রকাণ্ড, ৭০ বৎসর বয়ঃক্রম, বেশ বলিষ্ঠ, আর এমন বশ্য—এমন শান্ত। উহাদের বুদ্ধিব্যঞ্জক

ক্ষুদ্র চক্ষুর দৃষ্টি আমার উপর ন্যস্ত হইল। আর এমন শায়েস্তা,—যাহাতে আমি ধীরে-সুস্থে আরোহণ করিতে পারি, তজ্জন্য অনেকক্ষণ জানু পাতিয়া বসিয়া রহিল।

আবার যখন আমি সেই মক্ষিকাগুঞ্জনবৎ সঙ্গীতের নিকট ফিরিয়া আসিলাম, তখন শুভ গোধূলি সঙ্গীতশালায় প্রবেশ করিয়াছে।

মধ্যে মধ্যে যখন সেই স্তব্ধপ্রায় সমবেত সঙ্গীতের বিরাম হইতেছে—সেই অবকাশকালে প্রত্যেক যন্ত্র আবার পৃথক্‌ভাবে খুব উচ্চৈঃস্বরে সজোরে তান ধরিতেছে। বাদক কোনটাকে ছড়ের দ্বারা, কোনটাকে হস্তের দ্বারা প্রপীড়িত—কোনটাকে বা মিজ্‌রাফের দ্বারা সন্তাড়িত করিতেছে; এবং সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়জনক, কোনটাকে তারের উপর ডিম্বাকৃত কাষ্ঠখণ্ড বুলাইয়া কাঁদাইয়া তুলিতেছে। কিন্তু সে যাহাই হউক, এই বিষাদময় সুরগুলি, মঙ্গলিয়া কিংবা চীনদেশীয় সঙ্গীতের ন্যায়, আমাদের নিকট নিতান্ত দূরদেশীয় কিংবা দুর্ব্বোধ বলিয়া মনে হয় না। আমরা উহাদের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারি। সেই একই মানবজাতির সুতীব্র মর্ম্মবেদনা উহারা প্রকাশ করিতেছে—যে জাতি কালসহকারে আমাদের হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া দূরে চলিয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু মূলত ভিন্ন নহে। "জিগান্"-নামক য়ুরোপীয় বেদিয়ারা আমাদের মধ্যেও এইরূপ জ্বরজ্বালাময় সঙ্গীত আনয়ন করিয়াছে।

শেষে কণ্ঠসঙ্গীত। একটির পর একটি—সেই সমস্ত সুকুমার বালকগুলি (সুন্দর-পরিচ্ছদ-পরিহিত—বড় বড় চোখ) খুব তাড়াতাড়ি দ্রুতলয়ে কতকগুলি গান গাহিল। উহাদের বালকণ্ঠস্বর ইহারই মধ্যে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে—চিরিয়া গিয়াছে। জরির পাগড়ি-পরা একটি লোক উহাদের অধিনেতা ও শিক্ষক। সে মাথা নীচু করিয়া—পাখীকে যেরূপ সর্পেরা দৃষ্টির দ্বারা মুগ্ধ করে, সেইরূপ সমস্তক্ষণ উহাদের চোখের পানে একদৃষ্টে তাকাইয়া ছিল। মনে হইল যেন সে, বৈদ্যুতিক শক্তির দ্বারা উহাদিগকে

আয়ত্ত করিবার চেষ্টা করিতেছে ;—ইচ্ছা করিলে যেন সে উহাদের ভঙ্গুর ক্ষীণ কণ্ঠযন্ত্রটিকে চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া ফেলিতে পারে। "কনিষ্ঠ-গ্রামের" স্বরে উহারা যে গান ধরিয়াছিল, সেই গানটিতে, কুপিত কোন দেবতাকে প্রার্থনার দ্বারা প্রসন্ন করা হইতেছে।

সর্ব্বশেষে, ঐ দলের যে প্রধান গায়ক, এইবার তাহার গাহিবার পালা। ত্রিশবর্ষবয়স্ক যুবাপুরুষ, দেখিতে বলিষ্ঠ, সুন্দর মুখশ্রী। কোন যুবতী কামিনীর বল্লভ আর তাহাকে ভালবাসে না বলিয়া সেই কামিনী আক্ষেপ করিয়া যে গান করিতেছে, সেই গানটি ঐ গায়ক এইবার আমাকে শুনাইবে।

সে বরাবর ভূতলেই বসিয়া ছিল। প্রথমে সে গানটি মনে-মনে ঠিক করিয়া লইল, পরে, তাহার দৃষ্টি একটু ঘোর-ঘোর ভাব ধারণ করিল। তাহার পরেই সে একেবারে সজোরে গলা ছাড়িয়া দিল। প্রাচ্যদেশীয় শানাই প্রভৃতি যন্ত্রের ন্যায় তাহার কণ্ঠস্বর অতীব তীক্ষ্ণ। তার-গ্রামের কতকগুলি স্বরের উপর, পুরুষোচিত বল-সহকারে (একটু কর্কশ) উহার কণ্ঠস্বর স্থায়ী হইল; খুব তীব্রভাবে (আমার পক্ষে নূতন) কত মর্ম্ম-বেদনাই প্রকাশ করিল। তাহার মুখে কত দুঃখের ভঙ্গী—তাহার সরু-সরু হস্তে কত কষ্টের সঙ্কোচন প্রকটিত হইতে লাগিল। এই সমস্তই উচ্চাঙ্গ-কলার মধ্যে ধর্ত্তব্য।

ইহারা মহারাজের খাস্ গায়ক-বাদক। মহারাজা প্রতিদিন রুদ্ধ-প্রাসাদের ঘোর নিস্তব্ধতার মধ্যে, উহাদের সঙ্গীত শুনিয়া থাকেন। তাঁহার চারিপার্শ্বে ভৃত্যবর্গ মার্জ্জারবৎ নিঃশব্দপদসঞ্চারে ঘুরিয়া বেড়ায় এবং জোড়হস্তে নতশিরে ক্রমাগত প্রণাম করে।...জীবনের দুঃখযন্ত্রণা, প্রেমের দুঃখযন্ত্রণা, মৃত্যুর দুঃখযন্ত্রণা—এই সম্বন্ধে মহারাজার কল্পনা ও চিন্তাপ্রবাহ আমাদিগের হইতে না-জানি কত ভিন্ন!... আদব-কায়দার সহিত বিদেশীয় ভাষায়, বাধ-বাধ-ভাবে আমাদের মধ্যে যে কথাবার্ত্তা অল্পক্ষণ

হইয়াছে, তাহাতে যত-না আমি তাঁহার অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিয়াছি—তাহা অপেক্ষা এই উচ্চাঙ্গের দুর্লভ সঙ্গীত (যাহা তাঁহার খাস্ জিনিষ) শ্রবণ করিয়া তাঁহার মনোভাবের একটু বেশি আভাস পাইয়াছি, সন্দেহ নাই।

এক্ষণে তিনসহস্র ব্রাহ্মণ মহারাজের নিমন্ত্রিত অতিথি। উঁহারা উচ্চ-বর্ণের জন্য রাক্ষিত সেই ঘেরের মধ্যে বাস করিতেছেন এবং উঁহাদের সমাগমে পবিত্র পুষ্করিণীগুলিও সমাচ্ছন্ন। উহারা চতুর্দ্দিকের গ্রামপল্লী ও অরণ্য-প্রদেশ হইতে আসিয়াছেন, ফলমূলশস্যাদি আহার করিয়া জীবনধারণ করেন, পার্থিববিষয়ের প্রতি বীতরাগ এবং রহস্যময় ধ্যানধারণায় দিবারাত্রি নিমগ্ন। একটা যজ্ঞানুষ্ঠানের জন্য উঁহারা এখানে সমবেত হইয়াছেন। এই যজ্ঞ পনর দিন ধরিয়া চলিবে এবং ইহা ছয় বৎসর অন্তর অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। পূর্ব্বকালে, কোন পার্শ্ববর্ত্তী দেশ জয় করিবার জন্য যে যুদ্ধ হয় এবং যুদ্ধকালে ঐ ভূমিতে যে রক্তপাত হয়, তাহারি প্রায়শ্চিত্ত-স্বরূপ এই ব্রাহ্মণেরা সুদীর্ঘ প্রার্থনা মন্ত্রাদি পাঠ করিয়া থাকেন। অগণিত বৎসর অতীত হইয়াছে সত্য, কিন্তু তাহাতে কিছুই আসে যায় না। সেই রক্তপাতের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ এখনো ভগবানের নিকট উচ্চকণ্ঠে ক্ষমাপ্রার্থনা করিতে হইবে, তূরীভেরী বাজাইতে হইবে, পবিত্র শঙ্খধ্বনি করিতে হইবে। রাজচিহ্নস্বরূপ এই শঙ্খ, ত্রিবন্দ্রম-অধিপতির ছত্রচামরাদিতে অঙ্কিত।

পাণ্ডবদিগের প্রতিমূর্ত্তি—ত্রিশফুট উচ্চ, মস্তকের উপর কিরণমণ্ডল বিরাজিত, ভীষণদর্শন; উহাদের রোষকষায়িত নেত্রের রুদ্রদৃষ্টি মানবগণের উপর নিপতিত। এই উৎসব উপলক্ষে, উহাদিগকে মন্দিরের গুপ্তকক্ষ হইতে বাহির করিয়া, রসারসি দিয়া, বহু আয়াসে মন্দিরের মুক্তপ্রাঙ্গণে—সূর্য্যালোকের মধ্যে টানিয়া আনা হইয়াছে। উদ্দেশ্য—যাহাতে সাধারণ লোকেরা উহাদিগকে দর্শন করিয়া ভীত হয়। ইহাদিগের নিকট যখন

প্রার্থনাদি হয়, তখন ব্রাহ্মণেরা স্বয়ং অন্তরের অন্তস্তল হইতে সেই অদৃশ্য অনির্ব্বচনীয় পরব্রহ্মেরই আরাধনা করিয়া থাকেন। যজ্ঞোৎসবের এই পনর দিন, অসংখ্য অনুষ্ঠান, সাগ্রহ প্রার্থনা, ভয়-আনন্দের জীবন-উচ্ছ্বাসে—ব্রাহ্মণ-গণ্ডির প্রাচীরাভ্যন্তরস্থ ভূমি তীব্ররূপে স্পন্দিত হইতে থাকে। দূরস্থ লোকদিগের তুমুল কোলাহলে আমি প্রপীড়িত হইতেছি—আকৃষ্টও হইতেছি। কিন্তু সেখানে আমার প্রবেশ একেবারেই নিষিদ্ধ;—মহারাজের অনুগ্রহ এস্থলে কিছুই করিতে পারে না;—সর্ব্বপ্রকার মানবচেষ্টা এখানে নিষ্ফল।

যে বিশাল তালবনে এই নগরটি সমাচ্ছন্ন—সেই তালবনের মধ্যে যে সময়ে দীক্ষিত ব্রাহ্মণেরা যজ্ঞোৎসব করিতেছেন, সেই একই সময়ে, তাহারি অনুকরণে, মধ্যবর্ত্তী ও নীচবর্ণের লোকেরাও নিজ নিজ গৃহে এই অনুষ্ঠানে ব্যাপৃত। আমার ন্যায় তাহারাও ব্রাহ্মণসংসর্গ হইতে বর্জ্জিত। সেখানেও, চতুর্দ্দিকে, সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত দেবতার নিকট এইরূপ অনুশোচনা ও ক্ষমাপ্রার্থনা চলিতেছে।

যুদ্ধে-নিহত বীরপুরুষদিগকে যেখানে গোর দেওয়া হইয়াছে, সেই-সব সমাধিস্থানে—সেই-সব চৈত্যবৃক্ষতলে—এইরূপ পূজা-অর্চ্চনা হইতেছে।

রাত্রি হইবামাত্র, সেই বনের প্রত্যেক ছায়াচ্ছন্ন মার্গে, এবং যেখানে যেখানে সমাধিস্তম্ভ সমুত্থিত হইয়াছে এইরূপ প্রত্যেক চতুষ্পথে, ছোট-ছোট প্রদীপ জ্বালান' হয়, বাদ্যোদ্যম হইতে থাকে, এবং বিবিধ নৈবেদ্য-সামগ্রী প্রদত্ত হয়। ক্ষুদ্র দেবালয় কিংবা সামান্য যজ্ঞবেদি—যাহা তরু-অধিষ্ঠাত্রী নিকৃষ্ট দেবতাদিগের উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত—সেখানেও সহস্র সহস্র ক্ষুদ্র কম্পমান অগ্নিশিখা জ্বলিতেছে। এখানে আমি অবাধে প্রবেশ করিতে পাইলাম। সহসা, পরস্পরসংশ্লিষ্ট তালবনের নিবিড় অন্ধকারের মধ্যে গিয়া পড়িলাম। যেখান হইতে, বাদ্যের শব্দ শোনা যাইতেছে—

আলো দেখা যাইতেছে, আমি সেই দিকেই আকৃষ্ট হইয়া, পথভ্রান্ত পথিকের ন্যায় ইতস্তত বিচরণ করিতে লাগিলাম।

প্রথমেই একটি সামান্য ক্ষুদ্র দেবালয়;—বহুপুরাতন, লুপ্তমুখশ্রী-প্রস্তরস্তম্ভ-যুক্ত, অতীব নিম্ন, তরুপুঞ্জের পাদদেশে প্রতিষ্ঠিত; তরুগণ তাহাকে ছাড়াইয়া অতি ঊর্দ্ধে অন্ধকারের মধ্যে মিলাইয়া গিয়াছে। দেবালয়টি ফুলের মালায় ও ফুলের অলঙ্কারে বিভূষিত। নারিকেলতৈলের ছোট ছোট দীপ চারিদিকে ঝুলিতেছে এবং তাহা হইতে যেন অসংখ্য জোনাকির আলো বিকীর্ণ হইতেছে। দুই তিনটি ক্ষুদ্র দালানের পশ্চাদ্ভাগে মন্দিরের বিগ্রহটি সমাসীন,—ভীষণদর্শন, মস্তকে উচ্চমুকুট, বহুবাহুবিশিষ্ট, মুখমণ্ডল শুকপক্ষীর ন্যায় হরিদ্বর্ণ। দেবালয়ের সুপরিচিত ও পবিত্র শাদা-শাদা ছাগশিশু চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। পুষ্পমাল্যে বিভূষিত, অর্দ্ধনগ্ন ভক্তের দল দ্বারের সম্মুখে ভিড় করিয়া হুড়াহুড়ি করিতেছে। শোকবিষাদময় তূরীরবে ও পবিত্র শঙ্খধ্বনিতে ঢাক-ঢোলের শব্দ ও বংশীধ্বনি আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে।

উহারা স্বাগত-স্মিতহাস্যে আমাকে অভ্যর্থনা করিল; তীব্রগন্ধি জুঁই-ফুলের মালা আমার কণ্ঠে পরাইয়া দিল। রাত্রির 'গুমট্'-উত্তাপে, সুগন্ধি-রস-পাকের কটাহ-সমুত্থিত ধূমের ন্যায়, এই জুঁইফুলের গন্ধ আমার 'মাথায় চড়িল'। তাহার পর লোক সরাইয়া আমার জন্য একটু জায়গা করা হইল। তালবনের চতুষ্পথবর্ত্তী শতবর্ষবয়স্ক একটি ডুমুরগাছের তলায় আমি দাঁড়াইলাম। প্রাচীনধরণের মস্তকহীন ক্ষুদ্রস্তম্ভ-পরিবৃত একটি প্রস্তরবেদীর চতুর্দ্দিকে সমবেত লোকেরা আনন্দে উন্মত্ত হইয়া বাদ্য শ্রবণ করিতেছে। এখানেও দীপালোক, গোলাপ ও জুঁইফুলের মালা, ফলশস্যাদির নৈবেদ্য। পুরোহিতের মত একজন নীচবর্ণের লোক, মুখের রং কালো; খুব উচ্ছ্বাসের সহিত মন্ত্রাদি পাঠ করিতেছে; আর মধ্যে মধ্যে ঢাক-ঢোল বাজিয়া উঠিতেছে। বৃক্ষসমূহের পশ্চাতে, ছায়ার

মধ্যে, প্রচ্ছন্নপ্রায় রমণীগণ দাঁড়াইয়া আছে। এবং সকলে মিলিয়া দীর্ঘস্বরে চীৎকার করিয়া মুহুর্মুহু কি-একপ্রকার শব্দ করিয়া উঠিতেছে। কতকগুলি বালক ঘাসের আগুন জ্বালাইয়া ক্রমাগত উস্কাইতেছে; আর বাদকেরা মধ্যে মধ্যে আসিয়া তাহাদের বাদ্যযন্ত্রগুলি সেই আগুনের উপর সঞ্চালিত করিয়া, যথোপযুক্ত শব্দ বাহির করিবার জন্য, তাতাইয়া লইতেছে। পুরোহিতের উন্মত্ত উচ্ছ্বাস উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে লাগিল;—ক্রমে সে ভূতাবিষ্ট হইল। সে বিকট চীৎকার করিয়া, বৃক্ষের উপর—প্রস্তরের উপর মাথা ঠুকিতে উদ্যত হইল; লোকেরা চারিদিকে শৃঙ্খলের ন্যায় বাহুবেষ্টন করিয়া তাহাকে আটকাইয়া রাখিল; তাহার পরেই সে অবসন্ন স্পন্দহীন হইয়া মূর্চ্ছিত হইল; কণ্ঠ হইতে ঘর্ঘর শব্দ বাহির হইতে লাগিল।...

এই দেবতা—যিনি আমাদের হইতে বহুদূরে—যাঁহাকে এখানকার লোকেরা ঘোর বাদ্যধ্বনি-সহকারে পূজা করিতেছেন—ইনি রহস্যময় ব্রাহ্মণদিগের দেবতারই রূপান্তরমাত্র,—সেই দেবতা, যাঁহাকে ব্রাহ্মণেরা মন্দিরের নিভৃতকক্ষে আধ্যাত্মিকভাবে আরাধনা করিয়া থাকেন।

আমরা যে-দেবতাকে ভজনা করি—তিনি সেই দেবতারই রূপান্তর-মাত্র...কেন না, ব্রহ্ম, জিহোবা, আল্লা—যে নামেই অভিহিত হউন না, "মিথ্যা-দেবতা" কেহই নাই। যে তত্ত্বজ্ঞানীরা অভিমান করেন—কেবল তাঁহাদের দেবতাই সত্য, তাঁহাদের বৃথা-গর্ব্ব শিশুজনোচিত বলিয়া আমার মনে হয়। আসল কথা, সেই অপরিমেয় অনধিগম্য পুরুষ আমাদের জ্ঞানকে এতদূর অতিক্রম করেন যে, আমরা তাঁহার স্বরূপসম্বন্ধে যে-কোন ধারণাই করি না কেন, তাহাতে ভ্রান্তি হইবার কথা; একটু কম ভ্রম হইল, কি একটু বেশি ভ্রম হইল, তাহাতে কিছুই আসে যায়-না। যাহারা জীবন-মৃত্যুর কষ্টযন্ত্রণায় আর্ত্তনাদ করিতে করিতে অরণ্যের মধ্যে একটা হীনবিগ্রহের পদতলে প্রার্থনা করে—যতই তাঁহারা

ক্ষুদ্র হউক, যতই তাহারা অনুন্নত হউক, তাহাদের প্রার্থনাও তিনি শ্রবণ করেন।

ভারতে, কাকের কা-কা-ধ্বনি যেন সমস্ত শব্দরাশির ভিত্তি-স্বরূপ। তাই, ক্রমে সেই ধ্বনি অভ্যস্ত হইয়া যায়—আর গ্রাহ্যের মধ্যে আইসে না। মন্দিরের কোলাহল থামিয়া গেলে, পার্শ্ববর্ত্তী কাকদিগের ভীষণ বৈতালিক সঙ্গীত যখন আরম্ভ হয়, আমি জাগ্রত হইয়া আর তাহা উপলব্ধি করিতে পারি না। আমার ছাদের সম্মুখেই একটা বৃহৎ বৃক্ষ,—সেই বৃক্ষশাখাই তাহাদের প্রিয় দাঁড়। সেই বৃহৎ তরুর গোলাপিরঙের কুসুমগুচ্ছ অনেকটা আমাদের Chestnut-তরুর পুষ্পের ন্যায়। অরুণোদয় পর্য্যন্ত ইহার শাখাগুলি এই কৃষ্ণবর্ণ বিহঙ্গদিগের ভারে বক্র হইয়া থাকে।

আজ প্রাতে, সূর্য্যোদয়ে, যখন পল্লবপুঞ্জের তলদেশ—হরিৎ-শাখা-মণ্ডপের তলদেশ—নবভানুর কিরণচ্ছটায় উদ্ভাসিত হইল, আমি সেই সময়ে ব্রাহ্মণঘেরের মধ্যে মহারাণীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য একটা গাড়িতে উঠিলাম।

সিংহদ্বার পার হইয়া, প্রথমেই আবার সেই পবিত্র পুষ্করিণীগুলি দেখিতে পাইলাম। এই সব পুষ্করিণীর জলে ব্রাহ্মণেরা প্রতিদিন প্রভাতে অর্দ্ধনিমজ্জিত হইয়া স্নান করে—পূজার্চ্চনা করে।

এই প্রাচীরবেষ্টিত নগরের মধ্যে এইবার আমি পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকদূর অগ্রসর হইয়াছি। এই নগরস্থ উদ্যানের মধ্যে,—তালপুঞ্জের মধ্যে, শুধু যে রাজপরিবারেরই বাসস্থান, তাহা নহে; তা ছাড়া, রাস্তার দুধারে ছোট ছোট মাটির ঘর রহিয়াছে,—তাহাতে শুধু উচ্চবর্ণের লোকেরা বাস করে। আয়তনয়না ব্রাহ্মণগৃহিণীরা, এই রমণীয় ঊষাকালে, নিজ নিজ গৃহের সম্মুখস্থ ভূমির শোভাসম্পাদনে প্রবৃত্ত হয়। সেই লাল মাটি উত্তমরূপে পিটাইয়া ও ঝাঁটাইয়া, একটা শাদা গুঁড়া দিয়া তাহার উপর নানাবিধ অদ্ভূত নক্‌সা কাটিতে থাকে। কিন্তু এই নক্‌সাগুলি এত ক্ষণস্থায়ী যে,

একটু বাতাস উঠিলেই বিলুপ্ত হয়—অথবা মানুষের, ছাগলের, কুকুরের, কাকের পদসঞ্চারে মুছিয়া যায়। অগ্রে তাহারা একটু-একটু চিহ্ন দিয়া রাখে,—পরে সেই চিহ্ন-অনুসারে খুব তাড়াতাড়ি নক্‌সাগুলি রচনা করে। অতীব শোভনভাবে আনত হইয়া, গুঁড়ার আধারপাত্রটি হস্তে লইয়া, মাটির উপর ঘুরিয়া ফিরিয়া দ্রুতভাবে বেড়াইতে থাকে। সেই চূর্ণপাত্র হইতে শাদা-শাদা চূর্ণধারা, অফুরন্ত ফিতার ন্যায় অনবরত পড়িতে থাকে। গোলাপপাপ্‌ড়ির অনুকরণে জটিল নক্‌সা, জ্যামিতিক আকৃতির চিত্রাবলী, উহাদের নিপুণ অঙ্গুলি হইতে আশ্চর্য্যরূপে বাহির হইতে থাকে। নক্‌সা-রচনা শেষ হইলে, অঙ্কিত রেখাজালের প্রধান-প্রধান সন্ধিস্থলে উহারা নানাবিধ পুষ্প বসাইয়া দেয়। এইরূপে, সেই ছোট রাস্তার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত বিভূষিত হইলে, অন্তত ঘণ্টাখানেকের জন্য মনে হয়, যেন একটা চিত্রবিচিত্র অদ্ভুত গালিচায় রাস্তাটি আচ্ছাদিত হইয়াছে।

তা ছাড়া, এই অঞ্চলটির সর্ব্বত্রই কেমন-একটা প্রাচীনধরণের শোভন-পারিপাট্য, বিমল শান্তি ও সরল গাম্ভীর্য্য বিরাজমান।

মহারাণীর উদ্যানের সিংহদ্বারের সম্মুখে, সেই একইধরণের কায়দাদুরস্ত লালপাগ্‌ড়িওয়ালা সিপাই-সান্ত্রী। উহারা তূরীভেরী বাজাইয়া, অস্ত্রশস্ত্র স্কন্ধ হইতে নামাইয়া, উচিত সম্মানপ্রদর্শনে সতত তৎপর। মহারাণীর পতি রাজা, বহিঃসোপানের নিম্নতলে, চাতালে নামিয়া-আসিয়া, বিশিষ্ট শিষ্টতার সহিত পূর্ণ উপচারে আমাকে অভ্যর্থনা করিলেন। মহারাজের ন্যায় ইনিও সুরুচির অনুসরণ করিয়া, ভারতীয় বেশেই আসিয়াছিলেন। সবুজরঙ্গের মখ্‌মলের পোষাক, মাথায় শাদা রেশমের পাগ্‌ড়ি, আর সর্ব্বাঙ্গে হীরক ঝক্‌মক্‌ করিতেছে। এই সমস্ত বেশভূষা সত্ত্বেও ইনি একজন কৃতবিদ্য পণ্ডিত।

প্রাসাদের প্রথমতলস্থ দরবারশালায় মহারাণী আমাকে অভ্যর্থনা

করিলেন। এই দরবারশালাটি য়ুরোপীয় আস্‌বাবে সজ্জিত। কিন্তু মহারাণী স্বয়ং স্বদেশীয় পরিচ্ছদ ধারণ করায় তাঁহাকে মূর্ত্তিমতী ভারতলক্ষ্মী বলিয়া মনে হইতেছিল। তাঁহার পার্শ্বমুখের অবয়বরেখা সরল, মুখশ্রী অতি বিশুদ্ধ, চোখদুটি বেশ বড় বড়,—তাঁহার সমস্ত শ্রীসৌন্দর্য্য স্ববংশ-সুলভ। নায়ের-জাতির প্রথা-অনুসারে, তিনি তাঁহার কৃষ্ণ কেশকলাপ প্রথমে ফিতাবন্ধনের আকারে বিন্যস্ত করিয়া, পরে সেইগুলি একত্র সম্মিলিত করিয়া ছোট একটি মসৃণ টুপির মত মস্তকে ধারণ করিয়াছেন। উহা সম্মুখদিকে ঝুঁকিয়া, ললাটের উপর ছায়াপাত করিয়াছে। হীরক-মাণিক্য-খচিত কানবালার ভারে কর্ণদ্বয়ের নিম্নাংশ অতিমাত্র প্রসারিত। মখ্‌মলের 'চোলি'-পরা, নগ্ন বাহুদ্বয়ে বহুমূল্য মণিখচিত বাজুবন্ধ; পরিধানে জরির পাড়ওয়ালা শাড়ী;—তাহাতে সুন্দর নক্‌সা কাটা। প্রস্তরপ্রতিমা যেরূপ পরিচ্ছদে আবৃত হয়, তাঁহার পরিচ্ছদ তদনুরূপ। যে দেশে নিম্নশ্রেণীর মধ্যেও বেশভূষায় মার্জ্জিতরুচি পরিলক্ষিত হয়, সেখানে পুরাতন রাজবংশের সম্ভ্রান্ত রমণীদিগের কিরূপ বেশভূষা, তাহা সহজেই কল্পনা করা যাইতে পারে। কিন্তু এই মহারাণীর শ্রীসৌন্দর্য্য,—বেশভূষা অতিক্রম করিয়া, সর্ব্বোপরি তাঁহার করুণার্দ্র মুখশ্রীতে, তাঁহার মৌনমাধুর্য্যে, তাঁহার নারীজনোচিত শালীনতায় আরো যেন ফুটিয়া উঠিয়াছে।

তা ছাড়া, তাঁহার স্মিতহাস্যের অন্তরালে যেন একটা চাপা বিষাদের ভাব প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, বেশ বুঝা যায়। তাঁহার তাপসীকল্প জীবন, কিসের দুঃখে তমসাচ্ছন্ন, তাহা আমি অবগত আছি। ব্রহ্মা তাঁহার অদৃষ্টে একটিও কন্যারত্ন লেখেন নাই; তাঁহার একটি ভাগিনেয়ীও নাই যাহাকে তিনি দত্তকস্বরূপে গ্রহণ করিতে পারেন। তাই তাঁহার বংশলোপ হইবার উপক্রম হইয়াছে। বহুশতাব্দী হইতে আজ পর্য্যন্ত যাহা কখন ঘটে নাই, এইবার তাহা ঘটিতে চলিল। এইবার ত্রিবঙ্কুরে একটা বিষম বিপ্লব উপস্থিত হইবে।...

মহারাণীর সহিত য়ুরোপসম্বন্ধে আমার কথাবার্ত্তা হইল। এই প্রসঙ্গে তাঁহার কল্পনা বিলক্ষণ উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল। আমি বুঝিলাম, ঐ সুদূরভূখণ্ড সম্বন্ধে জ্ঞানলাভকরাই তাঁহার জীবনের একটি চিরপোষিত স্বপ্ন। কিন্তু, মঙ্গলগ্রহের কিম্বা চন্দ্রলোকের কাল্পনিক দেশসমূহের ন্যায় এই য়ুরোপ তাঁহার পক্ষে দুরধিগম্য। কেন না, ত্রিবঙ্কুরে, কোন সম্ভ্রান্ত উচ্চকুলের রমণী, বিশেষত কোন রাজরাণী য়ুরোপযাত্রা করিলে, তাঁহাকে জাত্যংশে পতিত হইয়া "পারিয়া"র সামিল হইতে হয়।

আর যে-কয়েকদিন আমি ত্রিবঙ্কুরে অবস্থিতি করিব, ইহার মধ্যে মহারাজার দর্শনলাভ আমার ভাগ্যে কখন কখন ঘটিতে পারে, কিন্তু এই লক্ষ্মীস্বরূপা মহারাণীর দর্শনলাভ আমার ভাগ্যে আর কখনই ঘটিবে না। তাই, এখান হইতে বিদায় হইবার পূর্ব্বে, যে মূর্ত্তিটি একালের বলিয়া মনে হয় না, সেই মূর্ত্তিটি আমার নেত্রের উপর ভাল করিয়া মুদ্রিত করিয়া লইতে আমি অভিলাষী হইয়াছি। ইতপূর্ব্বে আমি এইরূপ রাণীদিগকে কেবল ভারতের পুরাতন ক্ষুদ্র চিত্রপটেই দর্শন করিয়াছি। মহারাণীর নিকট বিদায় লইয়া, এই ব্রাহ্মণগণ্ডির মধ্যেই, মহারাণীর এক ভগিনীর পুত্রদ্বয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। তাঁহারাই সিংহাসনের ভাবী উত্তরাধিকারী। তাঁহাদের পরেই এই রাজবংশ লোপ পাইবে। উঁহাদের মধ্যে একজনের পদবী "প্রথম রাজকুমার", অপরটির পদবী "দ্বিতীয় রাজকুমার"। এই উদ্যানের মধ্যে, তাঁহাদের পৃথক্ আবাসগৃহ। এই যুবকদ্বয়ের উষ্ণীষে মরকতমণির শ্রীপচ্ কল্কা সংযোজিত। ইহারা ব্যাঘ্র-শিকার করেন, ব্রাহ্মণ্যের অনুষ্ঠানাদি করেন, অথচ আধুনিক কালের সমস্ত বিষয়েরই খোঁজখবর রাখেন, এবং সাহিত্য ও ভৌতিকবিজ্ঞানের অনুশীলন করেন। ইঁহাদের মধ্যে একজন, আমার অনুরোধক্রমে, প্রথমে আমাকে হাওদাখানায় লইয়া গেলেন। সেইখানে হাতীদের সাজসজ্জা ও সরঞ্জাম রক্ষিত। তাহার পর, তাঁহার স্বগৃহীত কতকগুলি ফোটোচিত্র

আমাকে দেখাইলেন;—তিনি নিজহস্তে সেগুলি পরিস্ফুট করিয়াছেন। এবং পরে, পদকপুরস্কারলাভের আশায় ঐগুলি সখ্ করিয়া তিনি য়ুরোপের কোন প্রদর্শনীতে পাঠাইয়া দেন।

আজ সন্ধ্যার সময়, সূর্য্যাস্তকালে, ভারতসমুদ্র দেখিতে আমার ইচ্ছা হইল। ত্রিবঙ্কুর হইতে সমুদ্র প্রায় দেড়ক্রোশ দূরে। সেখানে উহার বীচিমালা বিজন তটভূমির উপর অনবরত ভাঙিয়া পড়িতেছে।

মহারাজার একটা গাড়িতে উঠিয়া, প্রথমে সমস্ত প্রাচীরবেষ্টিত নগরটি অতিক্রম করিতে হইল। ব্রাহ্মণগৃহসমূহের ধার দিয়া যে সব রাস্তা গিয়াছে, সেই সব নিস্তব্ধ রাস্তা দিয়া, প্রাসাদ ও উদ্যানের লাল প্রাচীরের সম্মুখ দিয়া, বৃহৎ মন্দিরটির ধার দিয়া, আমার গাড়ি চলিতে লাগিল। মন্দিরের এত নিকটে আমি ইতপূর্ব্বে কখন আসি নাই।

শীঘ্রই নগর পার হইলাম এবং নগর পার হইয়াই, নিস্তব্ধ সৈকতভূমির মধ্যে, স্তূপাকার বালুকারাশির মধ্যে আসিয়া পড়িলাম। রক্তবর্ণ প্রকাণ্ড সূর্য্য দিগন্তে মগ্নপ্রায়,—তাহারি ভাঙা-ভাঙা রশ্মিচ্ছটা চারিদিকে প্রসারিত। অস্মদ্দেশের সমুদ্রোপকূলস্থ বৃক্ষের ন্যায়, বাতাহত ও আলুলিতশাখ কতকগুলি বিরল তালজাতীয় বৃক্ষ, সাগরবায়ুর অবিশ্রান্ত প্রবাহবেগে, ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। বহুশতাব্দীসঞ্চিত এই সব বালুকারাশি, এই সমস্ত প্রস্তর, প্রবাল ও শম্বূকের চূর্ণরাশি, সহস্র-সহস্র চূর্ণীকৃত জীবদেহের ধূলিরাশি— এই ভীষণ স্থানের সান্নিধ্য ঘোষণা করিতেছে। তাহার পরেই, সেই অন্তহীন মহাকণ্ঠস্বর শ্রুত হইল। এবং এই বালুকাস্তূপের মধ্যে, একটা পথের বাঁক ফিরিবামাত্র, সেই সচল অনন্তমূর্ত্তি আমার সম্মুখে সহসা আবির্ভূত হইল।

পৃথিবীর অন্যান্য প্রদেশে, মনে হয় যেন, মানবজীবন স্বভাবতই সমুদ্রের অভিমুখে প্রবাহিত হয়। সেখানে লোকেরা সমুদ্রের ধারে আবাসগৃহ নির্ম্মাণ করে, সমুদ্রের যতটা নিকটে হওয়া সম্ভব—তাহাদের নগর পত্তন

করে; তাহাদের নৌকাদির জন্য অল্পস্বল্প স্থান এবং বেলাভূমির একটু-আধটু কোণ খালি রাখিতেও তাহারা যেন কুণ্ঠিত হয়।

কিন্তু এখানকার লোকেরা সমুদ্রকে শূন্য শ্মশান ও সাক্ষাৎ মৃত্যু মনে করিয়া, যতটা পারে, তাহা হইতে তফাতে সরিয়া যায়। এদেশে সমুদ্র—একটা দূরতিক্রমণীয় অতলস্পর্শ রসাতলবিশেষ—যাহা কোন কাজে আইসে না, যাহা কেবল মনুষ্যের অন্তরে ভয়ের উদ্রেক করে। সমুদ্রকে দুর্গম স্থান মনে করিয়া কেহ তাহার নিকটে যাইতে সাহস করে না। আমি এই অনন্ত বীচিমালার সম্মুখে, বালুরাশির অক্ষুরন্ত রেখার উপরে, একটি পুরাতন প্রস্তরমন্দির ছাড়া মনুষ্যের আর কোন নিদর্শন দেখিতে পাইলাম না। মন্দিরটি রূঢ়-ধরণে গঠিত, স্থূল ও খর্ব্বাকার, থামগুলি লুপ্তমুখশ্রী,—কতকটা তরঙ্গশীকরে, কতকটা লবণাক্ত জলে ক্ষয় হইয়া গিয়াছে। যে সমুদ্র-কর্ত্তৃক ত্রিবঙ্কুর কারারুদ্ধ, সেই দুর্বৃত্ত সমুদ্রকে মন্ত্রবশীভূত ও প্রশমিত করিবার নিমিত্তই যেন এই মন্দিরটি এখানে অধিষ্ঠিত। এই সন্ধ্যাকালে সমুদ্রটি বেশ প্রশান্ত। কিন্তু গ্রীষ্মের আরম্ভ হইতে, এই সমুদ্র কিছুকালের জন্য আবার রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করিবে।

মহারাজা-বাহাদুরের উপদেশ-অনুসারে দেওয়ান আমার জন্য যতপ্রকার অনুষ্ঠান-আয়োজনের কল্পনা করিয়া আমাকে অনুগৃহীত করিয়াছেন, তন্মধ্যে উচ্চবর্ণের বালিকা-মহাবিদ্যালয়ে আমার অভ্যর্থনার্থ যে আয়োজন হইয়াছে, তাহাই আমি বিশেষ অনুগ্রহ বলিয়া মনে করি। উহা আমি কখন ভুলিতে পারিব না।

সূর্য্যোদয় হইবামাত্র আমি গৃহ হইতে যাত্রা করিলাম। কিন্তু বলিতে কি, আমার মনে মনে একটু আশঙ্কা ছিল;—না জানি, সেখানে গিয়া কি দেখিব। হয় ত এমন-কিছু দেখিব, যাহা শুধু কঠোর গ্রাম্য-গুরুমহাশয়কে স্মরণ করাইয়া দিবে; কিংবা এমন-কিছু দেখিব, যাহা অতীব নীরস, বিরক্তিকর ও ক্লান্তিজনক। পাছে নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বে সেখানে

উপনীত হই, এইজন্য তালবনের মধ্যে ঘোড়াদের ছাড়িয়া রাখিয়াছিলাম : এই তালবনে,—প্রথমে একটি, তারপর দুইটি, পরে তিনটি ক্ষুদ্র বালিকা আমার দৃষ্টিপথে পতিত হইল;—বেশ সুশ্রী, জম্‌কাল বেশভূষায় ভূষিত হইয়া ঝক্‌মক্ করিতেছে; দশবর্ষবয়স্কা, নগ্ন পদ, কেশকলাপে শাদা ফুল;—পরিধানে জরির পাড়-দেওয়া রেশ্‌মি শাড়ী; কণ্ঠ ও বাহুস্থিত মণি-মাণিক্য—নব ভানুর কিরণে উদ্ভাসিত। আমার ন্যায় উহারাও ব্রাহ্মণঘেরের অভিমুখে, চলিয়াছে। আমার গাড়ি দেখিয়া, উহারা প্রাণপণে দ্রুত চলিতে লাগিল; এবং চলিবার সময়, উহাদের মহার্ঘ বস্ত্রের অঞ্চলপ্রান্ত পায়ে জড়াইয়া যাইতে লাগিল......তবে কি উহাদের এই পরীসুলভ কিংবা অপ্সরাসুলভ সাজসজ্জা আমারই জন্য ?...

এই সব ভারতীয় পরীবালিকাগুলি উহাদের বিদ্যালয়ে গিয়া সম্মিলিত হইল। বিদ্যালয় সহসা যেন কিরণচ্ছটায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। বোধ হইল, এখন উহাদের ছুটির সময়। কিন্তু তথাপি উহারা আমার জন্য একটি দিনের প্রাতঃকাল ছাড়িয়া দিতে সম্মত হইয়াছে। উহাদের মধ্যে একজন একটা ফুলের তোড়া উপহার দিবার জন্য আমার নিকট আসিল। ফুলের তোড়াটি বেশ সুগন্ধ ও সুসজ্জিত; ফুলগুলি জরির তারে জড়িত।

যে শিক্ষা অস্মদ্দেশে সর্ব্বোচ্ছেদকারী মহা অনর্থ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, সেই শিক্ষা স্বরাজ্যে বিস্তার করা মহারাজার একান্ত ইচ্ছা। কিন্তু যতদিন ধর্ম্মবিশ্বাস অক্ষত থাকিবে, যতদিন ধর্ম্ম সর্ব্বোপরি বিরাজমান থাকিয়া মঙ্গলকিরণ বর্ষণ করিবে, ততদিন ত্রিবঙ্কুরে কিছুকালের জন্য শিক্ষা হইতে শুভফলই প্রসূত হইবে সন্দেহ নাই।

উচ্চকুলোদ্ভবা বালিকাদিগের এই মহাবিদ্যালয়—যাহা অস্মদ্দেশীয় বিদ্যালয়ের সমতুল্য, অথবা তাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ—এই বিদ্যালয়টি মহারাজ আমাকে দেখাইবেন মনে করিয়া, যাহাতে আমার চক্ষে ইহা একটি দুর্লভদর্শন দ্রষ্টব্যজিনিষ বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তজ্জন্য তিনি বিশেষ

আয়োজন করিয়াছিলেন; বালিকাগণের অভিভাবকদিগকে বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন, যেন বয়োজ্যেষ্ঠদিগের গুরুভার অলঙ্কারে ভূষিত করিয়া উহাদিগকে বিদ্যালয়ে পাঠান হয়। তাই, মন্দিরের দেবীগণ যেরূপ অলঙ্কার ধারণ করেন, সেইরূপ সুগঠিত মণিমাণিক্যের পুরাতন অলঙ্কার-গুলি এই সকল তরুণ বাহুতে—তরুণ কণ্ঠে অধিষ্ঠিত হইয়া ঝিক্‌মিক্ করিতেছিল।

এই বিদ্যালয়ের পড়িবার ঘরগুলি আমাদের য়ুরোপীয় ইস্কুলের পড়িবার ঘরের ন্যায়;—স্বল্প-উপকরণ ও মুক্ত-পরিসর। শুধু কতকগুলি বড়-বড় মানচিত্র শাদা দেয়ালের গায়ে ঝুলিতেছে। কচি-কচি মেয়েগুলি হইতে, বয়স্ক বালিকা পর্য্যন্ত—এই সমস্ত অপূর্ব্ব ছাত্রীবৃন্দ—আমার চক্ষে কতক-গুলি পুতুল বলিয়া মনে হইল। কচি মেয়েগুলির ড্যাবা ড্যাবা চোখের বিস্ফারিত তারা চারিদিকে ঘুরিতেছিল। শাড়ী ও জরির চোলী—এই দুয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থানে, উহাদের তাম্রাভ নগ্নগাত্র দেখা যাইতেছিল। বড়-বড় বালিকাগুলির মাথার উপরিভাগে "ভর্জিন্"-ধরণে ফিতা বাঁধা, তাহার উপর ভারতীয় শাদা মল্‌মলের অবগুণ্ঠনবস্ত্র। যে বয়সে বালিকারা স্বীয় শরীরকে দেবালয়বৎ সযত্নে রক্ষা করিতে প্রথম আরম্ভ করে—সেই বয়সের বালিকাদিগের দৃষ্টিতে যে উদ্বেগ ও গাম্ভীর্য্যের ভাব লক্ষিত হয়, এই বালিকাদিগের মুখে ইহারি মধ্যে সেই ভাব পরিব্যক্ত।...উহাদের প্রবন্ধ-রচনা, উহাদের ঐতিহাসিক রচনা আমাকে দেখান হইল। ঐ ক্ষুদ্র দেবীগুলি যে-সব সুন্দর ছবি আঁকিয়াছে, তাহাও আমাকে দেখান হইল। যে-সব আদর্শ আমাদের শিশুরা নকল করে—য়ুরোপ হইতে আনীত সেই-সব আদর্শচিত্র দেখিয়াই এই ছবিগুলি আঁকা। এই সব চিত্ররচনার নীচে উহাদের নাম লেখা। নামগুলি কতিপয়-পদাক্ষর-বিশিষ্ট—গানের কলির ন্যায় অতীব সুশ্রাব্য।

ছয়সাত-বৎসর-বয়স্কা একটি বালিকা, একটা "ঈগল্"-পক্ষীর ছবি

আঁকিয়াছে—উহার পালকরাশি অতীব জটিল; পাখীটা বৃক্ষশাখায় বসিয়া আছে। বেশ বুঝা যাইতেছে, বালিকা মাপ-জোক্ না করিয়াই, মধ্যস্থল হইতে আঁকিতে আরম্ভ করে। সমস্ত মাথাটা কুলায়—কাগজের এরূপ উচ্চতা ছিল না; তাই, ঈগ্‌লের মাথাটা চ্যাপ্টা করিয়া আঁকিয়াছে—কাগজপ্রান্তের একেবারে গা-ঘেঁষিয়া আঁকিয়াছে; কিন্তু তবুও একটি পালক বাদ দেয় নাই,—একটি খুঁটি-নাটি বাদ দেয় নাই। ছবির নীচে, বেশ সুস্পষ্ট-রূপে—জোর-কলমে—নিজের নাম স্বাক্ষর করিয়াছে,—"অপ্সরা"।

জরির কাজ-করা মখ্‌মল্; বাষ্পবৎ স্বচ্ছ অবগুণ্ঠন; হীরা, মাণিক, স্বচ্ছ-পান্না; সরু-সরু ক্ষুদ্র বাহুতে বড়-বড় বালা সূতা দিয়া আবদ্ধ; দুষ্প্রাপ্য পুরাতন পোর্টুগীমুদ্রায় গ্রথিত কণ্ঠহার;—যে সময়ে গোয়ার সমৃদ্ধ অবস্থা,—এই মুদ্রাগুলি সেইসময়কার;—চন্দনকাষ্ঠের সিন্দুকের মধ্যে না জানি কত শতাব্দী ধরিয়া ঘুমাইয়া ছিল!

সর্ব্বশেষে গান, বহু বেহালার সমবেতবাদ্য, তাহার পর নৃত্য। নৃত্য অতীব জটিল ও বিলম্বিত—একটু ধর্ম্মভাবান্বিত; তালে-তালে পা পড়িতেছে, বাহুসঞ্চালনে মণি-মাণিক্য ঝিক্‌মিক্ করিয়া উঠিতেছে।...

এই বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা বেশ সুন্দর-সুশ্রী; সচরাচর এরূপ দৃশ্য দেখা যায় না। আর উহাদের কি সুন্দর চোখ!—এরূপ চোখ একমাত্র ভারত-বর্ষেই দেখা যায়। অহো! রহস্যের এই কুসুমকলিকাগুলি কি-এক অপূর্ব্ব অতীন্দ্রিয় অকলুষ সৌন্দর্য্যের ছবি আমার মনে অঙ্কিত করিয়া দিল!

কাল আমি ত্রিবঙ্কুর ছাড়িয়া যাইব। এখানে যে আদরযত্ন পাইয়াছি, আমি তার যোগ্য নহি। রাজাকে একটি "ক্রুশ" উপহার দিবার যে ভার গ্রহণ করিয়াছিলাম, আমি সেই প্রীতিকর কাজটি সুসম্পন্ন করিয়াছি। মহারাজার একটা নৌকা করিয়া জলাভূমির রাস্তা দিয়া আমি উত্তরদিকে যাত্রা করিব। কোচিনের ক্ষুদ্র রাজ্যে পৌছিতে দুই দিন দুই রাত্রি লাগিবে। সেখানে কিছুকাল অবস্থিতি করিব। তাহার পর, কোচিন

ছাড়াইয়া, ৩০।৪০ঘণ্টার পথ অতিক্রম করিয়া, আবার সেই সব প্রদেশে আসিয়া পড়িব, যেখান দিয়া রেলপথ গিয়াছে এবং যেখান দিয়া আমি অনেকবার যাতায়াত করিয়াছি। যে রেলপথ কালিকট্ হইতে মাদ্রাজে গিয়াছে, সেই মহারেলপথটি আবার আমি ধরিব।

ত্রিবন্দ্রমে আজ আমার শেষ রাত্রি। তাই আজ সহরের অলিগলির মধ্যে ইচ্ছা করিয়া একটু বিলম্ব করিতেছি;—সেই সব পথ, যেখানে তমসাচ্ছন্ন নিবিড় পল্লবপুঞ্জের মধ্যে নারিকেলতৈলের রুদ্ধশ্বাস দীপগুলি মহাপ্রভাবশালী তালপুঞ্জের নৈশ অন্ধকার ভেদ করিতে না পারিয়া যেন হতাশ হইয়া পড়িয়াছে। দিনমান অপেক্ষা রাত্রিকালেই উদ্ভিজ্জজীবনের প্রভাব এখানে যেন একটু বেশি করিয়া অনুভব করা যায়;—হরিৎশোভার মহিমাসাগরে যেন ডুবিয়া যাইতে হয়।

কাল আমি চলিয়া যাইব। এখানে কিছুই আমি দেখিতে পাইলাম না। ভারতের হৃদয়দেশে প্রবেশ করিতে পারিলাম না। এই প্রদেশ—যাহা ব্রাহ্মণ্যের কেন্দ্রস্থল বলিলেও হয়—এখানে আসিয়াও আমি ব্রাহ্মণ্যের কিছুই জানিতে পারিলাম না। যথোচিত সাদর অভ্যর্থনা পাইলেও, আমরা য়ুরোপীয়, আমাদের নিকট সে সমস্ত রহস্যের দ্বার এখনো রুদ্ধ।

বেড়াইতে বেড়াইতে আমি অবশেষে বণিক্‌দের সেই বড় রাস্তায় আসিয়া পড়িলাম। অনাবৃত আকাশ। উপরে তারা ঝিক্‌মিক্ করিতেছে। সোজা বড় রাস্তা—প্রাসাদ ও মন্দিরের ঘের পর্য্যন্ত আসিয়া মিলিত হইয়াছে। সরু-সরু উচ্চ দণ্ডের উপর স্থাপিত সেকেলে ধরণের দীপগুলি হইতে যে আলোক বিকীর্ণ—সেই আলোকের মধ্যে, স্ত্রীজনসুলভ দীর্ঘ-কেশধারী পুরুষজনতা চলাফেরা করিতেছে। এই সব লোক,—খোদিত পিত্তলসামগ্রী, ছাপ্-দেওয়া ছিটের কাপড়, পুতুল, দেব-দেবীর মূর্ত্তি—এই সমস্ত দ্রব্যের ক্রেতা-বিক্রেতা। ইহাদের কপিল গাত্র, কৃষ্ণবর্ণ কেশকলাপ, কৃষ্ণবর্ণ জ্বলন্ত চক্ষু। শস্যের দানা, মিষ্টান্ন, উদ্ভিজ্জমূল প্রভৃতি ব্রাহ্মণদিগের

মিতাহারোপযোগী সামান্য খাদ্যসামগ্রী বিক্রয়ার্থ সজ্জিত রহিয়াছে। অসংখ্য ছোট ছোট দোকান ;—উত্তুঙ্গ প্রদীপসমূহের আলোকে আলোকিত। কোন-কোন দীপের তিনটি শিখা। কোন পশুমূর্ত্তি অথবা দেবমূর্ত্তি এই দীপ-গুলিকে ধারণ করিয়া আছে।

রাজপথ হইতে দূরে সেই পবিত্র ঘেরের সিংহদ্বার এবং উহা ছাড়াইয়া আরো দূরে মুক্তদ্বার মহামন্দির ও তাহার গভীর অভ্যন্তরপ্রদেশ দেখা যাইতেছে। বিন্দুচিহ্নের মত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য দীপশিখা সারি-সারি জ্বলিতেছে। ইহা বিষ্ণুর মন্দির ;—যেন এই প্রদেশেরই সুগম্ভীর ধ্যানমগ্ন অন্তরাত্মা।

যতদূর দৃষ্টি যায়—মন্দিরের ভিতরটা সমস্তই আলোকিত। ওখানে পুরোহিত ছাড়া আর কাহারও যাইবার অধিকার নাই। দীপালোকের রেখা দেখিয়া বুঝা যায়—মন্দিরের দালান কতদূর পর্য্যন্ত প্রসারিত। মধ্যস্থলে, গোলাপপাপ্‌ড়ির অনুকরণে একটা জ্যামিতিক নক্সা পরিলক্ষিত হইতেছে—বোধ হয়, উহা একটা প্রকাণ্ড বেলোয়ারির ঝাড় ;—কিন্তু এতদূরে যে, ঠিক্ করিয়া কিছুই নিরূপণ করা যায় না। মন্দিরে সারাদিনই পূজার্চ্চনা চলিতেছে। আজ এই সান্ধ্যপূজার সময়, মানবকোলাহলের সহিত মিশ্রিত হইয়া সঙ্গীতধ্বনি—তূরীনিনাদ আমার নিকট পর্য্যন্ত আসিয়া পৌছিতেছে। এই সিংহদ্বার যদিও কখনই রুদ্ধ থাকে না—তবু উহা দুর্লঙ্ঘনীয়। নভোব্যাপ্ত স্বচ্ছ তমোজালের মধ্য হইতে একটি প্রকাণ্ড "পিরামিড্" সিংহদ্বারের উপর দেখা যাইতেছে—উহা রাশীকৃত দেবমূর্ত্তির যেন একটা স্তূপ। উহার খাঁজকাটা চূড়াদেশ—মনে হয় যেন তারকা-রাজির সহিত সংলগ্ন। চারিটা সিংহদ্বারের উপর এইরূপ চারিটা "পিরামিড" অধিষ্ঠিত। প্রতিদিন সান্ধ্যপূজার সময়, প্রত্যেক পিরামিডের উপর, দীপাবলী হইতে প্রসারিত একটা আলোকরেখা পরিলক্ষিত হয় ;—এই আলোকরেখা তমসাচ্ছন্ন খোদিত মূর্ত্তিরাশির মধ্য দিয়া লতাইয়া-লতাইয়া চূড়াদেশ পর্য্যন্ত

উঠিয়াছে ;—মনে হয় যেন এই সব প্রস্তরময় দেবমূর্ত্তির মধ্য দিয়া একটা স্বর্গের পথ উপরে উঠিয়াছে।

যে সময়ে রাজপথ জনশূন্য হইয়া পড়ে, সেই সময় এখন উপস্থিত। এই সময়ে আদিম-কালসুলভ কাঠের দোকানগুলিতে দোকানদারেরা বেচাকেনা বন্ধ করিবার উদ্যোগ করিতেছে এবং ভূতযোনি যাহাতে গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিতে না পারে, এই উদ্দেশে প্রাচীরের বহির্ভাগে, কুলঙ্গিতে ছোট-ছোট প্রদীপ জ্বালাইয়াছে।

দোকানদারেরা হিসাবনিকাশ করিতেছে। ত্রিবঙ্কুরের গোল-গোল টাকা ও পয়সা উহারা থলিয়া হইতে চাল-ডালের মত মুঠা-মুঠা তুলিয়া একপ্রকার গণনা-যন্ত্রের মধ্যে নিক্ষেপ করিতেছে। কতকগুলা তক্তা—তাহাতে সারি-সারি গর্ত্ত ; এই প্রত্যেক কাঠের গর্ত্তের মধ্যে একএকটি মুদ্রা ধরে। যখন তক্তার সমস্ত আধারগর্ত্তগুলি পূর্ণ হইয়া যায়, তখন তাহারা সেই মুদ্রার মোট সংখ্যা ঠিক্ জানিতে পারে ; তার পর ঐ সব মুদ্রা একটা বাক্সর মধ্যে ঢালিয়া, আবার অন্য মুদ্রার গণনা আরম্ভ করে। অপর কতকগুলি লোক একতাড়া শুষ্ক তালপত্রে তাহার অঙ্কগুলি লিখিয়া হিসাব করিতে থাকে। এই শুষ্ক তালপত্রগুলি কতকটা পুরাকালের "পেপাইরস্"-পত্রের ন্যায়। আমার মনে হইল, আমি যেন সেই পুরাকালের মধ্যেই অবস্থিতি করিতেছি।

রাত্রি অধিক হইয়াছে। জীবন-কোলাহল সহসা স্তম্ভিত হইল। প্রাচীরের ও মন্দিরের প্রদীপগুলি ছাড়া আর সমস্তই অন্ধকারের মধ্যে বিলীন হইল। রমণীরা নিজ নিজ গৃহে প্রবেশ করিয়াছে—কোথাও আর তাহাদিগকে দেখা যায় না। পুরুষেরা শাদা মসিনা-সূত্র-বস্ত্রে অথবা মল্‌মলে আবৃত হইয়া, কেশকলাপ মুক্ত করিয়া, ছাগাদির সহিত গৃহদ্বারের সম্মুখে বারাণ্ডার নীচে, ছাতের উপর, মৃতবৎ সটান শুইয়া পড়িয়াছে। গৃহকুট্টিমের নীচে অথবা ভূগর্ভস্থ কক্ষে শয়ন করিতে ভারতবাসীর অত্যন্ত

বিতৃষ্ণা। তাই তাহারা অবসাদজনক গ্রীষ্মরাত্রে, বিবিধ কুসুমের সুরভি উচ্ছ্বাসে পরিষিক্ত ও নীল ধূলায় পরিলিপ্ত হইয়া বহির্দ্দেশে শয়ন করে।'

প্রভাতে, বায়সদিগের অশুভ কোলাহলের মধ্যে, মন্দিরের প্রাতঃপূজা যখন শেষ হইল, সেই সময়ে একটা গাড়ীতে উঠিয়া আমি যাত্রা করিলাম। প্রথমেই ত্রিবন্দ্রমের বন্দরে উপনীত হইলাম। এই মধুর রমণীয় সূর্য্যোদয়-কালে, আর একবার—এবং এই শেষবার—নারিকেলবনাচ্ছন্ন ত্রিবন্দ্রম-নগরের মধ্য দিয়া চলিতেছি।

আজ রাত্রে একটা ঝড় উঠিয়া, রাস্তার রক্তিম ধূলা, ছোট-ছোট মেটে দেয়ালের উপর—সুধালিপ্ত গৃহছাদের উপর ন্যস্ত করিয়াছে; তাহাতে করিয়া, যেন একপ্রকার লাল আলোকে, গৃহগুলি দৃষ্ট হইতেছে। আবার স্থানে-স্থানে, স্তবকে-স্তবকে পুষ্পরাশি তরুসমূহের চূড়াদেশ হইতে ভূতল পর্য্যন্ত ছাইয়া পড়িয়াছে।

প্রভাতে মহারাজার সিপাই-সান্ত্রি বিভিন্ন স্থানে বদ্‌লি হইয়া দলে-দলে যাতায়াত করিতেছে;—অস্ত্রশস্ত্রে ও উষ্ণীষে তাহাদের দেখিতে খুব জম্‌কাল। একদল লোক শান্তভাবে গির্জ্জার অভিমুখে চলিয়াছে; কেন না, আজ রবিবার। ইহারা ক্ষুদ্র বালিকা, মলমলচাদরে অবগুণ্ঠিতা—হস্তে একএকখানি গ্রন্থ। ইহাদের অধিকাংশই প্রাচীনখৃষ্টানবংশীয়; ইহাদের পূর্ব্বপুরুষ, আমাদের বহুশতাব্দী পূর্ব্বে, খৃষ্টভক্ত। এই সিরীয় অথবা ক্যাথলিক্ খৃষ্টানদের গির্জ্জা হইতে ঘণ্টাধ্বনি শুনা যাইতেছে। এই গির্জ্জাগুলি হিন্দুমন্দিরের সন্নিকটে এবং সেই একই হরিৎশোভার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত। দেখিলে মনে হয়, শান্তি, সুশৃঙ্খলা, নির্ব্বিঘ্নতা ও পরধর্ম্মসহিষ্ণুতা এখানে পূর্ণভাবে বিরাজমান।

নৌকারোহণের ঘাট;—ইহাই ত্রিবন্দ্রমের বন্দর। কিন্তু বন্দর বলিলে যাহা বুঝায়—এ সেরূপ বন্দর নহে;—অর্থাৎ সমুদ্রের বন্দর নহে। কেন

না, এখান হইতে সমুদ্র অনধিগম্য। এই বন্দরটি বিস্তৃত বিলের ধারে অধিষ্ঠিত। শতশত অচল-স্থির নৌকার মধ্যে একখানি নৌকা আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। এটি রাজার নৌকা। ইহা দেখিতে কতকটা সেকেলে সুদীর্ঘ রণতরীর ন্যায়; ইহার চোদ্দটা দাঁড়; পশ্চাদ্ভাগে একটি কাম্‌রা;—এই কাম্‌রার মধ্যে পা-ছড়াইয়া ঘুমানো যায়। চৌদ্দজন দাঁড়ী চোদ্দটা সরু বাঁশের দাঁড় যন্ত্রের ন্যায় একসঙ্গে ফেলিতেছে। এই যন্ত্র—তাম্রাভ মানবদেহ;—সুনম্যতা ও বল যেন মূর্ত্তিমান্।

নিবিড় তালবনের মধ্যে, সূর্য্যালোকে, এই বিলটি আমাদের সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত হইল। এই গভীর বিলটি বরাবর সোজা চলিয়াছে। যাত্রারম্ভের সময়, দাঁড়ীরা গান গাইয়া, চীৎকার করিয়া, আপনাদিগকে উত্তেজিত করিয়া তুলিল। কীটাণুসঙ্কুল এই আবিল জলরাশি আমরা ভেদ করিয়া চলিলাম। ত্রিদিবসব্যাপী নিঃশব্দ জলযাত্রার আজ এই প্রথম আরম্ভ।

বিলের দুইধারে তালতরুপুঞ্জ অফুরন্ত পর্দ্দার ন্যায় একটার পর একটা ক্রমাগত আসিতেছে। মধ্যে মধ্যে বহুকাণ্ডবিশিষ্ট বটবৃক্ষ। শাখায়-শাখায় অপরিচিত কুসুমগুচ্ছ মাল্যাকারে বিলম্বিত; এবং বিন্দুলাঞ্ছিত আলুলিতদল একপ্রকার পদ্ম, কাঠিতে-জড়ানো সূতার গুটির ন্যায় খাগড়াবনের মধ্যে গজাইয়া উঠিয়াছে।

ত্রিবন্দ্রম-অভিমুখে নৌকাসকল প্রতিমূহূর্ত্তে আমাদের নৌকার সম্মুখ দিয়া যাইতেছে। এই শান্তিময় নিস্তব্ধপ্রদেশের এই বিস্তীর্ণ জলাশয়টি লোকযাতায়াতের মহামার্গ। এই নৌকাগুলি প্রকাণ্ড, আকারে "গণ্ডোলা"র ন্যায়,—অতীব মন্থর ও নিঃশব্দচারী। সুনম্য-সুন্দর-অঙ্গভঙ্গি-সহকারে মাল্লারা লগি মারিয়া নৌকা চালাইতেছে। এই নৌকাগুলিরও পশ্চাদ্ভাগে একএকটি কাম্‌রা,—এই কাম্‌রাগুলি ভারতবাসী স্ত্রী-পুরুষে পরিপূর্ণ। আমরা চৌদ্দদাঁড়ের নৌকা করিয়া ব্যস্তভাবে কোথায়-না-জানি চলিয়াছি,—

এই মনে করিয়া, ঐ সকল বড়-বড় কালো-চোখের কুতূহলী দৃষ্টি আমাদের উপর নিপতিত।

মধ্যে মধ্যে, একরকম চমৎকার পাখী—"মাছরাঙা",—খুব উজ্জ্বল, খুব নীলবর্ণ, একপ্রকার আনন্দের চীৎকার করিতে করিতে জলের গা ঘেঁসিয়া উড়িয়া যাইতেছে। নীলপদ্ম ও রক্তপদ্ম চারিদিকে ফুটিয়া আছে।

আমাদের যাত্রাপথের এই অফুরন্ত জলরাশি, বিশেষ বিশেষ সময়ে, বিশেষ বিশেষ ভাব ধারণ করিতেছে:—কখন সঙ্কীর্ণ ও ছায়াময়;—মাথার উপর, দুই ধারের নারিকেলগাছগুলা সম্মিলিত হইয়া মন্দিরমণ্ডপে পরিণত হইয়াছে; শাখাগুলি যেন তাহার খিলান!—তাহার পর, এই জলরাশি ক্রমশঃ বিস্তৃত হইয়া, উচ্ছলিত হইয়া, সুদূর প্রদেশ পর্য্যন্ত প্লাবিত করিতেছে। দুইধারে, যবনিকার ন্যায় নিবিড় তালপুঞ্জ;—তাহার মধ্যে, এই বিলটি উদ্ভিজ্জশ্যামল ক্ষুদ্রদ্বীপসঙ্কুল সাগরবৎ প্রতীয়মান হইতেছে।

সূর্য্য ক্রমশঃ উর্দ্ধে উঠিল। এই ছায়াসত্ত্বেও, এই আলোড়িত জলরাশি-সত্ত্বেও, গ্রীষ্মদেশসুলভ উত্তাপ ক্রমশঃ যেন ঘনাইয়া উঠিতেছে। তথাপি, আমাদের দ্রুতগতির কিছুমাত্র লাঘব নাই; আমাদের দাঁড়ীরা সমান জোরে দাঁড় ফেলিতেছে। মাঝি মধ্যে মধ্যে হাঁকডাক্ দিয়া দাঁড়ীদিগকে উত্তেজিত করিতেছে; সেই হাঁকডাকে তাহাদের সমস্ত মাংসপেশী এক এক চাবুকের ঘায়ে যেন খাড়া হইয়া উঠিতেছে; এবং তাহারাও তাহার প্রত্যুত্তরে বানরের ন্যায় তীব্রস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিতেছে। আমাদের নৌকার পার্শ্ব দিয়া—তৃণরাশি, পদ্মের বৃন্তসমূহ, বিকশিত খাগড়াগুচ্ছ, আমাদেরি ন্যায় দ্রুতভাবে চলিয়াছে।

বেলা দশটা। এখন আমার নৌকা আর তাল-নারিকেলের নীচে দিয়া যাইতেছে না,—একটা গলির মত সঙ্কীর্ণ পথে, একপ্রকার শাদা ফুলের ঝোপ্‌ঝাড়ের মধ্য দিয়া চলিয়াছে। আমার সম্মুখে,—দুইধারে সমান সারিসারি তাম্রমূর্ত্তি-মানবেরা যন্ত্রের ন্যায় অঙ্গচালনা করিতেছে।

এইভাবে ১৮ক্রোশ পথ উহারা অতিক্রম করিয়াছে। কেবল, অল্পস্বল্প স্বেদবিন্দু মুক্তাফলের ন্যায় উহাদের গাত্রে দেখা দিয়াছে; তাহাতে, উহাদের দেহযষ্টি খাঁটি ধাতবপদার্থের ন্যায় ঝিক্‌মিক্ করিতেছে। প্রখর-ভীষণ সূর্য্যকিরণে উহাদের দেহপঞ্জরের রেখাবলি আরো যেন পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। তটজাত ঝোপের অবসাদক্লিষ্ট শুভ্র কুসুমসমূহ বৃন্তচ্যুত হইয়া, উপর হইতে নীল জলরাশির উপর পতিত হইতেছে। উহাদের অতিপ্রচুর অনাবশ্যক ফলরাশিও বিকীর্ণ হইয়া, ছোট ছোট সোনার "আপেলের" ন্যায় চারিদিকে জলের উপর ভাসিতেছে।

আমাদের মাঝিমাল্লারা অবিশ্রান্ত বাহিয়া চলিয়াছে। এইবার উহারা গান ধরিয়াছে। স্বাস্থ্যকর-শ্রমপ্রভাবে তন্দ্রাভিভূত স্বপ্নদর্শী ব্যক্তির ন্যায় উহারা অলস-অবশভাবে গান গাহিতেছে। একপ্রকার ভাবশূন্য স্মিতহাস্যে উহাদের দশনদীপ্তি প্রকটিত হইতেছে।

এইবার একটি অধ্যুষিত প্রদেশ দিয়া আমরা চলিয়াছি। কতকগুলি গ্রাম; কতকগুলি মন্দির; কতকগুলি হিন্দুধরণে নির্ম্মিত প্রাচীন গির্জ্জা; সিরীয় খৃষ্টানেরা এদেশে আসিয়া, এইরূপ গঠনপ্রণালী স্বেচ্ছাপূর্ব্বক অবলম্বন করিয়াছে।

সন্ধ্যার মুখে, আবার বিলটি—দুইধারের পর্ণতরুভূষিত উচ্চ পাড়ের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া পড়িল।

হঠাৎ অন্ধকার;—অন্তর্ভৌম শৈত্য। আমরা একটা সুরঙ্গের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছি। যাহাতে দূরস্থ অন্যান্য বিলের সহিত—উত্তরস্থ বিলসমূহের যোগাযোগ ঘটে, এই উদ্দেশ্যে মহারাজা এই সুরঙ্গটি কাটাইয়া-ছেন। আজ সন্ধ্যায় এবং কাল সমস্তদিন আমরা এই অন্তর্ভৌম খালের মধ্য দিয়া যাইব। দাঁড়পতনের শব্দ এখন যেন দশগুণ বর্দ্ধিত হইল। অন্ধকারের ন্যায় কালো-কালো চলন্ত নৌকাগুলা যখন আমাদের নৌকার সম্মুখে আসিয়া পড়ে, তখন আমাদের মাল্লারা চীৎকার করিয়া উঠে;—

সেই শোকগম্ভীর প্রতিধ্বনির অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত পুনরাবৃত্তি হইতে থাকে।

এখন মধ্যাহ্ন। এইবার মাঝিমাল্লারা বদ্‌লি হইবে। অন্তর্ভৌম খাল অতিক্রম করিয়া আবার আমরা তালীবনসঙ্কুল ক্ষুদ্র দ্বীপপুঞ্জের গোলক-ধাঁধার মধ্যে আসিয়া পড়িলাম। সুশ্যামল-তরুপল্লব-নিমজ্জিত একটি গ্রামের সম্মুখস্থ তটভূমিতে আসিয়া আমাদের নৌকা ভিড়িল! এইখানে চাল্লিশজন নূতন মাল্লা আমাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। মহারাজার নৌকার জন্য, সমস্ত পথ এইরূপ লোকবদ্‌লির বন্দোবস্ত আছে।

এই নূতন মাল্লারা স্ব স্ব স্থানে উপবিষ্ট হইলে পর, একপ্রকার উন্মত্ত অঙ্গচালনা ও কোলাহল আরম্ভ হইল। শিশুসুলভ আনন্দের উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বসিত হইয়া উহারা যাত্রা আরম্ভ করিল, খুব উত্তেজিত হইয়া দাঁড় ফেলিতে লাগিল, এবং শুভ্র দন্তপংক্তি আ-প্রান্ত বিকশিত করিয়া হাসিতে লাগিল—গাহিতে লাগিল। উহাদের মধ্যে কেহ কেহ খৃষ্টান ;—খৃষ্ট-সন্ন্যাসীরা যে বক্ষ-আবরণ পরিধান করে, সেই "স্ক্যাপুলারি" ইহাদের নগ্নবক্ষে ঝুলিতেছে। অপর মাল্লাদের ললাটে শৈবচিহ্ন, এবং বাহু ও বক্ষদেশে ভস্মধূসর তিনটি করিয়া সমতল রেখা অঙ্কিত।

আবার সেই তালজাতীয় তরুপুঞ্জ,—সেই একঘেয়ে তালীবনের-প্রাচুর্য্যমহিমা!...উহা দেখিয়া-দেখিয়া চিত্ত উদ্বেজিত ও ক্লান্ত হইয়া পড়ে। মনে করিয়া দেখ,—তিনশতক্রোশব্যাপী সমস্ত প্রদেশটি উহাদের নিবিড় শাখাপুঞ্জে সমাচ্ছন্ন। ইহাতে, মনের মধ্যে কেমন একপ্রকার যাতনা উপস্থিত হয়। পুরাকালের লোকেরা যাহাকে "অরণ্যভীতি" বলিত—ইহা তাহারি একটা বিশেষ-আকার বলিলেও হয়।

সেই তালজাতীয় তরু ; ক্রমাগত সেই তালজাতীয় তরু—তাহার আর অন্ত নাই। তন্মধ্যে কতকগুলি গগনস্পর্শী তালতরুর শাখাপত্র একত্র পুঞ্জীভূত। তাহাদের উত্তুঙ্গ কাণ্ডের চূড়াদেশ হইতে যেন কতকগুলা

পালোকের থোপ্‌না নীচে ঝুলিয়া পড়িয়াছে। আবার কতকগুলি তরুণ তরু আর্দ্রতপ্ত ভূমি হইতে গজাইয়া উঠিয়াছে; তাহাদের শাখাপত্র আরো বিশাল। সমস্তই কি হরিৎ-শ্যামল!—কি অভিনব উজ্জ্বলকান্তি! সূর্য্য-কিরণে ঐ সকল স্নিগ্ধমসৃণ পত্রপুঞ্জ ঝিক্‌মিক্‌ করিয়া জ্বলিতেছে; এবং উহাদের তলদেশে, এই মধ্যাহ্নসময়ে, বিলের জলরাশি টিনের দর্পণের ন্যায় ঝক্‌মক্‌ করিতেছে।

সূর্য্য এখন মাথার উপর। শ্বেতাঙ্গ লোকদিগের যাহাতে সদ্য মৃত্যু হইবার কথা—সেই মধ্যাহ্নসূর্য্যের প্রখর কিরণে, আমার এই নৌকার মধ্যে, কি অপর্য্যাপ্ত জীবনী শক্তি ব্যয়িত হইতেছে! দাঁড়ীরা, বাহুপেশী প্রসারিত ও আকুঞ্চিত করিয়া দুইঘণ্টাকাল সমানভাবে দাঁড় টানিতেছে; বাহুর শিরাগুলা ফুলিয়া খাড়া হইয়া উঠিতেছে; আর সেই সঙ্গে উহারা গলা ছাড়িয়া তীক্ষ্নস্বরে গান গাহিতেছে। এক-একসময়ে, যেন একটা মত্ততার আবেশ আসিয়া উহাদের চিত্তকে অধিকার করে;—তখন, উহারা হাঁপাইতে-হাঁপাইতে ঝোঁকে-ঝোঁকে গান গায়িতে থাকে, জলরাশিকে অতীব ভীষণভাবে আক্রমণ করে;—জল ফেনাইয়া উঠে; দাঁড়গুলা ভাঙ্গিবার উপক্রম হয়। তখন কৃষ্ণচর্ম্মের উপর অঙ্কিত শৈবচিহ্নগুলি স্যন্দমান স্বেদজলে মুছিয়া যায়।

সন্ধ্যার মুখে, বিলটি আবার দুইধারের গালিচা-বৎ তৃণভূষিত উচ্চপাড়ের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া পড়িল। আমাদের চতুর্দ্দিকে শত শত নৌকা বিশ্রাম করিতেছে এবং আমাদের মাথার উপর, খোদাই-কাজ-করা একটা প্রস্তর-সেতু প্রসারিত। যে স্থানে আমরা আসিয়াছি, ইহা "কিলোন্"-নামক ত্রিবঙ্কুরের একটি বৃহৎ নগর;—ত্রিবন্দ্রমের ন্যায়, বাগান-বাগিচার মধ্যস্থিত একটা মুক্ত পরিসরভূমি। এখানে তালজাতীয় বৃক্ষ আর দেখা যায় না। অন্য বৃক্ষ তাহাদের স্থান অধিকার করিয়াছে। এই বৃক্ষগুলি আমাদের বৃক্ষ হইতে ভিন্ন। এমন কি, এখানে শাদ্বলভূমি ও গোলাপগুল্মও দৃষ্ট হইতেছে।

একটা বৃহৎ সোপান জলের মধ্যে নাবিয়া গিয়াছে; অদূরে শাদা-শাদা স্তম্ভশ্রেণী দৃষ্ট হইতেছে। ঐ গৃহে অনেকদিন কেহ বাস করে নাই। শুনিলাম, দেওয়ানের আদেশক্রমে ঐখানেই আমাদের জন্য সান্ধ্যভোজের আয়োজন হইয়াছে। রাত্রির প্রারম্ভেই, আমরা ঐ বাটীতে উঠিলাম। উঠিবামাত্র, ঐ শুভ্রগৃহের ন্যায়—শুভ্রবসনধারী ভারতীয় ভৃত্যগণ সোপান-পংক্তির উপর দৌড়িয়া আসিল এবং স্বাগত-অভ্যর্থনা করিয়া রূপার থালায় রক্ষিত একটা ফুলের তোড়া আমাকে উপহার দিল। দুইএকঘণ্টাকাল মাত্র এখানে আমার থাকিবার কথা। ততক্ষণ আমার মাঝিমাল্লারা বিশ্রাম করিতে পাইবে।

সান্ধ্যভোজের পর, এই বিজন উদ্যানে বসিয়া চিন্তা করা ভিন্ন আমার আর কোন কাজ নাই। মনে হয় যেন, ফ্রান্সের একটা পুরাতন উদ্যানে আসিয়া পড়িয়াছি।

উদ্যানটির একটু "পোড়ো" অবস্থা; ইহার সরু পথগুলির ধারে-ধারে বঙ্গদেশীয় গোলাপগুল্ম। আমার সম্মুখে; অস্তাচলদিগন্তে, নির্ব্বাপিতরশ্মি নভোদেশ এখনো তামসী রক্তিমা ধারণ করিয়া আছে—সেই ম্লানাভ আলোকচ্ছটা যাহা অস্মদ্দেশের উষ্ণতম গ্রীষ্মসন্ধ্যায় কখন-কখন পরিলক্ষিত হয়।

এই শান্তিময় নিস্তব্ধতার মধ্যে, শৈশবের চিরাভ্যস্ত ও সুমধুর স্মৃতির আবেশ আসিয়া আমার চিত্তকে অধিকার করিল;—তখন,—সর্ব্বসময়ে ও সর্ব্বত্র আমি প্রায় যাহা করিয়া থাকি, এখন তাহাই করিলাম;—এই স্মৃতির প্রবাহ-মুখে আপনাকে একেবারে ছাড়িয়া দিলাম। এই বিষাদময় স্মৃতি লইয়া আমি যদৃচ্ছাক্রমে আত্মবিনোদন করিতে পারি—তাহাতে কিছু-মাত্র আমার ক্লান্তি হয় না।...বনবেষ্টিত "পোড়ো"-ধরণের এই উদ্যানের ন্যায়, স্বদেশের কোন-একটি উদ্যানে, প্রকৃতির ভাব আমার মনে সর্ব্বপ্রথমে প্রতিভাত হয়; এবং আমাদের সেই সমতল-দিগন্তপ্রদেশে, অগষ্ট ও

সেপ্টেম্বর মাসের জ্বালাময়ী সন্ধ্যার এইরূপ রক্তিম আলোকে, "গ্রীষ্মপ্রধান-দেশের" প্রথম স্বপ্ন আমার মনে সমুদিত হয়।

সেই সেকালের গ্রীষ্মবায়ুর মধ্যে, এই একই যূথির সৌরভ বিচরণ করিত; এমন কি, তাম্রাভ আকাশের নীচে, উত্তাপ ও সন্ধ্যালোকপ্রভাবে ধূসরীকৃত—এইরূপ কৃষ্ণবর্ণ বাদুড় ও পেচকগুলা সেখানেও যাতায়াত করিত।...তবে কিনা, এখানে যে বাদুড়গুলা গৃহের মধ্যে বিচরণ করে, তাহা আমাদের চামচিকার অপেক্ষা অনেক বড়; আমাদের চাম্‌চিকার ন্যায়, ইহারাও নিঃশব্দচারী ও বিচিত্রগতি; কিন্তু ইহারা সেই বৃহৎ-আকারের বাদুড়, যাহাকে "ভ্যাম্পায়ার্" বলে; এবং ইহাদের ডানা এত বিস্তৃত যে, উহারা সম্মুখে আসিলে পথ হইতে সরিয়া দাঁড়াইতে হয়!...তাহার পর সুদূরে—এই উদ্যানের চারিদিকে তমোবেষ্টনের ন্যায় যে তরুপুঞ্জ রহিয়াছে, তাহারি মধ্য হইতে সহসা তূরীনিনাদ ও পবিত্র শঙ্খধ্বনি সমুত্থিত হইল। এখন পূজার সময়;—তাই মানবকোলাহলও শুনিতে পাইলাম;—মন্দিরের অভ্যন্তর হইতে লোকেরা দেবতার নিকট যে স্তবস্তুতি করিতেছে—ইহা তাহারই শব্দ।...

তাহার পর, নিস্তব্ধতা আবার যেন ঘনাইয়া আসিল;—মুহূর্ত্তের মধ্যে যেন একটা বিশেষ আকার ধরিয়া পুনরাবির্ভূত হইল। কি-যেন একটা অননুভূতপূর্ব্ব বিষাদের ভারে আমি অভিভূত হইয়া পড়িলাম। স্মরণ হইল, আজ ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দ, ৩১শে ডিসেম্বরের রাত্রি। আমার শৈশবের শতাব্দীটি কালের অতল রসাতলে এখনি নিমগ্ন হইবে।...আমাদের নিকটে যাহা অনন্তবৎ—সেই তারকারাজি নভস্তলে ফুটিয়া উঠিয়াছে। গুরুভার অনন্তের ভাব আসিয়া, আমার ন্যায় ক্ষণজীবি প্রাণীর চিত্তকে বিদলিত করিল। এই পুরাতন শতাব্দী—যাহা অস্তোন্মুখ, এবং এই উদীয়মান নব শতাব্দী—যাহাতে আবার আমি ভাসিয়া চলিব—এই উভয়েরই উত্থানপতন মহাভীষণ অনন্তের তুলনায় অতীব নগণ্য বলিয়া

মনে হয়। সকল পদার্থই শীঘ্র চলিয়া যাইতেছে—মরিয়া যাইতেছে—এইরূপ একটা ভাব আসিয়া মনোমধ্যে উৎকট যন্ত্রণা উপস্থিত হইল। বৃহৎ বন ও বৃহৎ মন্দিরসমূহে আমি পরিবেষ্টিত—সঙ্কীর্ণ ব্রাহ্মণ-ভারতের মধ্যে—ছায়ান্ধকারের মধ্যে আমি আবদ্ধ—এই কথা মনে হওয়ায়, মনোমধ্যে একপ্রকার অভূতপূর্ব্ব ও সুমধুর উদ্বেগ উপস্থিত হইল। এই সব গোলাপযূথিকাশোভিত উদ্যান দর্শনে বারংবার স্বদেশবিভ্রম হইলেও, প্রবাসের ভাব মন হইতে একেবারে দূর হয় না। যখনি যে দেশে গিয়াছি—এইরূপ অসম্বদ্ধ ও অনির্ব্বচনীয় ভাবসমূহ আমার চিত্তমধ্যে উদয় হইয়াছে। তবে কি না, সকল জিনিযেরই মত, তাহার তীব্রতা কালসহকারে হ্রাস হইয়া আসে। কিন্তু আজ রাত্রে, আমার এই দৈহিক শ্রান্তির মধ্যে, অবসাদময় উষ্ণতার মধ্যে, তন্দ্রাবস্থার মধ্যে, ঐ সমস্ত ভাব আবার যেন সহসা ঘনাইয়া আসিল।...

রাত্রি নয় ঘটিকার সময়, এই সুন্দর পরিষ্কার তারার আলোকে, আবার আমরা যাত্রা করিব। আমার মাঝিমাল্লারা বিশ্রাম করিয়াছে। এখন আরো তিনক্রোশ তাহাদিগকে নৌকা বাহিতে হইবে। তাহার পর, আমরা একটা গ্রামে গিয়া পৌছিব—সেইখানে মাঝিমাল্লা বদ্‌লি হইবে।

আমাদের যাত্রাকালে, মন্থরগামী নৌকাসকল, আবার আমাদের নৌকার পাশ দিয়া যাইতে লাগিল;—কালো-কালো ছায়াচিত্র;—জলে প্রতিবিম্ব পড়ায় আরো বড় দেখাইতেছে—যেন অতি-উচ্চ "গণ্ডোলা"—কিন্তু উপচ্ছায়ার মত ঝাপ্‌সা।

একটু পরেই, গোলকধাঁধার মত এই বিলগুলি সমুদ্রের ন্যায় বিশাল হইয়া উঠিল—অগ্নিশিখায় পূর্ণ হইল। এই অগ্নিশিখাগুলি ধীবরদিগের লণ্ঠন;—মৎস্যদিগকে ডাকিয়া আনিবার জন্য বড়-বড় মশাল; সুদীর্ঘ খাগ্‌ড়ার গুচ্ছে আগুন জ্বালাইয়াছে, এবং যাহাতে না নিবিয়া যায়, এইজন্য উহা ক্রমাগত দুলাইতেছে। এই সকল মশালের আলোকচ্ছটা, দীর্ঘ-

রেখায় জলের উপরে প্রতিবিম্বিত হইতেছে।...নিশার মৃদুমন্দ নিশ্বাসে, লঘুলহরীর ক্ষীণ রেখা জলের উপর কদাচিৎ অঙ্কিত হইতেছে। এই একঘেয়ে দাঁড়পতনের শব্দে সহজেই নিদ্রাকর্ষণ হয়; কিন্তু মনের মধ্যে এই ভাবটি সর্ব্বদাই জাগরূক থাকে যে,—আমার চতুর্দ্দিকে, সর্ব্বত্রই জীবন উদ্যম—সুতীব্র জীবন-উদ্যম স্ফূর্ত্তি পাইতেছে। তবে এ কথা সত্য,—এ জীবনস্ফূর্ত্তি নিতান্ত আদিমকালসুলভ;—আমাদের হ্রদবাসী পূর্ব্বপুরুষের জীবন হইতে অধিক ভিন্ন নহে।

দাড়ীরা সমস্ত রাত্রি অবিরাম তালে-তালে দাঁড় ফেলিয়াছে। এই কবোষ্ণ রাত্রির অবসানে, নব শতাব্দীর নবরক্তিম প্রথম সূর্য্য একপ্রকার মৎসজীবি-জগতের উপর সমুদিত হইল;—যে জগতের লোক শিকারে রত,—যাহারা এই অকলুষ তরুণ আলোকে আহার্য্য-আহরণের প্রত্যাশায় চারিধারে বসিয়া আছে। বিশাল-বিস্তীর্ণ বিল; দুই ধারের তালজাতীয় নিবিড় তরুপুঞ্জ তটের উপর ঝুঁকিয়া রহিয়াছে; অসংখ্য জেলে-নৌকা;— অনেক সময়ে আমাদের নৌকার গা ঘেঁষিয়া যাইতেছে—আমাদের পথরোধ করিতেছে। কোন নৌকা একস্থানে স্থির হইয়া আছে, আবার কোন নৌকা, যতদূর সম্ভব—নিঃশব্দে মণ্ডলাকারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। লোকগুলা,—জাল, ছিপ, বল্লম হস্তে লইয়া, ভাসন্ত তক্তার উপর, সজাগ-সতর্কভাবে দাঁড়াইয়া আছে; জলের মধ্যে কোথাও কিছু নড়িলেই ব্যগ্রভাবে নিরীক্ষণ করিতেছে। পানিভেলা, বক এবং অন্যান্য ছোট ছোট পাখীরাও জলের ধারে কাদার উপর বসিয়া অন্বেষণের তীক্ষ্নদৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে; এবং অনেক বর্ষির কাঁটায়, প্রসারিত মৎস্যজালে, ত্রিমুখ শূল-অস্ত্রে, শত শত মৎস্যের মুখ আট্‌কাইয়া রহিয়াছে। এই বিলটি—এই সব শীতলমাংস নিঃশব্দচারী ক্ষুদ্রজীবের অফুরন্ত জলাধার। তাই, এত অসংখ্য মৎস্যভোজী এইখানে আকৃষ্ট হয় এবং মৎস্য আহার করিয়া প্রাণধারণ করে। নবোদিত শতাব্দী এ সমস্ত কিছুই পরিবর্ত্তন

করিতে পারিবে না,—এই ব্যাপার অনাদিকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে।

তটভূমি নিকটবর্ত্তী হইলে দেখা যায়,—মহাপ্রভাবশালী নারিকেল-পুঞ্জের নীচে নিম্নশ্রেণী ইতর লোকদিগের বাস। এই দীনহীন মানবকুলের অস্তিত্ব বৃক্ষগণের অস্তিত্বের উপর একান্ত নির্ভর করে। নারিকেলপত্রের ডাঁটাগুলা একটা গুঁড়ি হইতে অন্য গুঁড়িতে প্রসারিত হইয়া বেড়ার কাজ করিতেছে; মৎস্যের জাল, রসারসি—সমস্তই নারিকেল-ছোব্ড়ায় প্রস্তুত। এই অতীব প্রয়োজনীয় বৃক্ষগুলি শুধু যে ছায়াদান করে—ফল দান করে,—তৈল দান করে, তাহা নহে; যাহারা উহাদের হরিৎশ্যামল অনন্ত ছায়াতলে বাস করে, তাহাদের যাহা-কিছু আবশ্যক, সমস্তই উহারা যোগাইয়া থাকে।

রঙিন রেশমের তল্‌তলে গদির মত, চৌকোণা এক-এক টুক্‌রা ধানের ক্ষেত যে ইতস্তত দেখা যায়—মনে হয়,—এ প্রদেশে সে সকল ক্ষেত না থাকিলেও চলে—খাদ্যের কোন অভাব হয় না।

বিলটি ক্রমশই বিস্তৃত আকার ধারণ করিতেছে। এইবার একটু অনুকূল বাতাস উঠিয়াছে। বাহুদ্বয়ের সাহায্যার্থ,—মাল্লারা, ৪।৫গজ উচ্চ একটা দর্ম্মা একটা মাস্তুলের উপর চড়াইয়া দিল; নিরীহ-ধরণের এই ক্ষুদ্র সমুদ্রটির উপর পাল ও দাঁড়যোগে আমাদের নৌকা আরো দ্রুত চলিতে লাগিল। বিলের দুই কূলে বন; এই বনরাজি দূর হইতে নীলাভ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। বায়ুবেগে, নৌকায় প্রসারিত পালটি ফুলিয়া উঠিতেছে; এই বায়ুর সাহায্য পাইয়া মাল্লারা নিজ বাহুবেগ অনেকটা কমাইয়া দিয়াছে এবং আর-এক ধরণের তান উঠাইয়া একপ্রকার ঘুমের গান মুখ দিয়া গাহিতে আরম্ভ করিয়াছে। মনে হয়, যেন গির্জ্জা-ঘড়ির সুর-সংবলিত ঘণ্টাধ্বনি দূর হইতে আসিতেছে—আর যেন, তাহা ফুরায় না।

ফ্রান্সে, এ সময়ে প্রায় মধ্যরাত্রি—এই সময়ে বিংশতি শতাব্দী প্রথম পদার্পণ করিয়াছে। এই নববর্ষের উৎসব আজ সেখানে অন্ধকারের মধ্যে, বরফের মধ্যে, পূর্ণ উপচারে অনুষ্ঠিত হইবে।

বাতাস পড়িয়া গেল। মধ্যাহ্নের শুভ্রোজ্জ্বল নিস্তব্ধতা—অগ্নিকুণ্ডবৎ উষ্ণতা। নারিকেলতরুশোভিত তটভূমিতে আমাদেব নৌকা আসিয়া ভিড়িল। প্রাতঃকালের মাঝিমাল্লারা এইখানে বদ্‌লি হইল,—অতীব নতভাবে উহারা প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল। নূতন মাল্লারা আর-একটু উজ্জ্বল-তাম্রবর্ণ; উহাদের বহুল কণ্ঠমালা,—কানবালা; গাত্রে নানাবিধ পৌরোহিতিক নক্‌সা ধূসরবর্ণে অঙ্কিত। এক্ষণে উহারা ভীষণবেগে দাঁড় টানিতে আরম্ভ করিল। বায়ু ভারাক্রান্ত বলিয়া বোধ হইতেছে। উষ্ণ-বাষ্পগর্ভ পরিম্লান আকাশমণ্ডল, বিস্তীর্ণ আবিল জলাশয়, সমস্ত জীব, সমস্ত পদার্থ,—অতিরিক্ত আলোকপ্রভাবে যেন বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে। নেত্রাভিঘাতী অত্যুজ্জ্বল একটা শাদা-রঙের ব্যাপক প্রলেপে যেন সমস্তই একাকার। আবার এই সমস্ত একাকারের মধ্যে, নৌকার চতুষ্পার্শ্বে, উজ্জ্বলকান্তি কাটা-ছোলা হীরার টুক্‌রাগুলির মত—জলবিন্দু উচ্ছ্বসিত হইতেছে,—দাঁড়ের গা দিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে; এবং দাঁড়ীদেরও ললাট ও বক্ষ বাহিয়া স্বেদবিন্দু স্যন্দিত হইতেছে।

কোচিন।

প্রায় তিনঘটিকার সময়, ত্রিবঙ্কুর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া, ক্ষুদ্র কোচিন-রাজ্যে প্রবেশ করিলাম। কিন্তু, কি জলরাশির উপর, কি তালীবনের মধ্যে—কোথাও কিছু রূপান্তর লক্ষিত হইল না। কেবল, দিবাবসানে, বৃহৎ নদীর ন্যায় পরস্পর-দূরবর্ত্তী দুই কূলে, নগরাদি দেখা যাইতে লাগিল।

অপেক্ষাকৃত নিকটতর দক্ষিণকূলে রাজার রাজধানী—“এরাকুলম”-

নগর। এইখানে রাজা বাস করেন। বিলের বরাবর ধারে-ধারে, প্যাগোদা-মন্দিরের ন্যায় চারিটা সীরীয় খৃষ্টসম্প্রদায়ের গির্জ্জা, একটা বৃহৎ দেবমন্দির, কতিপয় সৈন্যনিবাস, কতকগুলি পাঠশালা ;—এই সমস্ত, লালমাটীর উপর অধিষ্ঠিত ও রক্তিমবর্ণ। একটি মনুষ্য নাই। কিনারায় একখানি নৌকা নাই। এই সমস্ত প্রাণহীন নিষ্প্রভ ঐশ্বর্য্য-আড়ম্বরের পশ্চাতে বিষয়বিতৃষ্ণ ব্রাহ্মণদিগের আবাসগৃহগুলি অরণ্যের বিষাদ-অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া,—সর্ব্বগ্রাসী তালজাতীয় তরুপুঞ্জের মধ্যে, ঝোপ্‌ঝাড়ের মধ্যে, নীলিম ছায়ার মধ্যে—ক্রমশ বিলীন হইয়া গিয়াছে।

আরো দূরে, জলাশয়ের অপর পারে, বাম কূলে,—জীবন-উদ্যমের উদ্দাম স্ফূর্ত্তি। প্রথমেই হিন্দু বণিক্‌দিগের নগর—"মাতাঞ্চেরি"—শত-শত ক্ষুদ্র গৃহ উদ্ভিজ্জশ্যামল ভূমির উপর অধিষ্ঠিত। একটি উপসাগর-সূত্রে, মহাসমুদ্রের সহিত এই নগরীর যোগাযোগ রক্ষিত হইয়াছে। এই উপসাগরে অসংখ্য নৌকা নোঙর করিয়া আছ ; এগুলি সেকেলে-ধরণের নৌকা ;— পাল ও অদ্ভুত মাস্তুল বিশিষ্ট। এই নৌকাগুলি আরবসমুদ্রের উপর দিয়া ক্রমাগত যাতায়াত করে, মস্কটের সহিত বাণিজ্য করে, পারস্য-উপসাগরের অভ্যন্তর পর্য্যন্ত প্রবেশ করে এবং বসোরা-নগরে মসলা-সামগ্রী ও শস্যাদি লইয়া যায়। তার পর, আরো দূরে—পোর্টুগী ও ওলন্দাজদিগের পুরাতন কোচিন। এখন ইহা অন্য প্রভুদের হস্তে। উহাদের একটা বন্দর আছে,— সেইখানে আধুনিক জাহাজগুলার ধোঁয়া-চোং হইতে কৃষ্ণবর্ণ ধূমরাশি নিরন্তর উচ্ছ্বসিত হইতেছে।

ঐই বিলের মাঝখানে,—ঐ পরস্পর-বিসদৃশ তিনটি নগরের সংস্রব হইতে দূরে,—একটি তরুসমাচ্ছন্ন দ্বীপ আছে ; এখন সেই দ্বীপের অভিমুখে আমার নৌকা চলিতে লাগিল। হরিৎ-শ্যামল উদ্ভিজ্জরাশির মধ্যে নিমজ্জিত কতকগুলা শাদা-শাদা সোপানপংক্তি, একটা শাদা ঘাট, একটি শাদা রঙের পুরাতন প্রাসাদ। আমি যে রাজার অতিথি, সেই রাজার আদেশক্রমে

বোধ হয়, ঐখানেই আমার বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। উহার যেরূপ জীর্ণ ও "পোড়ো" অবস্থা, তাহাতে মনে হয়, ঐ সকল শাদ্বলভূমির উপর, ঐ সকল শাখাপল্লবের মধ্যে—কোন নিদ্রামগ্না ঔপন্যাসিক রূপসী বাস করে। সন্ধ্যা নিকটবর্ত্তী হওয়ায়, এই বিজন দ্বীপটি আরো বিষণ্ণ আকার ধারণ করিল।

কিলোন্-নগরীর ন্যায়, এখানেও শুভ্রবসনধারী ভারতীয় ভৃত্যগণ আমাকে একটি গোলাপের তোড়া দিবার জন্য, শাদা সিঁড়ির উপর দৌড়িয়া-আসিয়া আমার সম্মুখে উপস্থিত হইল। আমি এখন, একটি সুন্দর পুরাতন উদ্যানের মধ্য দিয়া চলিতেছি;—সেকেলেধরণের সোজা-সোজা রাস্তা; ধারে-ধারে জুঁইগাছ, গোলাপগাছ।

এই দ্বীপের মধ্যে একটিমাত্র বাড়ী, আর সেই বাড়ীর মধ্যে আমি একা। যে শতাব্দীতে, কৌচিনরাজ্য ওলন্দাজদিগের অধিকারে ছিল, তখন এই বাড়ীটিতে ওলন্দাজ শাসনকর্ত্তা বাস করিতেন। ইহা দুর্গের ন্যায় পিণ্ডাকৃতি; এবং ইহার অলিন্দ, বারান্দা—সুন্দর মস্‌জিদ্-ধরণের খিলানে বিভূষিত। অভ্যন্তরে, সেকালের স্তম্ভময়ী বিলাসিতা। চূনকাম-করা প্রকাণ্ড বড় বড় ঘর;—তাহাতে প্রাচীনকালের মাদুর বিছানো; এপ্রকার সূক্ষ্মধরণের মাদুর আজকাল আর দেখা যায় না। পুরাতন সুদুর্লভ কাঠ-কাঠরার কাজ; অতি পুরাতন য়ুরোপীয় আদর্শে নির্ম্মিত খোদাই-কাজ-করা ঘরের আস্‌বাব; দেয়ালে জল-রঙের ছবি;—এই ছবিগুলা সপ্তদশ-শতাব্দীর আমষ্টার্ডামের চিত্রকলার নমুনা। কি রাত্রে, কি দিনে,—দর্জাগুলা কখনই বন্ধ করা হয় না। এই প্রত্যেক দর্জার সম্মুখে এক-একটা দাঁড়ানো-পর্দ্দা;—তাহাতে ম্লান-মনোহর পীতবর্ণ রেশমের কাপড় টানা।

ভৃত্যেরা আমাকে জানাইল,—আমি যে রাজার অতিথি, তাঁহার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইবে না; কেন না, তাঁহার অশৌচ—এখন তিনি শ্রাদ্ধ-

শান্তি করিতেছেন। কোচিন-রাজ্যের অল্পবয়স্ক যুবরাজ—নিতান্ত শিশু—সম্প্রতি স্বকীয় কৃষ্ণবর্ণ কুসুমনেত্র চিরতরে নিমীলিত করিয়াছেন; তাই, প্রাসাদের সমস্ত লোক এখন শোকমগ্ন।

এই রাজকীয় বিজনতার মধ্যে না আসিয়া, মাতাঞ্চেরি-নগরে অবস্থিতি করিলে আমার পক্ষে ভাল হইত। সেখানে একটা ক্ষুদ্র পান্থনিবাসে থাকিলেও, আজ আমি সায়াহ্নে, তত্রত্য জনতার মধ্যে মিশিয়া, তাহাদের প্রকৃত জীবন প্রত্যক্ষ করিতে পারিতাম!…এখানে ও ত্রিবঙ্কুরে—আমি ভারতবর্ষে থাকিয়াও যেন নাই। বিশিষ্টদর্শন নিঃশব্দচারী ভৃত্যেরা, মার্জ্জারবৎ-পদসঞ্চারে, খাঁজ-কাটা-খিলান-বিলম্বিত সমস্ত দীপগুলি জ্বালিয়া দিল। নূতন-ধরণে পুষ্পপল্লবে সুসজ্জিত টেবিলের ধারে বসিয়া আমার "কয়েদির ভোজ" শেষ হইলে পর,—নবশতাব্দীর প্রথম সন্ধ্যার অভ্যুদয় দেখিবার জন্য আমি উদ্যানের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। যেখানে নির্ব্বাপিত-প্রায় জ্বলন্ত অঙ্গারের রং এখনো পর্য্যন্ত রহিয়াছে—সেই পশ্চিম দিগন্তপটের উপর, এই দ্বীপতরুগুলি, ঘোর-কৃষ্ণবর্ণ কত-কি দুর্ব্বোধ্য চিত্রাক্ষর অঙ্কিত করিতেছে। এখনো, উদ্যানবীথির ঊর্দ্ধদেশে—উত্তপ্ত নভস্তলে, সেই সন্ধ্যাচর জীব—পেচক ও বৃহৎ-জাতীয় বাদুড় বিচিত্র চক্রগতিতে উড়িয়া বেড়াইতেছে।

তাহার পর, সমস্ত আকাশে, মিট্‌মিট্‌ করিয়া তারা জ্বলিতে লাগিল—সহসা রাত্রি আসিয়া পড়িল।

প্রভাতে রক্তিমভানু আবার যখন উদিত হইল, দেখিলাম—বৃহৎ সোপানের তলদেশে আমার নৌকা প্রস্তুত রহিয়াছে। নৌকায় উঠিয়া, বিলের মধ্য দিয়া, মাতাঞ্চেরি-নগরের অভিমুখে চলিলাম। অবশেষে সহরের ইহুদিবিভাগে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। অষ্টম শতাব্দীতে, জেরুশালেমের দ্বিতীয় মন্দিরটি যখন ধ্বংস হইয়া যায়, সেই সময়ে প্রায় দশসহস্র ইহুদি ও ইহুদিনী এই ম্যালাবার-প্রদেশে আসিয়া, ক্র্যাঙ্গানোরে

(তৎকালীন নাম "মহোদ্রপত্না") বাসস্থাপন করে। পরধর্ম্মসহিষ্ণু হিন্দুরা উহাদিগকে সাদরে গ্রহণ করিয়াছিল। এখনও পর্য্যন্ত এই ক্ষুদ্র ঔপ-নিবেসিকমণ্ডলী, পার্শ্ববর্ত্তী হিন্দুগণ হইতে—সমস্ত জগৎ হইতে স্বতন্ত্র থাকিয়া, পুরুষপরম্পরাগত স্বকীয় ঐতিহ্য ও কুলপ্রথা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। মনে হয়, যেন উহারা কোন জাদুঘরেব সংরক্ষিত ঐতিহাসিক কৌতুক-সামগ্রী।

মাতাঞ্চেরীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত অতিক্রম করিয়া, প্রথমেই 'শাদা-ইহুদি"দিগের সহরে (এ দেশে উহাদিগকে "শাদা-ইহুদি" বলে) উপনীত হইলাম। মাতাঞ্চেরি—একটি বৃহৎ বিপণি বলিলেও হয় —খাটি দেশীয় বিপণি,—যেখানকার সমস্ত মানবমূর্ত্তি—সমস্ত মানবদেহ বিশুদ্ধ পিত্তলবর্ণের; সমস্ত দোকানগুলি কাঠের,—বারণ্ডার পশ্চাতে মুক্ত পরিসর—সেই উত্তুঙ্গ সুনম্য তালতরুর তলদেশে অবস্থিত। ক্রোশখানেক ধরিয়া এইরূপ বাজার চলিয়াছে। এইরূপ ভারতীয় দৃশ্যে চক্ষু যখন অনেকক্ষণ অভ্যস্ত হইয়াছে—এমন সময়ে একটা বাঁক ফিরিয়াই একটা পুরাতন "অন্ধকেরে" রাস্তায় হঠাৎ আসিয়া পড়িলাম; যেন ইহা স্থানভ্রষ্ট হইয়া কোনপ্রকারে এখানে আসিয়া পড়িয়াছে। কোন স্থানচ্যুত জিনিষ দেখিলে মনে যেমন একপ্রকার অশান্তি উপস্থিত হয় আমার মনে সেইরূপ অশান্তি উপস্থিত হইল। খুব ঘেঁষাঘেঁষি সারি-সারি পাথরের বাড়ী। শীতপ্রধান দেশের ন্যায়, বাড়ীর সম্মুখভাগের মুখশ্রী বিষাদময়, প্রবেশপথগুলি সঙ্কীর্ণ। তাতে আবার, প্রত্যেক গৃহের দ্বারদেশে, গবাক্ষে, বিষাদতমসাচ্ছন্ন এই ক্ষুদ্র রাজপথে, সর্ব্বত্রই ইহুদিমুখ দেখা যাইতেছে। এই আকস্মিক দৃশ্যপরিবর্ত্তনের ন্যায় ইহুদিমুখও আমার চিত্তকে উদ্বেজিত করিয়া তুলিল। এই বিষাদময় জীর্ণদশা, এখানকার এই সমস্ত পরিদৃশ্য,—পার্শ্ববর্ত্তী তালপুঞ্জের সহিত, আকাশের সহিত, যেন একটুও খাপ্ খায় না। এই অপ্রত্যাশিত রাস্তাটিতে সহসা আসিয়া, মনে

হয় যেন আমি এখন আর ভারতের মধ্যে নাই ;—এমন কি, মনে হয়, প্রাচ্যভাব যেন এখান হইতে একেবারেই অন্তর্হিত হইয়াছে। যেন লাইড্ কিংবা আমষ্টার্ডামের রাস্তার একটা টুক্‌রা স্থানচ্যুত হইয়া এখানে আসিয়া পড়িয়াছে ;—কেবল, গ্রীষ্মপ্রধান দেশের প্রখর উত্তাপে উহা তাপদগ্ধ হইয়াছে,—ফাটিয়া গিয়াছে। বেশ মনে হয়, ওলন্দাজেরাই সহরের এই ভাগটি নির্ম্মাণ করিয়াছে ; কেন না, সেই যুগের ওলন্দাজেরা, আপনাদের নিজের দেশেও, জলবায়ুভেদে কিরূপ গৃহ নির্ম্মাণ করিতে হয়, তাহা জানিত না। তাহার পর, ওলন্দাজেরা এ দেশ হইতে চলিয়া গেলে, ক্র্যাঙ্গানোরের ইহুদিরা সেই সব শূন্যগৃহ অধিকার করে। এখানে কেবলি ইহুদি—ইহুদি ছাড়া আর কিছুই নাই। এই সব ইহুদিগের রং ফ্যাকাশে ; ভারতের জলবায়ুপ্রভাবে এবং খুব-ঘেঁষাঘেঁষি বাড়ীতে বাস-করা-প্রযুক্ত, ইহারা রক্তহীন হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু দ্বিসহস্রবৎসরকাল ম্যালাবার-প্রদেশে বাস করিয়াও উহাদের মৌলিক ছাঁচ কিছুমাত্র রূপান্তরিত হয় নাই ;—এমন কি, (প্রচলিত মতের উল্টা) উহাদের মুখ তাপদগ্ধ হইয়া একটুও মলিন হয় নাই। জেরুশালেমে, কিংবা তিবেরিয়াদে যেরূপ মূর্ত্তি—যেরূপ লম্বা আলখাল্লা সচরাচর দেখা যায়,—এখানেও ঠিক্ তাই। যুবতীদের স্বপ্নচারু মুখশ্রী ; দীনদর্শন বৃদ্ধদিগের শুকচঞ্চুবৎ বক্র নাসিকা ; শিশুদিগের শাদা ও গোলাপি রং ; রসপ্রধান দৈহিক প্রকৃতি—মুখে একটু ধূর্ত্তামির ভাব পরিস্ফুট, —"কানানে"র জাত্‌-ভাইদিগের মত, ইহাদেরও কানের উপর চুল-কোঁক্‌ড়াইবার কাগজ রহিয়াছে।

রাস্তা দিয়া যদি কোন বিদেশী পথিক চলিয়া যায়, অমনি তাহাকে দেখিবার জন্য, এই সকল লোক দ্বারদেশে নামিয়া আসে ; কেন না, মাতাঞ্চেরিতে বিদেশী লোক প্রায় কখন আইসে না। বিদেশী দেখিলেই, উহাদের মুখে স্মিতহাস্য ও আতিথ্যের ভাব ফুটিয়া উঠে। যে-কোন গৃহেই

আমি প্রবেশ করি না কেন—প্রায় সকল গৃহেই উহারা সৌজন্যসহকারে আমাকে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত।

এইরূপ কিংবদন্তী—পূর্ব্বে দশসহস্র ইহুদি এখানে আইসে; তন্মধ্যে এখন কয়েকশত মাত্র অবশিষ্ট। দ্বিসহস্রবৎসর কাল অবসাদজনক উত্তাপের মধ্যে বাস করায়, এই চিরস্থায়ী ইহুদিজাতি ক্রমশই বিকৃত হইয়া পড়িতেছে। বোধ হয়, ইহারা এখন গুপ্ত ব্যবসায়ের দ্বারা—কুসীদবৃত্তির দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করে; এবং যখন উহারা ধনাঢ্য হইয়া উঠে—তখন, যেন ধনশালী নহে—এইরূপ ভাণ করিয়া থাকে। দুইতিনজন বিশিষ্ট ইহুদির আতিথ্য গ্রহণ করিয়া, কিয়ৎকাল আমি তাহাদের গৃহে বসিয়াছিলাম। সেই সব গৃহের আভ্যন্তরিক অবস্থা এইরূপ :—অর্দ্ধ-অন্ধকারের মধ্যে একটা সুঁড়িপথ; পচাধসা জিনিষপত্র এলোমেলোভাবে ছড়ান রহিয়াছে; কতকগুলা পুরাতন কীটদষ্ট আস্‌বাব—প্রায় সমস্তই য়ুরোপীয় —বোধ হয় ওলন্দাজদিগের আমল হইতেই চলিয়া আসিতেছে। দেয়ালে মূশার কতকগুলি প্রতিকৃতি ও কতকগুলি উৎকীর্ণ-লিপি বিলম্বিত।

রাস্তার প্রান্তভাগে ইহুদি-গির্জ্জা; ঘণ্টাঘরটির অতীব শোচনীয় অবস্থা; —গ্রীষ্মে সূর্য্যের উত্তাপে ফাটিয়া গিয়াছে;—বয়ঃপ্রভাবে বাঁকিয়া গিয়াছে। প্রথম-দরজা পার হইয়াই একটা প্রাঙ্গণের মধ্যে আসিয়া পড়িলাম;— প্রাচীর স্থূল এবং কারাগারের প্রাচীরের ন্যায় উচ্চ। পবিত্র বেদিটি মধ্যস্থলে রহিয়াছে;—অষ্টঘটিকার প্রাতঃসূর্য্যের বিমল আলোকে পরিপ্লাবিত; এবং ঐ সুধালিপ্ত বেদি হইতে ধবল কিরণ বিকীর্ণ হইয়া নেত্র ঝলসিয়া দিতেছে। পৃথিবীর মধ্যে আর কোথাও এরূপ একটি ইহুদি-গির্জ্জা দেখা যায় না—যাহার সাজসজ্জা এত পুরাতন এবং সাজাইবার ধরণটিও এরূপ অপূর্ব্ব—এরূপ নূতন। এখানকার বিচিত্র বর্ণবিন্যাস কালপ্রভাবে ক্ষীণ ও ম্লানাভ হইয়া, অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে চিত্তকে মুগ্ধ করে। সবুজ দরজা—তাহাতে অদ্ভুত পুষ্পসকল চিত্রিত; গৃহের কুট্টিমটি চমৎকার

—নীল চীনে মাটি দিয়া বাঁধানো ; দেয়ালগুলা দুধের মত শাদা। গির্জ্জার অভ্যন্তরে লালরঙের—সোনালিরঙের আগুন যেন চারিদিকে জ্বলিয়া উঠিয়াছে। কতই তাঁবার থাম্—কতই তাঁবার গরাদে—তার আর অন্ত নাই ;—মানব-হস্তের ঘর্ষণে উহা দর্পণবৎ মসৃণ হইয়া উঠিয়াছে। অনেক-গুলা বিচিত্র রঙের বহু-পুরাতন ঝাড়লণ্ঠান চাঁদোয়া-ছাদ হইতে লম্বমান ; —এইগুলি, বোধ হয়, সেই ঔপনিবেশিক যুগে য়ুরোপ হইতে আসিয়াছিল।

পাণ্ডুমুখশ্রী, আলখাল্লা-পরা', দীর্ঘনাসিক কতিপয় ব্যক্তি বিড়্‌বিড়্‌ করিয়া কি প্রার্থনামন্ত্র পাঠ করিতেছিল,—হস্তে হিব্রুগ্রন্থ ;—আমাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য হঠাৎ থামিল। একজন পুরোহিত,—মনে হয়, শতবর্ষ বয়ঃক্রম—কাঁপিতে-কাঁপিতে আমাকে সংবর্দ্ধনা করিলেন, অতিসূক্ষ্ম-খোদাই-কাজ-করা সেই তাম্রস্তম্ভগুলি আমাকে দেখাইলেন, এবং উহা কিরূপ মসৃণ, স্পর্শ করিয়া দেখিবার জন্য আমাকে অনুরোধ করিলেন ; তাহার পর, নীল চীনেমাটিতে বাঁধানো কুট্টিমের সমস্ত বৃত্তান্ত আমার নিকট বিবৃত করিলেন। কুট্টিমটি বাস্তবিকই অমূল্য—এত দুর্লভ জিনিষ যে, উহাতে পা রাখিতে ভয় হয়। প্রায় দশসহস্র বৎসর হইল, এই চীনে-মাটি চীনদেশ হইতে ফর্মাস দিয়া আনানো হয়, উহার জাহাজভাড়ায় বহু অর্থব্যয় হইয়াছিল। তাহার পর, আমাকে পুণ্য-মঞ্জুষাটি (Tabernacle) দেখাইলেন ; উহা একখণ্ড জরির-পাড়-লাগানো বস্ত্রে আচ্ছাদিত ছিল। উহার অভ্যন্তরে কতকগুলি রত্নখচিত মুকুট রহিয়াছে,—যাহার নক্সা-কল্পনা সলোমন-রাজার মুকুট-নক্সার ন্যায় অতীব আদিমকালের। অবস্থাবিশেষে শতবর্ষবয়স্ক বর্ষীয়ান্ পুরোহিতদিগকে এই মুকুটে বিভূষিত করিবার জন্যই ঐগুলি রক্ষিত হইয়াছে। তা ছাড়া, উহার মধ্যে কতকগুলি ধর্ম্মগ্রন্থ আছে ;—অনির্দ্দেশ্য অতীতের কতকগুলা গোটানো পার্চমেণ্ট-কাগজ,—রূপালি-জরির পাড়ওয়ালা কালো রেশ্‌মি কাপড়ে আচ্ছাদিত।

অবশেষে, উহাদের যেটি বহু আদরের পবিত্র স্মৃতিসামগ্রী—সেইটি

আমার নিকট লইয়া আসিল। ইহা একটি বহুমূল্য দলিল ; তাম্রফলকে উৎকীর্ণ লিপিমালা। ইহুদিদিগের ভারতবর্ষে আসিবার প্রায় চারিশত বৎসর পরে, ৩১৯ খৃষ্টাব্দে, ম্যালাবারের অধিপতি এই শাসনপত্রে লিখিত কতকগুলি অধিকার উহাদিগকে প্রদান করেন।

এই তাম্রফলকে এই মর্ম্মের কথাগুলি উৎকীর্ণ রহিয়াছে ঃ—

যিনি ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়াছেন, যিনি রাজাদিগকে রাজপদে অধিষ্ঠিত করিয়াছেন—সেই পরমেশ্বরের প্রসাদে, আমি রবিবর্ম্মা ম্যালাবারের সম্রাট্, আমার ৩৬ বৎসরের রাজত্বকালে, ক্র্যাঙ্গানোরস্থ মাদেরকাৎলাদুর্গের মধ্যে অবস্থিত হইয়া, সচ্চরিত্র জোসেফ-রব্বন্‌কে নিম্নলিখিত স্বত্ব ও অধিকার প্রদান করিলাম ঃ—

১। পবিত্রবর্ণের লোকদিগের মধ্যে তিনি নিজধর্ম্ম প্রচার করিতে পারিবেন।

২। তিনি সর্ব্বপ্রকার সম্মান সম্ভোগ করিতে পারিবেন ; তিনি অশ্বারোহণ ও গজারোহণ করিতে পারিবেন ; সমারোহপূর্ব্বক নগরযাত্রা করিতে পারিবেন ; নকিবেরা তাঁহার উপাধি প্রভৃতি তাঁহার সম্মুখে ফুকরাইতে পারিবে ; দিবাভাগেও তিনি আলোক ব্যবহার করিতে পারিবেন—তিনি সর্ব্বপ্রকার সঙ্গীত করিতে পারিবেন ; বৃহৎ ছত্র ব্যবহার করিতে পারিবেন ; এবং তাঁহার সম্মুখে প্রসারিত শাদা গালিচার উপর দিয়া চলিয়া যাইতে পারিবেন। তিনি চতুর্দ্দোলা-সিংহাসনে বসিয়া, লোকজন সম্মুখে রাখিয়া সবৈভবে যাত্রা করিতে পারিবেন।

জোসেফ্-রব্বন্‌কে এবং ৬২ জন ইহুদি ভূম্যধিকারীকে এই সকল অধিকার আমি প্রদান করিলাম। জোসেফ-রব্বন্ নিজ অধীনস্থ প্রজাদিগকে শাসন করিতে পারিবেন ; এবং যতদিন জগতে দিবাকরের উদয় হইবে, ততদিন ঐ প্রজারা তাঁহার ও তাঁহার উত্তরাধিকারিগণের আদেশপালন করিতে বাধ্য।

ত্রিবঙ্কুর, তেসেনোর, কদ্রমোর, কালিকিলোন, ক্রেঙ্গুট-জামোরিন্, পালিয়াথাচেন, ও কালিস্ত্রিয়া—এই সকল রাজাদের সম্মুখে এই শাসনপত্র আমি লিখিয়া দিলাম।

লেখক কলম্বী-কেলাপুরের হস্তাক্ষরে এই শাসনপত্র লিখিত হইল। এবং যেহেতু কোচিনের রাজা পরম্পদপা আমার উত্তরাধিকারী—সেইজন্য এই রাজাদিগের মধ্যে তাঁহার নাম ধরা হইল না।

স্বাক্ষরিত ঃ—

চেরুম্ প্রুমল্ রবিবর্ম্মা—

ম্যালাবারেশ্বর।

ইহুদিগির্জ্জার উপরে, ফাটা ঘণ্টাঘরের পার্শ্বে, উহারা আমাকে একটা উচ্চ ঘর দেখাইল। ঘরটি যার-পর-নাই জীর্ণ ও ভগ্নদশাপন্ন,—দেয়াল ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে ও লোহার কড়িগুলা ভাঙাচোরা; তক্তায় গর্ত্ত; কালো চাঁদোয়া-ছাদে বাদুড়-চাম্‌চিকারা ঘুমাইতেছে। দুর্গপ্রাকারের রন্ধ্রের ন্যায়, প্রাচীরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গবাক্ষ;—তাহার মধ্য দিয়া ওলন্দাজসহরের কিয়দংশ দৃষ্টিগোচর হয়—সেই অংশটি এখন ইহুদিদিগের হস্তগত;—সমস্তই ধূসর-বর্ণ, বিষাদমগ্ন ও হৃতসার—মহাপ্রবল তালপুঞ্জের নীচে অধিষ্ঠিত। এই ঘননিবিষ্ট তালপুঞ্জের বিশাল চূড়াগুলি সুদূর পর্য্যন্ত প্রসারিত;—সহসা একস্থানে অরণ্যের আকার ধারণ করিয়াছে;—উহাদের স্থিরস্নিগ্ধ শ্যামল-শোভায় দিগন্ত আচ্ছন্ন। আবার, অপর দিকে দেখা যায়,—একটা পুরাতন দেবমন্দিরের সুধালিপ্ত ছাদ, বৃহৎ ও নিম্ন তাম্রগম্বুজ,—মনে হয়, যেন উত্তপ্ত ধরাতলের উপর ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে।

এই উচ্চ ঘরটি—এই লূতাতন্তুসমাকীর্ণ ভগ্নাবশেষটি শাদা-ইহুদি-শিশু-দিগের পাঠশালা। এই অনুষ্ণ মধুর প্রভাতে, ২০জন শিশু হিব্রু পড়িতেছে। সিদ্ধপুরুষ (Elie) এলির মত দেখিতে একজন ইহুদি-পুরোহিত একটা ফলকের উপর হিব্রু-বাক্য লিখিয়া উহাদিগকে দেখাইতেছে। উহাদের পাশ্চাত্য ভ্রাতৃগণ আজকাল যে হিব্রুভাষাকে অবহেলা করে, সেই হিব্রু-ভাষাতেই এই প্রবাসী শিশুরা এখনো কথা কহে।

শাদা-ইহুদি-অঞ্চলের পরেই, কালো-ইহুদি-টোলা। এই কালো-ইহুদিরা শাদা-ইহুদিদিগের প্রতিদ্বন্দ্বী। আমাকে জানাইয়া দিল—ইহার পর যদি আমি কালো-ইহুদি ও তাহাদের গির্জ্জা দেখিতে না যাই, তাহা হইলে উহারা মনঃক্ষুণ্ণ হইবে। আমি উহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাই কি না, দেখিবার জন্য এখনি কতকগুলি কালো-ইহুদি রাস্তার মাথায় দাঁড়াইয়া আছে। আবার ঊর্দ্ধে গবাক্ষদেশে, অর্দ্ধোত্তোলিত "ন্যাকড়া-কানি"র পর্দার পিছনে কতকগুলি শাদা-ইহুদি-মুখও দেখা যাইতেছে;—একটু যেন বেশি

শীর্ণ, কিন্তু সুশ্রী। উহারাও কৌতূহলের সহিত দেখিতেছে—আমি কোন্ দিকে যাই।

কালো-ইহুদি-বেচারাদিগের ওখানেই তবে যাওয়া যাক্। কালো-ইহুদিরা বলে, শাদা-ইহুদিদিগের আসিবার কিয়ৎ-শতাব্দী পূর্ব্বে তাহারা জুডিয়া হইতে এদেশে আসিয়াছে। আবার, শাদা-ইহুদিরা অবজ্ঞাসহকারে এই কথা বলে যে, কালো-ইহুদিয়া আদিমনিবাসী পারিয়া-জাতির অন্তর্ভুক্ত, শাদা-ইহুদিরা এদেশে ধর্ম্মপ্রচার করিয়া উহাদিগকে স্বধর্ম্মভুক্ত করিয়াছে।

শাদা প্রতিবেশীদিগের অপেক্ষা ইহাদের রং একটু মলিন বটে, কিন্তু একেবারে কালো নহে। আসলে উহারা ভারতীয় ও ইহুদির সংমিশ্রণজাত "মেটে-ফিরিঙ্গি"। উহারা আমাকে আগ্রহসহকারে গ্রহণ করিল। উহাদের গির্জ্জা অনেকটা প্রতিদ্বন্দ্বী গির্জ্জাটিরই অনুরূপ;—কিন্তু তেমন সমৃদ্ধ নহে। সেই সুন্দর তাম্রময় স্তম্ভশ্রেণী এখানে নাই; বিশেষত এখানকার কুট্টিম সেই চমৎকার চীনে-মাটিতে বাঁধানো নহে। এই সময়ে শিশুদের জন্য কি-একটা অনুষ্ঠান হইতেছিল। সমবেত শিশুগণ ধর্ম্মগ্রন্থের মধ্যে নাক গুঁজিয়া ভল্লুকের মত দাঁড়াইয়া, শরীর দোলাইতেছিল;—ইহুদি-অনুষ্ঠানাদির ধরণই এইরূপ। পুরোহিত, প্রতিদ্বন্দ্বী শাদা-ইহুদিদিগের অহঙ্কারের কথা উল্লেখ করিয়া আমার নিকট অনেক দুঃখ করিতে লাগিলেন। উহারা কালো-ইহুদিগের সহিত পরিণয়-সম্বন্ধ স্থাপন করিতে সম্মত নহে; এমন কি, কালো-ইহুদিদিগের সহিত ঘেঁষাঘেঁষি করিয়া একত্র বসিতেও কুণ্ঠিত। আরো দুঃখের বিষয় এই, উহারা যখন এই বিষয়ের দুঃখ জানাইয়া প্রধান-পুরোহিতকে পত্র লিখিয়াছিল, তাহার প্রত্যুত্তরে তিনি সাধারণভাবে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা আরো মর্ম্মঘাতী:—"এক নীড়ে একত্র বাস করিতে গেলে, এক-পালোকের পাখী হওয়া চাই।"

ইহুদি-গির্জ্জার উপর হইতে—তাম্রগম্বুজ, প্রস্তরপ্রাচীর ও সুধালিপ্তছাদ বিশিষ্ট যে দেবমন্দিরটি দেখিয়াছিলাম—সমস্ত উপকূলের মধ্যে সেই

মন্দিরটি সর্ব্বাপেক্ষা আদিম ও উগ্রদর্শন। তা ছাড়া, এরূপ দুর্গম যে, বলা বাহুল্য, আমি উহার নিকটে ঘেঁষিতে সাহস করি নাই। সূর্য্য-করোজ্জ্বল প্রাঙ্গণ—শূন্য, শোকগম্ভীর ;—উত্তপ্ত প্রস্তররাশির মধ্যে, লৌহ ও তাম্র-গঠিত কতকগুলা অদ্ভুত সামগ্রী খাড়া হইয়া রহিয়াছে ;—এইগুলি বহুশাখাবিশিষ্ট একপ্রকার দীপাধার ;—বহুশতাব্দীব্যাপী ঝঞ্ঝাবাতের প্রভাবে উহাতে মর্চে ধরিয়াছে।

পার্শ্বেই কোচিন-রাজাদিগের পুরাতন প্রাসাদ। সরু-সরু দীর্ঘ ঢাকা-বারাণ্ডার পথ দিয়া মন্দিরের মধ্যে যাওয়া যায়। কিছুকাল হইল, কোচিন-রাজারা এই প্রাসাদ ত্যাগ করিয়া, অপরকূলস্থ এর্‌নাকুলমের নূতন আবাসগৃহে উঠিয়া গিয়াছেন। এই প্রাসাদটি দেখিলে মনে হয়—একটা গুরুভার চতুষ্কোণ পুরাতন দুর্গ। ইহার নির্ম্মাণকাল ঠিক নির্ণয় করা অসম্ভব ;—বিশেষত এই প্রদেশে, যেখানে গল্প ও রূপকের সহিত ইতিহাস মিশিয়া গিয়াছে। যাহাই হউক্‌, প্রাসাদটি দেখিলে, অতি পুরাকালের ভাব মনোমধ্যে অঙ্কিত হয়। দ্বারদেশে আসিবামাত্র মনে হয়, কি-যেন-একটা অজ্ঞাতপূর্ব্ব প্রবলপরাক্রম অনার্য্য বর্ব্বরদেশে প্রবেশ করিতেছি। খুব্‌রি-কাটা ছোটছোট কত গবাক্ষ ; নীচে প্রস্তর হইতে খুদিয়া-বাহির-করা কত আসনবেদিকা ;—ইহাতেই বুঝা যায়, ইমারতের মালমস্‌লা কতটা ঘন-সন্নিবিষ্ট। সমস্ত সিঁড়ি—অমন কি,—যে সিঁড়িটি দিয়া দরবারশালায় উঠা যায়, তাহাও অতি সঙ্কীর্ণ, তমসাচ্ছন্ন, শ্বাসরোধী ;—একজনমাত্র উঠিতে পারে, এরূপ পরিসর ; উহাদের নির্ম্মাণে কি-যেন-একটা শিশুসুলভ বর্ব্বরতা লক্ষিত হয়। বড়-বড় দালানঘর খুব দীর্ঘ, নীচু, "অন্ধকেরে"—কারাগারের মত কষ্টজনক।

ঘরে চাঁদোয়া-ছাদগুলা খুব নীচু—খুব কাজ-করা—দুর্লভ কাষ্ঠে নির্ম্মিত ;—কোথাও ঘর-কাটা নক্সা, কোথাও গোলাপ-পাপ্‌ড়ির নক্সা, কোথাও খিলান-কাটা নক্সা,—সমস্তই মলিন, কোন-কোন অংশ

রং দিয়া চিত্রিত। আবার এদিকে দেয়ালগুলা একেবারে সমতল—এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত একসমান ;—অর্দ্ধ-অন্ধকারের মধ্যে প্রথম-দৃষ্টিতে মনে হয়, দেয়ালগুলা বুঝি নানারঙের রঙিন কাপড়ে মোড়া ; কিন্তু আসলে তাহা নহে,—উহাতে নানা রঙের ছবি চিত্রিত হইয়াছে। প্রাসাদের সর্ব্বত্রই, দেয়ালের গায়ে এইরূপ বর্ণচিত্র ;—কোথাও বা কালপ্রভাবে নষ্ট হইয়া গিয়াছে,—কোথাও বা সমাধিমন্দিরস্থ বর্ণচিত্রের ন্যায় অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে।

দেয়ালের এই বর্ণচিত্রগুলি দেখিলে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইতে হয় ;—ইহাতে একটি বিশেষ কলানৈপুণ্য প্রকাশ পায়। কি শাখাবহুল প্রাচুর্য্য ! কি উদ্দাম বিলাসলীলা ! রাশি-রাশি নগ্নমূর্ত্তি,—ভারতরমণীর রূপ অতি-রঞ্জিতভাবে চিত্রিত হইলেও, মানবদেহপঞ্জরের সমস্ত খুঁটিনাটি পুঙ্খানুপুঙ্খ-রূপে অনুকৃত হইয়াছে। কটিদেশ অতীব ক্ষীণ, বক্ষোদেশ অতীব পরিপুষ্ট ও প্রলম্বিত। সুগোল বাহু, সুবক্র নিতম্ব, অতি পীন পয়োধর—এই সমস্তের ছড়াছড়ি—জড়াজড়ি ;—উহার মধ্যে কোনপ্রকার শৃঙ্খলা নাই। হস্তে বলয়, পায়ে নূপুর ; ললাটে সিঁথি, কণ্ঠে হার। এই সব মূর্ত্তির সহিত পশুমূর্ত্তিও মিশ্রিত।

কোথাও একটি আস্‌বাব নাই ;—সমস্তই শূন্য। সমস্ত দেয়াল বর্ণচিত্রে আচ্ছন্ন—এ ছাড়া আর কিছুই নাই। যে ঘরগুলা পরিত্যক্ত ও অন্ধকারাচ্ছন্ন—সেখানেও এই মানবমূর্ত্তি ও পশুমূর্ত্তির ছড়াছড়ি। মাঝের ঘরটি খুব বিশাল—খুব উচ্চ ; এইখানে রাজাদিগের অভিষেক-অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। এই ঘরের দেয়ালে যে-সব কিরণমণ্ডলভূষিত সারি-সারি দেবীমূর্ত্তি—উহারা আসন্নপ্রসবা এবং অসংখ্য বিবস্ত্র দর্শকের মধ্যে অবস্থিত।

রাজাদের শয়নকক্ষটিতে এখনো কিছু-কিছু আস্‌বাব আছে—নৌকা-আকৃতি, দুর্লভ কাষ্ঠে নির্ম্মিত একটি পর্য্যঙ্ক,—তাহাতে জরির রেশ্‌মি গদি—লাল রেশ্‌মি রজ্জু দিয়া চাঁদোয়া-ছাদে লট্‌কানো। ভোজনান্তে রাজাকে

ঘুম পাড়াইবার জন্য ভৃত্যেরা এই পর্য্যঙ্কটি দোলাইরা থাকে। এই রাজ-শয্যার চতুর্দ্দিকে, প্রাচীরের বর্ণচিত্রগুলিতে নিরঙ্কুশ লাম্পট্যলীলা প্রকটিত। দেবদেবী, মানব, পশু, বানর, ভল্লুক, হরিণ—সকলেরই অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কামাবেশে সবেগে আক্ষিপ্ত, চক্ষু উন্মত্তের ন্যায় বিস্ফারিত, আবেশভরে পরস্পরকে জাপ্টাইয়া ধরিয়াছে—পরস্পরের সহিত জড়াজড়ি করিয়া আছে। একটা পিছনের ঘর—অতিব্যবহারে মলিন ও হতশ্রী—সেখানে দিবারাত্রি একটা পিত্তলের দীপ জ্বলিতেছে ও ধূমায়িত হইতেছে···এ ঘরটিতে আমার পদার্পণ করিবার অনুমতি নাই—কেন না, উহারি প্রান্তভাগ—সেখানটা অন্ধকার—সেইখান দিয়া মন্দিরে যাইবার পথ।···

মধ্যাহ্ন আসন্ন। এখন একটা গৃহের মধ্যে আশ্রয় লওয়া নিতান্তই আবশ্যক। আমার ছায়াচ্ছন্ন দ্বীপটি এখান হইতে বেশি দূরে। এখন আমি কোচিনে গিয়া কোনো পান্থশালায় আশ্রয় লইব।

দুইটি চটুল-অশ্ব-যোজিত একটা ক্ষুদ্র ভাড়াটে গাড়ি করিয়া আবার আমি মাতাঞ্চেরির ভারতীয়-ধরণের রাস্তা দিয়া চলিতে লাগিলাম। আজ প্রাতে যেখানে ম্যালাবারের বিভিন্নবেশধারী নানাজাতীয় লোক পিপীলিকার সারির ন্যায় চলিতেছে দেখিয়াছিলাম—সেইখানে এখন মধ্যাহ্নের নিস্পন্দতা।

সেখান হইতে শীঘ্রই কোচিনে পৌঁছিলাম। এক দিকে বিল, অপর দিকে সমুদ্র—ইহারই মাঝখানে, বালুভূমির উপর, কোচিন স্থাপিত;—পুরাতন ঔপনিবেশিক নগর—একটু স্থাবরভাবাপন্ন—এখনো যেন সেখানে ওলন্দাজি ছাপ্ মুদ্রিত। যে ক্ষুদ্র গৃহে আমি আশ্রয় লইয়াছি, সেখান হইতে সমুদ্রের বেলাভূমি পরিদৃশ্যমান—বিরাট-অনন্ত পরিদৃশ্যমান।

আমার সম্মুখে সেই নীল মহাসমুদ্র,—আরবসাগর। মাথার উপর মধ্যাহ্নসূর্য্য—তাহার প্রখর কিরণে বালুকারাশি ও তটভূমি একপ্রকার শুভ্র ও গোলাপি রঙে উদ্ভাসিত। কাকচীলেরা চীৎকার করিয়া আকাশে

উড়িতেছে। নিয়মিত সময়ান্তরে, তরঙ্গমালা স্ফীত হইয়া, তটভূমির উপর সবেগে ভাঙিয়া পড়িতেছে। বহিঃসমুদ্রের সুনীল মসৃণ ঝিকিমিকি জলের মধ্য হইতে শিকার-অন্বেষী দুর্বৃত্ত হাঙরদিগের ডানা ও পৃষ্ঠদেশের কিয়দংশ উঁকি মারিতেছে। নেত্রাভিঘাতী দীপ্ত প্রভার মধ্যে দিগন্ত মিলাইয়া গিয়াছে। যে আবাসগৃহে আমি আজ নিদ্রা যাইব—তাহার কোনো দিক্ বদ্ধ নহে; ইহার পশ্চাদ্ভাগে, নারিকেলবন যেন হঠাৎ আরম্ভ হইয়াছে; আমার ঘরের জান্‌লা দিয়া, যেন একপ্রকার সবুজ আলোকে নিম্নদেশটি দেখা যাইতেছে। উচ্চ তালতরুর খিলান-আকৃতি সুদীর্ঘ সবৃন্ত-পত্রগুলি স্বচ্ছ প্রভায় উদ্ভাসিত এবং তালীবনের হরিদ্বর্ণ গভীর প্রদেশ যেন ভাস্বর হইয়া উঠিয়াছে। ঐ দেখ, একজন ভারতীয় যুবক একপ্রকার পানীয় আহরণ করিবার জন্য পদাঙ্গুলির সাহায্যে স্তম্ভবৎ মসৃণ তালতরু বাহিয়া কপিসুলভ চটুলতা ও দ্রুততা সহকারে নিঃশব্দে উপরে উঠিতেছে। যে শেষ প্রতিবিম্বটি গ্রহণ করিয়া আমার নেত্র নিমীলিত হইল, সেটি ঐ চতুর্ভুজপ্রায় মনুষ্যমূর্ত্তির প্রতিবিম্ব। লোকটা এত শীঘ্র গাছের উপর উঠিয়া গেল যে, তাহার কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না।...

এই সমুদ্রটি এমন ভাস্বর, এমন গভীর—ইহাকে আজ আমি নিকটে পাইয়াছি, হৃদয়ের মধ্যে যেন অনুভব করিতেছি; ইহার বিপুল স্পন্দন শুনিতে পাইয়া আজ আমার কি আনন্দ!—এই সেই অবারিত মার্গ, যেখান দিয়া সর্ব্বত্র যাতায়াত করা যায়; সেই মার্গ, যেখান হইতে সুদূর পরিলক্ষিত হয়; যেখানে প্রতি নিশ্বাসে মুক্তবায়ু গ্রহণ করা যায়; সেই মার্গ, যাহা আমার চিরপরিচিত। বাস্তবিক ইহার সান্নিধ্যে আমার জীবন যেন উজ্জ্বল হইয়া উঠে; উহাকে পাইলে আমি যেন আপনাকে ফিরিয়া পাই; মনে হয়, যেন এই দুর্ব্বোধ্য দুরবগাহ ভারত হইতে—এই ছায়াচ্ছন্ন তরুসমাকীর্ণ বদ্ধ ভারত হইতে ক্ষণেকের জন্য বাহির হইয়াছি।

কিয়ৎকাল বিশ্রামের পর, আমি আবার সেই দ্বীপটির মধ্যে—সেই আমার সুপ্ত প্রাসাদের মধ্যে প্রবেশ করিলাম।

যখন সূর্য্য অস্তপ্রায়, সেই সময়ে এখান হইতে চিরবিদায় লইবার জন্য আমি উদ্যোগ করিলাম। সেই চল্লিশ দাঁড়ের নৌকায় উঠিয়া কোচিন-রাজ্যের দক্ষিণতম নগর "ত্রিচূড়"-অভিমুখে যাত্রা করিলাম। এখান হইতে আরো একরাত্রির পথ যাইতে হইবে।

প্রত্যেক জলযাত্রার আরম্ভে আমার নৌকা ইতপূর্ব্বে যেরূপ বেগে চলিয়াছিল, এবার সেইরূপ বেগে চলিল। বিশ্রামের পর দাঁড়ীরা নববলে বলীয়ান্ হইয়া, কোদালি-কোদালি মাটি উঠাইবার মত, প্রত্যেক দাঁড়ের আঘাতে রাশি-রাশি জল উঠাইয়া চলিতে লাগিল। দাঁড়ীদের সাহায্যার্থে আমরা পাল তুলিয়া দিলাম। তালীবনসমাচ্ছন্ন দুই কূলের মধ্যবর্ত্তী বিলের মধ্যে আবার প্রবেশ করিলাম।

বলা বাহুল্য—আমাদের অস্তগামী সূর্য্য রক্তিম স্বর্ণ-আভার মধ্যে অবতরণ করিয়া নির্ব্বাপিত হইল; এবং পরক্ষণেই, ঐ অদূরে, চির-উদ্ভিজ্জের পশ্চাতে অদৃশ্য হইয়া পড়িল। আমাদের এই প্রশান্ত জগতের উপর, অতীব মধুর বর্ণে রঞ্জিত নির্ম্মেঘ অমল আকাশ প্রসারিত। আমরা এখন মৎস্যজীবীর রাজ্যে—জেলে-নৌকার মধ্যে—মৎস্যজালের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছি। এই ভারতীয় বিলের চারিধারে, তালীবনের পর্দ্দা থাকায় সেই আদিমকালের হ্রদবাসী মৎস্যজীবীর জীবন এখানে বেশ সুরক্ষিত রহিয়াছে।

কল্যকার মত আজও আমার মাঝিমাল্লারা মুখ বুজিয়া সমস্বরে তান ধরিয়াছে; এই তান,—এই প্রশান্ত সময়ের সহিত বেশ খাপ্ খাইয়াছে। পবনদেবের কৃপায় আমাদের নৌকা পালভরে চলিতেছে; দাঁড়ীরা ঔদাস্যের সহিত অলসভাবে দাঁড় ফেলিতেছে। অন্য নৌকাতেও জেলেরা গান ধরিয়াছে; যে স্বরে গান গাহিতেছে, তাহা মানবকণ্ঠ স্বর বলিয়া মনে হয় না,—মনে হয় যেন গির্জ্জাঘড়ির ঘণ্টাধ্বনি

দূর হইতে ও চারিদিক্ হইতে এই শব্দযোনি জলরাশির উপর আসিয়া পৌঁছিতেছে।...

যে-সব সাদাসিধা সরলপ্রাণ বিশ্বস্তচিত্ত অসংখ্য লোক আমাকে ঘিরিয়া আছে—মনে হয় যেন উহারা হরিৎ-শ্যামল তালীবনের ছায়াময় সমাধিগর্ভ হইতে সশরীরে পুনরুত্থান করিয়া, এই "খয়রাৎ-ডাঙা"য় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে!—বিভিন্ন পুরাতন আচার-অনুষ্ঠানে আবদ্ধ খৃষ্টান্, হিন্দু কিংবা ইহুদি; কিন্তু ইহারা সকলেই সমান শ্রদ্ধার পাত্র, একই সত্য উহাদের সকলেরই পশ্চাতে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে।...যে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম এমন কঠোরভাবে রক্ষিত, তাহারও মধ্য হইতে যদি আমি দুরধিগম্য সত্যের দুইএক টুক্‌রা পাইতে পারি—এই শিশুসুলভ আশা আমার চিত্তকে অধিকার করিয়াছিল!...কিন্তু না;—যেমন অন্যত্র, তেম্‌নি এখানেও, চিরবিদেশী ও চিরপান্থ হইয়াই আমাকে থাকিতে হইল;—প্রাণী ও পদার্থসমূহের বাহ্য-ভাবদর্শনে নেত্রের তৃপ্তিসাধন ভিন্ন আমি আর কিছুই করিতে পারিলাম না। তা ছাড়া, আমার যাত্রা শেষ হইয়াছে—আমি চলিলাম; গান গাইতে-গাইতে ও দোলাইতে-দোলাইতে, একখানি সুন্দর নৌকা করিয়া মাঝিমাল্লারা আমাকে লইয়া চলিল। ইহাতেও আমার আনন্দ; এইটুকুই আমার সৌভাগ্য; এবং ইহাই আমার পক্ষে যথেষ্ট।...

দিগ্‌বলয়ের চারিধারে অরণ্যের নীল যবনিকা;—এই নীলিমা ক্রমশ গভীর হইতে গভীরতর হইয়া উঠিল; অস্তাচলদিগন্তের ক্ষণস্থায়ী নীলিমা ক্রমে ঘোর কৃষ্ণবর্ণে পরিণত হইল। ইতস্তত, অপেক্ষাকৃত বিশাল এক-একটি তালবৃক্ষের নিঃসঙ্গ ছায়াচিত্র বৈচিত্র্যহীন অরণ্যরেখার উপরিভাগে পরিস্ফুটরূপে অঙ্কিত। সম্মুখে তারকাবলী। মুমূর্ষু সোনালি-গোলাপি আভার মধ্যে শুক্রগ্রহ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে; এবং তাহার পার্শ্বে নব-ইন্দু সমুদিত। এরূপ চন্দ্র সব-সময়ে দেখা যায় না;—কোন বিশেষ সময়ে, গ্রীষ্মপ্রধান দেশের বিমল-স্বচ্ছ নভোমণ্ডলেই দৃষ্ট হয়;—একটি ভাস্বর

শীর্ণসূত্র বক্রাকারে অঙ্কিত; কিন্তু সমস্তই বেশ পরিস্ফুট ও দৃষ্টিগ্রাহ্য;— মনে হয় যেন পশ্চাৎ হইতে আলোকিত; বেশ বুঝা যায়, উহা একটা সামান্য চক্রমাত্র নহে, পরন্তু এমন একটি গোলক, যাহা নিরাধার হইয়া মহাশূন্যে ঝুলিতেছে। কোন-একটা পদার্থ বিনা-অবলম্বনে রহিয়াছে— মনে করিতে গেলে,—আমাদের অর্জ্জিত সংস্কার যাহাই হউক—ভারসাম্য ও গুরুত্বের যে স্বাভাবিক সংস্কার আমাদের মনোমধ্যে নিহিত আছে, সেই স্বাভাবিক সংস্কারের বশে আমাদের চিত্ত একটু আকুল হইয়া উঠে।

অন্ধকার হইয়া আসিল। মৎস্যদিগকে আকর্ষণ করিবার জন্য জেলেরা তাহাদের মশাল জ্বালিল; গান থামিল; এবং সমস্তই নিদ্রামগ্ন বলিয়া মনে হইতে লাগিল। কেবল, আমার চল্লিশ জন দাঁড়ীর দাঁড় জলের উপর যন্ত্রবৎ অবিরাম পড়িতেছে;—প্রভাত হইতে আরম্ভ করিয়া,তাহারা আমাকে ক্রমাগত উত্তরাভিমুখে লইয়া যাইতেছে।

তালীবনের পশ্চাতে হঠাৎ যেন একটা আগুন জ্বলিয়া উঠিল; ইহা সূর্য্যের উদয়। সারারাত্রি আমার নৌকা চড়ায় ঠেকিয়া ঠেকিয়া অবশেষে লালমাটির একটি ছোট পাহাড়ের নীচে আসিয়া লাগিল। এইখানে বিল শেষ হইয়াছে। ইহাই ত্রিচূড়ের ঘাট;—শতশত নৌকায় সমাচ্ছন্ন। উহাদের সম্মুভাগ "গণ্ডোলার" মত। এই নৌকাগুলি এখনও নিদ্রামগ্ন।

ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মে অতীব নিষ্ঠাবান্ ও অতীব রক্ষণশীল ত্রিচূড়নগর এখান হইতে আরো অর্দ্ধক্রোশ দূরে—তরুপুঞ্জের মধ্যে নিমজ্জিত। বয়েল-গাড়ি করিয়া যখন আমি সেখানে পৌঁছিলাম, তখন সেখানকার লোকেরা সদ্যোমাত্র জাগিয়াছে। এই সব চূনকামকরা কাঠের বাড়ীর ঊর্দ্ধে তালবৃক্ষ-সকল বায়ুবেগে আন্দোলিত হইতেছে। একটা ঠাণ্ডা ঝোড়ো বাতাস উঠিয়া, রক্তিম মেঘপুঞ্জের ন্যায় ধূলিরাশি উড়াইয়া, গাছপালাদিগকে হেলাইতেছে। পেটাই তাঁবার ও শস্যদানার ছোট-ছোট দোকান; আলুলিতকুন্তল বটবৃক্ষশ্রেণী, সমস্তই মালাবারপ্রদেশের অন্যান্য নগরেরই

মত। এই সকল নগর,—আধুনিক পদার্থসমূহ হইতে বহু দূরে—তরু-পুঞ্জের মধ্যে নিমজ্জিত হইয়া, বহুকাল হইতে স্বকীয় জীবন রক্ষা করিয়া আসিতেছে। ত্রিচূড়ের মন্দিরটি অতীব প্রকাণ্ড ও ভীমদর্শন। এই ত্রিচূড়নগরের অপর নাম—"তিবু-শিবায়-পেরিয়া-বুর"—অর্থাৎ শিবের পবিত্র মহানগরী।

এই মন্দিরের সম্মুখস্থ ভূমিতে আমি অবতরণ করিলাম। ইহা মন্দিরও বটে, দুর্গও বটে। এক সময়ে ইহা সেই দুর্দ্দান্ত মহিশূরসুল্‌তান টিপুর অবরোধ সহ্য করিয়াছিল। দুর্গের ঢালুমাটির উপর দিয়া মন্দিরে উঠিতে হয়। এখন এই ভূমির উপর অলস মেষদল ও গবয়াদি নিদ্রা যাইতেছে। ব্রাহ্মণেরা মন্দিরের একটা দ্বারদেশে বসিয়া ধ্যান ও প্রাতঃসূর্য্যের উদয় নিরীক্ষণ করিতেছে। আমি আসিতেছি দেখিয়া শশব্যস্ত হইয়া উহারা আমার দিকে অগ্রসর হইল। এই বিদেশী না-জানি কি মনে করিয়া এখানে আসিতেছে!...কিন্তু আমি তাহাদিগকে বলিলাম,—আমি সব জানি, আমি কেবল মন্দিরচূড়ার কারুকার্য্য দেখিবার জন্য এখানে আসিয়াছি;—যথাযোগ্য দূর হইতে আমি উহা দর্শন করিব। তখন তাহারা হাসিমুখে আমাকে অভিবাদন করিল এবং নিশ্চিন্তমনে আবার মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করিল। গুরুভার প্রাচীরগুলা সুধালেপের দ্বারা ধবলীকৃত; কিন্তু যাহার উপর খোদাই-কাজ-করা চারিটা চূড়া আছে,—চারিদিকের সেই চারিটা দ্বার, ভারতীয় প্রস্তরের ন্যায় শ্যামলবর্ণ। দূর-অতীতের এই পুরাতন শ্যামল চূড়াগুলি প্রচুর অলঙ্কারে ভূষিত;—বহুল ক্ষুদ্রস্তম্ভ ও বর্ব্বর মূর্ত্তিসমূহে পরিপূর্ণ।

এই যে শীতকালের ঝড়ঝটিকা এখানকার সকল পদার্থকেই উৎপীড়ন করে—আলুলিতকুন্তল বৃহৎ বটবৃক্ষদিগকে ঝাঁকাইয়া দেয়—পথে-ঘাটে লাল ধূলা উড়াইয়া দেয়—ইহার প্রভাব কি এই শিবপুরীতে কিছুমাত্র প্রকটিত হয় নাই? পথের ধারে-ধারে সর্ব্বত্রই বর্ষীয়ান্ তরুগণের তলদেশে

পূজা-অর্চ্চনার জন্য একএকটি শান্তিময় নিভৃত স্থান রহিয়াছে। আমাদের দেশে, যেখানে মৃত্তিকাস্তূপের উপর ক্রুশ-দণ্ড স্থাপিত হয়—সেই সব চত্বর-ভূমির উপর—চৌমাথা রাস্তার উপর, এখানে ছোট-ছোট প্রস্তরবেদিকা, বিগ্রহশিলা, প্রতিমাদি প্রতিষ্ঠিত।

রাস্তার পথিক খুবই কম। স্বকীয় নগ্নতার সৌন্দর্য্যে গর্ব্বিত,—কেশগুচ্ছ আকটিবিলম্বিত—শিব কিংবা বিষ্ণুর তিলকচিহ্নে ললাট চিত্রিত—স্বপ্নময় ঢুলুঢুলু নেত্র—এইরূপ কতকগুলি লোক মন্দিরাভিমুখে চলিয়াছে; প্রায় সকলেরই বক্ষদেশে উচ্চবর্ণের চিহ্নস্বরূপ উপবীত রহিয়াছে। কতকগুলি রমণী ইন্দারায় জল লইতে আসিয়াছে। তাহাদের বঙ্কিম দেহভঙ্গী;—স্কন্ধের উপর ঝকৃঝকে তাঁবার কলস রহিয়াছে। স্তনযুগলের একটিতে বক্ষের বসন ফুলিয়া উঠিয়াছে;—অপরটি (প্রায়ই ডানদিক্‌কার) নগ্ন রহিয়াছে। এই সব তরুণীর তরুণ বক্ষোদেশ য়ুরোপীয় জাতিদিগের অপেক্ষা একটু বেশি পরিপুষ্ট,—নিতম্বের তুলনায় একটু বেশি অতিরিক্ত;—কিন্তু উহার গঠন অনিন্দ্যসুন্দর। বহু পুরাকাল হইতে হিন্দুরা তাহাদের প্রস্তর ও ধাতুময় মূর্ত্তিসকল যেরূপ-ভাবে গঠন করে—উহাতে নারীসৌন্দর্য্যের উপকরণগুলি যেরূপভাবে অতিরঞ্জিত করে—এই রমণীরাই সেই-সব প্রতিমূর্ত্তির জীবন্ত আদর্শ। পথিমধ্যে তাহাদের সহিত কখন সাক্ষাৎ হইলে, তাহাদের নয়নকোণের চোরা-চাহনি তোমার দৃষ্টির উপর নিপতিত হয়;—তাহাদের সেই দৃষ্টি বড়ই মধুর, কিন্তু নিতান্ত উদাসীন—নিতান্ত অন্যধরণের;—যেন উহা কালো বিদ্যুতের অনিচ্ছাকৃত সোহাগ-আলিঙ্গন; কিন্তু পরক্ষণেই সেই দৃষ্টি আবার নিম্নদিকে নত হইয়া পড়ে। বিদেশী পথিকের নিকট এদেশের বৃহৎ মন্দির যেরূপ দুর্জ্ঞেয়, সমস্ত পদার্থই যেরূপ দুর্জ্ঞেয়—এই রমণীরাও সেইরূপ দুর্জ্ঞেয়।

সীমান্তদেশে পৌছান পর্য্যন্ত আমি কোচিনরাজের অতিথি

হইয়াছিলাম,—তিনি আমাকে যেখানে লইয়া গিয়াছেন, আমি সেইখানেই গিয়াছি। প্রভাতে ত্রিচূড় দিয়া যাত্রা করিবার সময়, তিনি কৃপা করিয়া সমস্তই পূর্ব্ব হইতে বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন; আমার পথপ্রদর্শক, আহারসামগ্রী—সমস্তই প্রস্তুত ছিল। এমন কি, যে তিনঘণ্টার পথ অতিক্রম করিয়া, গ্রাম-জঙ্গল বনের মধ্য দিয়া, বয়েল-গাড়িতে আমায় "সোরান্নুরে" যাইতে হইবে—সেই গাড়িরও বন্দোবস্ত তিনি করিয়া রাখিয়াছিলেন।

বিদেশী পর্য্যটকেরা সেখানে কখনই যায় না,—সোরান্নুর ছাড়াইলেই—আহা! আমি সেই চিত্তবিমোহন ভারতখণ্ডের বাহিরে চলিয়া যাইব; মাদ্রাজ যাইবার জন্য, আবার সেই সাধারণ রেলপথ ধরিয়া ডাকগাড়ির ট্রেণে আমার উঠিতে হইবে।

তাঞ্জোরের অদ্ভুত শৈল।

তাঞ্জোর প্রদেশের অনন্তপ্রসারিত সমভূমির ঊর্দ্ধে, নারিকেলাদিতরু-সমাচ্ছন্ন বনভূমির ঊর্দ্ধে, একটি শৈলস্তূপ খাড়া হইয়া উঠিয়াছে—নিঃসঙ্গ, বিরাটাকৃতি; উহা যুগযুগান্তর হইতে এই প্রদেশটিকে নিরীক্ষণ করিতেছে; কালক্রমে কত বন গজাইয়া উঠিল, কত নগর সমুত্থিত হইল, কত দেবালয় নির্ম্মিত হইল—সমস্তই দেখিয়াছে। ভূতত্ত্বের হিসাবে ইহা একটি অদ্ভুত ব্যাপার;—আদিযুগের প্রলয়-প্লাবন-সম্ভূত যেন একটি আজগুবি খেয়াল-কল্পনা; দেখিতে মুকুটের চূড়ার মত; অথবা যেন দৈত্যদিগের জাহাজের অগ্রভাগ, উদ্ভিজ্জের হরিৎ-সাগরে অর্দ্ধ-মজ্জিত। প্রায় পাঁচ শত হাত উচ্চ। চারিদিককার বিস্তৃত সমতল ভূমির মধ্যে উহা কিরূপে সমুদ্ভূত হইল, আশপাশের কোন লক্ষণ দেখিয়া তাহা বুঝা যায় না। উহার গাত্র এরূপ মসৃণ যে, এই উদ্ভিজ্জ-প্রবল দেশেও, উহাতে কোনও গাছের চারা

লগ্ন হইতে পারে নাই। এই হেতু, স্বভাবতই পুরাকালের ভারতবাসী সেই মহাযোগী ঋষিগণ এই শৈলটিকে স্বকীয় আরাধনার স্থান করিয়া লইয়াছেন। বহুকাল ধরিয়া, ধৈর্য্যসহকারে তাঁহারা এই শৈল-প্রস্তর কাটিয়া, অলিন্দ-সোপানাদি-সমন্বিত দেবালয় নির্ম্মাণ করিয়াছেন। উহার শীর্ষদেশে কনক-মণ্ডিত চূড়া ঝক্‌মক্ করিতেছে। যুগযুগান্তর কাল হইতে, প্রতিরাত্রে ঐ চূড়ার উপর পূত অগ্নি জ্বালানো হইয়া থাকে। সাগরস্থ দীপ-স্তম্ভের ন্যায়, তাঞ্জোরের দূর দিগন্ত হইতেও উহা সকলের দৃষ্টিগোচর হয়।

আজ প্রাতঃকালে সূর্য্যোদয়ে, শৈলের পদপ্রান্তস্থ নগরটি অন্য দিন অপেক্ষা আজ যেন একটু বেশী চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। আগামী কল্য ব্রাহ্মণদিগের একটা মহা পূজা-পার্ব্বণের দিন। গত কল্য হইতে উহারা বিষ্ণুপূজার জন্য অসংখ্য হল্‌দে ফুলের মালা প্রস্তুত করিতেছে। রমণীরা, বালিকারা, উৎসবের সাজসজ্জায় ভূষিত হইয়া, যাহার যাহা-কিছু উত্তম অলঙ্কার ছিল—বলয়, নথ্, কান্-বালা—সমস্ত পরিধান করিয়া, তাম্র-কলসে জল ভরিবার জন্য, উৎসবের চারিধারে আসিয়া মণ্ডলীবদ্ধ হইয়াছে। শকটের বলদদিগের সিং রং-করা—সোনার-গিল্‌টি করা। তাহাদের কণ্ঠহার, ছোট ছোট ঘণ্টা ও কাচের গুটিকায় বিভূষিত। মালার দোকান-দারেরা, দোকানে রাশি রাশি মালা সাজাইয়া রাখিয়াছে—একপ্রকার ছোট ছোট লাল ফুল, বঙ্গীয় গোলাপ, গাঁদা—এই সকল পুষ্প মুক্তার মত গাঁথিয়া, কতিপয়-হার-বিশিষ্ট মালা রচিত হইয়াছে। এই মালাগুলি অজাগর অপেক্ষাও স্থূল। ইহার ঝুলন্‌গুলিও ফুলের, জড়ি দিয়া জড়ানো। কল্য, যাহারা পূজা-উপলক্ষে আসিবে, এবং মন্দিরস্থ দেবতারা—সকলেই এই হল্‌দে ও গোলাপী রঙের মালাগুলি কণ্ঠে ধারণ করিবে। এই উৎসবের কর্ম্মকর্ত্তারা, আজ প্রত্যূষেই গাত্রোত্থান করিয়া, স্বকীয় আবাসগৃহের সম্মুখে ও সযত্নসম্মার্জ্জিত কুট্টিম-ভূমির উপরে, ফুলের ও নানাপ্রকার রেখার নক্‌সা চিত্র করিবার জন্য ব্যস্ত; একটা ছোট সাদা গুঁড়ার পাত্র হস্তে

লইয়া, চিত্র বিচিত্র নক্‌সার আকাকে সেই গুঁড়া ছড়াইয়া দিতেছে। এই সাদা নক্‌সাগুলি এমন সুন্দর, এবং নক্‌সার প্রত্যেক সন্ধিস্থলে, হল্‌দে ফুল এমন সুন্দরভাবে সন্নিবেশিত যে, রাস্তায় চলিতে আর সাহস্ হয় না। কিন্তু এইবার বাতাস বহিতে আরম্ভ করিয়াছে; তাহার সঙ্গে লাল ধূলাও উড়িয়াছে। ভারতের এই দক্ষিণপ্রদেশে এই ধূলায় সব জিনিষ লাল হইয়া যায়। লোকেরা যে এত ধৈর্য্য ধরিয়া চিত্র বিচিত্র রঙে ভূমি রঞ্জিত করিল, এখন ইহার আর কিছুই থাকিবে না।

নগরের বাড়ীগুলিতে লাল ইটের রং। গৃহ-দ্বারের উপর ত্রিশূল-চিহ্ন অঙ্কিত—সমস্তই খুব নীচু। মোটা-মোটা খাটো দেয়াল, পোস্তা-গাঁথুনি, খিলান-গাঁথুনি,—এই সমস্ত, 'ফ্যারোয়া'দিগের মিসর-দেশকে মনে করাইয়া দেয়। এখানে মনুষ্যালয় অপেক্ষা দেবালয়ই অধিক। প্রত্যেক দেবালয়ের সম্মুখস্থ ত্রিকোণাকার গাঁথুনির উপর ছোট ছোট লাল্‌চে রঙ্গের বিকটাকার মূর্ত্তি সন্নিবেশিত, এবং তাহাদিগের সঙ্গে এক-ঝাঁক দাঁড়কাক বসিয়া আছে। তাহারা পান্থদিগের গতিবিধি নিরীক্ষণ করিতেছে;—কিরূপ শীকার জোটে, পচা-ধসা কিরূপ জিনিষ মেলে তাহারই জন্য অপেক্ষা করিতেছে; এই চিরঅবারিত-দ্বার প্রত্যেক দেবালয়ের অভ্যন্তরে এক একটি ভীষণ মূর্ত্তি অধিষ্ঠিত; গজমুণ্ডধারী গণেশের মূর্ত্তিই প্রায় সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়। টাট্‌টা হল্‌দে ফুলের রাশি-রাশি মালা তাঁহার কণ্ঠে ঝুলিতেছে;—এই সকল মালায় তাঁহার চারিটি বাহু ও লম্বমান শুণ্ডটি ঢাকিয়া গিয়াছে।

মন্দিরের পর মন্দির; ব্রাহ্মণদিগের স্নানার্থ পুণ্য পুষ্করিণী; প্রাসাদ; বাজার। মুসলমানের মস্‌জিদ্‌ও এই তাল-নারিকেলের দেশে অল্প-স্বল্প প্রবেশ-লাভ করিয়াছে। এক সময়ে ভারতের উত্তর-পশ্চিম ও মধ্য-দেশে মুসলমানধর্ম্মের জয়-পতাকা উড্ডীন হইয়াছিল—ইহাই বোধ হয় তাহার কারণ। মস্‌জিদ্‌গুলি সাদাসিধা; গায়ে, আরবীয় শিল্পরীতির অনুযায়ী নক্‌সা-কাটা, সরু-সরু "মিনারের" মাঝখান হইতে উহা আকাশ ফুঁড়িয়া

সোজা উঠিয়াছে। যে ধূলা এখানকার সব জিনিস লাল করিয়া দেয়, সেই লাল ধূলা-সত্ত্বেও, এই মস্‌জিদ্‌গুলি, 'হেজাজে'র মস্‌জিদের মত, কোন উপায়ে স্বকীয় তুষার-শুভ্রতা রক্ষা করিয়াছে।

পিপীলিকাশ্রেণীর ন্যায় লোকের গতিবিধি—লোকের প্রবাহ চলিয়াছে। কাল উৎসবের দিন। আমি শৈল-মন্দিরের অভিমুখে যাত্রা করিলাম। মন্দিরের সম্মুখভাগটি নগর ছাড়াইয়া ঊর্দ্ধে উঠিয়াছে। তিন চারিটি প্রকাণ্ড শৈলস্তূপে মন্দিরটি গঠিত; উহাতে একটুও চীড়্ নাই, ফাটল নাই, জীর্ণতার রেখামাত্রও নাই। এই স্তূপগুলি পরস্পর-উপর্য্যুপরি-নিক্ষিপ্ত, জন্তুর পার্শ্ব-দেশের ন্যায় ঈষৎ-বর্ত্তুল, বৃষ্টির জলধারায় মসৃণীকৃত; উহাদের গাত্র এত ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে যে, দেখিলে ভয় হয়। দাঁড়কাকের মেঘে চারি দিক্ আচ্ছন্ন;—উহারা অর্দ্ধচন্দ্রাকারে ঘোর-পাক দিয়া উড়িয়া বেড়াইতেছে। জটিল-নক্‌সা কাটা উচ্চ প্রস্তর-স্তম্ভের মধ্যে, ছোট-ছোট মন্দির-চূড়ার মধ্যে, (সমস্তই ক্ষয়গ্রস্ত ও বহুপুরাতন) একটা প্রকাণ্ড-উচ্চ সিঁড়ি শৈলের নৈশ-অন্ধকার ভেদ করিয়া ঊর্দ্ধে উঠিয়াছে। কতকগুলি সুলক্ষণাক্রান্ত পবিত্র হস্তি-শাবক (আরাধ্য হস্তিবংশ-প্রসূত) প্রবেশ-পথটি প্রায় রুদ্ধ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। ছোট-ছোট ঘণ্টা-গাঁথা মালায় উহাদের দেহ আচ্ছাদিত। সেই প্রবেশ-পথে উহারা শিশু-সুলভ ক্রীড়াচ্ছলে, আমার গায়ে শুঁড় বুলাইয়া দিল। এইবার আমার আরোহণ আরম্ভ হইল। হঠাৎ অন্ধকারের মধ্যে গিয়া পড়িলাম। সেই সঙ্গে চারি দিক হইতে বাদ্যধ্বনি শুনা যাইতে লাগিল;—শৈল-গহ্বরের মধ্যে সেই ধ্বনির গভীরতা যেন আরও বৃদ্ধি হইল;—মনে হইতে লাগিল, যেন উহা পাতাল-গর্ভ হইতে নির্গত হইতেছে।

বলা বাহুল্য, আমি এক্ষণে মন্দিরের কাছে আসিয়া পড়িয়াছি। কত গুপ্ত-কক্ষ, কত অলিন্দ, কত প্রবেশ-দালান, কত সিঁড়ি;—ইহার মধ্যে কতকগুলি কেবলমাত্র পুরোহিতদিগের ব্যবহার্য্য;—এই সিঁড়িগুলি

রহস্যময় অন্ধকার ভেদ করিয়া ঊর্দ্ধে উঠিয়াছে। প্রত্যেক গুপ্তস্থানে, প্রত্যেক কোণে, এক একটি প্রতিমা অধিষ্ঠিত; কোনটা বা বামনের ন্যায় ক্ষুদ্র, কোনটা বা দৈত্যের ন্যায় বিকটাকার, কিন্তু সবগুলিই কাল-বশে লুপ্তাঙ্গ; কাহারও বা বাহুর অংশমাত্র—কাহারও বা আধখানা মুখ অবশিষ্ট রহিয়াছে।

আমি অদীক্ষিত দর্শক—আমি-মাঝের বৃহৎ পথটি দিয়া উপরে উঠিতেছি—সে পথটি সকলেরই নিকট অবারিত। চারিধারে,এক-একটি অখণ্ড প্রস্তরে গঠিত চমৎকার স্তম্ভশ্রেণী—নক্‌সা ও আকৃতিচিত্রে সমাচ্ছন্ন; উহাদের তলদেশ এক-মানুষ-সমান উচ্চ—পদঘর্ষণে তেলা ও চিক্‌চিকে হইয়া উঠিয়াছে। কত কত শতাব্দী হইতে, এই সকল সঙ্কীর্ণ পথের ছায়ান্ধকারে, কত অগণ্য ঘর্ম্মাক্ত নগ্নগাত্র মনুষ্য অবিরাম চলিয়াছে; এই সকল শৈল-কুট্টিম, তাহাদেরই স্বেদজল গভীররূপে শোষণ করিয়াছে। শৈল-মন্দিরের গায়ে—এমন কি, উহার সোপান-ধাপ ও টালিতে পর্য্যন্ত—কতকাল পূর্ব্বে, লেখাক্ষর ও সাঙ্কেতিক চিহ্ন সকল ক্ষোদিত হইয়াছিল, কিন্তু সে সমস্ত এখন দুর্ব্বোধ ও দুর্নিরূপ্য হইয়া পড়িয়াছে;—বিচরণকারী লোকদিগের পাণিতল ও নগ্ন পদের ঘর্ষণে অতি ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

প্রথমেই কতকগুলি ভজন-মণ্ডপ; এত জনতা যে নিশ্বাস রুদ্ধ হইয়া যায়। এইখানে ভক্তজন অন্ধকারের মধ্যে বন্দনা গান করিতেছে। আর একটু উচ্চে একটি দেবালয়, 'ক্যাথিড্রাল' গির্জ্জার ন্যায় বিশাল; অরণ্যবৎ স্তম্ভশ্রেণী উপরকার ভীষণ পাষাণ-ভার ধারণ করিয়া আছে। এই মন্দিরে বিধর্ম্মীদিগের প্রবেশাধিকার আছে, কেবল এই নিয়ম যে, প্রবেশ করিয়া আর অধিক অগ্রসর হইতে পারিবে না। এই দেবালয়টি কোথায় গিয়া শেষ হইয়াছে, দেখা যায় না। দূর-প্রান্তের বর্ণবিন্যাস ও ক্ষোদিত গুহাগুলি শৈলের নৈশ-অন্ধকারে বিলীনপ্রায়। শুভ্র লোমশ বস্ত্রে আচ্ছাদিত একটি বৃদ্ধের নিকট, কতকগুলি ব্রাহ্মণ-শিশু বেদ পুরাণাদি

পাঠ করিতেছে। শৈল-মণ্ডপের সুঁড়িপথ-গুলিতে, ব্রাহ্মণদিগের আনুষঙ্গিক পূজা-সামগ্রী সকল সংরক্ষিত:—মহাপুরুষ, রথ, ঘোড়া, হাতী, (প্রকৃত অপেক্ষা বড়) অদ্ভুত কল্পনা-প্রসূত কত খুঁটিনাটি জিনিস, জমাট্-কাগজের উপর—রঙ্গিন কাগজের উপর আঁকা—দেবালয়ের গায়ে, ভঙ্গুর বংশদণ্ডের উপর লট্‌কানো রহিয়াছে। এখানকার জীবকুল উন্মত্তভাবে বংশবর্দ্ধনে ব্যাপৃত। ছোট-ছোট পাখী—চাতক কিংবা চড়াই—মন্দিরের সুঁড়ি-পথগুলিতে নীড়নির্ম্মাণ করিয়া, চিত্রবিচিত্র রঙ্গের অণ্ডে তাহা পূর্ণ করিতেছে। এই সুঁড়ি-পথগুলিতে লোকজন যাতায়াত করিতেছে, পক্ষি-শাবকগুলি চিঁ চিঁ শব্দ করিতেছে, এবং এই লঘু প্রাণীদিগের পরিত্যক্ত পুরীষ, কুট্টিম-প্রস্তরের উপর শিলাবৃষ্টির ন্যায় পতিত হইতেছে;—এই সমস্ত জীবন-উদ্যমের বিকাশে, বিচিত্র বিকটাকার জীবের প্রাচীর-বিলম্বিত চিত্রগুলিও যেন একটু সজীব হইয়া উঠিয়াছে।

এখনও আরও ঊর্দ্ধে উঠিতে হইবে। এই অর্দ্ধ-অন্ধকারের মধ্যে, এই সকল অখণ্ড-প্রস্তরময় মসৃণ প্রাচীরের মধ্যে, মনে হয়, যেন কোন ভূগর্ভস্থ-সমাধি-মন্দিরের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছি। এই সময়ে, হঠাৎ একটি বাতায়নের মধ্য দিয়া সূর্য্যের কিরণচ্ছটা প্রবেশ করিয়া আমার সর্ব্বাঙ্গ প্লাবিত করিল, তখন নিম্নদেশের দূরস্থ বৃক্ষ ও মন্দিরাদি দেখিতে পাইলাম। আমি আকাশের খুব উচ্চদেশে উঠিয়াছি। কতকগুলি শৈলস্তূপ—শৈল-যুগের প্রস্তরবৎ প্রকাণ্ড, পরস্পর উপর্য্যুপরি বিন্যস্ত, বিশ্লিষ্ট ও এক-ঝোঁকা, শুধু স্বকীয় পরমাণুরাশির ভারেই, প্রায় অনাদি কাল হইতে এক স্থানে দণ্ডায়মান।

আবার একটি দেবালয়; কিন্তু উহাতে আমার প্রবেশ নিষিদ্ধ। আমি উহা দ্বারদেশ হইতেই দেখিলাম। এইমাত্র আমি যে স্থানটি ছাড়িয়া আসিলাম, সেখানকার শৈলস্তূপগুলির ন্যায় এই শৈলস্তূপগুলিও পরস্পর উপর্য্যুপরি বিন্যস্ত, কিন্তু তদপেক্ষা আরও প্রকাণ্ড ও চমৎকারজনক।

তা ছাড়া এইগুলি অধিকতর আলোকিত; কেন না, ইহার খিলানের গায়ে, স্থানে স্থানে চতুষ্কোণাকার ফাঁক আছে,—যেখান হইতে নীল-আকাশ পরিলক্ষিত হয়, এবং সূর্য্যকিরণ প্রবেশ করিয়া, বিচিত্র রঙ্গের অলঙ্কারে বিভূষিত, সোনালি-গিল্টির কাজ-করা, মন্দিরের অংশ-বিশেষের উপর নিপতিত হয়। এই দেবালয়টি—যাহা গগনবিলম্বী বলিলেও হয়—ইহার উপরে কতকগুলি ছাদ আছে;—এই ছাদের উপর হইতে দেখা যায়,—তাঞ্জোরের সমভূমি দূরদিগন্ত পর্য্যন্ত প্রসারিত, এবং তত্রস্থ অসংখ্য মন্দির, হরিদ্বর্ণ নারিকেল-কুঞ্জের মধ্য হইতে মস্তক উত্তোলন করিয়া আছে।

এখন কেবল সেই সর্ব্বোপরিস্থ শৈলস্তূপটি আমার দেখিতে বাকি;—একটি অখণ্ড প্রস্তরের সেই স্তূপ, যাহা আদিকালের প্রলয়বিপ্লবে, অত ঊর্দ্ধে নিক্ষিপ্ত হইয়া ঝুঁকিয়া রহিয়াছে। নিম্নদেশ হইতে দেখিলে মনে হয়, যেন উহা কোন জাহাজ-"গোলুই"এর অগ্রভাগ, অথবা 'হেল্‌মেট'-শিরস্কের চূড়াপ্রান্ত। এই শৈলের গা বাহিয়া একটা অপরিস্ফুট সিঁড়ি উঠিয়াছে, তাহার ১৪০টা ধাপ—সঙ্কীর্ণ, ক্ষয়গ্রস্ত ও এরূপ ঝোঁকা যে দেখিলে মাথা ঘুরিয়া যায়।

উল্লিখিত কনক-কলস-ভূষিত ছাদের উপরেই, প্রতিরাত্রে পুণ্য-অগ্নি জ্বালানো হয়, এবং সেইখানেই মন্দিরের মুখ্য পুত্তলিকাটি, একটা প্রকাণ্ড তমসাচ্ছন্ন মণ্ডপের মধ্যে স্থাপিত। যেন কোন বন্য পশুকে রুদ্ধ করিয়া রাখিতে হইবে, এইভাবে মণ্ডপের চারিধার মজবুৎ লোহার গরাদে দিয়া ঘেরা। বিগ্রহটি কৃষ্ণবর্ণ ভীষণ গণেশ—স্বকীয় পিঞ্জরের দূরপ্রান্তে, অন্ধকারের মধ্যে বসিয়া আছেন।—একেবারে গরাদের ধারে না আসিলে স্পষ্ট দেখা যায় না। ইঁহার গজকর্ণ ও গজশুণ্ড স্বকীয় লম্বোদরের উপর ঝুলিয়া পড়িয়াছে, এবং ইঁহার প্রস্তরময় দেহটি, ঈষৎ ছাই-রঙ্গের ছিন্ন মলিন চীরবস্ত্রে আচ্ছাদিত। এই উত্তুঙ্গ ব্যোমমার্গস্থ কারাগৃহে বন্দীর ন্যায় আবদ্ধ থাকিয়াও, ইনি একাকী সেই সর্ব্বোপরিস্থ

মন্দিরের মধ্যে রাজত্ব করিতেছেন,—সেখান হইতে, দ্বিসহস্র বৎসর যাবৎ, বাদ্যধ্বনি ও বন্দনা-গান অবিরাম উচ্ছ্বসিত হইতেছে।

আমি এখন মনুষ্য ও পাখীর রাজ্য ছাড়াইয়া বহু ঊর্দ্ধে আসিয়াছি। নীচে কাকেরা ঘোরপাক দিয়া উড়িতেছে, চীলেরা উধাও হইয়া ঊর্দ্ধে উঠিয়াছে—মনে হইতেছে, যেন নিঃস্পন্দ হইয়া স্থিরভাবে আকাশে ঝুলিতেছে। এই মন্দিরস্থ গণপতি যে প্রদেশের উপর আধিপত্য করিতেছেন, ঐ প্রদেশটি পূজা-অর্চ্চনায় যেরূপ উন্মত্ত, সমস্ত ভূমণ্ডলে এরূপ আর কুত্রাপি দেখা যায় না। দেবালয়-সমূহ যেন বৃক্ষের ন্যায় চারি দিক হইতে গজাইয়া উঠিয়াছে। চারি দিকেই দেব-মন্দিররূপ লোহিত-কুসুম-রাশি যেন হঠাৎ বনভূমি হইতে বিকসিত হইয়া উঠিয়াছে। তাল নারিকেলের বন হইতে এত মন্দির উঠিয়াছে যে, এই উচ্চস্থান হইতে মনে হয়, যেন তৃণক্ষেত্রের মধ্যে, শৃগালের কতকগুলি আবাসগর্ত্ত রহিয়াছে।

ঐ অদূরে, ২০টা ত্রিকোণাকৃতি প্রকাণ্ড মন্দির-চূড়া—যেন কোন ছাঁউনিতে কতকগুলি তাঁবু একত্র সাজানো রহিয়াছে। উহা 'শ্রীরাগমে'র মন্দির। যতগুলি বিষ্ণুমন্দির আছে, তন্মধ্যে ঐটি সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। কাল ওখানে মন্দিরের উৎসব-উপলক্ষে, লোকেরা ঠাকুর লইয়া মহা-সমারোহে রাস্তায় বাহির হইবে—আমি দেখিতে যাইব।

শৈলের ঠিক তলদেশে একটি নগর অধিষ্ঠিত—এখান হইতে ঝুঁকিয়া যেন একেবারে উহার উপরে গিয়া পড়া যায়; মনে হয়, যেন কোন-একটা রং-চং-করা মানচিত্রে রাস্তাসমূহের জটিল নক্‌সা-জাল অঙ্কিত; বিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত মন্দিরের ছড়াছড়ি; কতকগুলি মন্দির খুব সাদা ধব্‌ধবে—তাহাতে একটু নীলের আভা স্ফুরিত হইতেছে। সূর্য্যকিরণদীপ্ত দর্পণের ন্যায় পুণ্যতীর্থ-পুষ্করিণীগুলি ঝিক্‌মিক্‌ করিতেছে, আর সেই পুষ্করিণী-জলে ব্রাহ্মণেরা প্রাতঃস্নান করিতেছে—মনে হয়, যেন কালো-কালো অসংখ্য মাছি ভাসিতেছে।

ম্যালাবার প্রদেশের ন্যায় এখানেও নারিকেলের রাজত্ব। তথাপি, অনিল-আন্দোলিত এই শাখা-পক্ষময় অরণ্যের মধ্যে—যাহা চতুর্দ্দিকে দিগন্তে গিয়া শেষ হইয়াছে—এক একটা বড়-বড় ফাঁক্, হল্‌দে দাগের মত দেখা যাইতেছে। এইগুলি শুষ্ক তৃণক্ষেত্র, বর্ষণের অভাবে দগ্ধ হইয়া গিয়াছে। এই শুষ্কতা ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতেছে, এবং আরও দূর প্রদেশে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে দুর্ভিক্ষ আরম্ভ হইয়াছে। তাঞ্জোরেও এই দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা উপস্থিত হইয়াছে।

সুতীব্র জীবন-উদ্যম-পূর্ণ বিচিত্র কোলাহল, এইখানে পৌঁছিবামাত্র সব একত্র মিশিয়া যাইতেছে। উৎসবময় নগরের প্রমোদ-কল্লোল, গরুর গাড়ীর চাকার শব্দ, রাস্তার ঢাক্ ঢোল ও শানাইয়ের বাদ্যনির্ঘোষ, চিরন্তন বায়সদিগের কা-কা-রব, চীলদিগের তীব্র চীৎকার, উপর্য্যুপরি-বিন্যস্ত মন্দিরসমূহের স্তবগান, তূরী ও শঙ্খধ্বনি,—এই সমস্ত শৈলদেহে প্রতিহত হইয়া অবিরাম প্রতিধ্বনিত হইতেছে।

শ্রীরাগমের অভিমুখে।

যে পান্থনিবাসে আমি আশ্রয় লইয়াছি, উহা পূর্ব্ববর্ণিত নিঃসঙ্গ শৈলটি হইতে প্রায় দেড় ক্রোশ, এবং শ্রীরাগমের বৃহৎ মন্দির হইতে তিন ক্রোশ দূরে। ইহা অরণ্যমধ্যস্থিত একটি তরুশূন্য রৌদ্রস্নাত মুক্ত পরিসরের মধ্যে অবস্থিত। এখানে একজাতীয় "লজ্জাবতী" লতা-গাছ আসিয়া তালবৃক্ষের স্থান অধিকার করিয়াছে। উহার পাতা এত অল্প ও এত সূক্ষ্ম যে, উহাতে কিছুমাত্র ছায়া হয় না। চারি দিকেই অবসাদক্লিষ্ট ঝোপ্‌ঝাড়, শুষ্ক দগ্ধ তৃণরাশি। শুষ্কতা-প্রযুক্ত এক্ষণে ভারতের সমস্ত উত্তর প্রদেশ, সমস্ত রাজস্থান মরণপথে অগ্রসর; সেই অসাধারণ শুষ্কতার একটু নমুনা যেন এই চিরআর্দ্র চিরশ্যামল দক্ষিণ দেশেও আসিয়া পড়িয়াছে।

আমার আবাস হইতে শ্রীরাগমে যাত্রা করিবার সময়, যে নগরটির

মাথার উপরে পূর্ব্ববর্ণিত শৈলটি ঝুঁকিয়া রহিয়াছে—সেই নগরটির মধ্য দিয়া আমাকে যাইতে হইল। তাহার পর, দুই ঘণ্টা কাল গাড়ীতে তাল প্রভৃতি তরুপুঞ্জের নীচে দিয়া কতকগুলি মন্দিরের নিকট উপনীত হইলাম। এই মন্দিরগুলি, বলিতে গেলে, আসল মন্দিরটির পূর্ব্বোদ্‌যোগমাত্র।

এই মন্দিরগুলি বিভিন্ন যুগের ও বিভিন্ন আকারের।—ইহারা যেন সাদাসিধা ও ক্ষোদিত বিবিধ প্রস্তরের উদ্দাম বিলাসলীলা। ভক্তগণ সাগ্রহে ও উৎসাহভরে এখানে আসিয়া ফুল ও ফুলের মালা রাখিয়া যাইতেছে। এ মালাগুলি কল্যকার উৎসবের জন্য;—অতি অপূর্ব্ব। প্রত্যেক প্রবেশ-পথে, প্রত্যেক তোরণপ্রকোষ্ঠে, বিষ্ণুদেবের (মহাদেবের?) ভীষণ ত্রিশূল-গুলি সাদা ও লাল রঙে টাট্‌কা রং করা হইয়াছে। এই সকল মনুষ্যদিগেরও ললাটে ত্রিশূলচিহ্ন অঙ্কিত। এখানকার কোনও কোনও তালবন বিষ্ণু-দেবের উদ্দেশে বিশেষরূপে উৎসর্গীকৃত, এবং বিষ্ণুদেবেরই নিজস্ব রঙে অনুলিপ্ত। স্তম্ভের ন্যায় মসৃণ প্রত্যেক বৃক্ষকাণ্ড সাদা ও লাল রঙে রঞ্জিত;—কোথায় যে মন্দিরের শেষ ও বনের আরম্ভ, তাহা বুঝা দুষ্কর। সমস্ত প্রদেশটিই যেন একটি বিশাল ভজনালয়।

অবশেষে আসল মন্দিরে আসিয়া পৌছিলাম। মন্দিরটি প্রকাণ্ড, এবং উহার সাতটি ঘের। প্রথম ঘেরটির পরিধি তিন ক্রোশ। উহার মধ্যে ২১টি মন্দির;—মন্দিরের চূড়াগুলি ৬০ ফুট পরিমাণ আকাশ ভেদ করিয়া ঊর্দ্ধে উঠিয়াছে।

মন্দিরগুলির প্রকাণ্ডতা ও প্রাচুর্য্যের মধ্যে যেন আত্মহারা হইয়া যাইতে হয়; উহাদের আত্যন্তিক বহির্বিকাশে অন্তরাত্মা যেন ক্লিষ্ট হইয়া পড়ে। উহাদের আকার এত বৃহৎ, এবং সূক্ষ্ম কারুকার্য্যও এত প্রচুর যে, তৎসমস্ত মনোমধ্যে ধারণা করা দুষ্কর। ভারতবর্ষ-সম্বন্ধে যাহা কিছু পাঠ করা গিয়া-ছিল, যাহা-কিছু জানি বলিয়া বিশ্বাস ছিল, পরীস্থানের নাট্যদৃশ্য ইতপূর্ব্বে

যাহা-কিছু দেখিয়াছিলাম, সমস্তই এই চমৎকারজনক দৃশ্যের নিকট হার মানে। ভারতবর্ষীয় পুষ্পের নিকট আমাদের ছোট ছোট সুন্দর ফুলগুলি যেরূপ,—এই সকল লাল পাথরের রাশি-রাশি প্রকাণ্ড স্তূপের নিকট, এই সকল বিংশতিবাহু বিংশতিমুখ দেবতাদিগের নিকট, আমাদের সাদাটে রঙ্গের ছোট-ছোট প্রস্তরে গঠিত, "সেণ্ট" ও "এঞ্জেলে" ভূষিত ক্যাথিড্রাল গির্জাগুলিও তদ্রূপ।

প্রথম ঘেরটি যার-পর-নাই বিরাট প্রকাণ্ড; উহা মন্দিরের অন্যান্য অংশ নির্ম্মিত হইবারও বহুপূর্ব্বে বিরচিত—কোনও দুর্জ্ঞেয় পুরাকালের সামিল বলিয়া মনে হয়। কোন এক যুগের লোকেরা "ব্যাবেল" মন্দিরের মত একটা প্রকাণ্ড মন্দির এখানে নির্ম্মাণ করিবে বলিয়া কল্পনা করিয়াছিল, কিন্তু মন্দিরটি সমাপ্ত না হইতে হইতেই, তাহাদের কল্পনা-বহ্নি বোধ হয় নির্ব্বাপিত হইয়া যায়। যে তোরণের মধ্য দিয়া এই ঘেরের ভিতরে প্রবেশ করিতে হয়, উহার খিলান ৪০ ফুটের উর্দ্ধে বিলম্বিত; এবং উহা ১৩।১৪ গজ পরিমাণ—দীর্ঘ অখণ্ড প্রস্তরসমূহে নির্ম্মিত। উহার শীর্ষদেশে একটি ত্রিকোণাকৃতি অসমাপ্ত চূড়ার তলদেশের নিদর্শন এখনও দৃষ্ট হয়। ঐ চূড়া সমাপ্ত হইলে, একটা ভীষণ প্রকাণ্ড অসম্ভব ব্যাপার হইয়া উঠিত, সন্দেহ নাই। সমস্তই তাম্রবৎ লোহিত বর্ণে রঞ্জিত। এবং উহার খোদাই-কার্য্যখচিত আলিসার উপর কতকগুলি পবিত্র টিয়া পাখী সপরিবারে বাস করে;—মনে হয়, যেন উহাতে উজ্জ্বল সবুজের কতকগুলি দাগ পড়িয়াছে।

তোরণগুলির অপর দিকে, মন্দিরের উদার প্রশস্ত বীথিসমূহ প্রসারিত; ক্রমপরম্পরাগত অন্যান্য ঘেরগুলির মধ্য দিয়া এই সমস্ত বীথিগুলি বরাবর চলিয়া গিয়াছে। উহাদের দুই ধারে ধর্ম্মসংক্রান্ত বিবিধ ইমারৎ, মেছো-পুষ্করিণী, বাজার, কুলুঙ্গীর মধ্যে আসীন বিবিধ দেবমূর্ত্তি, উচ্ছ্রিত-স্তম্ভ প্রস্তরগঠিত দ্বারহীন সেকেলে-ধরণের মণ্ডপগৃহ;—এই মণ্ডপগৃহের

থাম-গুলি ভারতীয় ধরণের—চতুর্মুখী ; খিলানপার্শ্বের 'ঠেস্'-স্বরূপ, থামের মাথাগুলি কতকগুলি বিকটাকার মূর্ত্তিতে গঠিত।

প্রত্যেক ঘেরের তোরণের মাথার উপর সেই একই রকম, বর্ণনাতীত, গুরুভার ত্রিকোণাকৃতি চূড়া—৬০ ফুট উচ্চ। ১৫ "থাক্" প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দেবমূর্ত্তি সারি সারি উপর্য্যুপরি স্থাপন করিয়া এই চূড়াটি নির্ম্মিত হইয়াছে। ত্রিদিববাসিগণ অযুত চক্ষু দিয়া উপর হইতে অবলোকন করিতেছেন—অযুত অঙ্গের বিবিধ ভঙ্গী করিতেছেন। কতকগুলি দেবতা স্বীয় দেহের উভয় পার্শ্ব হইতে বিংশতি বাহু হা্ত-পাখার মত প্রসারিত করিয়া আছেন। তাঁহাদের মাথায় মুকুট, হস্তে অসি, বিবিধ প্রকারের সাঙ্কেতিক পদার্থ, পদ্মফুল, অথবা নরমুণ্ড। তাঁহাদের ঘন পংক্তির মধ্যে নানা প্রকার কাল্পনিক পশুও পরস্পরের সহিত জড়াজড়ি ভাবে রহিয়াছে ;—অসম্ভব-বৃহৎ-পুচ্ছধারী ময়ূর অথবা পঞ্চশীর্ষ ভুজঙ্গ। তা ছাড়া, পাথরগুলা এমন ভাবে উৎকীর্ণ—এরূপ গভীর ভাবে খোদিত যে, প্রত্যেক প্রধান ও আনুষঙ্গিক মূর্ত্তি, সমগ্র মূর্ত্তিসমষ্টি হইতে যেন স্বতন্ত্র বলিয়া মনে হয় ;—যেন উহাদের প্রত্যেককে পৃথক করিয়া খুলিয়া লওয়া যাইতে পারে। এই সমস্ত মূর্ত্তি-সংঘাত আকাশ ভেদ করিয়া ঊর্দ্ধে উঠিয়াছে, এবং ক্রমশঃ সরু হইয়া, সুতীক্ষ্ণ শূলাগ্রের ন্যায়, সারি-সারি কতকগুলি বিন্দুমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছে। সমস্ত পদার্থ, সমস্ত জীবজন্তু, সমস্ত নগ্নমূর্ত্তি, সমস্ত পরিচ্ছদ, সমস্ত ভূষণ, একই অপরিবর্ত্তনীয় রঙ্গে রঞ্জিত। কত কত শতাব্দীর সহিত যুঝাযুঝি করিয়া এই রংটি স্বকীয় উজ্জ্বলতা এখনও পর্য্যন্ত রক্ষা করিয়াছে। এখানে রক্ত-লোহিত বর্ণেরই প্রাধান্য। দূর হইতে দেখিলে, প্রত্যেক চূড়াই লাল বলিয়া মনে হয়। কিন্তু কাছে আসিলে, অন্য রঙ্গেরও মিশ্রণ দৃষ্ট হয় ;—উহাতে সবুজ, সাদা ও সোনালি রঙ্গের মিশ্রণ রহিয়াছে।

দেবকার্য্যে নিযুক্ত যে সকল ব্রাহ্মণ অতীব শুদ্ধাচারী, তাঁহারাই মন্দিরের শেষ ঘেরটির মধ্যে সপরিবারে বাস করিবার অধিকারী। এই

শেষ তোরণের উভয় পার্শ্বে কতকগুলি জীবন্ত হস্তী প্রস্তর-চাতালের উপর শিকল দিয়া বাঁধা। এই বৃদ্ধ হস্তীগুলি অতীব পবিত্র বলিয়া পরিগণিত। এখন ইহারা আনন্দে বৃংহিতধ্বনি করিতেছে। ভক্তগণপ্রদত্ত তরুণ বৃক্ষের ডালপালা চর্ব্বণ করিতেছে। যেমন এক দিকে অসংখ্যমূর্ত্তি-সমন্বিত এই সমস্ত গুরুভার মন্দিরচূড়ার গম্ভীর মহিমা, তেমনই আবার চতুষ্পার্শ্বে কতকগুলা নিতান্ত গ্রাম্য জিনিস থাকায় বড়ই বিসদৃশ বলিয়া মনে হয়; কতকগুলি চালা-ঘর, কতকগুলা ছোট ছোট সেকেলে শকট, আদিমকালের শ্রমকার্য্যোপযোগী কতকগুলা সামগ্রী ইতস্ততঃ পড়িয়া রহিয়াছে। এই পুরাতন প্রাকারের পাদদেশে সমস্তই ভগ্ন চূর্ণ, সমস্তই বিলুপ্তমুখশ্রী। না জানি কোন্ সুদূর অতীতের নৃশংস বর্ব্বরতা এই প্রাকারটির উপর ধ্বংসের ছাপ রাখিয়া গিয়াছে।

সূর্য্য অস্তগত। দ্বারদেশ পার হইয়া ভিতরে প্রবেশ করিব—সে সময় আর নাই। গুরুভার প্রস্তর-খিলানের নিম্নে, মন্দিরের অফুরন্ত মণ্ডপগুলির মধ্যে সন্ধ্যা দেখা দিয়াছে। তবে যে আমি প্রবেশ করিতেছি, সে কেবল কল্যকার রথযাত্রার কথা মন্দিরপুরোহিতদিগের নিকট জিজ্ঞাসা করিবার নিমিত্ত। ক্ষুদ্র চলন্ত ছায়ামূর্ত্তিবৎ ঐ সকল পুরোহিত, স্তম্ভশ্রেণীর অসীমতার মধ্যে কোথায় যেন হারাইয়া গিয়াছে।

উহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া আমি যে কথা জানিতে পারিলাম, তাহা অতীব অস্পষ্ট ও পরস্পরবিরোধী। যথা,"—বিষ্ণুদেবের রথ-যাত্রা আজ রাত্রেই, কিংবা আরও বিলম্বে আরম্ভ হইবে। দিন ক্ষণের উপর, তিথি নক্ষত্রের উপর সমস্তই নির্ভর করিতেছে।" * * * আমি বেশ বুঝিতে পারিতেছি, উহাদের ইচ্ছা নয়, আমি এই উৎসবে যোগ দিই।

এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত বরাবর দেওয়ালের ধারে ধারে দুই-সারি অদ্ভুত বিচিত্র ব্যাঘ্র, এবং স্বাভাবিক অপেক্ষা বৃহৎ রোষদীপ্ত অশ্ববৃন্দ অঙ্কিত—এইরূপ একটি গভীরনিনাদী সরু পার্শ্ব-দালানের মধ্যে,

একজন অতীব সৌম্যমূর্ত্তি বৃদ্ধ পুরোহিতের নিকট আমি সমস্ত অবগত হইলাম। তিনি বলিলেন, এই উৎসব, নিশ্চয়ই কাল সূর্য্যোদয়সময়ে হইবে, এবং যদি এই উৎসব দেখিতে হয়, তাহা হইলে আমাকে এইখানেই রাত্রিযাপন করিতে হইবে।

আমি তৎক্ষণাৎ গাড়ীতে উঠিয়া ক্ষুৎপিপাসানিবৃত্তির জন্য আমার বাসায় গেলাম, এবং রাত্রি যাপন করিবার নিমিত্ত আবার মন্দিরে ফিরিয়া আসিলাম।

কিছু আহার করিয়া পান্থশালা হইতে যখন বাহির হইলাম, তখন মধুর চন্দ্রমা রজতকিরণ বর্ষণ করিতেছেন। এই কিরণচ্ছটা এত শুভ্র যে মনে হয় যেন, তৃণশূন্য নগ্ন ভূমির উপর—সুধালিপ্ত প্রাচীরের উপর—অজস্র তুষারপাত হইতেছে।

আমাদের শীতদেশীয় বৃক্ষের ন্যায়, চতুর্দ্দিকস্থ লজ্জাবতী লতাগাছের মধ্যে, চন্দ্রের পাণ্ডুর কিরণ সর্ব্বতোভাবে প্রবেশ করিয়াছে। কেন না, উহার শাখাপল্লব অতীব বিরল ও সূক্ষ্ম—প্রায় দৃষ্টির অগোচর। নরম পালকের থোপ্‌নার মত, উহাদের ছোট ছোট ফুলগুলিও যেন পড়ন্ত তুষারকণার অনুকরণ করিতেছে—ভূতলস্থ জমাট্ হিমকণার অনুকরণ করিতেছে। মনে হয় যেন, শীতপ্রধান উত্তর দেশের একটি প্রাকৃতিক দৃশ্য এই অত্যুষ্ণ দেশে পথ ভুলিয়া আসিয়া পড়িয়াছে। কিন্তু এখন আর আমি কিছুতেই বিস্মিত হই না—কেন না, এ দেশে যাহাই দেখি, তাহাই অপূর্ব্ব,—সমস্তই যেন বিচিত্র ছায়াচিত্রপরম্পরা,—সমস্তই পরিবর্ত্তনশীল মৃগতৃষ্ণিকা।

কিন্তু এই শীতের বিভ্রমটি ক্ষণিক; কেন না, এই শুষ্ক তৃণহীন ভূমিখণ্ড হইতে বাহির হইবামাত্র, বৃহৎ তালজাতীয় বৃক্ষের, বটবৃক্ষের, Bindweed বৃক্ষের পরিস্ফুট ছায়াতলে আসিয়া উপনীত হইলাম।

এই সময়ে উৎসব-দীপাবলীর আলোকচ্ছটায় নগরটি উদ্ভাসিত।

সমস্ত অবারিত মন্দিরগুলি, এমন কি, আলমারীর ন্যায় সংকীর্ণ ও ক্ষুদ্রতম মন্দিরগুলিও, ছোট ছোট প্রদীপে ও হল্‌দে ফুলের মালায় সুসজ্জিত। শ্রীরাগমের অভিমুখে আমার গাড়ী ছুটিয়া চলিয়াছে; একটার পর একটা কত দৃশ্যই আসিতেছে, কিন্তু সমস্তই পরস্পরের সহিত মিশিয়া যাইতেছে। * * *

আবার এই সময়েই "রামদানে"র মাস; সুতরাং মুসলমানের মধ্যেও এখন উৎসব আরম্ভ হইয়াছে! যে মস্‌জিদ্‌টির সম্মুখে তুরীভেরী বাদ্যের সহিত, নানা রঙ্গের অসংখ্য উষ্ণীষ চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে, সেই মস্‌জিদ্‌টি অসংখ্য প্রজ্বলিত দীপকাঠিতে আচ্ছন্ন। পরী-দৃশ্যটি আরও সম্পূর্ণ করিবার জন্যই যেন সাদা প্রাচীরগুলি, স্তম্ভশ্রেণী, লতাপাতা অঙ্কিত আরবী-ধরণের নক্সাদি, প্রজ্বলিত দীপাবলী,—সমস্তই একটি লাল রঙ্গের সূক্ষ্ম মলমল্‌ বস্ত্রখণ্ডে আচ্ছাদিত; তাহাতে, মস্‌জিদ্‌ একটু ঘোর-ঘোরভাব ধারণ করিয়াছে; উহাতে গোলাপী রঙ্গের ছায়া পড়িয়াছে; বোধ হইতেছে, যেন মস্‌জিদ্‌টি আরও একটু দূরে সরিয়া গিয়াছে; সমস্ত বস্তুর আকারে ও দূরত্বে যেন এক প্রকার অস্পষ্ট অনিশ্চিতভাব আসিয়া পড়িয়াছে; কেবল মস্‌জিদ্‌টির ঈষৎনীলাভ তুষারধবল "মিনার" চূড়াগুলি ও গম্বুজটি এই রঙ্গিন বস্ত্রের মধ্য হইতে মাথা বাহির করিয়া রহিয়াছে—উহাদের অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি ধ্বজাগ্রগুলি চন্দ্রালোকে ঝিক্‌মিক্‌ করিতেছে; এবং সমস্ত মিলিয়া এক সঙ্গে তারকা-খচিত আকাশের অভিমুখে সমুত্থিত হইয়াছে।

রথযাত্রার আয়োজন।

এই ত আমি শ্রীরাগমে আবার ফিরিয়া আসিলাম। এখন রাত্রি। সম্মুখে বৃহৎ বিষ্ণুমন্দিরের প্রাচীর। যেখানে কেবল ব্রাহ্মণেরা বাস করে—ইহা সেই গণ্ডির মধ্যে অধিষ্ঠিত, এবং আমি এক্ষণে বীথির সেই অংশে উপস্থিত হইয়াছি, যেখান হইতে সমস্ত মন্দিরটি প্রদক্ষিণ করা যায়।

এইখানে চন্দ্রালোকে রথটি অপেক্ষা করিতেছে। উহার উপর একপ্রকার সিংহাসন কিংবা একপ্রকার চূড়া-বিশিষ্ট মঞ্চ;—উহার গায়ে লাল রঙ্গের, পাণ্ডু রঙ্গের; রাংতা ঝক্‌মক্ করিতেছে; উহার ছাদ, মন্দির-চূড়ার অনুকরণে নির্ম্মিত ও বিবিধ অলঙ্কারে বিভূষিত। ঐ সমস্তের তলদেশে যে আসল রথটি অবস্থিত, উহা ব্রাহ্মণ-ভারতের ন্যায় পুরাতন;—উহা উৎকীর্ণ কাষ্ঠফলকসমূহের একটা গুরুভার প্রকাণ্ড স্তূপ;—এরূপ প্রকাণ্ড যে, মনে হয় না, উহাকে কেহ কখন নড়াইতে পারে। কিন্তু এই বিভূষিত স্তূপটি—এই ঝক্‌মকে অতি প্রকাণ্ড চূড়াসমন্বিত মঞ্চটি আজ বেশ শোভন-ভাবে স্থাপিত হইয়াছে। এখন উহাকে, রেশম ও রাংতায়-ঢাকা বাঁশের কাঠামে কাগজ-মোড়া খুব হাল্‌কা অথচ একটা জম্‌কালো জিনিষ বলিয়া মনে হইতেছে। রথের চারিধারে দলবদ্ধ হইয়া যে সকল শুক্ল-বেশধারী লোক দাঁড়াইয়া আছে, তাহাদের উপর চাঁদের কিরণ পড়িয়াছে:—এই সকল ভারতবাসী রাত্রিকালে প্রায়ই সূক্ষ্ম মল্‌মল্ বস্ত্রে স্বকীয় গাত্র ও মস্তক আবৃত করিয়া উপছায়ার ন্যায় বিচরণ করে; কিন্তু যেন চন্দ্রালোকও যথেষ্ট নহে, উহারা আবার মশাল লইয়া আসিয়াছে। কেন না, বিকট বিরাট কূর্ম্ম-সদৃশ এই রথটির গায়ে, বৎসরের মধ্যে একবার চাকা লাগাইবার জন্য উহাদিগকে আজ বিশেষরূপে খাটিতে হইবে। এই রথচক্র-গুলি, উচ্চতায় মনুষ্যের অর্দ্ধ-শরীর ছাড়াইয়া উঠে; এই চক্রগুলি পুরু কাষ্ঠফলকের দুই স্তবকে নির্ম্মিত; কাষ্ঠফলকগুলি উল্টা-উল্টিভাবে সন্নিবেশিত, এবং লোহার ক্রেক্ দিয়া আবদ্ধ। ইতিমধ্যেই উহারা রথ টানিবার রসি ভূমির উপর লম্বা করিয়া বিছাইয়া রাখিয়াছে; এই রসি ব্রহ্মার জঙ্ঘার ন্যায় স্থূল; বিরাট রথ-যন্ত্রটি নাড়াইবার জন্য তিন চারি শত উন্মত্ত লোক এই রসিতে আপনাদিগকে জুড়িয়া দিবে।

এই সময়ে মন্দিরটি—এই প্রস্তররাশির প্রকাণ্ড স্তূপটি একেবারেই জনশূন্য, নৈশ অন্ধকারে আচ্ছন্ন, শব্দগভীরতায় ভীষণ। জনপ্রাণী নাই,

কেবল পার্শ্ববর্ত্তী স্থানের কতকগুলি ব্রাহ্মণ উৎসব উপলক্ষে আসিয়া এইখানে আশ্রয় লইয়াছে। এবং সাদা চাদর মুড়ি দিয়া, সানের উপর সটান পড়িয়া মড়ার মত ঘুমাইতেছে। দূর-দূরান্তরে লম্বমান মিট্‌মিটে প্রদীপগুলা জ্যোৎস্নালোকের সহিত যেন পালা করিয়া, পুত্তলিকা-সমূহের ও স্তম্ভারণ্যের অনন্ততা আরও বর্দ্ধিত করিতেছে।

যে বীথি-পথটি দিয়া কাল প্রভাতে, রথযাত্রা আরম্ভ হইবে, উহা মন্দিরের ভীষণ দস্তুর প্রাকারের চারিধার দিয়া গিয়াছে। এই প্রশস্ত সরল পথটি,—প্রাকার ও ব্রাহ্মণদিগের পুরাতন গৃহ-সমূহের মধ্য দিয়া চলিয়াছে; ছোট ছোট থাম, বারাণ্ডা, বিকট-প্রস্তর-মূর্ত্তি-বিভূষিত সোপান-ধাপ— এই সকলের জটিল মিশ্রণে গৃহগুলি পূর্ণ। পথটি আজ সজীব হইয়া উঠিয়াছে; কেন না, আজ রাত্রে প্রায় কেহই নিদ্রা যাইবে না। এই সকল শুভ্র-বসন-ধারী লোকেরা দলে দলে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে; মনে হইতেছে যেন, চন্দ্রমার বিরাট ছায়া-মূর্ত্তিখানি উহারা প্রত্যেকে আংশিকভাবে নিজ নিজ দেহে প্রকটিত করিতেছে, এবং দেব ও পশুসমূহের "পিরামিড্"— সেই প্রকাণ্ড বিরাট গুরুভার বিষ্ণু-মন্দিরের কৃষ্ণবর্ণ চূড়াগুলি সর্ব্বোপরি রাজত্ব করিতেছে। উচ্চবর্ণের রমণীরা, বালিকারা, গৃহ হইতে বাহির হইতেছে; যে ভূমিখণ্ড চষিয়া—গভীর মাটি খুঁড়িয়া, বিষ্ণুদেবের রথ কাল যাত্রা করিবে, সেই পুণ্যভূমিকে চিত্রিত ও অলঙ্কৃত করিবার জন্য, উহারা স্ব স্ব গৃহের দ্বারদেশে আসিয়া চলা-ফেরা করিতেছে; সচরাচর উহারা প্রাতঃকালেই ঐ লাল মাটি বিচিত্র-রঙ্গের রেখায় অঙ্কিত করে; রথটি খুব প্রত্যূষেই যাত্রা করিবে। আজ রাত্রিটি কি পরিষ্কার! এই চাঁদের আলোয় দিনের মত সমস্ত স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। আর এই রমণীদিগের নিকট—এই বালিকাদিগের নিকট এত জুঁই ফুলের মালা রহিয়াছে—এত ফুলের হার তাহাদের কণ্ঠে ঝুলিতেছে যে, মনে হয়, যেন তাহারা সুগন্ধী ধূপাধার সঙ্গে করিয়া সর্ব্বত্র বিচরণ করিতেছে।

ঐ দেখ একজন নবযুবতী—গঠনটি বেশ ছিপ্‌ছিপে—জরির-কাজ-করা কালো রঙ্গের মলমল-শাড়ী পরিয়াছে; দেখিতে এমন সুশ্রী যে, না ইচ্ছা করিয়াও, তাহার সম্মুখে থমকিয়া দাঁড়াইতে হয়। যতবার সে মাটির দিকে নীচু হইতেছে—যতবার সে উঠিতেছে, ততবারই তাহার বাহু ও চরণদ্বয় হইতে নূপুর-বলয়ের মধুর ঝঙ্কার শ্রুত হইতেছে; যে সকল মনঃকল্পিত নক্‌সা সে ভূমির উপর আঁকিতেছে, তাহাতে তাহার অপূর্ব্ব কল্পনা-লীলার পরিচয় পাওয়া যায়। * * * আজিকার রাত্রে যে ব্যক্তি আমার প্রদর্শক, তাহার নাম "বেল্লনা"—উচ্চবর্ণের লোক; স্ত্রীলোকটির সহিত সে সাহস করিয়া কথা আরম্ভ করিয়া দিল, এবং আমার হইয়া সে জিজ্ঞাসা করিল—তাহার সাদা গুঁড়া আমাকে সে কিছু দিতে পারে কি না,—যদি দেয়, তাহা হইলে আমিও তাহার গৃহের সম্মুখস্থ ভূমিটি চিত্রিত করিয়া দিই। সে একটু মুচ্‌কি হাসিয়া সঙ্কোচের সহিত তাহার চূর্ণাধারটি আমার নিকট পাঠাইয়া দিল, সে স্বয়ং আমার হস্ত স্পর্শ করিতে কুণ্ঠিত হইল। আমার হস্ত হইতে কিরূপ নক্সা বাহির হয়, দেখিবার জন্য কুতূহলী হইয়া, এই সকল উপচ্ছায়াবৎ শুভ্রবসনধারী লোকেরা আমার চারি দিকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল।

বিষ্ণুর সাঙ্কেতিক চিহ্নটি আমি অতি পরিপাটীরূপে লাল মাটির উপর চিত্রিত করিলাম। তখন, বিস্ময় ও মমতা-সূচক অস্ফুট গুঞ্জনধ্বনি চারি দিক হইতে সমুত্থিত হইল। তখন সেই রূপসী ভারত-ললনা স্বয়ং সেই চূর্ণাধারটি আমার হস্ত হইতে ফিরিয়া লইল; এমন কি, তাহার কল্পিত নক্‌সা-রচনার কাজে আমাকে সহকারী করিতেও সম্মত হইল :—চারিধারে গোলাপ ফুলের ও তারার নক্‌সা কাটিয়া তাহাদের প্রত্যেকের মধ্যবিন্দুতে এক একটি Ibiscus ফুল বসাইয়া দিতে হইবে।—ইহাই তাহার নক্‌সার কল্পনা।

যাহা হউক, আমাকে সে যে স্পর্শ করিল তাহার পক্ষে ইহা একটা খুব

দুঃসাহসের কাজ সন্দেহ নাই। একটা অবিবেচনার কাজ করিয়া ফেলিয়াছে বলিয়া আমার সহিত জড়িত কোন কষ্টকর স্মৃতি তাহার মনে থাকিয়া না যায়, এবং তাহার নিকট হইতে অন্ততঃ শিষ্টাচার-সম্মত একটি বিদায়-দৃষ্টিও যাহাতে আমি লাভ করিতে পারি—এই হেতু, এই সময়ে আমি সরিয়া পড়াই শ্রেয় মনে করিলাম।

ও-দিকে উজ্জ্বলপ্রভ চূড়াসমন্বিত কনক-পত্র-মণ্ডিত বিষ্ণু-রথের চারিধারে, শুক্লবসনধারী লোকেরা দলে-দলে সম্মিলিত হইয়াছে। দ্বিপ্রহর রাত্রি আগ্রতপ্রায়। এইবার কি একটা রহস্য-ব্যাপার অনুষ্ঠিত হইবে, তাহারই আয়োজন হইতেছে। আমার তাহা দেখিবার অধিকার নাই। উৎসব-ঘণ্টা এবং জাঁক্‌জমক বর্দ্ধিত করিবার জন্য, বড় বড় সুলক্ষণ হস্তী ("তন্মধ্যে একটির বয়স শতবর্ষ) রথের নিকট আনা হইয়াছে; উহারা জরির সাজে সুসজ্জিত হইয়া চন্দ্রালোকে শরীর দুলাইতেছে—মনে হইতেছে যেন প্রকাণ্ড কতকগুলা কাদার ঢিবি। এই ঘোর নিশাকালেও বৃহৎ ছত্র সকল উদ্ঘাটিত হইয়াছে—ছত্রের প্রান্তদেশে তাঁবার চাকৃতি। অষ্টাদশ-বর্ষীয় এক দল ব্রাহ্মণযুবক ত্রিশূলের অনুকরণে-নির্ম্মিত ত্রিশাখা-বিশিষ্ট কতকগুলা মশাল লইয়া উপস্থিত হইল।

এইক্ষণে যে রহস্যব্যাপারটি অনুষ্ঠিত হইবে, তাহা এই:—ইতর-সাধারণের অদর্শনীয় সেই পবিত্র সাঙ্কেতিক বিগ্রহটিকে—শ্রীরাগমের সেই অনন্যসাধারণ প্রকৃত বিষ্ণুমূর্ত্তিটিকে আজ মন্দিরের পশ্চাদ্ভাগে—সর্ব্বাপেক্ষা পবিত্র যে স্থান—সেই নির্দ্দিষ্ট স্থানে লইয়া যাওয়া হইবে। এই বিগ্রহটি বিশুদ্ধ স্বর্ণে গঠিত,—পঞ্চশীর্ষ ভুজঙ্গের উপর শয়ান। রথের সম্মুখে একটি মঞ্চের উপর প্রাচীন ধরণের একটি মন্দিরাকার গৃহের অভ্যন্তরে স্থাপিত হইবে; গৃহটি এই উদ্দেশ্যেই বিশেষরূপে নির্ম্মিত; বিগ্রহের পাদদেশে দীপমালা জ্বলিবে, এবং পুরোহিতেরা সমস্ত রাত্রি জাগিয়া বসিয়া থাকিবে। তাহার পর কল্য প্রভাতে, যাত্রোৎসবের সময়ে, বিগ্রহটিকে ঐ মন্দির-গৃহের

একটা জন্‌লার ভিতর দিয়া বাহির করিয়া রথের উপর মন্দির-চূড়ার ন্যায় একটা চন্দ্রাতপের নীচে—বসান হইবে। বিগ্রহটি উহার ভিতর প্রচ্ছন্ন থাকিবে। পূর্ব্বোক্ত মন্দিরগৃহে ফিরিবার সময় যতবার এই শ্রীরাগমের বিষ্ণুমূর্ত্তি বীথিটি পার হইবে,—বলা বাহুল্য, ততবারই উহাকে কাপড় দিয়া খুব ঢাকিয়া লইয়া যাইতে হইবে। কাপড় দিয়া ঢাকা হউক, বা না হউক, সে একই কথা ; কেন না, যাহাতে অদীক্ষিত ব্যক্তিগণ বিগ্রহটিকে দেখিতে না পায়, এই জন্য উহাকে রাত্রিতেই গৃহান্তরিত করা হইয়া থাকে। কিন্তু এ বৎসর, পূর্ণিমা তিথিতে উৎসবের দিনটা পড়ায়, লোকেরা আমাকে দূরে সরিয়া যাইতে বলিল ; কারণ আমিই এখানে একমাত্র বিধর্ম্মী ; আর বাস্তবিকই রাত্রিটা খুব পরিষ্কার।

তখন আমি, অন্য ব্রাহ্মণ পথিকদিগের ন্যায়, মন্দিরের অভ্যন্তরেই (যে প্রস্তরময় গলির উপর দিয়া রথ চলিবে, তাহা হইতে অবশ্য বহুদূরে) শয়ন করিয়া সূর্য্যোদয়ের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। চারি দিক ঘোর নিস্তব্ধ ; সেখানকার শৈত্য প্রায় যেন গোরস্থানের ন্যায় স্থিতিশীল। মধ্যে মধ্যে, নিঃশব্দ পদক্ষেপে লোকেরা নগ্নপদে অতি সাবধানে মন্দিরের সানের উপর যাতায়াত করিতেছে। প্রার্থনা মন্ত্রাদির অস্ফুট গুঞ্জন শুনিতে শুনিতে মন্দিরের সেই শব্দযোনি খিলানমণ্ডলের নীচে আমি ঘুমাইয়া পড়িলাম। * * *

রথযাত্রা।

কা! কা!—একটা কাক উষাকে অভিবাদন করিয়া, এবং আমার চতুর্দ্দিকে নিদ্রিত গলিত-দ্রব্যভোজী শত-সহস্র কাককে প্রথম সঙ্কেত জ্ঞাপন করিয়া, আমাকে জাগাইয়া দিল। এই গভীর খিলান-মণ্ডলের প্রতিধ্বনি-কারী প্রস্তরারণ্য,—ঐ অশুভ বায়স-সঙ্গীতকে আরও যেন বাড়াইয়া তুলিল। এই বায়সেরা মন্দিরেরই কুলঙ্গিতে বাস করে। কেন না ইহারাও একটু পবিত্র বলিয়া পরিগণিত। এই প্রতিধ্বনির বিরাম নাই—চতুর্দ্দিকেই

ইহার পুনরাবৃত্তি হইতেছে। মন্দিরের প্রস্তরময় বীথিগুলির শেষ প্রান্ত পর্য্যন্ত এবং উচ্চ নিম্ন সমস্ত দালানে, আমার চতুর্দ্দিকে, পাকচক্রাকারে ঐ শব্দ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, অথচ কাকগুলা আমার নিকট অদৃশ্য। সমস্ত মন্দির এই কা-কা-রবে অণুরণিত। মন্দিরের পবিত্র ছায়াতলে যে সকল দেবতা বাস করেন—এই প্রাভাতিক অভ্যর্থনা-গীতি তাঁহাদের চিরপ্রাপ্য।

শেষ দীপটি পর্য্যন্ত নিভিয়া গিয়াছে। চন্দ্রমা আর কিরণ বর্ষণ করিতেছেন না। গতকল্য অপেক্ষা আজিকার রাত্রি এই মন্দিরে যেন আরও ঘনীভুত। শীঘ্রই প্রভাত হইবে—ইহা বুঝিবার জন্য বিহঙ্গ-সুলভ তীক্ষ্ণদৃষ্টির প্রয়োজন। মন্দিরের সান্‌গুলি গোরস্থানের ন্যায় আর্দ্র, সেই জন্য শৈত্য-বিভ্রম উপস্থিত হইতেছে। কিছুই দেখা যায় না। কদাচিৎ দুই একটি অপরিস্ফুট আলোকচ্ছটা,—(যে অন্ধকারে চতুর্দ্দিক আচ্ছন্ন, তাহা অপেক্ষা কিছু কম অন্ধকার, এইমাত্র)—দুই এইটি ক্ষীণ রশ্মি, খিলান-মণ্ডলের বায়ুরন্ধ্র দিয়া—ছিদ্র দিয়া প্রবেশ করিতেছে। পরে বিভিন্ন দিক্ হইতে, এই কা-কা-রবের সহিত পালোকের 'ফর্‌ফর্‌' শব্দ, ডানার 'ঝটাপট্' শব্দ সংযোজিত হইল। এইবার কৃষ্ণবর্ণের পিণ্ডগুলা উড়িয়া যাইবে।......

এইবার আলোক আসিয়াছে!.........এ দেশে আলোক যেমন শীঘ্র চলিয়া যায়, তেমনই আবার শীঘ্র আইসে,.........এত শীঘ্র যে নাট্যবিভ্রম বলিয়া মনে হয়। সুদূরপ্রসারিত স্তম্ভশ্রেণী পাণ্ডুর স্বচ্ছতায় অনুরঞ্জিত হইল ;—উহা এত স্বচ্ছ যে মনে হয়, বুঝি দূরস্থ বস্তুর ছায়াপাত হইয়াছে। ধূসরবর্ণ পাতলা রেশমী কাপড়ের অবগুণ্ঠনের মধ্য দিয়া, স্পর্শাতীত বিবিধ শোভন ছবির ছায়াবাজি যেন দৃষ্ট হইতেছে! মন্দির-দালানের বিচ্ছিন্ন প্রকাণ্ড বিভাগগুলি নেত্রসমক্ষে প্রকাশিত হইল ; দালানের চতুষ্পথগুলি শেষ প্রান্তে মিলাইয়া গেল। আমার পশ্চাদ্ভাগে, যেখানে গতকল্য সায়াহ্নে এক জন পুরোহিতের নিকট রথযাত্রা সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিয়াছিলাম, সেই রোষদীপ্ত-বিকটাকার-জন্তু-চিত্রময় বীথিটিতে সেই জন্তুদের ছায়া-ছবি

আবার দৃষ্টিপথে পতিত হইল। যে সকল নরমূর্ত্তি ভূতলে শুইয়া ছিল, সেই সকল মল্‌মল্‌-বস্ত্র-পরিহিত মূর্ত্তিগুলা খাড়া হইয়া উঠিল ;—বাহুদ্বয় প্রসারিত করিয়া, পশ্চাতে শরীর হেলাইয়া, যাতায়াত করিতে লাগিল। এই অবাস্তব, বর্ণহীন, ঐন্দ্রজালিক দৃশ্যের মধ্যে, এই শুভ্রবসন স্বচ্ছ মূর্ত্তিগুলির পদসঞ্চারশব্দ শুনিয়া আশ্চর্য্য হইতে হয়।

গতকল্য যে সানের উপর আমি নিদ্রা গিয়াছিলাম, তাহার নিকটে একটা পাথরের সিঁড়ি মন্দিরের ছাদ পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। একটু হাতড়াইয়া—ঠাণ্ডা দেওয়ালের উপর হাত বুলাইয়া সেই সিঁড়িটা খুঁজিয়া বাহির করিলাম।

ছাদের উপরে উঠিলাম। আমি এখন একাকী। গুরুভার, সমতল, খিলান-মণ্ডলের উপর এই ছাদ মরুভূমির ন্যায় ধূধূ করিতেছে। ইহা বড় বড় পাথরের চাক্‌লা দিয়া বাঁধানো। উহার দুই ধার প্রসারিত হইয়া দূরবর্ত্তী আকাশের জলদচূড়ায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। নিম্নতলের ন্যায় এখানেও ছায়াবাজির দৃশ্য ;—আর একটি পাণ্ডুবর্ণের চিত্রাবলী। এখানে একটু ফর্‌সা হইয়াছে, কিন্তু এখনও দিন হয় নাই। মন্দিরের অভ্যন্তরে যেরূপ সমস্তই অবাস্তব বলিয়া মনে হইতেছিল, এখানেও সেইরূপ মনে হইতেছে। এই বিস্তীর্ণ ময়দানের চতুর্দ্দিকে যে জলদ্‌-চূড়াগুলি দেখা যাইতেছে, উহা বাষ্পরাশি বই আর কিছুই নহে ;—রাত্রিকালে বাষ্পরাশি ঘনীভূত হইয়াছে মাত্র। এই বাষ্পরাশি ঈষৎ নীল রঙ্গের তূলা-ভরা গদীর ন্যায় এরূপ স্থূল যে মনে হয়, আর একটু নিকটে গেলেই উহাকে হস্তের দ্বারা স্পর্শ করা যাইতে পারে। সমস্ত ভূমি ঐ তুলারাশির মধ্যে এরূপ মগ্ন হইয়া আছে যে, কালো কালো কতকগুলা তালপক্ষপুঞ্জ অথবা তালপত্রগুচ্ছ উহার মধ্য হইতে শুধু মাথা বাহির করিয়া আছে। ঐগুলি উচ্চতম তালবৃক্ষের চূড়াদেশ।

'সমুদ্রাভ মণি'র ন্যায় রং—দিব্য শোভন-স্বচ্ছ—এক প্রকার হরিৎ আলোকে উদয়গিরির দিঙ্‌মণ্ডল পরিব্যাপ্ত হইল ; যেন তৈলের একটি

ফোঁটা নৈশ গগন-তটে মণ্ডলাকারে ক্রমশঃ বিস্তৃত হইল। ওদিকে অস্তাচলদিগন্তে একটি স্থূল লোহিত গোলক অবসাদে ম্রিয়মাণ—একটি পুরাতন গ্রহ শ্রান্তক্লান্ত—একটি প্রাচীন জীবলোক পৃথিবীর অতিসান্নিধ্য-বশতঃ ভয়ে আকুল;—ইনি অস্তমান চন্দ্রমা। এক্ষণে মন্দিরের সমস্ত কাকগুলা জাগ্রত হইয়া কা-কা রব করিতেছে। নিম্নদেশ হইতে, আকাশের সর্ব্বদিক হইতে, যেখান দিয়াই উহারা চলিয়া যাইতেছে—ঐ কা-কা-ধ্বনি সমুত্থিত হইতেছে। ... ...

প্রভাত হইয়াছে, সূর্য্যোদয়ের আর বড় বিলম্ব নাই। রথের চারিটা প্রকাণ্ড চাকা। টানিবার রসিগুলা ভূতলে বিছাইয়া রাখা হইয়াছে।

এইবার, পুরোহিত ব্রাহ্মণেরা যে মন্দিরাকৃতি ক্ষুদ্র গৃহে পূজা-অর্চ্চনা করিয়া রাত্রিযাপন করিয়াছিল, সেখান হইতে তাহারা নামিয়া আসিল। তাহাদের সম্মুখে, অষ্টাদশবর্ষীয় এক দল বালক, ত্রিশিখা-বিশিষ্ট মশাল ধরিয়া আছে; এবং বাহিরে আসিয়া, উদীয়মান দিবালোক যেমন-যেমন বর্দ্ধিত হইতেছে, অমনই উহারা এক একটা করিয়া মশাল নিভাইয়া দিতেছে। এই বৃদ্ধ পুরোহিতেরা, এক এক জন করিয়া ক্রমান্বয়ে সেই দূরস্থ কৃষ্ণবর্ণ সোপানের উচ্চতম ধাপে আসিয়া দণ্ডায়মান হইল; এবং ধাপ হইতে ধাপান্তরে ক্রমশঃ যেমন নামিতে লাগিল, ঐ গুহ্যধর্ম্মের সেবক শুভ্রকেশ মূর্ত্তিগুলি প্রভাতের তরুণ আলোকে আরও পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। যাহাতে স্বকীয় ইষ্টদেবের ত্রিশূল-চিহ্নটি আরও বিস্তৃতভাবে অঙ্কিত হইতে পারে, এই জন্য উহাদের ললাটের উপরিভাগ হইতে মস্তকের চূড়াদেশ পর্য্যন্ত মুণ্ডিত। পার্থিব বিষয় সম্বন্ধে এমনই উদাসীন যে, উহারা প্রায় উলঙ্গ—একখণ্ড বস্ত্রমাত্র উহাদের গায়ে জড়ানো রহিয়াছে। বর্ণভেদের চিহ্নস্বরূপ, শোণের শুভ্র সূক্ষ্ম সূত্রগুচ্ছ জটা পাকাইয়া তির্য্যক্‌ভাবে বক্ষের উপর লম্বমান। মন্দিরাকৃতি সেই শোভাগৃহের জান্‌লা ও রথ—এই উভয়ের মধ্যে রেশমী বস্ত্রে আচ্ছাদিত একটি পদ-সেতু—যাহার উপর

দিয়া কিছু পূর্ব্বে স্বর্ণবিগ্রহটিকে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল—সেই সেতুটি এক্ষণে উঠাইয়া লওয়া হইল। এইবার এক দল কৃষ্ণকায় বাদক এরূপ সজোরে বাদ্য বাজাইতে লাগিল যে, কর্ণ বধির হইয়া যায়, এবং এই বাদ্য এরূপ বন্য-ভীষণ ও শোকভারাক্রান্ত যে, শুনিলে শিহরিয়া উঠিতে হয়। এক দল লোক ঢাক পিটিতেছে; অপর এক দল, বিরাটাকার তূরীসমূহ সেই প্রচ্ছন্ন দেবতার অভিমুখে উত্তোলন করিয়া, উহাতে প্রাণপণে ফুৎকার করিয়া অমানুষিক ধ্বনি বাহির করিতেছে।

রথ সাজানো হইয়াছে। চৌঘুড়ি গাড়ীর অশ্বচতুষ্টয়ের অনুকরণ করিয়া চারিটা বড় বড় কাঠের ঘোড়া রথের সম্মুখভাগে স্থাপিত হইয়াছে। এই তেজীয়ান রোষদীপ্ত পক্ষিরাজ ঘোড়াগুলি পা ও ডানার আস্ফালনে আকাশকে তাড়না করিতেছে। লাল রেশমের দুর্ভেদ্য যবনিকার মধ্যে বিগ্রহটি প্রচ্ছন্ন। বিগ্রহ-সিংহাসনের চতুর্দ্দিকে 'ঝুলানো বাগিচা'র ন্যায় কতকগুলি পুষ্পিত কদলীবৃক্ষ স্থাপিত হইয়াছে। বস্ত্রের ঝালরে দুই তিন গজ লম্বা বৃহদাকার লোলক-সমূহ ঝুলিতেছে। স্বাভাবিক পুষ্প ও জরী-জড়ানো পুষ্পমালা দিয়া এই লোলকগুলি রচিত। এই চক্রবিশিষ্ট অট্টালিকার সকল তলার উপরেই কতকগুলি উলঙ্গপ্রায় বালক অধিষ্ঠিত; প্রথমে উহারা বস্ত্রসজ্জার মধ্যে—পুষ্প-গ্রথিত রেশম-মণ্ডিত মঞ্চতলে লুক্কায়িত ছিল, উহারাই বিগ্রহের পার্শ্বরক্ষী। যে সময়ে নিম্ন হইতে সেই ভীষণ তূর্য্যধ্বনি হইল, অমনই উহারাও উপর হইতে তূরীনাদ করিতে লাগিল।

এইবার সুলক্ষণ হস্তীদিগকে আনা হইল। উহারা নূতন জরীর পোষাক ও মুক্তাখচিত জরীর টুপি পাইবার জন্য, আপনা হইতেই হাঁটু গাড়িয়া বসিল। তাহার পর চলিয়া গিয়া চির-অভ্যস্তভাবে পুরোহিতদিগের পশ্চাতে দণ্ডায়মান হইল। সহযাত্রিগণ এখনও অচল স্থির। যুবকেরা, সম্মুখভাগে চারি সার বাঁধিয়া, ভূতলে-প্রসারিত চারিটা বিস্তীর্ণ রজ্জুর ধারে ধারে আসিয়া দাঁড়াইল।

বীথির যে ধারে মন্দিরের প্রাচীর—সেই ধারটি এক্ষণে তমসাচ্ছন্ন, পরিত্যক্ত, বিষাদময়। কিন্তু অপর ধারে ব্রাহ্মণদিগের আবাস-গৃহের সম্মুখে, জনতার বৃদ্ধি হইয়াছে—উহারা একদৃষ্টে রথের দিকে তাকাইয়া আছে। গবাক্ষ, গুরুভার-স্তম্ভ-সমন্বিত বারাণ্ডা, বিকটাকার পশুমূর্ত্তিভূষিত সোপানাবলী—শিশু ও বৃদ্ধগণ কর্ত্তৃক অধিকৃত। বিশেষতঃ সেখানে রমণীগণের জনতা। উহারা জরীর পাড়ওয়ালা শাড়ী পরিয়াছে, উহাদের গলায় পুষ্পমালা ঝুলিতেছে, অঙ্গে নানাবিধ অলঙ্কার ঝক্‌মক্ করিতেছে। উহাদের মধ্যে কেহ কেহ, পুরোহিতদিগের জন্য উপহারসামগ্রী আনিয়াছে; কেহ বা চূর্ণ-পাত্র হস্তে করিয়া, ভূতলস্থ নক্‌সা-চিত্র যেখানে যেখানে লুপ্ত হইয়াছে, সেই সকল নক্‌সা আবার তাড়াতাড়ি ফুটাইয়া তুলিতেছে। স্থানে স্থানে নূতন হল্‌দে ফুল বসাইয়া দিতেছে।

কিন্তু এই উষ্ণপ্রধান দেশে, নবভানু-উদ্ভাসিত মুক্ত আকাশ, মানবের সমৃদ্ধি-আড়ম্বর-প্রদর্শনের পক্ষে কি অনুপযোগী! যখন আমি মন্দিরের ছাদ হইতে নামিয়া আসিলাম, তখনও শেষাবশিষ্ট মশালগুলির দীপ্তি—স্খলিতপদ উষার অর্দ্ধস্ফুট আলোকে অক্ষুণ্ণ ছিল। তখনও সমস্তই কুহকময় বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছিল; কিন্তু এক্ষণে প্রভাতিক গগনের অভিনব অকলুষ স্বচ্ছতার মধ্যে সে কুহকটা ছুটিয়া গিয়াছে। এখন এই আকাশে আর কিছুই নাই, সর্ব্বত্র কেবলই অপরিসীম বিশুদ্ধতা—মনোহর হরিদ্বর্ণ—কি-এক প্রভাময় হরিদ্বর্ণ—পাণ্ডুর হরিদ্বর্ণ—যাহার নাম নাই—যাহা বর্ণনাতীত। ইহার পর, সমস্তই যেন হীনপ্রভ, ম্লানচ্ছবি। এক্ষণে মন্দির-প্রাচীরে জরাজীর্ণতা ও রক্তিম কুষ্ঠক্ষত-সকল প্রকাশ পাইতেছে। এখন যেন সমস্তই বেশী বেশী দেখা যাইতেছে। এ সমস্ত ঢাকিয়া রাখিতে হইলে, হয় নিশার আবরণ আবশ্যক, নয় দুর্নিরীক্ষ্য মধ্যাহ্ন-সূর্য্যের দীপ্ত-প্রভার প্রয়োজন। রথের বিলাস-সজ্জা নিতান্তই স্থূল ও শিশুচিত্তহারী। হস্তীদের পরিচ্ছদ জীর্ণ ও বহু-ব্যবহৃত। যুবতী ললনাদের মুখমণ্ডল ও

কণ্ঠদেশের বিশুদ্ধ তাম্র-আভা অক্ষুণ্ণ থাকিলেও, উহাদের দীনহীন মলিন চীরবস্ত্র প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। ব্রাহ্মণ-ভারতের বার্দ্ধক্য ও অবনতি, এই সব অমানুষিক স্মৃতি-মন্দিরের ধ্বংসদশা, উহাদের উৎসব-অনুষ্ঠানাদির ধূলিধূসর জীর্ণতা, এমন কি, এই মহাজাতির বর্ত্তমান হীনতা—সমস্তই, এই কুহকময় মুহূর্ত্তে, আমার নিকট অপ্রতিবিধেয় বলিয়া মনে হইতেছে। অতীতের লোক—অতীতের ধর্ম্ম—এই উভয়েরই যুগচক্র যেন ঘুরিয়া গিয়াছে, উহারা এক্ষণে শূন্যে বিলীন হইয়াছে।

তথাপি এখানে বিদেশীয় ভাবের গন্ধমাত্র নাই। এই প্রাচীন সাজ-সজ্জার মধ্যে, আধুনিক কালের ছোটখাটো খুঁটি নাটি সামগ্রী প্রবেশ করিয়া ইহকে বেসুরো বেখাপ্পা করিয়া তুলে নাই। বিধর্ম্মী একমাত্র আমিই এই উৎসব-অনুষ্ঠানে উপস্থিত।

ফলতঃ এই সূর্য্যই এ দেশের মহা-ঐন্দ্রজালিক। সূর্য্যই সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া সমস্ত পদার্থকে রূপান্তরিত করিয়া তুলে। সূর্য্যের এই আকস্মিক উদয়ে কি-জানি কি-একটু কারুণ্য-রস আছে, যাহা মন্দিরের সহিত—আজ যে দেবতার পূজা হইবে, সেই দেবতার সহিত—একতানে মিশিয়া যায়। দিগন্তে একটিমাত্র মেঘখণ্ড। ধরণীর ধূলিকণা যে আমরা—আমাদের দৃষ্টি হইতে এই মেঘখণ্ডটি সূর্য্যকে এখনও পর্য্যন্ত ঢাকিয়া রাখিয়াছে। একটি ঘোর তাম্রবর্ণ কটিবন্ধের উপরিভাগে সূর্য্যদেব অগ্নিশিখা বিকীর্ণ করিতেছেন। বিষ্ণু দেবের ত্রিশূলচিহ্নের ন্যায় তিনটি অগ্নিশিখা প্রদীপ্ত। ইহারই মধ্যে এই প্রকাণ্ড অট্টচূড়াগুলি সূর্য্যদেবের দৃষ্টিপথে পতিত হইয়াছে। এই রক্তিমাভ পাষাণস্তূপগুলি—গগনচুম্বী মন্দিরগুলি দেব-মাহাত্ম্যে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। এই সকল খোদিত প্রস্তরময় মূর্ত্তি-অরণ্যের মধ্যে, টিয়া-পাখীর শত সহস্র নীড় রহিয়াছে। বিবিধ মুখভঙ্গি ও অঙ্গভঙ্গি-বিশিষ্ট লোহিত মূর্ত্তির মধ্যে ও বাহু-জঙ্ঘার জটিল মিশ্রণের মধ্যে—সেই উচ্চ শূন্য দেশে উহারা ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতেছে—চীৎকার করিতেছে।

রথের শীর্ষদেশে, গিল্টিকরা কাজগুলি ঝক্ মক্ করিতেছে। এইবার যাত্রাকাল উপস্থিত। তূরীধ্বনি করিয়া যেই সঙ্কেত করা হইল, অমনই পেশী-স্ফীত-বাহু শতসহস্র লোক রজ্জুর নিকটে সার দিয়া দাঁড়াইল। সমস্ত যুবক-মণ্ডলী—এমন কি, উচ্চ শ্রেণীর ব্রাহ্মণেরাও ভক্তি ও প্রীতি-সহকারে এই সাধারণ কার্য্যে যোগ দিল। এইবার রথ টানিবার উদ্যোগ হইতেছে। লোকেরা রমণীসুলভ বিবিধ ভাবভঙ্গী প্রকাশ করিতেছে। এই সকল ভাবভঙ্গীর সহিত উহাদের নেত্রস্ফূর্ত্ত পৌরুষিক তেজ ও স্কন্ধদেশের বিশালতা মিশ খাইতেছে না। উহারা গুরুকেশভার উন্মোচন করিয়া, এবং বলয়ভূষিত বাহু উত্তোলন করিয়া, কেশে দৃঢ় গ্রন্থি বন্ধন করিল।

পুনর্ব্বার সঙ্কেত। ঢাক ঢোল সরোষে বাজিয়া উঠিল; সজোরে তূরীনাদ হইতে লাগিল; তাহার সহিত মানব-কণ্ঠ-নিঃসৃত মহা নিনাদ সম্মিলিত হইল; বাহুর পেশীসমূহ সঙ্কুচিত হইল;—রজ্জুগুলিতে টান পড়িল। কিন্তু এই বিরাটযন্ত্রটি একটুও নড়িল না। গতবর্ষের রথযাত্রার পর হইতে, উহা স্থূল মৃত্তিকার মধ্যে আবদ্ধ।

একজন প্রধানের অনুজ্ঞাক্রমে, আরও ভাল-করিয়া সমবেত চেষ্টা আরব্ধ হইল। এইবার বোধ হয়, আর কোন বাধা হইবে না। আরও অনেক লোক দৌড়িয়া আসিল; তুষার-শুভ্র-যজ্ঞসূত্রধারী বৃদ্ধগণ, এই কৃষ্ণ রজ্জুর সহিত তাহাদের শুভ্র সূত্র সম্মিলিত করিল; জনতা হইতে একটা মহা কোলাহল সমুত্থিত হইল; বাহু ও প্রকোষ্ঠের মাংসপেশী আরও দৃঢ় কঠিন হইয়া উঠিল। তবু কিছুই হইল না! রজ্জুগুলি সুদীর্ঘ মৃত ভুজঙ্গবৎ হতাশ হইয়া হস্ত হইতে ভূতলে স্খলিত হইল!

তথাপি উহারা বেশ জানে,—দেবতার রথ নিশ্চয়ই চলিবে। সহস্র বৎসর হইতে আবহমানকাল পর্য্যন্ত রথ অবাধে চলিয়াছে। যাহাদের বাহু এক্ষণে ধূলিসাৎ হইয়া গিয়াছে, যাহাদের আত্মা বহুকাল-যাবৎ দেহান্তর

প্রাপ্ত হইয়া, অথবা মায়াময় ব্যক্তিত্ব হইতে মুক্তিলাভ করিয়া, বিশ্বাত্মার মধ্যে বিলীন হইয়া গিয়াছে—সেই সব পূর্ব্বপুরুষের উদ্যম চেষ্টায় রথ এতকাল চলিয়াছে!

রথ অবশ্যই চলিবে। রথ চলিবে বলিয়া বৃদ্ধ পুরোহিতদিগের ধ্রুব বিশ্বাস। সেই জন্য তাহারা অবিচলিতভাবে প্রতীক্ষা করিতেছে। তাহাদের নেত্রে অন্যমনস্কভাব; তাহাদের আত্মা ইহারই মধ্যে যেন তপঃক্লিষ্ট দেহ হইতে বিমুক্ত। এমন কি, হস্তীরা পর্য্যন্ত জানে যে, রথ চলিবে; তাই তাহারাও অতীব প্রশান্তভাবে অপেক্ষা করিতেছে। তাহাদের মনে যে চিন্তাপ্রবাহ চলিতেছে, আমাদের নিকট তাহা দুরবগাহ হইলেও, এই সব চিন্তায় তাহাদের বৃহৎ মস্তিষ্ক পূর্ণ। তাহাদের মধ্যে যে হস্তী সর্ব্বজ্যেষ্ঠ, সে বিলক্ষণ জানে, রথ এক সময়ে চলিবেই চলিবে। কেন না, তাহারা তিন চারি পুরুষ হইতে বংশানুক্রমে, মানববাহুকে রজ্জু ধরিয়া রথ টানিতে দেখিয়াছে;—শত বৎসর হইতে এইরূপ দৃশ্য প্রত্যক্ষ করিয়াছে।

চলে এসো! আনো ফিক্‌না, আনো কপিকলের রসারসি; উঠাও চাড়া দিয়া! এক দল মুটিয়ার কাঁধে কতকগুলা কাঠের গুঁড়ি আসিয়া পৌঁছিল। একটা গুঁড়ির প্রান্তদেশে একটু ছিল্‌কা উঠাইয়া, আবদ্ধ চাকাটির নীচে সেই প্রান্তভাগ স্থাপিত হইল; এবং গুঁড়ির উচ্ছ্রিত অপর প্রান্তের উপর অশ্বারোহীর ধরণে দশ জন লোক বসিয়া ঝাঁকানি দিতে লাগিল; ও দিকে, কপিকলের রসারসি ও রজ্জুগুলিতেও এক সঙ্গে টান পড়িল। এইবার সেই পর্ব্বত-শিখর একটু নড়িল! একটা আনন্দের কোলাহল সমুত্থিত হইল;—রথ চলিল!

ভূমিতে চারিটা গভীর খাত খনন করিয়া রথচক্র ঘুরিতে ঘুরিতে চলিল। অক্ষদণ্ডের আর্ত্তনাদ, নিষ্পেষিত কাষ্ঠের কাতরধ্বনি, মনুষ্যকণ্ঠের কোলাহল ও পবিত্র তূরীর ঘোর নিনাদ যুগপৎ সমুত্থিত হইল। শিশু-সুলভ আনন্দ উচ্ছ্বসিত হইল; সমস্ত আস্য-বিবর উদ্‌ঘাটিত হইল; জয়ধ্বনি করিবার

জন্য সমস্ত অশুভ্র দন্তপাঁতি বিকশিত হইল; সমস্ত বাহু শূন্যদেশে উৎক্ষিপ্ত হইল; এই আনন্দে উন্মত্ত হইয়া লোকেরা রজ্জুতে টান্ দিতে বিস্মৃত হইল;—রথ থামিল! সমবেত আকর্ষণের প্রথম আবেগে, প্রায় ত্রিশপদ অগ্রসর হইয়াছিল, আবার রথ ভূমিতে আবদ্ধ হইয়া পড়িল। হস্তীরা রথের পিছনে পিছনে আসিতেছিল, রথ সহসা থামিয়া যাওয়ায়, উহাদের পরস্পরের মধ্যে ঠেকাঠেকি হইতে লাগিল। আবার সমস্ত গোড়া হইতে আরম্ভ হইল।

কিন্তু এবার শৃঙ্খলার সহিত আরম্ভ হইল। লোকেরা কপিকলের রসারসি, ফিক্‌না-আদি আনিতে গেল। এই অবসরে, রমণীগণ পুরোহিত-জনতার মধ্যে তাড়াতাড়ি আসিয়া—এমন কি, নিরীহ হস্তিগণের প্রায় পদপ্রান্তে আসিয়া উপস্থিত হইল। স্বর্ণবিগ্রহের গুরুভারে, ভূতলে যে রথ্যা খনিত হইয়াছে, তাহা চুম্বন করিবার জন্য এই সময়ে সৌর-কর, মন্দির-চূড়া হইতে নামিয়া আসিয়া জনতার উপর পতিত হইল, এবং উহাদিগকে নবতর শোভায় সজ্জিত করিল। সমস্ত নগ্ন বাহুতে ধাতব বলয় ঝক্‌মক্ করিতেছে; রমণীগণের মুখমণ্ডলে, শলাকা-বিদ্ধ নাসিকাপুটে, হীরামাণিক্যের ভূষণ ঝিক্‌মিক্ করিতেছে; অতিসূক্ষ্ম রঙ্গিন্ মল্‌মল্ অথবা জরীর পাড় বিশিষ্ট মল্‌মলের ভিতর দিয়া মীনাক্ষী শিবানীর বক্ষের ন্যায় নির্ম্মল কণ্ঠদেশ দেখা যাইতেছে।

এইবার এই বিরাট যন্ত্রটি দমকে-দমকে ভীষণ বেগে চলিতেছে। মধ্যে-মধ্যে থামিতেছে—আবার চলিতেছে।

এই গতিক্রিয়া ও পৈশিক বলের উদ্দাম বিলাস-লীলা দুই তিন ঘণ্টা ধরিয়া চলিবে। এই যাত্রাপথের পশ্চাদ্ভাগে, ভূমি যেন শত শত হলের দ্বারা কর্ষিত হইয়াছে—সেই ভূমি, যাহা প্রাতঃকালে যেন 'রোলার' যন্ত্রে সমীকৃত হইয়াছিল, এবং শুভ্র নক্‌সা-চিত্রে ও সুষমান্বিত কুসুমসমূহে বিভূষিত হইয়াছিল!

যেখানে বীথির বাঁক্ ফিরিয়াছে, এবং যে দিকে রথটিকেও ফিরাইতে

হইবে, সেই মন্দিরের কোণে রথ আসিয়া যখন অনেকক্ষণ থামিল, সেই অবসরে একজন প্রদর্শক ও একজন ব্রাহ্মণকে লইয়া, একটু নিস্তব্ধতা ও মুক্ত বায়ুর অন্বেষণে, সেই বৃহৎ দালানের জটিল অরণ্য—সেই সহস্র-স্তম্ভ মণ্ডপ-শালা—সেই তমসাচ্ছন্ন অসংখ্য পার্শ্ব-দালানের ঊর্দ্ধদেশে—মন্দিরের সেই বিশাল বিস্তীর্ণ ছাদের উপর আবার আরোহণ করিলাম। প্রভাতে যেরূপ মরুবৎ শূন্য দেখিয়াছিলাম, এখনও সেইরূপ। কিন্তু সপ্ত ঘটিকার সূর্য্যালোকে এই স্থানটি আরও ভগ্নপ্রায়—আরও দীনভাবাপন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হইল। রক্তিম-ধূসরবর্ণ;—জরা-জাত বলি-রেখার ন্যায় সর্ব্বত্র ফাট্ ধরিয়াছে—চীড় পড়িয়াছে। এখনও যথেষ্ট প্রভাত; সূর্য্য এখনও যথেষ্ট নিম্নে; এই ছাদের উপর এখনও বেশ বসা যায়; এমন কি, এই সব অমানুষী মন্দির-চূড়ার দীর্ঘ-প্রক্ষিপ্ত ছায়াতলে দিব্য আরামে শয়ন করাও যায়।

এই ছাদ,—'ষ্টেপ্' নামক রুসিয়ার অধিত্যকা ভূমির ন্যায় সুবিস্তীর্ণ। কিনারায়, বাদুড়ের ডানা-যুক্ত কতকগুলি পুরাতন ক্ষুদ্র দেবমূর্ত্তি স্বকীয় চরণযুগল দর্শন করিবার জন্যই যেন বহির্দ্দিকে ঝুঁকিয়া রহিয়াছে। ইহা ছাড়া আর কিছুই নাই;—সমস্তই সমতল। জীর্ণ শীর্ণ লুপ্ত-প্রলেপ দেবমূর্ত্তি-সমন্বিত মন্দিরচূড়া ভিন্ন এখানে আর কিছুই নাই;—চূড়াদিগের মধ্যে এক একটা বিস্তৃত ব্যবধান-পরিসর। সমতল ছাদ হইতে চূড়াগুলি দূরে-দূরে অবস্থিত;—মন্দিরের আয়তন এতই বৃহৎ।

ইতস্ততঃ, খাতের আকারে কতকগুলি বিচরণভূমি এখান হইতে দৃষ্টিগোচর হইতেছে। তমসাচ্ছন্ন মণ্ডপশালা-সমূহের মধ্যে—কোনরূপ প্রকারে যেন জায়গা বাঁচাইয়া এই বিচরণভূমি রচিত হইয়াছে। উহার মধ্যে যেটি সকলের মধ্যস্থলে অবস্থিত, তাহাতে বটবৃক্ষ রোপিত;—সেই বটবৃক্ষের সবুজ মাথাগুলি ছাদ পর্য্যন্ত উঠিয়াছে, এবং তাহাতে ফুল ধরিয়াছে। মন্দিরের যে স্থানটি সর্ব্বাপেক্ষা পবিত্র—সেই ভীষণ গুপ্তস্থান

—সেই দুরধিগম্য তমসাচ্ছন্ন রহস্য-স্থানকে বেষ্টন করিয়া এই বিচরণ-ভূমিটি অধিষ্ঠিত।

প্রাচীরের মাথায় যে সকল ছোট-ছোট দেবমূর্ত্তি ঝুঁকিয়া রহিয়াছে, তাহারা বোধ হয় এই রথযাত্রা দেখিবার জন্য সমুৎসুক। কিন্তু আমি এখান হইতে কিছুই দেখিতে পাইতেছি না—কিছুই শুনিতে পাইতেছি না। নিম্নদেশের চটুল গতিবিধি আমার নিকট প্রচ্ছন্ন; এমন কি নিকটস্থ নগর, গৃহ, মার্গ, সমস্তই আমার নিকট প্রচ্ছন্ন। আমার এই শূন্য মরুক্ষেত্র—সেই তাল-অরণ্যের সংলগ্ন বলিয়া মনে হইতেছে,—যাহার চূড়াগ্রভাগ দিগন্তকে নীলিম করিয়া তুলিয়াছে।

আমার এই দুর্নিরীক্ষ্য প্রজ্বলন্ত আকাশ-খণ্ডে, কাক চীল ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। মধ্যে মধ্যে সবুজ টিয়া-পাখীগুলা উড়িয়া যাইতেছে। সর্ব্বত্র টিকটিকি গিরগিটি বিচরণ করিতেছে। যে কাঠবিড়ালী ভারতের সমস্ত ভগ্ন মন্দির—সমস্ত বৃক্ষ আশ্রয় করিয়া থাকে—সেই কাঠবিড়ালিরা পরস্পরের অনুধাবন করিতেছে; পবিত্র প্রস্তররাশির মধ্যে খেলা করিয়া বেড়াইতেছে। এখানে নিঝুম নিস্তব্ধতা। এই দেবমূর্ত্তি-সমন্বিত অদ্ভুতাকৃতি চূড়াগুলি আমার মাথা ছাড়াইয়া উঠিয়াছে,—চূড়াগুলি এত অদ্ভুত ও এত উচ্চ যে, ইহা বাস্তুনির্ম্মাণ-পদ্ধতি-বিষয়ক য়ুরোপীয় সমস্ত সংস্কারের বিরুদ্ধ। এই চূড়াগুলি ব্যতীত এখানে এমন আর কিছুই নাই যাহা আমার চিত্তে ভীতি-সঞ্চার করিতে পারে। এই চূড়াগুলির নিস্তব্ধতা অনন্ত অসীম!

এই গগন-বিলম্বী মরুদেশের ছায়াতলে, শান্তি-আরামে এক ঘণ্টা কাল কাটিয়া গেল। আমার প্রদর্শক ও ব্রাহ্মণ এই কবোষ্ণ পাষাণের উপরেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।··· ··· ···

নিশ্চয়ই আমার দৃষ্টিবিভ্রম বা ঘূর্ণি-রোগ উপস্থিত!··· ···ঐ অদূরে একটা চূড়া··· ··· এইমাত্র নড়িয়া উঠিল··· ···ঐ যে আবার চলিতেছে!··· ···

মুহূর্ত্তকাল স্তম্ভিত হইলাম, পরে দৃষ্টিপাত করিয়া সমস্ত বুঝিলাম। ওহো! রথের চূড়াটিও মন্দির-চূড়ার অনুকরণে নির্ম্মিত। আমা হইতে বহুদূরে মন্দিরের সম্মুখ দিয়া রথটাকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে। আমি যেখানে আছি, তাহারই নীচে, আকৃষ্ট রজ্জু, উন্মত্ত জনতা, হস্তিবৃন্দ, সহযাত্রিদল—সমস্তই যেন একটা খাতের মধ্যে প্রচ্ছন্ন। যে সিংহাসনের উপর অদৃশ্য বিগ্রহটি আসীন, তাহারই উপরিস্থ চূড়াটিমাত্র আমি দেখিতে পাইতেছি। কোনও জয়ধ্বনি কিংবা কোনও বাদ্যনির্ঘোষ শুনা যাইতেছে না। বিষ্ণুরথের এই শেষ প্রতিবিম্ব আমার নেত্রবিম্বে পতিত হইল। ছাদের ধার দিয়া, প্রস্তররাশির মধ্যে, যেন একটি মন্দির-চূড়া একাকী নিস্তব্ধভাবে আপনা-আপনি চলিতেছে।

মাদুরায় ব্রাহ্মণদিগের গৃহে।

মাদুরা নগর পূর্ব্বে এক জন বিলাস-আড়ম্বর-প্রিয় রাজার রাজধানী ছিল। এখানে হরপার্ব্বতীর উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত একটি মন্দির আছে। "মীনাক্ষী" পার্ব্বতী শিবের গৃহিণী। মন্দিরটি আমাদের "লূভ্র্" প্রাসাদ অপেক্ষাও বৃহৎ, শিল্পকর্ম্মে ও খোদাই-কাজে অধিকতর ভূষিত, এবং তাহারই মত বিবিধ আশ্চর্য্য সামগ্রীতে পরিপূর্ণ।

দয়াশীল ত্রিবঙ্কুর মহারাজের প্রভাবে ও অনুগ্রহে আমি মন্দিরের অনেকটা অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারিব, অন্তর্ভৌম কক্ষের মধ্যে নামিতে পারিব, দেবীর ঐশ্বর্য্যবিভব ও সাজসজ্জা দেখিতে পাইব, সন্দেহ নাই।

নগরটি অতিমাত্র ভারতীয়-লক্ষণাক্রান্ত হইলেও, বৈদেশিকদিগের প্রতি সাদর-আহ্বান-বিতরণে বিমুখ নহে। মন্দিরদর্শনের জন্য অনেক বৈদেশিক এখানে আসিয়া থাকে। অন্যান্য পার্শ্ববর্ত্তী রাজ্যে, মন্দিরগুলিতে বৈদেশিকের প্রবেশ যেরূপ কঠোরভাবে নিষিদ্ধ, এখানে সেরূপ নহে। মাদুরায় গিয়া যাহাতে আমি তত্রত্য গৃহস্থ পরিবারবর্গের মধ্যে সাদরে গৃহীত হই, এই

উদ্দেশে কতকগুলি অনুরোধপত্র ত্রিবঙ্কুরে প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। প্রথমেই আমি ব্রাহ্মণদিগের গৃহে উপস্থিত হইলাম। ভারতে, ব্রাহ্মণেরাই সর্ব্বাপেক্ষা বিশিষ্ট ও পরিশুদ্ধ।

গুরুভার, পিণ্ডাকৃতি, উচ্চ-"ভিত"-বিশিষ্ট একটি ক্ষুদ্র একতালা গৃহ। এই মাদুরা নগরে ব্রাহ্মণদিগের যত গৃহ, সমস্তই এই আদর্শের। একটা বারাণ্ডা;—বারাণ্ডার থামের মাথায় বিকটাকার জীবজন্তুর মস্তক। একটা পাথরের সিঁড়ি; সেই সিঁড়ি দিয়া গৃহের অভ্যর্থনাশালায় যাওয়া যায়। সেখান হইতে লতাপাতার কাজ-করা অতীব ক্ষুদ্র তিনটি গবাক্ষ দিয়া নীচের রাস্তা দেখিতে পাওয়া যায়। এই ঘরে গৃহস্বামী আমাকে অভ্যর্থনা করিলেন। তিনি পলিতকেশ বৃদ্ধ; চারিটি যুবক তাঁহাকে ঘিরিয়া আছে;—ইহারা তাঁহার পুত্র। ইহাদের দীর্ঘ নেত্র নীলকৃষ্ণ অঞ্জনরেখায় অঙ্কিত। পরিচ্ছদের মধ্যে একটা ধুতি কোমরে জড়ানো; কিন্তু ইহাতে করিয়া তাহাদের উদাত্তভাব, বিশিষ্টতা ও কুলগৌরবের কিছুমাত্র লাঘব হয় নাই। ঘরটি চুন্‌কাম-করা, খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, কি একটা সুগন্ধি ধূপে আমোদিত; সাজসজ্জাও নিতান্ত অশোভন নহে। আরাম-কেদারাগুলি খোদিত আব্লুস্ কাঠের। দেয়ালের উপর, গিল্টিকরা "ফ্রেমে" পুরাতন জলরঙের ছবি সংরক্ষিত;—ছবিগুলি বিষ্ণুর অবতার-মূর্ত্তি। কুট্টিমতলে সুন্দর ভারতীয় গালিচা, এবং ফুলকাটা কাপড়ে আচ্ছাদিত গদী। আমার আগমনে ইহারা একটু বিস্মিত হইল; কেন না, বৈদেশিকেরা এখানে বড় একটা আইসে না; তথাপি, ভদ্রতা ও আতিথ্য প্রদর্শন পূর্ব্বক গৃহের সমস্ত অংশ আমাকে দেখাইতে চাহিল। প্রথমে একটি অন্তঃপ্রাঙ্গণ—প্রাচীরবেষ্টিত ও বিষাদময়। একটা "মর্কুটে মারা" বটগাছের ছায়ায় মেষ ও ছাগল বিশ্রাম করিতেছে। তাহার পর, গৃহের ছাদ;—ছাদে পায়রারা বাস করে ও কাকেরা আসিয়া বসে। সেখান হইতে, মাদুরার প্রাচীন রাজাদিগের প্রাসাদ দেখা যায়;—উহা সপ্তদশ শতাব্দীর

হিন্দু-আরব-ধরণের বহুব্যয়সাধ্য প্রকাণ্ড স্মৃতিসামগ্রী ; তা ছাড়া পল্লী-প্রদেশের দূরস্থ তালকুঞ্জ পর্য্যন্ত মন্দিরাদি-সমেত সমস্ত নগরটি দৃষ্টিপথে পতিত হয়। লাল রঙ্গের প্রকাণ্ড মন্দিরচূড়াগুলি চারি দিক হইতে বিহঙ্গ-সঙ্কুল গগনমণ্ডলে সমুত্থিত। অবশেষে উহারা আমাকে গৃহের পুস্তকাগার দেখাইল,—উহা দার্শনিক গ্রন্থে ও ধর্ম্মগ্রন্থে পরিপূর্ণ। ইহাতে সূচিত হইতেছে, আমার অভ্যর্থনাকারিগণ, অতীব বিশিষ্ট ও অতীব উচ্চ-অঙ্গের জ্ঞানানুশীলনে নিরত। উহাদিগকে নগ্নকায় দেখিয়া প্রথমে সহসা যেরূপ মনে হয়, তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। প্রস্থান করিবার পূর্ব্বে আবার সেই অভ্যর্থনাশালায় আমাকে আসিতে হইল। সেখানে একটুখানি বসিলাম। সেই যুবকদিগের মধ্যে এক জন একটা দীর্ঘ গিল্টি-করা সেতার লইয়া মৃদুস্বরে দুই চারিটা সুমধুর গৎ বাজাইল। মহিলাদিগকে যে উহারা আমার সম্মুখে আনিবে না,—ইহা জানা কথা। কিন্তু বিদায়গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে, তিন চারি বৎসর বয়স্কা ছোট দুইটি বালিকাকে আমার সম্মুখে আনিয়া উপস্থিত করিল। বালিকা দুটি অতি শিষ্ট শান্তভাবে আমার নিকটে আসিল,আদপে ভয় করিল না। উহাদের পরিচ্ছদের মধ্যে,—শিকলে ঝোলানো, হৃৎপিণ্ডাকৃতি একটা সোনার তক্তি—এবং সেই শিকলটা কটিদেশে বেষ্টিত। তক্তিটা যথাযোগ্যরূপে নীচে নামিয়া আসিয়াছে। উহাদের হস্তপদ—গুরুভার বলয় নূপুরে ভূষিত। বালিকা দুটি যেন সৌন্দর্য্যের প্রতিমা ;—অনিন্দ্য-গঠন মনোমোহিনী যেন দুইটি ক্ষুদ্র দেবীমূর্ত্তি। রং উজ্জ্বল পিত্তলের ন্যায় ; দেহ সুনম্য ও মাংসল ; হাসি-হাসি সুগম্ভীর কালো চোখ,—পক্ষ্মরাজি অতুলনীয় ; চারিধারে কজ্জলের রেখা।

দয়াশীল নর্ত্তকী—বালামণি।

মাদুরা নগরে একটি নর্ত্তকী আছে,—সে যেমন রূপলাবণ্যের জন্য—সেইরূপ বদান্যতার জন্যও প্রখ্যাত। এই শ্রেণীর রমণীদিগের চিরপ্রথা-

অনুসারে, বালামণি প্রথমে একজন নবাবের রক্ষিতা ছিল। নবাব মৃত্যু-কালে, তাঁহার সমস্ত হীরা জহরৎ তাহাকে দিয়া যান। তাই পুত্তলীর ন্যায় তাহার সর্ব্বাঙ্গ মণিরত্নে বিভূষিত। এখন সে প্রভূত ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী ও স্বাধীনা। কিন্তু তাহার ধন ঐশ্বর্য্য শিল্পকলার অনুশীলনে ও দানধর্ম্মেই ব্যয়িত হইয়া থাকে। বালামণি একটা নাট্যশালা স্থাপন করিয়াছে;—আমাদের সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে, ভারতে যে সব নাটক রচিত হয়, সেই নাটকগুলি, নিজ মনোহর অভিনয়ের দ্বারা পুনর্জীবিত করিয়া তুলিয়াছে।

আমি আজ রাত্রে, সমুজ্জ্বল জ্যোৎস্নালোকে, তালীবনের মধ্য দিয়া,সেই দয়াশীলা নর্ত্তকী বালামণির নাট্যালয়-অভিমুখে যাত্রা করিলাম। তাল-তরুর শাখাগুলি, সুদীর্ঘ ভঙ্গুর বেতসের ন্যায় অবনত হইয়া আছে, এবং সেই শাখাপ্রান্তবর্ত্তী কৃষ্ণকায় পত্রপুঞ্জ, মৃদুল অনিলে সঞ্চালিত হইয়া, পরস্পরের সহিত সংঘর্ষিত হইতেছে।

আমি যখন আমার নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপনীত হইলাম, তখন বালামণি রঙ্গপীঠে অধিষ্ঠিত;—চিত্রিত পুষ্পোদ্যানের পশ্চাদ্ভাগে, পরী-প্রাসাদের ক্ষুদ্র একটি স্বর্ণময় চূড়াগৃহের মধ্যে বন্দিভাবে অবস্থিত হইয়া, গবাক্ষের সম্মুখে বসিয়া, বীণা বাজাইতে বাজাইতে গান গাহিতেছিল। বালামণি একজন রাজকুমারী, পার্শ্ববর্ত্তী রাজ্যের কোনও রাজার সহিত তাহার বিবাহের সম্বন্ধ হয়, এবং সেই রাজা তাহার উদ্দেশে এখনই আসিয়া উপস্থিত হইবে। প্রথম আরম্ভ হইতেই, তাহার বীণা-বাদনে, তাহার কণ্ঠস্বরে, শ্রোতৃবর্গের চিত্ত বিমোহিত। পুরাতন উৎকীর্ণ চিত্রাদি হইতে তাহার সাজসজ্জা অনুকৃত হইয়াছে। তাহার পার্শ্বমুখের ছায়া-ছবিটি অপূর্ব্ব-সুন্দর। সেই গায়িকার প্রত্যেক অঙ্গভঙ্গিতে, তাহার ভূষণ-সমাচ্ছন্ন অঙ্গের হীরক মাণিক্যগুলি ঝিক্ মিক্ করিয়া জ্বলিতেছে।

অন্য নাট্য সজ্জাগুলিতে, এমন একটি অবোধ শিশুসুলভ সারল্য প্রকটিত যে, দেখিলে একটু আমোদ বোধ হয়; এবং সেই সঙ্গে, বিদেশ-

ভূমির ভাব, দূরত্বের ভাব, মানস-পটে অঙ্কিত হয়। নাট্যশালাটি অতীব বিশাল; উহাতে সহস্রাধিক লোক ধরিতে পারে; কিন্তু উহার গঠনে কোন প্রকার মার্জ্জিতরুচির পরিচয় পাওয়া যায় না;—মন্দিরের ধারে, ধর্ম্ম-মহোৎসবের সময়ে যেরূপ গৃহ এখানে সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, সেইরূপ কাঠ দর্ম্মা বাঁশ দিয়া হাল্‌কা ধরণে নির্ম্মিত। রঙ্গপীঠের দুই পার্শ্বে, পুরাতন রাজবংশীয় রাজকুমারীদিগের বসিবার কক্ষ। কিন্তু, আজ তাঁহারা আসিবেন না, আজ তাঁহাদের "আসিবার দিন" নহে। আর সর্ব্বত্রই, নাট্যশালার সমস্ত আসনগুলিই প্রেক্ষকমণ্ডলীর দ্বারা অলঙ্কৃত। ঘরের ভিতরটা খুব গরম, এবং ফুলের গন্ধে আমোদিত।

সেই লুপ্ত ভাষা—যে ভাষা হিন্দু ইউরোপীয় ভাষাসমূহের মাতৃস্থানীয়া,—সেই সংস্কৃত ভাষায় বালামণি গান গাহিতেছে, এবং সেই ঘোর পুরাকালে নাটকটি যে ভাবে লিখিত হইয়াছিল, ঠিক সেই ভাবে সমস্তটা অভিনীত হইবে; শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে, আমি ছাড়া আর সকলেরই এতটুকু পাণ্ডিত্য আছে যে, উহা শুনিয়া বুঝিতে পারে।

আখ্যানবস্তুটি মোটামুটি এইরূপ; আজ রাত্রে, বালামণি যাহার ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে, সেই রাজকুমারীকে, সাত জন রাজকুমার—সকলেই সহোদর ভ্রাতা—এক সঙ্গে ভালবাসে। পাছে কোন ভ্রাতার মনে কষ্ট হয়, এই জন্য তাহারা সকলেই প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, কেহই উহাকে বিবাহ করিবে না; এমন কি, তাহাদের পিতা, যে ভ্রাতার জন্য এই বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিয়াছেন, সেও উহাকে বিবাহ করিবে না, এইরূপ শপথ করিয়াছে। প্রথম প্রথম, তাহারা সকলেই সুখ স্বচ্ছন্দে কাল যাপন করিতেছিল, রাজকুমারীর বন্ধুত্বে ও তাহার স্মিত-হাস্যেই তাহারা সন্তুষ্ট ছিল। কিন্তু একদিন যখন তাহারা মৃগয়ার্থ কোন বনে গমন করে, কতকগুলা দুরাত্মা দৈত্য, শুদ্ধসত্ত্ব শুভ্রকেশ মুনির রূপ ধারণ করিয়া তাহাদিগকে ছলিতে আসিল। তাহাদের প্রত্যেকের মনে কামজ লালসা উদ্বোধিত করিয়া

দিয়া, এবং নানা প্রকার মিথ্যা কথা রটনা করিয়া, পরস্পরের বিরুদ্ধে পরস্পরকে উত্তেজিত করিয়া দিল। তখনই বিদ্বেষবুদ্ধি ও দুর্ভাগ্য প্রাসাদের মধ্যে প্রবেশ করিল। কিন্তু কোনও দুষ্কর্ম্ম আচরিত হইবার পূর্ব্বেই, দেবযোনিরা এ দিকে অনেক যুঝাযুঝির পর, তাহাদের মনকে আবার অধিকার করিল। তখন আবার রাজকুমারগণ স্বকীয় চিত্তস্থৈর্য্য লাভ করিল, এবং সেই রাজকুমারীর সহিত ভগিনী-সম্বন্ধ পাতাইয়া, কোনপ্রকারে কালযাপন করিতে লাগিল। পরে বার্দ্ধক্য উপস্থিত হইলে, যখন তাহাদের সমস্ত বাসনা নির্ব্বাপিত হইল, তখন তাহারা কর্ত্তব্যপালনের আত্মপ্রসাদ অনুভব করিতে লাগিল; এবং তাহাদের গৃহ আবার সুখশান্তিতে পূর্ণ হইল। প্রত্যেক অঙ্কের শেষে, কিছু কালের জন্য যে সময়ে বিরাম হয়, সেই বিরামকালে, আমি বালামণির নেপথ্য-কক্ষে গমন করিলাম, আমি তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিব—এ সংবাদ পূর্ব্বেই তাহাকে দেওয়া হইয়াছিল। আমি তাহার রূপলাবণ্যের প্রশংসা করিলাম, এবং বলিলাম, তাহার গৃহীত রাজকুমারীর ভূমিকাটি বিশুদ্ধরূপে অভিনীত হইয়াছে। তাহার ক্ষুদ্র কক্ষটি নিতান্ত সাদাসিধা ধরণের—ঘরের মেজে সপ্ দিয়া মোড়া। তাহার ইতস্ততঃ-বিকীর্ণ হীরক-অলঙ্কার ও অঙ্গভূষণাদি দেখিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়,—মনে হয়, চাষার কুটীরে কোনও ঔপন্যাসিক দৈত্য আসিয়া এই সকল বিচিত্র উপহার বুঝি বর্ষণ করিয়াছে। কক্ষদ্বারে আসিবামাত্রই, তাহার ভৃত্যেরা, চিরপ্রথানুসারে, জরি-বিজড়িত একটি স্থূল ফুলের মালা সহজ-শোভন শিষ্টতা-সহকারে, আমার গলায় পরাইয়া দিল। বালামণি মন খুলিয়া আমার নিকট বলিল,—পুরাতন উৎকৃষ্ট নাটকগুলি যাহাতে পুনরুজ্জীবিত হয়, সেই উদ্দেশ্যেই এই নাট্যশালা স্থাপিত হইয়াছে। আমি যখন বলিলাম, আমার ফরাসী বন্ধুবর্গের নিকট আমি তাহার কথা বলিব, তখন সে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিল।

তাহার পরদিন, কোন একটা সাধারণ স্থানে, তাহার সহিত পুনর্ব্বার

আমার সাক্ষাৎ হইল—মান্দ্রাজ-রেলপথের ষ্টেশনে ;—দুঃখের বিষয়, এই রেল-পথ মাদুরা পর্য্যন্ত গিয়াছে। বালামণির সঙ্গে দুই জন ভৃত্য। মফস্বলের ভূসম্পত্তি পরিদর্শন করিতে যাইবে, তাই ট্রেণ ধরিতে এখানে আসিয়াছে। এখানকার দীন-বসনা জনতার মধ্যে বালামণিকে পথহারা পরীর মত দেখাইতেছিল। দূর হইতে মনে হইতেছিল, যেন একটি তারা ঝিক্‌মিক্ করিতেছে। তাহার কাণে হীরক, তাহার কণ্ঠে হীরক, তাহার বক্ষে হীরক। কর-প্রকোষ্ঠ হইতে স্কন্ধদেশ পর্য্যন্ত—তাহার সমস্ত নগ্ন-বাহুতে হীরক-অলঙ্কার। তাহার চারু ক্ষুদ্র নাসিকা হইতে একটি নথ ওষ্ঠ পর্য্যন্ত ঝুলিতেছে ;—তাহাতে যে হীরকগুলি রহিয়াছে, তাহা আরও দুর্লভ ও উজ্জ্বল। তাহার জরির-পাড়ওয়ালা হল্‌দে শাড়ী ও তাহার রেশ্‌মি কাঁচুলি --এই উভয়ের মাঝখানে, গাত্রের কিয়দংশ দেখা যাইতেছে —আর এই গাত্র সুন্দর ধাতু-স্তম্ভের ন্যায় সুচিক্কণ—সেই সঙ্গে স্তনযুগলের অকলুষিত তলদেশও অল্প অল্প দেখা যাইতেছে ; আর একটু ঊর্দ্ধে, আঁটা সাঁটা পাতলা কাপড়ের মধ্য দিয়া, সলজ্জ স্তনযুগলেরও একটু আভাস পাওয়া যাইতেছে। (সায়ংকালে আমাদের রমণীরা বক্ষের ঊর্দ্ধভাগটি খুলিয়া রাখে ; কিন্তু নিম্নভাগটি খুলিয়া রাখায় যে কি অসুবিধা, তাহা আমি ত বুঝিতে পারি না ;—উহাতে বেশী কৌশল খাটাইবার আবশ্যক হয় না—এইমাত্র) তা ছাড়া, এই নর্ত্তকীর সাজসজ্জায় বেশ একটু সংযম ও গাম্ভীর্য্য লক্ষিত হইল। বারাঙ্গনাদিগকে যে ধরণে নমস্কার করিতে হয়, সেই ধরণে আমি উহাকে নমস্কার করিলাম। রত্ন-ভারাক্রান্ত করযুগলে ললাটস্পর্শ করিয়া ভারতীয় ধরণে সে আমাকে প্রতিনমস্কার করিল। তাহার পর, পরিজন-সমভিব্যাহারে গাড়ীতে উঠিল * * * কেবল স্ত্রীলোকদিগের জন্য যে কক্ষটি রক্ষিত, সেই কক্ষে গিয়া বসিল।

ষ্টেশনের সমস্ত কদর্য্য সাজসজ্জা পরিত্যাগ করিয়া, যখন আমি দেবী-মন্দিরের অভিমুখে যাত্রা করিলাম, তখনও আমার নেত্রমুকুরে বালামণির

ছবিটি প্রতিবিম্বিত। আরও কত সৎকার্য্য সে করিয়াছে, তাহার বিবরণ আজ অনেকের মুখে শুনিলাম। তাহার একটি সৎকার্য্যের উল্লেখ করি ;—গতমাসে, কতকগুলি য়ুরোপীয় মহিলা, হিন্দু-অনাথা-বালিকাশ্রমের জন্য চাঁদা সংগ্রহ করিতে বাহির হইয়া, একটা গৃহের নিকটে আসিয়া যখন দ্বারে আঘাত করিলেন, তখন বালামণি, স্মিতমুখে, একহাজার টাকার নোট তাঁহাদের হস্তে অর্পণ করিল। বালামণি জাতিনির্ব্বিশেষে সকলকেই সাহায্য করিয়া থাকে, তাহার গৃহের পথটি দরিদ্রমাত্রেরই সুপরিচিত।

দেবালয়।

ভারতে, দেবালয়ের খিলান-মণ্ডপ নিম্ন, সমাধিমন্দিরের ছাদের ন্যায় গুরুভার ও ভারাবনত; এইজন্য দেবালয়ের মধ্যে, প্রায় সময়ের পূর্ব্বেই সন্ধ্যার আবির্ভাব হয়।

অস্তমান সূর্য্যের আলো এখনও রহিয়াছে ; কিন্তু ইহারই মধ্যে মাদুরার বৃহৎ মন্দিরের প্রবেশ-পথের—প্রস্তরময় খিলান-পথের দুই ধারে ছোট ছোট দীপ জ্বালান হইয়াছে। ইহা মন্দিরের একপ্রকার প্রবেশ-দালান ; এইখানে ফুলের মালা বিক্রী হয়। কুলঙ্গী প্রভৃতি মন্দিরের সমস্ত খোঁজ-খাঁজের মধ্যে, খিলান-পথের দুইধারে যে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মূর্ত্তি রহিয়াছে তাহাদের ফাঁকের মধ্যে মাল্যবিক্রেতারা তাহাদের দোকান বসাইয়াছে। আমার ন্যায় কোন লোক বাহির হইতে আসিলেই একটা ছায়া পড়িয়া, সমস্তই যেন একসঙ্গে মিশিয়া যায় ;—পুতুলগুলা, বিকট মূর্ত্তিগুলা, মনুষ্য-মূর্ত্তি, বড় বড় প্রস্তর-মূর্ত্তি, সেই সব বহুবাহুবিশিষ্ট মূর্ত্তি—যাহাদের অঙ্গভঙ্গী প্রভৃতি দ্বিবাহু বিশিষ্ট মানুষেরই মত—সমস্তই মিশিয়া যায়। সেখানে 'ধর্ম্মের গরুরা'ও রহিয়াছে, উহারা সমস্ত দিন রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়ায় এবং ঘুমাইবার জন্য মন্দিরে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে, খাকৃড়া ও ফুল ধীরে সুস্থে চর্ব্বণ করে।

এই খিলান-পথের পরেই একটা দ্বার; দেবমূর্ত্তিময় অভ্রভেদী মন্দির-চূড়ার তলদেশে, একটা অন্ধকেরে সুড়ঙ্গ-কাটা পথ। এই পথ দিয়া একেবারেই মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করা যায়; মন্দির না বলিয়া ইহাকে একটা নগর বলিলেও চলে; এই নিস্তব্ধ অথচ শব্দায়মান নগরটি পথে-পথে একেবারে আচ্ছন্ন—পথগুলা আড়াআড়িভাবে প্রসারিত; এবং ইহার অসংখ্য লোক সমস্তই প্রস্তরময়। প্রত্যেক স্তম্ভ, প্রত্যেক বিরাটাকৃতি পিল্‌পা এক-একটা অখণ্ড প্রস্তরে নির্ম্মিত; কি উপায়ে যে উহাদিগকে খাড়া করিয়া তুলিয়াছে তাহা আমাদের বুদ্ধির অগম্য,—(অবশ্য লক্ষ লক্ষ বাহু-পেশীর সমবেত চেষ্টায়) তাহার পর, বিবিধ দেবতা ও দানবের মূর্ত্তি খুদিয়া-খুদিয়া বাহির করা হইয়াছে। এই খিলান মণ্ডপগুলি প্রায়ই সমতল; প্রথম দৃষ্টিতে বুঝিতে পারা যায় না কেমন করিয়া উহারা ভার-সাম্য রক্ষা করিয়া স্থিরভাবে দণ্ডায়মান আছে। এই খিলানমণ্ডপ-গুলি ৮।১০ গজ লম্বা অখণ্ড প্রস্তরে নির্ম্মিত, এবং দুই প্রান্তে ভর দিয়া রহিয়াছে, আমাদের সাদাসিধা কাষ্ঠফলকের মত এইরূপ কত অসংখ্য প্রস্তরখণ্ড পাশাপাশি অবস্থিত। এই সমস্ত,—পুরাতন মিসরের 'থেব্‌' ও 'মেম্‌ফিস্‌' নগরের ধরণে নির্ম্মিত; কালের দ্বারা বিনষ্ট হইবার নহে—উহারা প্রায় অনন্তকালস্থায়ী। "শ্রী-রাগম"-মন্দিরের ন্যায়, এখানেও, আকাশে সতেজে পা ছুঁড়িতেছে এইরূপ অশ্বের মূর্ত্তি কিংবা দেবতাদের মূর্ত্তি সারি সারি রহিয়াছে এবং সুদূর আঁধারে ক্রমশ মিশিয়া গিয়াছে। এই সকল মূর্ত্তির কৃষ্ণবর্ণ মসৃণ তলদেশ—যেখানে মানুষের হাত কিংবা শরীর পৌঁছায়—তাহা মনুষ্য ও পশুর দৈনিক গাত্র ঘর্ষণে ক্ষয় হইয়া গিয়াছে—এবং শুধু ইহাতেই উহাদের প্রাচীনত্ব সূচিত হয়। একদিকে বিরাট মহিমা, অপরদিকে গোময়-রাশি; একদিকে ইন্দ্রপুরীর বিলাস-বিভব, অপর দিকে বর্ব্বরোচিত অযত্ন তাচ্ছিল্য। থাকৃড়ার ও কাটা-কদলীপত্রের মালা—যাহা পূর্ব্বে কোন উৎসবের সময়ে টাঙ্গান হইয়াছিল, তাহা গুঁড়া-

গুঁড়া হইয়া মাটিতে পড়িতেছে ও পচিয়া উঠিতেছে। বিচিত্র কাল্পনিক জীবজন্তু; কাগজ ও ময়দাপিণ্ডে নির্ম্মিত সজীব হাতীর প্রমাণ সাদা হস্তি-মূর্ত্তি—সমস্তই কোণে কোণে পচিতেছে। 'ধর্ম্মের' গাভীগণ, ও যে সব জীবন্ত হাতী কুট্টিমতলে মুক্তভাবে বিচরণ করে, উহারা সর্ব্বত্রই তাহাদের বিষ্ঠা ছড়াইয়াছে—নগ্নপদের ঘর্ষণে মসৃণীকৃত চক্‌চকে তৈলাক্ত মেজের উপরেও ছড়াইয়াছে। বড় বড় বাদুড় চাম্‌চিকা এই ভীষণ খিলান-মণ্ডপে বংশবৃদ্ধি করিতেছে; উহারা, নৌকার পালের মত, বড়-বড় কালো ডানাগুলা সর্ব্বত্রই নাড়া দিতেছে কিন্তু তাহার শব্দ শোনা যায় না—পালকের ডানা হইলে বোধ হয় খুব শব্দ হইত।......

অভ্যন্তরস্থ একটা মুক্তাকাশ অঙ্গনের মধ্যে সন্ধ্যার আলো আবার আমি মুহূর্ত্তকাল দেখিতে পাইলাম। সেখানে আর কেহই নাই, কেবল কতকগুলা ময়ূর, প্রস্তরময় পশুমূর্ত্তির উপর বসিয়া ঘোরা-ফেরা করিতেছে। প্রাচীর-ঘেরের ঊর্দ্ধে, ন্যূনাধিক দূরে, কতকগুলা লাল ও সবুজ মন্দির-চূড়া মাথা তুলিয়া রহিয়াছে। এই দেবমূর্ত্তিময় চূড়াগুলি চিরবিস্ময়জনক। এই চূড়ার গায়ে, রাশীকৃত দেবতাদের মাঝামাঝি একস্থানে, চাতক ও টিয়ার নীড় ঝুলিতেছে এবং সেই সব নীড়ের চতুষ্পার্শ্বে পাখীগুলা নড়া-চড়া করিতেছে এবং যেখানে শূল-মুখের ন্যায় কতকগুলা খোঁচ্ উঠিয়াছে এবং যাহা এখনো সূর্য্যকিরণে আলোকিত,—সেই ঊর্দ্ধতম চূড়াদেশের খুব নিকটে কাকেরা চীলদিগের সহিত উন্মত্তভাবে ঘোর-পাক্ দিতেছে।

এই অঙ্গন ছাড়াইয়া, মন্দিরের আর একটি গভীরতর অংশে, আমি পুরোহিতকে অবশেষে দেখিতে পাইলাম। পূর্ব্বেই তাঁহার নিকট আমার সম্বন্ধে অনুরোধ-পত্র পাঠান হইয়াছিল; দেবীর বেশভূষা তিনিই আমাকে দেখাইবেন, এইরূপ কথা আছে।

বোধহয় কাল আমি সে-সব বেশভূষা দেখিতে পাইব না, কেননা কাল একটা উৎসবের দিন। শ্রীরাগমের বিষ্ণু যেমন প্রতিবৎসর রথে

করিয়া তাঁহার মন্দির প্রদক্ষিণ করেন, মাদুরার শিব পার্ব্বতীও সেইরূপ প্রতি বৎসর, তাঁহাদের জন্য খনিত একটা বৃহৎ জলাশয়ের চতুর্দ্দিকে নৌকা করিয়া পরিভ্রমণ করেন। সেই নৌযাত্রার পূর্ব্বদিনে আমরা এখানে আসিয়াছি।

কিন্তু পরশ্ব প্রত্যূষে, যখনই মন্দিরের মধ্যে একটু আলো দেখা দিবে,—পুরোহিত সেই গুপ্ত কক্ষের দ্বার আমার নিকট উদ্‌ঘাটিত করিবেন এবং আমাকে দেবীর রত্নভাণ্ডার প্রদর্শন করিবেন।

শিবের নৌকা।

বলা বাহুল্য, এই নৌকাখানা একটা প্রকাণ্ড ব্যাপার হইলেও নিতান্ত ক্ষণস্থায়ী কতকগুলা হাল্‌কা বাঁশে নির্ম্মিত। তিন-'ডেক্‌'-ওয়ালা জাহাজ অপেক্ষাও ইহা বড়;—এক প্রকার পরী-প্রাসাদ বলিলেও হয়। ইহার পৃষ্ঠভাগ সোনালি পাতমোড়া মোটা কাগজের, অথবা রেশমের। ইহাতে মন্দিরের ন্যায় কতকগুলা চূড়া, কাগজের ঘোড়া, কাগজের হাতী রহিয়াছে; আর কতকগুলা ছোট ছোট নিশান উড়িতেছে। আমরা য়ুরোপীয়,—আমাদের চোখে, ইহার সব দোষ খণ্ডিয়া যায় ইহার অতিমাত্র বৈদেশিকতায়, ইহার অদ্ভুত বিচিত্র কল্পনা-লীলায়, ইহার সেকেলে ধরণের সাজসজ্জায়।

এখন অপরাহ্ণ দুই ঘটিকা। সরোবরের উপর,—উহার বিজন তটভূমির উপর,—প্রখর রৌদ্র। মান্ধাতার আমলের সাজ-সজ্জায় সজ্জিত হইয়া, এই নৌকাখানা এইখানেই, প্রকাণ্ড ঘাটের সিঁড়িতে বাঁধা রহিয়াছে। এই সময়ে শিবের নৌকারোহণ করিবার কথা। কিন্তু কেহই আসে নাই,—এখনও কাহারও সাড়াশব্দ নাই।

এই সরোবরটি মানুষের হাতে খনিত চতুষ্কোণ; তটের ঘের ৯০০ কিংবা ১২০০ গজ হইবে। ভক্তগণ যাহাতে সরোবরে নামিতে পারে,

এই জন্য উহার চারিধারেই পাথরের সিঁড়ি। সরোবরের মধ্যস্থলে একটি দ্বীপ—সরোবরেরই ন্যায় চতুষ্কোণ। এই দ্বীপের উপর একটি ধপ্‌ধপে সাদা মন্দির; উহার প্রত্যেক কোণ হইতে এক একটি ক্ষুদ্র চূড়া সমুত্থিত। সরোবরের তটসংলগ্ন বিস্তীর্ণ ভূমি—জনতার পক্ষে খুব অনুকূল—এই সময়ে সূর্য্যের প্রখর কিরণে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে; উহার চারিধারে উদ্ভিজ্জের হরিৎশ্যামল যবনিকা—তালীবনরাজি, আর কতকগুলি মন্দির; এ সমস্ত, দেবীর বৃহৎ মন্দির হইতে বহুদূরে—প্রায় গ্রামপল্লীর অভ্যন্তরে।

ঢাকঢোলের শব্দ ক্রমেই নিকটবর্ত্তী হইতেছে। * * সমারোহের ঠাট্ আসিতেছে;—একটা ছায়াপথ হইতে বাহির হইয়া উহারা মুক্তালোকে, এই তাপদগ্ধ ক্ষুদ্র মরুভূমির মধ্যে আসিয়া পড়িল—যেখানে সরোবর ও সরোবরের নৌকাখানা এখনও নিদ্রামগ্ন। প্রথমে মানুষের কাঁধে,—১০।১৫ ফীট উচ্চ, কতকগুলা কাগজের বিরাটমূর্ত্তি,—মানুষের পিঠে কতকগুলা কৃত্রিম হাতী ঝাঁকাইতে ঝাঁকাইতে আসিল, তাহার পর, ৬টা সত্যকার হাতী—চুম্‌কি বসানো, লম্বা, লাল পোষাকে সজ্জিত; ২০টা প্রাচ্যদেশীয় পুরাতন প্রকাণ্ড লাল ছত্র—যাহা এককালে ব্যাবিলন্ ও নিনিভায় খুব প্রচলিত ছিল; তাহার পর ঢাক ঢোল, তীক্ষ্ণস্বর শানাই প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র; সর্ব্বশেষে শিবের জন্য ও তাঁহার পরিবারস্থ অন্যান্য দেবতার জন্য সোনার গিল্টিকরা পাল্কী। সমারোহের এই সমস্ত ঠাট্। ইহার সঙ্গে কোনও জনতা নাই। এই ঠাট্ মাদুরার মধ্য দিয়া আসিবার সময়, মাদুরার লোকদিগের কিছুমাত্র ঔৎসুক্য হয় নাই। সরোবর প্রদক্ষিণ করিয়া ঠাট্‌টি নৌকার সম্মুখে আসিয়া থামিল। কিন্তু কেহই কুতূহলী হইয়া এখানে দেখিতে আসিল না!

শুনিলাম, এইবার উহারা নৌকায় উঠিবে; কে আগে, কে পরে উঠিবে, তাহাও পূর্ব্ব হইতে নির্দ্দিষ্ট আছে। প্রথমে শিবের দুই পুত্র, পরে শিব, এবং সর্ব্বশেষে পার্ব্বতী,—শিবের পত্নী। যাহারা বহুদিন হইতে

এই কর্ম্মে নিযুক্ত,—সেই চর্ম্মাবরণে আচ্ছাদিত পুরাতন মাঝিমাল্লারা—টস্‌টস্‌ করিয়া গা-বাহিয়া জল ঝরিতেছে, এই অবস্থায়,—জল হইতে উঠিয়া পাল্কীর নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল। বিষ্ণুদেবের রথারোহণের সহিত ইহার কত প্রভেদ; সেই শ্রীরাগমে, রহস্যময় বিষ্ণুদেব—গভীর রাত্রে, কত অবগুণ্ঠন-বস্ত্রে আবৃত হইয়া, তবে রথে উঠিয়াছিলেন! এইখানে আমি খুব কাছে আসিয়া দাঁড়াইলাম। উহারা তাহাতে কিছুমাত্র উদ্‌বেজিত হইল না—আমাকে দূরে যাইতেও অনুরোধ করিল না। পাল্কীর ঘেরাটোপ্‌ খোলা ছিল; তাই, আজ এই প্রথমবার সেই সব বিগ্রহ দেখিতে পাইলাম—যাহাদিগকে কত শতাব্দী ধরিয়া এখানকার লোকে ভয় ও ভক্তি করিয়া আসিতেছে। * * *

জম্‌কাল গদীর উপর উপবিষ্ট এই বিগ্রহগুলিকে, যখন কতকগুলি নগ্নকায় বৃদ্ধ স্বীয় বলিরেখাঙ্কিত বাহুর উপর বসাইয়া লইয়া গেল, তখন আমার যেকি বিস্ময়—এমন কি, আতঙ্ক উপস্থিত হইয়াছিল—তাহা আর কি বলিব! কতকগুলি বিকটাকার পুত্তলিকা;—দেখিতে নরম-তল্‌তলে; গ্রীবাদেশ কাঁধের মধ্যে যেন ঢুকিয়া গিয়াছে; গোলাপী রঙ্গের ছোট ছোট মূর্ত্তি—কমলানেবুর মত ট্যাবাটোবা। (কি জন্য গোলাপী রঙ্গ?—ভারত-বাসীর রঙ্গ তাম্রাভ বলিয়াই কি?) ওষ্ঠাধর পাতলা; চক্ষু নিমীলিত ও পক্ষ্মশূন্য;—দেখিলে মনে হয়, মনুষ্যের ভ্রূণ,— * * * মৃতশিশু; এই চিরনিদ্রার অবস্থাতেও মুখের ভাব ভীষণ; কিন্তু এই ভীষণতার সঙ্গে একপ্রকার ভোগতৃপ্ত হৃষ্টপুষ্ট ভাব, প্রমত্ততার ভাবও প্রকটিত রহিয়াছে। রাশি রাশি রত্নমালা, হীরা চুণির অলঙ্কার, সূক্ষ্ম মুক্তার ঝালর—এই সমস্তের মধ্যে বিগ্রহগুলি নিমজ্জিত। বহুমূল্য কাণবালার ভারে ভারাক্রান্ত বড় বড় সোনার কাণ উহাদের মাথার দুই পাশে ঝুলিতেছে। উহাদের হাতের উপর খুব বড় বড় সোনার হাত বসানো,—তাহাতে লম্বা লম্বা নখ; আবার উহাদের জঙ্ঘার শেষপ্রান্তে বড় বড় সোনার পা। এইরূপ একটা

বিপরীত-প্রমাণ কৃত্রিম হাতের মধ্য হইতে উহাদের একটা আসল হাত বাহির হইয়া পড়িয়াছে;—ইহা বানরের হাতের ন্যায়, কিংবা ভ্রূণশিশুর হাতের ন্যায় ক্ষুদ্র। হস্তপুট শঙ্খাকৃতি। হাতের রঙ দেহের রঙ্গেরই মত গোলাপী। * *

সূর্য্যের প্রখর তাপ; ঢাক্ ঢোল শানাইয়ের ঘোর বাদ্যঘটা। এ দিকে চর্ম্মাবরণে আচ্ছাদিত সেই মাঝিমাল্লারা মৃতজাত-শিশুপ্রায় পুতুলগুলাকে রত্নালঙ্কার ও কিংখাব-বস্ত্রে আচ্ছাদিত করিয়া নৌকায় লইয়া গেল; এবং নৌকার অন্তরতম প্রদেশে সিংহাসনের উপর বসাইয়া, মোটা কাপড়ের পর্দ্দার আড়ালে উহাদিগকে অদৃশ্য করিয়া রাখিল।

এইখানেই সমস্ত শেষ। সমারোহের ঠাট্—হস্তী, ছত্র, সমস্তই চলিয়া গিয়াছে। সরোবরের তটদেশ আবার মরুভূমিতে পরিণত হইল। কেবল আজ রাত্রে একবার বিগ্রহগুলিকে সরোবরের চারিধারে ঘুরাইয়া আনা হইবে।

দিবসের প্রখর অত্যাচার এবং রশ্মি ও বর্ণচ্ছটার উন্মত্ত উৎসব-লীলা থামাইয়া দিয়া,—বৃদ্ধ ভারতকে একটু বিশ্রাম দিবার জন্য, আবার রাত্রি আসিয়া উপস্থিত হইল। নীলিম কৃষ্ণবর্ণে ধরাপৃষ্ঠ আচ্ছন্ন ছিল,—এক্ষণে মধুর চন্দ্রমা সমুদিত হইয়া, ধীরে ধীরে সমস্ত পদার্থ রজতকিরণে রঞ্জিত করিল। এই সময়ে ভক্তগণ দলে দলে সরোবরের ধারে আসিয়া, তিনটি প্রস্তরনির্ম্মিত ঘাটের প্রত্যেক ঘাটের সিঁড়িতে নামিয়া, তিন-সারি তৈলসিক্ত দীপ-শলিতা জ্বালাইবার জন্য আগ্রহসহকারে প্রবৃত্ত হইল। এই প্রকাণ্ড চৌকোণা সরোবরের চারিধারেই তিন-সারি ছোট ছোট প্রদীপ সজ্জিত রহিয়াছে। সরোবরমধ্যস্থিত দ্বীপে যে মন্দিরাদি রহিয়াছে, তাহাতেও দীপাবলী জ্বালান হইল। শুভ্র চন্দ্রালোকে সমস্তই ধপ্ ধপ্ করিতেছে—তথাপি, অনলশিখাচ্ছটা চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইল।

সূর্য্যাস্ত-সময় হইতে জনতার আরম্ভ হইয়াছে। যে সব ছায়াতরুর

পথ,—আলুলায়িত-কেশ-বটবৃক্ষ-শোভিত পথ এইখানে আসিয়া মিলিত হইয়াছে, সেই পথগুলি,—নগর গ্রামাদি হইতে মানব-জনতার প্রবাহধারা, এই সরোবরের ধারে অজস্র ঢালিয়া দিতেছে।

শিবপূজার জন্য এই লোকসমাগম। সরোবরের চারিধার মাথায় মাথায় আচ্ছন্ন। মাথাগুলা এত ঘেঁসাঘেসি যে, নদীতীরের উপল-রাশি বলিয়া মনে হয়। ভারতবাসীদের এই সরু সরু তমসাচ্ছন্ন মাথাগুলা, আমাদের য়ুরোপীয় মাথা অপেক্ষা অনেক ছোট। মনে হয়, এই সব মস্তকে গুহ্যধর্ম্ম (Mysticism) ও জলন্ত ইন্দ্রিয়পরতা ভিন্ন বুঝি আর কিছুরই জন্য স্থান নাই। (কথাটা বিরক্তিকর হইলেও বলিতে হইবে,—এই দুই জিনিস প্রায় যুগলমূর্ত্তিতেই দেখা দেয়)। এই শিবের সরোবরে আসিবার সময়, প্রত্যেকেই একএকটা সপল্লব খাগ্‌ড়ার ডাল কাঁধে করিয়া লইয়া আইসে ;—দেখিলে মনে হয়, যেন একটা তৃণের ক্ষেত আসিতেছে।

রাত্রির প্রারম্ভেই, বৃহৎ মন্দির হইতে যে সকল হস্তী এখানে আসিয়াছে, তাহারা এই সব চিন্তাশীল-মস্তকরূপী কন্দুকরাশির মধ্যে—গণ্ডশৈলের ন্যায়, ক্ষুদ্র দ্বীপের ন্যায়, ইতস্ততঃ সমুত্থিত।

এই পরী-নৌকার পার্শ্বে,—এই স্বর্ণমণ্ডিত ধ্বজচূড়া-সমন্বিত ভাসন্ত প্রাসাদের পার্শ্বে—যেখানে অবিরাম মশাল জ্বলিতেছে—একটা তুমুল মানব-জনতা, বাদ্যোদ্যম-সহকারে, আসিয়া উপস্থিত হইল। উহারা, নৌকার গুণটানা রশি মাটির উপর লম্বাভাবে ছড়াইয়া রাখিল ; এবং ভক্তদিগের মধ্য হইতে শত শত লোক আসিয়া, আনন্দধ্বনি করিতে করিতে, ঐ রশিটা ধরিল। এই দীর্ঘ প্রসারিত রজ্জুর পার্শ্বে যাহারা দাঁড়াইবার স্থান পাইল না, তাহারা সকলের উপর জল ছিটাইয়া, সরোবরের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। আ-কটি জলে নিমজ্জিত হইয়া উহারা পিছন হইতে—পার্শ্ব হইতে নৌকাকে ঠেলিবে—অন্ততঃ নৌকার সঙ্গে সঙ্গে যাইবে।

আবার ঘোর কোলাহল ;—ঢাক ঢোল শানাইয়ের উন্মত্ত বাদ্যঘটা। এইবার নৌকা ছাড়িয়াছে। সরোবরের প্রস্তরময় কিনারা দিয়া নৌকা বেশ সহজে চলিতেছে। দেব ও দেবীর নৌকাযাত্রা এইবার আরম্ভ হইয়াছে। যে স্বর্গীয় শুভ্রকিরণ ঢালিয়া আজ রাত্রে চন্দ্রমা সকলকে বিমুগ্ধ করিতেছেন, তাহা অপেক্ষা শিবের এই উৎসব-আড়ম্বর শতগুণে পার্থিব, সন্দেহ নাই। সরোবরের তীরে, ঘন্টিকাজাল-সমাচ্ছন্ন শান্তশিষ্ট হস্তিগণ ঘণ্টাধ্বনি করিতে করিতে এই তুমুল জনতার সঙ্গে সঙ্গে চলিয়াছে, এবং তাহাদের গুরুপদভারে পাছে কোনও শিশু বিদলিত হয়, এই জন্য ধীরে ধীবে অতি সাবধানে পদক্ষেপ করিতেছে।

মীনাক্ষী-দেবীর রত্নভাণ্ডার।

আজ আমি প্রত্যূষে সূর্য্যোদয় হইবামাত্রই (১) দেবালয়ে উপস্থিত হইলাম। এই প্রস্তরময় গোলোকধাঁধার প্রবেশ-পথগুলিতে ইহারই মধ্যে প্রাভাতিক জীবন-উদ্যমের স্ফূর্ত্তি দেখা যাইতেছে। প্রবেশ-বীথীর ধারে ধারে, সমস্ত প্রস্তর-মঞ্চের ভীষণদর্শন প্রতিমা-সমূহের মধ্যবর্ত্তী সমস্ত কুলাঙ্গির মধ্যে, ফুলের দোকানীরা কাজে বসিয়া গিয়াছে ; গাঁদা ফুলের মালা গাঁথিতেছে, তাহার সহিত গোলাপ ফুল ও স্বর্ণসূত্র সংমিশ্রিত করিতেছে। অর্দ্ধনগ্ন লোকেরা যাতায়াত করিতেছে ; সদ্যস্নাত ব্যক্তির আর্দ্র কেশ হইতে জল ঝরিয়া পড়িতেছে, তাহাদের চক্ষে ধ্যানের ভাব,—ভক্তির ভাব। পবিত্র হস্তী, পবিত্র গাভী,—যাহারা তমসাচ্ছন্ন মন্দিরের কুট্টিমতলে বাস করে ; পক্ষীগণ, যাহারা রক্তিম মন্দির-চূড়ার বিভিন্ন উচ্চ-অংশে নীড় বাঁধিয়া আছে, সকলেই এই প্রভাত-আলোকে চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে, ক্রীড়া করিতেছে ;—পশুপক্ষীর মধ্যে—কেহ বা হম্বারব, কেহ বা বৃংহিত, কেহ বা কূজন কেহ বা গান করিতেছে।

পূর্ব্বের কথামত পুরোহিতেরা আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন; তাঁহারা আমাকে অন্ধকারময় মন্দিরের গভীরদেশে লইয়া গেলেন।

আমার সম্মুখে, একটা গুরুভার তাম্র-দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইল: উহাই মন্দিরের গুপ্ত অংশ। প্রথমে একটা দালান, তাহার দুই ধারে সারি সারি কৃষ্ণবর্ণ দেবমূর্ত্তি, গুহাগহ্বরের মত সমস্ত অন্ধকারে আচ্ছন্ন,—তাহার পরেই বিমল আলোকচ্ছটা, "স্বর্ণপদ্ম-সরোবর" নামে একটি পবিত্র পুষ্করিণী;—মুক্ত আকাশতলে, একটি চতুষ্কোণ গভীর জলাশয়; নামিবার জন্য, চারিধারে পাথরের সিঁড়ি; জলাশয়ের চারিদিকে, শোভন-সুন্দর স্তম্ভশ্রেণী চলিয়া গিয়াছে; কতকগুলি খিলান-মণ্ডপ খোদাই-কাজকরা ও কতকগুলি খিলান-মণ্ডপ পবিত্র গম্ভীর বর্ণে রঞ্জিত; আর সারি সারি ঢাকা-বারাণ্ডা; এই বারাণ্ডাগুলি, ব্রাহ্মণদিগের গুপ্ত বিচরণভূমি। এই বদ্ধ ঘেরের একটা দিক্, সুশীতল নীল ছায়ায় এখনও পরিস্নাত; অন্য দিক্, সূর্য্যের উদয়ে ইহারই মধ্যে পাটল-রাগে,—প্রাভাতিক সিন্দুররাগে রঞ্জিত হইয়াছে। এই সরোবরের চতুর্দ্দিকস্থ সারি সারি বারাণ্ডাদালানের মাথা ছাড়াইয়া, ঊর্দ্ধে রক্তিম মন্দির-চূড়াগুলি; সকল স্থান হইতেই এই চূড়াগুলি দেখা যাইতেছে; এই চূড়াগুলি বিভিন্ন ব্যবধানে ও বিভিন্ন উচ্চতায় অবস্থিত হইয়া দীপ্তি পাইতেছে এবং প্রত্যেক চূড়ার চারিধারে পাখীরা ঝাঁকে ঝাঁকে উড়িয়া বেড়াইতেছে; আর একটি সোনার গম্বুজও ঝিক্‌মিক্ করিতেছে—মন্দিরের যে স্থানটি সর্ব্বাপেক্ষা পবিত্র ও সর্ব্বাপেক্ষা রহস্যময়, যেখানে আমি কোনো উপায়েই প্রবেশলাভ করিতে পারি নাই—সেই গম্বুজটি তাহারই মাথায় অধিষ্ঠিত। অপূর্ব্ব সরোবর! নিস্পন্দতা যেন মূর্ত্তিমতী! তীরস্থ কঠোর ও বিরাট দৃশ্যের মধ্যে এই সরোবরের জল যেন মৃত বলিয়া মনে হয়—উহাতে একটি রেখামাত্র নাই। চতুর্দ্দিকের স্তম্ভশ্রেণী, জলের উপর প্রতিবিম্বিত, দ্বিগুণিত, দীর্ঘীকৃত ও বিপর্য্যস্ত ভাবে দেখা যাইতেছে। এই "স্বর্ণপদ্ম-সরোবর",—এই তপন-তারা জলদরাজির

দর্পণ—যাহা বিরাট মন্দিরের হৃদয়দেশে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিত—এইখানে এমন একটি শান্তির ভাব সর্ব্বত্র ওতপ্রোত হইয়া রহিয়াছে যে তাহা বাক্যের দ্বারা ব্যক্ত করা যায় না। এই সমস্ত খিলান-মণ্ডপের গোলোক-ধাঁধার মধ্যে, কোন্ পথ দিয়া, পুরোহিতেরা যে আমাকে লইয়া গেলেন, তাহা বুঝিবার চেষ্টা করা বৃথা। যতই আমি অগ্রসর হইতে লাগিলাম, ততই যেন সমস্ত আমার নিকট অতিভারাক্রান্ত ও অতিমানুষিক বলিয়া মনে হইতে লাগিল;—সমস্ত মন্দির উত্তরোত্তর আরও প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাথরের চাক্‌লায় গঠিত। বিংশতি বাহুবিশিষ্ট দেবতা, বিচিত্র অঙ্গভঙ্গীবিশিষ্ট দেবতা—এই সমস্ত অসংখ্য বিরাট দেবমূর্ত্তি ছায়ান্ধকারের মধ্যে সারি সারি কতই যে চলিয়াছে তাহার শেষ নাই—তাহার কোন শৃঙ্খলাও নাই। আমি তাহার মধ্যদিয়া চলিয়াছি। যেন স্বপ্নে অতিকায় দৈত্যদের রাজ্যের মধ্যদিয়া—ভয়ানকের রাজ্যের মধ্যদিয়া চলিয়াছি। চারিদিকেই অন্ধকার, এবং আমাদের পদক্ষেপে সমাধি-গহ্বরসুলভ মুখরতা যেন জাগিয়া উঠিল।

ক্রমাগতই প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রতিমা—ক্রমাগতই বিরাট ব্যাপার নেত্রপথে পতিত হইতেছে, আবার সেই সঙ্গে বর্ব্বরোচিত অযত্ন তাচ্ছিল্য, বিষ্ঠা ও আবর্জ্জনা রাশি। মানুষপ্রমাণ সমস্ত দেয়াল, দেয়ালের গাত্র-নিঃসৃত অংশগুলা—সমস্তই কালিমাগ্রস্ত, আর্দ্রতা ও ময়লায় চিক্‌চিক্ করিতেছে। এই একটা বারাণ্ডা—ইহা গজমুণ্ডধারী গণেশের নামে উৎসৃষ্ট, গণেশের পদতলে, শুণ্ডের নীচে, কতকগুলি ধূমায়মান প্রদীপ জ্বলিতেছে, তাহারই আলোকে গণেশের বিকটাকার শরীরটা আলোকিত হইয়াছে। এই দেখ, একটা ভীষণ কোণে, ঘোর রাত্রিকালে, এই সকল বিকটাকার প্রস্তর-মূর্ত্তির মধ্যে, এক-পাল জীবন্ত পশু অবস্থিত, উহাদের নিশ্বাসের শব্দ শুনা যাইতেছে; একটা সমস্ত গো-পরিবার এখনও নিদ্রা যাইতেছে—যেন এখনও সূর্য্যের উদয় হয় নাই; মন্দিরকুট্টিমের ষাণ্ উহাদের গোময়ে আচ্ছন্ন—তাহার মধ্যে পা পড়িয়া পা পিছ্‌লাইয়া যাইতেছে; ঘৃণিত বলিয়া কেহ তাহা বাহিরে

নিক্ষেপ করিতে সাহস করে না,—কেন না, যাহা তাঁহাদের অস্ত্র হইতে নিঃসৃত, তাহাও তাহাদেরই ন্যায় পবিত্র। বড় বড় ডানা-ওয়ালা বাদুড় চাম্‌চিকা ভয়চকিত হইয়া আমাদের মাথার উপর ক্রমাগত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

আমার পথপ্রদর্শকেরা, কোন এক বিশেষ মুহূর্ত্তে, উৎকণ্ঠিত হইয়া তাড়াতাড়ি চলিতে লাগিল; সেই সময়ে আমরা একটা অপেক্ষাকৃত উচ্চ ও তমসাচ্ছন্ন দালানের সম্মুখ দিয়া যাইতেছিলাম; সেই দালানের গভীর-দেশে কতকগুলা বিকটাকার দেবমূর্ত্তি কতকগুলি দ্বীপের আলোকে আমি 'চোরা-গোপ্তান্' দেখিয়া লইয়াছিলাম। আমাকে যাহারা লইয়া যাইতেছিলেন তাঁহাদের মধ্যে একটি ব্রাহ্মণ, আমার নিকট আসিয়া মৃদুস্বরে আমাকে বলিলেন ঐটিই সর্ব্বাপেক্ষা পবিত্র স্থান; আগে আমাকে বলেন নাই, পাছে আমি বেশী দেখিয়া ফেলি।

অবশেষে, এই গুরুপিণ্ডাকার স্তম্ভারণ্যের একটা জায়গায় আসিয়া পুরোহিতেরা থামিলেন; এই স্থানটি খুব বিশাল ও জম্‌কালো। কতকগুলা বৃহৎমন্দিরের মধ্যবর্ত্তী যেন একটা চৌমাথা-রাস্তা। এইখানে অনেকগুলি দালানের কুট্টিম উদ্‌ঘাটিত ও সর্ব্বদিকে প্রসারিত হইয়া ক্রমে ছায়ান্ধকারে মিশাইয়া গিয়াছে। অখণ্ড প্রস্তরের বিরাটাকার বিগ্রহ সমূহ চারিদিক বেষ্টন করিয়া আছে; উহারা বল্লম, অসি, নরমুণ্ড হস্তে ধারণ করিয়া আস্ফালন করিতেছে; উহারা কালো, চিক্‌চিকে, তেলা;—হস্তঘর্ষণে উহাদের উপর লম্বা-লম্বা দাগ পড়িয়াছে; উহারা লোকের গাত্রঘর্ম্ম শোষণ করিয়াছে! কতকগুলি বেদীর উপর, তাম্র ও রৌপ্য সামগ্রী ঝিক্‌মিক্ করিতেছে; কতকগুলা পিতলের চূড়াকার সামগ্রী বহুশতাব্দিব্যাপী কালপ্রভাবে বাঁকিয়া গিয়াছে,—বোধ হয় পূর্ব্বে দীপাধার ছিল;—এই সমস্ত দেবীর রহস্যময় পূজার সামগ্রী। এবং ইহারই মাঝখানে, দীর্ঘকুন্তল ও নগ্নকায় ভিক্ষুকের জনতা; মন্দিরই

ইহাদের প্রধান আড্ডা; রক্ষিগণ চীৎকার করিয়া, ঠেলাঠেলি করিয়া, উহাদিগকে সরাইয়া দিতেছে: কেন না, ভিক্ষুকেরা কৌতূহলাকৃষ্ট হইয়া একপ্রকার বেড়ার চারিধারে ক্রমাগত ঠেলিয়া আসিতেছে; দুই দিক্‌কার দুইটা পিল্‌পায় দুইগাছা রসি বাঁধিয়া এই বেড়াটি সংরচিত।

আমার প্রবেশের জন্য টানা রসির কিয়দংশ শিথিল করিয়া ভূমিতে নামাইয়া দেওয়া হইল, তাহার পর পূর্ব্বের মত আবার সটানে বাঁধা হইল; আমি পুরোহিতদের সহিত রজ্জু-চক্রের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। আমার সম্মুখে একটা বৃহৎ টেবিল কালো গালিচায় ঢাকা;—তাহারই উপর দেবীর অলঙ্কারগুলি স্তূপাকার। এই রাশীকৃত স্বর্ণ ও রত্নময় অলঙ্কারের নিকটে, উহারা আমাকে একটা আরাম-কেদারায় বসাইল; আমার গলায় গেঁদা ফুলের মালা পরাইয়া দিল; তাহার পর, পুরোহিতেরা আমার হস্তে অলঙ্কারগুলি দিতে আরম্ভ করিলেন; এই অলঙ্কারগুলি কোন গভীরতম গুপ্ত কক্ষ হইতে ঘণ্টাখানেকের জন্য বাহির করা হইয়াছে; তাঁহারা আমার হাতে অলঙ্কারগুলি স্পর্শ করাইতে লাগিলেন; এবং আমোদ করিয়া একটার পর একটা আমার জানুর উপর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। বিবিধ বর্ণের মণিরত্নে খচিত ডজন্‌-ডজন্‌ ভারী ওজনের সোনার মুকুট। অজাগর সর্পের ন্যায়, মাণিক ও মুক্তার পাকানো হার, সহস্র বৎসরের পুরাতন বলয়। পুরাতন কণ্ঠমালাগুলা এত ভারী যে এক হাতে উঠানো কঠিন। রমণীরা কূপ হইতে জল তুলিবার জন্য যে সব কলস ব্যবহার করে সেইরূপ বড় বড় কলস,—কিন্তু উহা পাত্‌লা সোনার, এবং হাতুড়ী পিটিয়া গঠিত। বক্ষদেশ বিভূষিত করিবার জন্য নীলরঙ্গের একটি অতুলনীয় কবচ—বাদামের মত বড় বড় মসৃণীকৃত নীলকান্তমণি দিয়া বিরচিত। যে সময় তাঁহারা এই সব অপূর্ব্ব রত্ন-ঐশ্বর্য্যে আমার হাত ভরিয়া দিতেছিলেন, সেই সময়ে দূর হইতে সঙ্গীতলহরী আমার কাণে আসিয়া পৌঁছিতেছিল:—ঢাক-ঢোলের ঘোর গর্জ্জন, পবিত্র শঙ্খ ও শানাইয়ের বিলাপ-ধ্বনি। মধ্যে

মধ্যে আমার পশ্চাতে ঘোর কোলাহল; ক্ষুধাতুর ভিক্ষুকদিগকে রক্ষিগণ তাড়াইতেছে; ভিক্ষুকেরা এতদূর ঠেলিয়া আসিয়াছে যে ভঙ্গুর দড়ির বেড়াটা ভাঙ্গিবার উপক্রম হইয়াছে। আবার এই দেখ, হীরক-খচিত কতকগুলা ঘোড়ার রেকাব,—নিশ্চয়ই দেবীর অশ্ব-বাহনের জন্য গঠিত। এই দেখ কতকগুলা সোনার কৃত্রিম কাণ, তাহাতে সূক্ষ্ম মুক্তাগুচ্ছ; উৎসবযাত্রাকালে দেবীর ভ্রূণাকার ক্ষুদ্র গোলাপীমস্তকের দুই পাশে উহা আটকাইয়া দেওয়া হয়। এই দেখ, কতকগুলা সোনার কৃত্রিম হাত ও কৃত্রিম পা; দেবী যখনই ভ্রমণার্থ মন্দির হইতে বাহির হয়েন, তখনই উহা তাঁহার ভ্রূণ-প্রায় ক্ষুদ্র হস্তপদের প্রান্তদেশে বাঁধিয়া দেওয়া হয়···

এই রত্নভারাক্রান্ত টেবিলের রত্ন-ঐশ্বর্য্য যখন সমস্তই দেখা হইয়া গেল, আমি মনে করিলাম এই বুঝি শেষ। কিন্তু না; ভীষণ মূর্ত্তিসমূহে পরিপূর্ণ, কৃষ্ণবর্ণ বারাণ্ডাগুলার মধ্যদিয়া পুরোহিতেরা আমাকে একটা অঙ্গনে লইয়া গেলেন; সেখান হইতে তুরীনাদের মত ঘোর তীব্র শব্দ নিঃসৃত হইতেছিল; সেখানে লাল পোষাকে আচ্ছাদিত ছয়টা হস্তী, রদ্দুরে দাঁড়াইয়া আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল; আমি আসিবামাত্রই, তাহাদের বৃহৎ ও স্বচ্ছ কর্ণরূপ তালপত্রের বীজনে ক্ষান্ত না হইয়া, আমার সম্মুখে নতজানু হইল। আমি প্রত্যেককে রৌপ্যমুদ্রা দিলাম; উহারা অতি সূক্ষ্ম ক্ষুদ্র চক্ষু দিয়া নিরীক্ষণ করিতেছিল এবং মুদ্রাটি উঠাইয়া লইয়াই, কতক-গুলা বৃহৎ চামড়ার 'কূপোর মত' 'নড়র্ বড়র্' করিতে-করিতে চলিয়া গেল; আপনার খেয়াল-অনুসারে যেখানে খুসি চলিয়া গেল;—কেহ বা সুঁড়ি বারাণ্ডাপথে, কেহ বা মন্দিরের কুট্টিমতলে; এই মন্দিরের মধ্যে উহারা মুক্তভাবে বিচরণ করে।

তাহার পর, উহারা আমাকে মন্দিরের দালানে লইয়া গেল; উহার ছাদ-আদি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাথরের চাক্‌লায় গঠিত; দেখিলে মনে হয়, অতিকায় দৈত্যদিগের গুহাভবন; যে সকল ভৃত্য আমাদের সঙ্গে ছিল,

তাহারা দেওয়াল বাহিয়া উঠিয়া দর্ম্মার ঝাঁপ্‌গুলা সরাইয়া দিল, ঝাঁপ্‌গুলা অপসৃত হইলে, দেয়ালের গায়ে কোন কোন স্থানে আলো আসিবার ফুকোর-পথ দেখা গেল। কিন্তু তাহা থাকা না থাকা সমান, ঠিক রাত্রির মত অন্ধকার,—দীপ জ্বালানো আবশ্যক।

কতকগুলি নগ্নকায় ক্ষুদ্র বালক, দীপ কিম্বা মশাল লইয়া দৌড়িয়া আসিল; এই মশালগুলা মান্ধাতা-যুগের, এই জ্বলন্ত মশালগুলি হইতে খুব ধোঁয়া উঠিতেছে; এইগুলি দীর্ঘ পিত্তলদণ্ড,—অগ্রভাগ শুঁড়ের মত বাঁকানো।

লোহার পতর-মারা একটা দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইল, সর্ব্বপ্রথমেই সেই ক্ষুদ্র বালকেরা প্রবেশ করিল...এখন আমরা দেবীর বিচিত্র পশুশালায় উপস্থিত; জীবন্ত পশুর প্রমাণ একটা রূপার গরু, কতকগুলা সোণার ঘোড়া, সেই চির-আর্দ্র উষ্ণতার মধ্যে—সারি সারি সজ্জিত রহিয়াছে; বালকেরা আসিয়া সেই খোদিত মূর্ত্তিদের নিকট আলো ধরিল; সেই আলোকে গরু ও ঘোড়ার সাজের রত্নগুলি ঝিক্‌মিক্ করিতে লাগিল। উপরে—ভীষণ প্রস্তরখিলানমণ্ডপে, পালোকহীন কতকগুলা ডানা ক্রমাগত সঞ্চালিত হইতেছে এবং সেই সঙ্গে মৃদু মৃদু তীক্ষ্ণ শব্দ শুনা যাইতেছে;—বাদুড় চাম্‌চিকার ঝাঁক্ উন্মত্তভাবে ঘোরপাক দিতেছে।

লোহার পতর-মারা দ্বিতীয় দ্বার; রূপা ও সোণার পশুদের জন্য আর একটা ঘর।

তৃতীয় দ্বার এবং ইহাই শেষ-দ্বার। এই খানে একটি রূপার সিংহ, একটি সোণার প্রকাণ্ড ময়ূব—প্যাখোম তোলা; প্যাখোমের 'চোখ্‌গুলা' পান্না দিয়া রচিত; একটা রূপার গরু, তাহার মুখ নারীমুখের মত, কিন্তু আসল নারীমুখ অপেক্ষা অনেক বড়; হিন্দু রমণীর ন্যায়, কাণে ও নাসিকার অগ্রভাগে বিবিধ রত্নালঙ্কার ধারণ করিয়া রহিয়াছে। এই ঘরের কোণে দেবীর একটা সোণার পাল্কী রক্ষিত; এই পাল্কীর গায়ে

অনেক খোদিত কারুকার্য্য—হীরা ও মাণিকের ফুল উৎকীর্ণ। নগ্নকায় বালকেরা এই ঔপন্যাসিক রত্নবিভবের উপর তাহাদের মশাল ধরিল; এই মশালে আলো অপেক্ষা ধোঁয়াই বেশী, যাই হোক্ এই মশালের আলোকে কোথাও কোথাও স্বর্ণালঙ্কারের খুঁটিনাটিগুলি প্রকাশ পাইতেছে, কোন কোন বহুমূল্য রত্ন হইতে অগ্নিচ্ছটা উচ্ছ্বসিত হইতেছে, কিন্তু মোটের উপর সমস্তই নিবিড় নৈশঅন্ধকারে সমাচ্ছন্ন। দেয়ালগুলা মাকড়শার জালে বিভূষিত—স্থানে স্থানে পাথরের গুঁড়া জমাট বাঁধিয়া গিয়াছে, স্বেদ ও যবক্ষার গড়াইয়া পড়িতেছে; আর বাদুড় চাম্‌চিকারা জাগিয়া উঠিয়া, ক্রমাগত ঘোরপাক দিতেছে, কিন্তু তাহাদের ডানার শব্দ শোনা যাইতেছে না। কালো রঙ্গের কাপড় হইতে ছিন্ন একটা বড় টুকরার মত তাহাদের ডানা; সেই ডানার বাতাস উহারা আমাদের গায়ে লাগাইয়া চলিয়া গেল। এবং এক প্রকার তীব্র শব্দ করিয়া উঠিল, ইঁদুরের কলে ইঁদুর পড়িলে যেরূপ শব্দ করে কতকটা সেইরূপ।

পণ্ডিচেরীর অভিমুখে।

মাদুরা ছাড়িয়া, উত্তরে পণ্ডিচেরীর অভিমুখে যতই অগ্রসর হইতে লাগিলাম, তালীবনের আর্দ্র প্রদেশ ততই দূরে সরিয়া যাইতে লাগিল; এখন শুধু স্থানে স্থানে স্বচ্ছায় তালকুঞ্জ দেখিতে পাওয়া যায়; তৃণভূমি, বাগান-বাগিচা, ধানের ক্ষেত তালীবনের স্থান অধিকার করিয়াছে। বাতাসও ক্রমে ক্রমে লঘু হইয়া আসিতেছে, মাঠ-ময়দানের মধ্যে জলের বিরলতা, জমি যেন শুকাইয়া গিয়াছে।

তথাপি, এখানকার লোক-জীবনে গোপ-ভূমি-সুলভ একটা শান্তির ভাব পরিলক্ষিত হয়। আমাদের য়ুরোপের ন্যায় এখানকার বসতি ঘননিবিড় নহে। নগ্নকায় রাখালেরা, লাল শাড়ী-পরিহিতা রাখালিনীরা

ছাগলের পাল, ককুদ্‌বান্ ক্ষুদ্রকায় গরুর পাল লইয়া মাঠে চরাইতেছে। মাঠের ঘাস ইহারই মধ্যে হল্‌দে হইয়া গিয়াছে, কিন্তু এখনও যথেষ্ট আছে।

গ্রামের ঘরগুলা চূণ ও পেটা-মাটী দিয়া গঠিত। প্রত্যেক গ্রামে এক-একটি দেবালয় আছে। দেবালয়ের দেবমূর্ত্তিগুলি পিরামিডের আকারে খাড়া হইয়া উঠিয়াছে, বিকট মূর্ত্তিগুলা দেয়ালের উপর বসিয়া আছে;—সমস্তই প্রখর সূর্য্যের উত্তাপে ও লাল ধূলার মধ্যে ম্রিয়মাণ। দূর-দূর ব্যবধানে, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গাছের কুঞ্জ, তাহারই ছায়াতলে কতকগুলি দেবতা সিংহাসনে সমাসীন; কতকগুলি পাথরের ছাগল ও পাথরের গরু দেবতাদিগকে আগ্‌লাইতেছে, এবং বহুশতাব্দী হইতে তাহাদের দিকে মুখ ফিরাইয়া তাহাদের ধ্যানে মগ্ন রহিয়াছে।

লাল ধূলা! এই ধূলা ক্রমেই কষ্টকর হইয়া উঠিতেছে। শুষ্কতা ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতেছে। ক্রমে সেই সকল স্থানে প্রবেশ করিলাম, যেখানে অস্বাভাবিক জলকষ্ট। আকাশের সেই একই ভাব, সেই একই স্বচ্ছতা, সেই একই নীলবর্ণ।

চাষারা চারিদিকে, সেকেলে পদ্ধতি অনুসারে সুকৌশলে জলসেচন করিতেছে। ধানের ক্ষেতের ধারে ধারে ছোট ছোট জলস্রোত চলিয়াছে, তাহারই এক-হাঁটু জলে দাঁড়াইয়া, দুই দুই-জন লোক একটা রজ্জুর প্রান্ত ধরিয়া আছে, সেই রজ্জু একটা ভেড়ার চাম্‌ড়ার মসকে বাঁধা; উহারা ঐ মসকটাকে একপ্রকার যান্ত্রিক গতির দ্বারা তালে তালে দুলাইতেছে ও তাহার সঙ্গে গান করিতেছে; এবং উহাতে জল ভরিয়া, ধান-ক্ষেতের লাঙ্গল-কৃত খাতের মধ্যে ঢালিয়া দিতেছে।

গাছের তলায় যে সকল কূপ আছে তাহার প্রণালী স্বতন্ত্র, তাহার গানও স্বতন্ত্র। একটা দীর্ঘ দণ্ডের প্রান্তে একটা চাম্‌ড়ার মসক আবদ্ধ, সেই দণ্ডটা একটা মাস্তুল-কাঠের মাথার উপর বিলম্বিত; সেই দণ্ডটার উপর, দুজন লোক "জিম্‌ন্যাষ্টের" সহজ-শোভন চটুলতা সহকারে পদচারণ

করিতেছে, একদিকে তিন পা চলিলেই দণ্ডটা কূপের অভিমুখে নুইয়া পড়িতেছে এবং মসকটাও নিমজ্জিত হইতেছে; আবার উল্টা দিকে তিন পা চলিলেই দণ্ডটা এবং সেই সঙ্গে মসকটাও উঠিয়া পড়িতেছে, এইরূপ ক্রমান্বয়ে প্রভাত হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত, অবিরাম উহাদের গান চলিয়াছে।

যতই অগ্রসর হইতেছি, শুষ্কতা ততই কষ্টকর হইয়া উঠিতেছে। একটু পরেই দেখিলাম, কতকগুলা গাছ যেন আগুনে পুড়িয়া গিয়াছে, পাতাগুলা কুঁকড়িয়া গিয়াছে, এবং গাছের গায়ে লাল ধূলার যেন একটা পুরু পোঁচ পড়িয়াছে। দক্ষিণ প্রদেশে কেবল কীর্ত্তিমন্দিরগুলাই এই লাল ধূলায় রঞ্জিত হয়, কিন্তু এখানে গাছপালাও রঞ্জিত রহিয়াছে। এখানে ভূমি যেমন তৃষাতুর, আকাশ যেরূপ নির্বৃষ্টি, তাহাতে মানুষের ক্ষুদ্র চেষ্টায় আর কি হইবে? মসকগুলা ক্রমেই কূপের গভীর দেশে তলাইতেছে, এবং শুষ্ক তলদেশে জল না পাইয়া উঠিয়া পড়িতেছে! আসন্ন ভীষণ দুর্ভিক্ষের পূর্ব্বসূচনা ও বাস্তবতা ক্রমেই উপলব্ধি হইতেছে। ভারতে আসিবার পূর্ব্বে, এইরূপ উৎপাৎ প্রাগৈতিহাসিক বলিয়াই মনে করিতাম। আমাদের এই রেল-পথ ও বাষ্পীয় পোতের যুগে, খাদ্যের আমদানির অভাবে, লোকেরা অনাহারে মরিবে—ইহা দয়াধর্ম্মের বিচারে নিতান্তই অমার্জ্জনীয়।

পণ্ডিচেরীতে।

আমাদের পুরাতন ক্ষুদ্র ম্রিয়মান উপনিবেশ নগর পণ্ডিচেরীর যতই নিকটবর্ত্তী হইতেছি ততই নারিকেল তালবৃক্ষাদি আবার দেখা দিতেছে। ইহার চতুর্দ্দিকস্থ প্রদেশ এখনও সর্ব্বগ্রাসী শুষ্কতার কবলে পতিত হয় নাই; এই প্রদেশটি যেন একপ্রকার মরুকানন বলিয়া মনে হয়; এখনও ইহা নদীর জলে—বৃষ্টির জলে পরিষিক্ত; এখনও দক্ষিণ প্রদেশের সুন্দর হরিৎক্ষেত্র মনে করাইয়া দেয়।

পণ্ডিচেরী!…আমাদের পুরাতন যে সকল উপনিবেশের নাম আমার শৈশবকালের কল্পনাকে মুগ্ধ করিত তন্মধ্যে পণ্ডিচেরী ও গোরের নাম, আমার মনে সুদূর বিদেশের একপ্রকার অনির্ব্বচনীয় স্বপ্ন জাগাইয়া তুলিত। আমার যখন বয়স প্রায় দশ বৎসর, আমার এক অতিবৃদ্ধা পিতামহী একদিন সন্ধ্যাকালে, পণ্ডিচেরী-নিবাসী তাঁহার একটি মহিলা-বন্ধুর কথা আমাকে বলিয়াছিলেন এবং তাঁহার পত্র হইতে একটি অংশ আমাকে পড়িয়া শুনাইয়াছিলেন, সেই পত্রের বৎসর সেই সময়েই এক-অর্দ্ধ শতাব্দি পিছাইয়া ছিল; সেই পত্রে তিনি তালকুঞ্জের কথা, 'প্যাগোডা'র (দেবালয়) কথা বলিয়াছিলেন…

সেই সুদূরবর্ত্তী পুরাতন রমণীয় নগর, যেখানকার কাটাকুটো প্রাকারাবলীর মধ্যে সমস্ত ফরাসী-অতীতটা যেন নিদ্রামগ্ন, সেই নগরে আসিয়া, ওঃ!—আমার মনে কি একটা তীব্র বিষাদের ভাব উপস্থিত হইল! আমাদের নিস্তব্ধ মফস্বলের অভ্যন্তর-প্রদেশে যেরূপ ছোট ছোট রাস্তা, এখানেও কতকটা সেইরূপ; ছোট ছোট রাস্তাগুলি খুব সোজা, রাস্তার বাড়ীগুলা নীচু, শতবৎসরের পুরাতন, চূণকাম-করা সাদা, লাল মাটির উপর দণ্ডায়মান; উদ্যানের প্রাচীরের উপর হইতে কল্‌মি ফুলের মালা কিংবা অন্যান্য গ্রীষ্মপ্রধান দেশের পুষ্পমালা ঝুলিয়া পড়িয়াছে; গরাদে-ওয়ালা জান্‌লার পশ্চাতে কতকগুলি ফিরিঙ্গিরমণী কিংবা মেটে-ফিরিঙ্গি রমণীর মুখ দেখা যাইতেছে। সুন্দর মুখ এবং চোখে ভারতীয় গূঢ়রহস্য বিদ্যমান। 'রু রইয়াল্', 'রু ডুপ্লে' (অর্থাৎ রয়্যাল রোড, ডুপ্লে রোড)। এই নাম অষ্টাদশ শতাব্দীর অক্ষরে, পাথরের উপর সেকেলে-ধরণে খোদিত। যে নগরটি আমার জন্মস্থান, সেই নগরের কোণে, কতকগুলি পুরাতন বাড়ীর উপর এইরূপ ধরণে নাম এখনও খোদিত আছে বলিয়া আমার স্মরণ হয়। "রু স্যাঁলুই" এবং "quay (কে) ব্লাঁশ—এই quayর বানানে i র বদলে সেকেলে y…

পণ্ডিচেরীর মধ্যস্থলে, একটা বৃহৎ চত্বর, ময়দানের মত প্রসারিত, সর্ব্বদাই জনশূন্য, তৃণাক্রান্ত, এবং তাহার মাঝখানে একপ্রকার শোভা-ফোয়ারা ; বোধ হয় ইহা একশ বৎসরেরও পুরাতন নহে, কিন্তু সর্ব্বধ্বংসী সূর্য্যের প্রখর উত্তাপে জরাজীর্ণ বার্দ্ধক্যের ভাব ধারণ করিয়াছে ; উহাকে দেখিলে, কে জানে কেন, মনে এক প্রকার বিষাদের ভাব উপস্থিত হয়।

"গোরা সহরের" পরেই দেশী সহর। এই দেশী সহর খুব বড়, জীবন উদ্যমে পূর্ণ, তাছাড়া খুব হিন্দুভাবাপন্ন ;—বাজার আছে, তালকুঞ্জ আছে, দেবালয় আছে।

এখানকার ভারতবাসীরা ফরাসী, আমাদের ফ্রান্সের লোক,—অন্তত এই কথা আবৃত্তি করিতে উহারা ভালবাসে। এখানকার একটি ক্লব—নিছক্ ভারতবাসীদের ক্লব—আমাকে যেরূপ আগ্রহের সহিত আদর অভ্যর্থনা করিয়াছিল তাহা আমি বাক্যের দ্বারা প্রকাশ করিতে পারি না—উহা বড়ই মর্ম্মস্পর্শী। উহারা নিজের চেষ্টা ও যত্নে এই ক্লবটি স্থাপন করে। যাহাতে আমাদের মাসিকপত্রিকা, আমাদের পুস্তকাদি পাঠ করিবার সুবিধা হয় এই উদ্দেশেই ক্লবটি স্থাপিত।

আমাদের ভাষাকে আরও দেশব্যাপ্ত করিবার জন্য, উহারা এই ক্লবের সঙ্গে একটা বিদ্যালয়ও যুড়িয়া দিয়াছে। যে সকল ছোট ছোট ছাত্র-গুলিকে উহারা আমার সমক্ষে আনিল, উহারা কি সৌম্য সুন্দর! আট বৎ-সরের বালক, সুগঠিতাবয়ব শ্যামল মুখমণ্ডল, কেমন ভদ্র, কেমন শিষ্ট, ছোট ছোট ক্ষুদে রাজার মত, উহাদের জরির পাড়ওয়ালা মখমলের পরিচ্ছদ। উহারা বিবিধ সমস্যা ও ফরাসীদের কর্ত্তব্য সকল যেরূপ স্পষ্ট করিয়া বিবৃত করিল তাহা আমাদের নিম্ন পাঠশালার অধিকাংশ ছাত্রের পক্ষে দুরূহ।

বাই-নাচ।

দীর্ঘায়াত নেত্র বিশিষ্ট, রং-করা একটি তরুণ মুখ,—ইন্দ্রিয়াসক্তি-পরি-ব্যঞ্জক মুখ,—তিমির-রাজ্যের মুখ—খুব লঘুভাবে, তাড়াতাড়ি একবার

এগিয়া আসিতেছে, আবার পিছিয়া যাইতেছে। চোখের দুইটি তারা, মিনা-র সাদা জমির উপর বসানো কৃষ্ণমণির (Onyx) মত কালো দুইটি তারা আমার চোখের উপর নিবদ্ধ। এই যে হৃদয়-দুর্গ অধিকার করিবার জন্য একবার আমাকে আক্রমণ করিতেছে, আবার পলায়ন করিয়া ছায়ান্ধকারের মধ্যে মিশিয়া যাইতেছে, একবার এগিয়া আসিতেছে, আবার পিছাইয়া যাইতেছে,—এই সমস্ত ক্ষণ উহার চোখের দুইটা কালো তারা আমার চখের উপর সমানভাবে নিবদ্ধ রহিয়াছে। এই শ্যামল তরুণ মুখখানি মণিরত্নে বিভূষিত; হীরক-খচিত একটা সোণার সিঁথি ললাট বেষ্টন করিয়া, চুল ঢাকিয়া রগের দিকে নামিয়া আসিয়াছে; কাণে ও নাকে আরও কতকগুলি হীরার টুক্‌রা ঝিক্ মিক্ করিতেছে।

আলোকোজ্জ্বল রাত্রি। জনতার মধ্যে, এই রমণীকে ছাড়া আমি আর কাহাকেও দেখিতেছি না, উহার ঐ সিঁথি-বিভূষিত মস্তক ছাড়া আর কিছুই দেখিতেছি না। উহার উজ্জ্বলতা যেন আমাকে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। দর্শক-বৃন্দের জনতাও আছে—সম্মুখ দিকে ঠেলিয়া আসিয়া উহারাও রমণীকে একদৃষ্টে দেখিতেছে; এতটা ঠেলিয়া আসিয়াছে যে রমণী অতি কষ্টে ঘোরাফেরা করিতেছে—উহারা রমণীর জন্য কেবল একটি সরু পথের মত স্থান রাখিয়া দিয়াছে; সেই স্থানটুকুর মধ্য দিয়া, নর্ত্তকী একবার আমার নিকট আসিতেছে আবার আমার নিকট হইতে পলায়ন করিতেছে; কিন্তু আমার চক্ষে জনতার যেন অস্তিত্বমাত্র নাই; বস্তুত সেই রমণীকে ছাড়া,—সেই রমণীর শিরোভূষণটি ছাড়া, তাহার সেই চোখের কালো তারা ও কালো ভুরুর খেলা ছাড়া, আমি যেন আর কাহাকেও দেখিতে পাইতেছি না—কিছুই দেখিতে পাইতেছি না… বেশ মোটা-সোটা ও মাংসল হইলেও, উহার দেহযষ্টি ভুজঙ্গের ন্যায় সুনম্য; বিধাতা যেন মনোহরণ ও আলিঙ্গনের জন্যই উহার বাহু দুটি গড়িয়াছেন; রমণী, হীরক মাণিক্য-খচিত বলয়-কেউরাদি ভূষণে আস্কন্ধ-বিভূষিত

বাহুযুগলকে ভুজঙ্গ-গতির অনুকরণে কত রকম করিয়া বাকাইতেছে···কিন্তু না, সর্ব্বাগ্রে উহার চোখের দৃষ্টি আমার চোখের অন্তস্তল পর্য্যন্ত এমন ভাবে ভেদ করিতেছে যে আমার সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিতেছে; ঐ চোখে নানাপ্রকার ভাব খেলিতেছে—কখন পরিহাসের ভাব, কখনও স্নিগ্ধ কোমল প্রেমের ভাব···উহার মণিরত্নখচিত শিরোভূষণের, ও কর্ণ-নাসিকার অলঙ্কারের এরূপ উজ্জ্বলতা এবং ঐ উজ্জ্বল সোনার সিঁথিটি এমন পরিপাটিরূপে উহার মুখটি বেড়িয়া আছে, যে তাহাতে ঐ সুন্দর শ্যামল মুখখানিতে কি জানি কি একটা অস্পষ্ট দূরত্বের ভাব আসিয়া পড়িয়াছে—আমাকে স্পর্শ করিলেও যেন সে দূরত্ব ঘুচিবার নহে।

সে যাইতেছে, আবার আসিতেছে; নর্ত্তকী বিশেষ করিয়া আমার জন্যই নাচিতেছে। উহার নৃত্যে লেশমাত্র শব্দ নাই। গালিচার উপর কেবল উহার পায়ের মৃদুমধুর নূপুরধ্বনি শুনা যাইতেছে। উহার ছোট ছোট পা-দুখানির আঙ্গুলগুলি ছড়ানো, আংটীর দ্বারা ভারাক্রান্ত; গালিচার উপরে পা-দুখানি তালে-তালে ফেলিতেছে; এবং পায়ের আঙ্গুলগুলাও হাতের মত কেমন সহজভাবে নাড়িতেছে।

ফুলের গন্ধে এখানকার বাতাস এমন পরিষিক্ত যে নিশ্বাস রুদ্ধ হইয়া যায়। এখানকার হিন্দুরা, হিন্দু-ফরাসীরা—আমার জন্য এই উৎসবের আয়োজন করিয়াছে, এবং উহাঁদের মধ্যে যিনি সর্ব্বাপেক্ষা ধনবান্, আমি নিমন্ত্রিত হইয়া তাঁহারই বাড়ীতে আসিয়াছি। আমি আসিবামাত্র গৃহস্বামী আমার গলায় কয়েক ছড়া জুঁই ফুলের মালা পরাইয়া দিলেন; সৌরভে ঘর ভরিয়া গেল—আমার যেন একটু নেশার ঘোর লাগিল; লম্বা-গলা-বিশিষ্ট একটা রূপার গোলাব্‌দান হইতে খানিকটা গোলাপ জলও আমার উপর ছিটাইয়া দেওয়া হইল। গরমে হাঁপাইয়া উঠিতেছি। যে সকল নিমন্ত্রিত লোক বসিয়া আছে—(অধিকাংশই জরির পাড়ওয়ালা-পাগড়ী-পরা শ্যামবর্ণ লোক) দণ্ডায়মান নগ্নকায় ভৃত্যেরা তাহাদের মাথার উপর,

রং-চঙে বড় বড় তালপাতার পাখা ব্যজন করিতেছে; যেখানে লোকেরা বেশভূষায় বিভূষিত—এমন কি পুরুষেরা পর্য্যন্ত কাণে হীরা পরিয়াছে—কোমরবন্দে হীরা পরিয়াছে—সেই জনতার মধ্যে ভৃত্যদের এইরূপ নগ্নতা কেমন বিসদৃশ বলিয়া মনে হয়।

নর্ত্তকীকে উহারা বলিয়াছে,—আমারই জন্য এই উৎসবের আয়োজন; তাই, চতুর অভিনেত্রী এবং বংশপরম্পরাক্রমে পেষাদার এই নর্ত্তকী, আমার উপরেই তাহার সমস্ত চাতুরী প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

আজিকার রাত্রির জন্য, উহাকে বহুদূর হইতে আনা হইয়াছে—এই প্রসিদ্ধ নর্ত্তকী, দক্ষিণ প্রদেশের কোন এক বৃহৎ দেবালয়ে মহাদেবের সেবায় নিযুক্ত। উহাকে আনিতে অনেক অর্থব্যয় হইয়াছে।

নর্ত্তকী সম্মুখ দিকে ঝুঁকিতেছে কিংবা ধনুকের মত বাঁকিয়া পড়িতেছে, হাতের আঙ্গুল বাকাইয়া, পায়ের আঙ্গুল ঘুরাইয়া কত রকম ভঙ্গী করিতেছে। শৈশবাবধি অভ্যাসের দ্বারা উহার পায়ের আঙ্গুলগুলা বেশ সুনম্য হইয়াছে; পায়ের বুড়া আঙ্গুলটা সর্ব্বদাই অন্য আঙ্গুল হইতে বিচ্ছিন্ন এবং সিধা ভাবে উপরপানে তোলা। সোনালী গাজের শাড়ীতে নিতম্বদেশ আচ্ছাদিত এবং বক্ষদেশ আঁট সাঁট কাঁচুলীতে আবদ্ধ—তাহাতে শ্যামল গাত্র ও মাংশপেশীযুক্ত মাংসল শরীরের একটু আভাস পাওয়া যাইতেছে, বক্ষের নিম্ন অংশের নড়াচড়া দেখা যাইতেছে।

উহার নৃত্যে কেবলই কতকগুলি অঙ্গভঙ্গী ও হাব্-ভাব; যে নাট্যাভিনয়ে কথোপথন নাই,—কেবল একজন মাত্র অভিনয় করে, সেইরূপ নাট্যের যেন ইহা মূক অভিনয়; আর আমার চোখের উপর চোখ নিবদ্ধ করিয়া, সেই জনতা-বিরচিত সরু পথের মধ্য দিয়া, একবার আমার নিকটে এগিয়া আসিতেছে, আবার সহসা আলোকিত নৃত্যশালার শেষপ্রান্তে পিছিয়া যাইতেছে।

এইবার নর্ত্তকী, মনোহরণ ও ভর্ৎসনার একটা দৃশ্য অভিনয় করি-

তেছে। ঐ ওদিকে উহার পশ্চাতে কতকগুলি বাদক গান গাহিয়া এই দৃশ্যটির ভাব ব্যক্ত করিতেছে এবং গানের সঙ্গে বাঁয়া-তব্‌লা ও বাঁশী বাজাইতেছে। নর্ত্তকীও মূক-অভিনয়ের সঙ্গে সঙ্গে মৃদুস্বরে যেন স্বগত গাইতেছে; সে গান আর কাহাকে শুনানো যেন তাহার উদ্দেশ্য নয়—কেবল অভিনয়ের অংশগুলা পর-পর যাহাতে তাহার স্মরণে আইসে এইজন্যই যেন আপনার মনে গাইতেছে।

এই নর্ত্তকী নৃত্যশালার একপ্রান্তে কিছুক্ষণ অন্ধকারের মধ্যে ছিল,—সহসা আবার আসিয়া উপস্থিত;—উহার দেহ আপাদ-মস্তক সোনা ও জহরতে আচ্ছন্ন, উহার চোখ্‌ দিয়া যেন আগুন ছুটিতেছে; কুপিতা নায়িকার ন্যায় রোষকষায়িত-নেত্র হইতে আমার উপর তীক্ষ্ণ বাণ বর্ষণ করিতেছে; আমি যেন উহার নিকট কি একটা অপরাধ করিয়াছি—তাহারই জন্য যেন সে স্বর্গ মর্ত্তকে সাক্ষী রাখিয়া, আমাকে ভৎর্সনা করিতেছে…

তার পর, নর্ত্তকী হঠাৎ উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল, সে হাসি পরিহাসের হাসি, ঘৃণার হাসি; জনতার নিকট আমাকে হাস্যাস্পদ করিবার জন্য আমার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া হাসিতে লাগিল। জানা কথা, উহার ভৎর্সনাও যেমন কৃত্রিম, এই উপহাসও সেইরূপ কৃত্রিম। কৃত্রিম হউক, কিন্তু আসলের ঠিক্‌ নকল;—চমৎকার নকল।

নর্ত্তকী, কণ্ঠ একটু উত্তোলন করিয়া, একটু গম্ভীর স্বরে, তীব্র হাসি হাসিতেছে। তাহার হাসি—মুখ দিয়া, ভুরু দিয়া, উদর দিয়া, কম্পবান বক্ষ দিয়া, যেন ফাটিয়া বাহির হইতেছে। হাসির আবেশে উহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতেছে এবং এইরূপ হাসিতে হাসিতে সে দূরে সরিয়া যাইতেছে। সে হাসি দুর্দ্দমনীয়, সে হাসি শুনিলে অন্যকেও হাসিতে হয়।

আর যেন আমার মুখদর্শন করিবে না, এইভাবে অত্যন্ত অবজ্ঞা সহকারে, মুখ ফিরাইয়া, নর্ত্তকী দ্রুতপদক্ষেপে পিছাইতে পিছাইতে চলিয়া গেল। আবার ফিরিয়া আসিল—কিন্তু এবার ধীরপদক্ষেপে ও গম্ভীর-

ভাবে ফিরিয়া আসিল। আমার উপর তাহার প্রবল ভালবাসা পড়িয়াছে; সে সর্ব্বজয়ী মদনের নিকট পরাভূত হইয়া, আমার দিকে বাহুপ্রসারিত করিয়া করযোড়ে মার্জ্জনা ভিক্ষা করিতেছে; আমাকে তাহার সর্ব্বস্ব দান করিবে বলিয়া অনুনয় করিতেছে, ইহাই তাহার শেষ প্রার্থনা। এবার যখন চলিয়া গেল, তখন তাহার দেহ একটু হেলিয়া পড়িয়াছে, ওষ্ঠদ্বয় একটু ফাঁক হইয়া তাহার মধ্য হইতে শুভ্র দন্তরাজি প্রকাশ পাইতেছে; তাহার নাসিকায় হীরকের টুক্‌রাগুলি ঝিক্‌মিক্ করিতেছে; সে চায়—সে নিতান্তই চায়, আমি তাহার অনুসরণ করি; সে তাহার বাহুর দ্বারা, তাহার কম্পিত বক্ষের দ্বারা, তাহার অর্দ্ধনিমীলিত নেত্রের দ্বারা আমাকে ডাকিতে লাগিল; সে চুম্বকমণির মত, সর্ব্বান্তঃকরণে আমাকে আকর্ষণ করিতে লাগিল; আমিও মন্ত্রমুগ্ধ অবস্থায়, ক্ষণেকের জন্য তাহাকে অনুসরণ করিলাম; কেন না, সে আমাকে সত্যই মন্ত্রমুগ্ধ করিয়াছিল। কিন্তু আসলে তাহার এই প্রেমের আহ্বানটা সর্ব্বৈব মিথ্যা; হাসির মত এই প্রেমের প্রকাশও তাহার অভিনয়ের একটা অংশ মাত্র; একথা সবাই জানে, তবু তাহাতে আকর্ষণের কিছুই লাঘব হয় না; প্রত্যুত, এই আহ্বান মিথ্যা বলিয়া জানি বলিয়াই যেন উহার এই দুষ্ট আকর্ষণের মাত্রাটা আরও বৃদ্ধি হয়…

যতক্ষণ সে অভিনয় করিতেছিল, বাদকদলের দুই গায়কের সহিত সে যেন একপ্রকার চুম্বক-আকর্ষণে সংযুক্ত কিংবা একটা অদৃশ্য বন্ধনে আবদ্ধ ছিল।

তাহারা তাহার তিন চারি পা পশ্চাতে থাকিয়া, তাহারই সঙ্গে সঙ্গে এগিয়া আসিতেছে—পিছাইয়া যাইতেছে। সে যখন এগিয়া আসে, তাহার পিছনে পিছনে তাহারাও এগিয়া আসে,—এবং পিছাইবার সময় হইলে তাহারাই আগে পিছাইতে আরম্ভ করে। তাহারা কখনই তাহাকে নজর-ছাড়া করে না; উহাদের চোখ্ যেন জ্বলিতেছে, ওষ্ঠ অনেকটা উদ্ঘাটিত রহিয়াছে, আর উচ্চৈঃস্বরে গান করিতেছে; মস্তক সম্মুখে

এগিয়া আসিয়াছে, ঝুঁকিয়া রহিয়াছে; উহারা মাথায় উঁচু, নর্ত্তকী ক্ষুদ্রকায়; উহারাই যেন নর্ত্তকীর প্রভু; উহাদেরই প্রভাবে যেন উহার ভাবস্ফূর্ত্তি হইতেছে, উহারাই উহার মনকে অধিকার করিয়া রহিয়াছে; —যেন একটা উজ্জ্বল লঘুকায় প্রজাপতির উপর ফুঁ-দিয়া নিজের খেয়াল-অনুসারে উহাকে যেখানে সেখানে চালাইয়া লইয়া বেড়াইতেছে। উহার মধ্যে, কি জানি কেমন একটা বিকৃতভাব—কেমন একটা কুটিল নষ্টামির ভাব পরিলক্ষিত হয়।

বাদকদলের পাশে, আরও দুই তিনটি নর্ত্তকী রহিয়াছে,—উহারই মত বেশভূষায় সুসজ্জিত। উহারা প্রথমেই নাচিয়াছে। উহার মধ্যে একজনকে আমার ভারী অদ্ভুত বলিয়া ঠেকিয়াছিল; যেন একপ্রকার বিষাক্ত সুন্দর ফুল, পাত্‌লা ও লম্বা; মুখটা সরু; একেই ত বড় বড় টানা চোখ্, তাতে আবার সুর্ম্মা দেওয়ায় আরও বেপরিমাণ দীর্ঘ হইয়াছে; চুল খুব কালো, দুই গালের উপর দিয়া, খুব 'পেটে-পাড়ানো' ভাবে ফিতার মত নামিয়াছে; শুধু কালো পরিচ্ছদ, কালো শাড়ী, সরু জরির পাড়-ওয়ালা একটা কালো ওড়না; অলঙ্কারের মধ্যে শুধু মাণিকের অলঙ্কার; হাতে মাণিক, বাহুতে মাণিক; এবং একগুচ্ছ মাণিক নাসিকা হইতে লম্বিত হইয়া ওষ্ঠের উপর ঝুলিয়া পড়িয়াছে, মনে হইতেছে যেন রক্তপায়ী রাক্ষসীর মুখে এখনও রক্তের দাগ লাগিয়া রহিয়াছে।

কিন্তু যখন আবার সেই স্বর্ণভূষণা নর্ত্তকী—সেই নর্ত্তকীবৃন্দের রাণী, নর্ত্তকীবৃন্দের উজ্জ্বল তারা,—বাদকদলে পরিবেষ্টিত হইয়া আবার সহসা আবির্ভূত হইল, তখন উহাদের স্মৃতি, আমার মন হইতে একেবারেই অন্তর্হিত হইল। শেষ নৃত্যের জন্য উহাকেই রাখা হইয়াছিল।

এই নর্ত্তকী অনেকক্ষণ ধরিয়া নৃত্য করিল; যদিও এই নৃত্যে আমার ক্লান্তিবোধ হইতেছিল, তবুও সেই সঙ্গে ভয়ও হইতেছিল, কোন্ মুহূর্ত্তে না জানি তাহার নৃত্যের অবসান হইবে, আমি তাহাকে আর দেখিতে পাইব না।

আবার সেই ভৎর্সনা, সেই দুর্দ্দমনীয় হাসি, নেত্রভঙ্গীতে সেই বিদ্রূপের ভাব, আবার সেই নিরঙ্কুশ প্রেমের আহ্বান…

যাই হোক্, নর্ত্তকী এইবার থামিল। সব শেষ হইয়া গেল; আমার চমক ভাঙ্গিল; যে সব লোক সেখানে ছিল তাহাদিগকে আবার আমি দেখিতে পাইলাম। আমার অভ্যর্থনার জন্যই এই মজলিসের আয়োজন হইয়াছিল; আবার আমি মজলিসের বাস্তব ভূমিতে পদার্পণ করিলাম।

এইবার প্রস্থানের সময় হইয়াছে। প্রস্থানের পূর্ব্বে, নর্ত্তকীকে আমি অভিনন্দন করিতে গেলাম। দেখিলাম, নর্ত্তকী একটা মিহি রুমাল দিয়া মুখ মুছিতেছে; উহার বড় গরম বোধ হইতেছে, মুক্তাফলের ন্যায় স্বেদ-বিন্দু উহার ললাটে, উহার শ্যামল মসৃণ গাত্রে দেখা দিয়াছে। এখন সে আদব্-কায়দা-দুরস্ত, পাষাণ-শীতল, সুবিনীত, উদাসীন, হৃদয়-হীন অভিনেত্রী মাত্র; সে কৃত্রিম লজ্জার সহিত, আমার প্রশংসা গ্রহণ করিল, আমাকে সেলাম করিল; প্রত্যেকবারেই, অঙ্গুরী-বিভূষিত-সর্ব্বাঙ্গুলি—হস্তযুগলের দ্বারা আপনার মুখ ঢাকিতে লাগিল…

শত সহস্র বৎসর হইতে বংশানুক্রমে যাহাদের ব্যবসায় চলিয়া আসিতেছে সেই পুরাতন নর্ত্তকীর বংশে ইহার জন্ম, ইহার হৃদয়ে মোহবিভ্রম ও ভোগবিলাস ছাড়া আর কি থাকিতে পারে ?…

পণ্ডিচেরী ছাড়িয়া।

কাল পণ্ডিচেরী ছাড়িয়া, নিজামের রাজ্যের ভিতর দিয়া, ভারতের দুর্ভিক্ষ পীড়িতপ্রদেশ রাজপুতদের রাজ্যে যাত্রা করিব।

আমাদের পুরাতন উপনিবেশে আমি হদ্দ দশ দিন মাত্র রহিয়াছি, আশ্চর্য্য, ইহারই মধ্যে এই স্থান ছাড়িয়া যাইতে আমার কেমন একটু কষ্টবোধ হইতেছে। এতদিন ত আমি ভারতের একস্থান হইতে স্থানান্তরে লঘুহৃদয়ে প্রস্থান করিয়াছি! কেহ মনে করিতে পারে, আমি

যেন পণ্ডিচেরীতে দ্বিতীয়বার আসিয়াছি, যেন আমার মনে পণ্ডিচেরীর পূর্ব্বস্মৃতি জাগিয়া উঠিয়াছে। আমার প্রথম যৌবনে, সেনেগ্যালের সেই নির্ব্বাপিত পুরাতন নগর Saint-Louisতে একবৎর বাস করিয়া, প্রস্থানের সময় আমার মনে যেরূপ ভাব হইয়াছিল, এখান হইতে যাইবার সময়েও কতকটা সেইরূপ ভাব উপস্থিত হইয়াছে।

আমি এখানে আসিয়া একটা হোটেলে ছিলাম। পণ্ডিচেরীতে দুইটা হোটেল আছে; কিন্তু পর্য্যটক আগন্তুকের অভাবে, দুইটা হোটেলই কোনপ্রকারে কষ্টেস্বষ্টে চলে। যে হোটেলটা সমুদ্রের ধারে অবস্থিত আমি সেই হোটেলটা বাছিয়া লইয়াছিলাম। হোটেলের বাড়ীটা একটু সেকেলে রাঁজ-রাজড়ার বাড়ীর মত, নগরের গোড়াপত্তন হইতে উহার নির্ম্মাণকাল ধরা যাইতে পারে; উহার জরাজীর্ণতা চূণকামে ঢাকা পড়িয়াছে। উহার ভগ্নদশা দেখিয়া, পোড়োভাব দেখিয়া, আমি একটু ভয়ে ভয়ে প্রবেশ করিয়াছিলাম। তখন কে বলিতে পারিত, যদৃচ্ছালব্ধ এই প্রবাস-গৃহটির উপর আমার আসক্তি জন্মিবে? আমি একটা বড় কাম্‌রা অধিকার করিয়া ছিলাম, বয়ঃপ্রভাবে কাম্‌রাটা একটু বাঁকিয়া গিয়াছে, চূণকামে ধব্‌ধব্‌ করিতেছে এবং ভিতরটা প্রায় খালি। আফ্রিকার উপকূলে যে বাড়ীটিতে আমি অনেকদিন বাস করিয়াছিলাম, তাহার সহিত উহার কি-যেন একটা অনির্দ্দেশ্য ও ঘনিষ্ঠতর সাদৃশ্য আছে। সবুজ খড়খড়িওয়ালা জান্‌লা হইতে ভারতের অসীম সমুদ্র দেখা যায়; দিনের যে সময়টা অত্যন্ত কষ্টজনক সেই সময়ে বহিঃসমুদ্রের স্নিগ্ধ বায়ু আদর্শ-শৈত্যে বহন করিয়া আনে। ফিরিঙ্গিদের ঘরে যেরূপ থাকে,—সেইরূপ আমার ঘরে, শত বর্ষের পুরাতন কতকগুলা কাঠের আরাম-কেদারা ছিল; কেদারার কিনারায় খোদাই-কাজ। ষোড়শ লুইর আমলের একটা দেয়াল-ঘেঁসা অর্দ্ধ-টেবিলের উপর সেই সময়কার একটা ঘড়ি ছিল। তাহার টিক্‌ টিক্‌ শব্দে জানা যায় তাহার জরাগ্রস্ত ক্ষুদ্রপ্রাণটা এখনও একটু

ধুক্‌ধুক্‌ করিতেছে। সমস্ত আস্‌বাবই শুষ্ক-জীর্ণ, পোকা-খাওয়া, ভগ্নপ্রায়; কেদারায় খুব চাপিয়া বসিতে কিংবা খাটের উপর ধড়াস্‌ করিয়া শুইয়া পড়িতে সাহস হয় না! কিন্তু দিনগুলি বড়ই রমণীয় ও উপভোগ্য; বায়ু নিস্তব্ধ, সমুদ্রের দিগন্ত সুনীল, চতুর্দ্দিকের সামুদ্রিক শান্তি অতীব মধুর।

জান্‌লার উপর হাতের কুনুই রাখিয়া ঝুঁকিয়া দেখিলে আরও অনেকটা সমুদ্র ও সমুদ্রের বেলাভূমি, নিকটস্থ অনেক পুরাতন বাড়ীর বারাণ্ডা, ও আরব-ধরণের ছাদ দেখা যায়,—ছাদ্‌গুলা সূর্য্যোত্তাপে ফাটিয়া গিয়াছে; এই সমস্ত দেখিয়াও আমার আফ্রিকা মনে পড়ে। প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত, একদল নগ্নকায় মজুর পার্শ্ববর্ত্তী একটা অঙ্গনে, জাহাজ বোঝাই করিবার জন্য, শস্যের দানা ও বিবিধ মস্‌লা চটাই-থলের মধ্যে ভরিতেছে, আর একপ্রকার ঘুমন্ত সুরে গান করিতেছে।

কি দিন, কি রাত্রি,—আমি দরজা জান্‌লা কখনই বন্ধ করিতাম না, পাখীরা আপনার ঘরের মত স্বচ্ছন্দে আমার ঘরে আসিত; চড়াইরা আমার ঘরের মেজের মাদুরের উপর নির্ভয়ে বিচরণ করিত; ছোট ছোট কাঠবিড়ালীরাও, চারিদিকটা এক নজরে একবার দেখিয়া লইয়া ভিতরে প্রবেশ করিত, আমার সমস্ত আস্‌বাবের উপর চলিয়া বেড়াইত; একদিন প্রাতে দেখিলাম, দুইটা দাঁড়কাক আমার মশারীর কোণে বসিয়া আছে।

আমার বাড়ীর চতুদ্দিকে, ছোট ছোট নিস্তব্ধ রাস্তাগুলা (রাস্তার নামগুলা সেকেলে ধরণের) প্রখর সূর্য্যোত্তাপে যখন প্রপীড়িত হইতেছে—সেই মধ্যাহ্ন সময়ে—ওঃ! কি বিষাদময় নিস্তব্ধতা! আমার কাম্‌রার মধ্যে কিংবা কাম্‌রার চারিদিকে আধুনিক কালের কোন চিহ্নই নাই; এই সকল বিজন বারাণ্ডার কিংবা অদূরের ঐ অসীম নীল মরুক্ষেত্রের কালনির্ণয় করিবার কোন নিদর্শন নাই। যাহারা শস্যের বস্তা প্রস্তুত করিতে ব্যাপৃত

রহিয়াছে তাহাদের শান্তিময় ভাব,—পূর্ব্বকালের উপনিবেশ-জীবনের একটা দৃশ্য মনে করিয়া দেয়। তখনকার কালে, এরূপ উন্মত্ত ব্যস্তভাব ছিল না, কার্য্যের কঠোরতা ছিল না, দ্রুতগতি বাষ্পপোত ছিল না; তখন খাম-খেয়ালী পালের জাহাজ, আফ্রিকা ঘুরিয়া কত বিলম্বে এখানে আসিত...

যাইবার সময় আমার যে কষ্ট হইয়াছিল তাহা অবশ্য গভীর নহে; কালই আমি সমস্ত কষ্ট ভুলিয়া যাইব, আমার সম্মুখে আবার কতকগুলা নূতন দৃশ্য আবির্ভূত হইয়া এই কষ্টের ভাবকে মন হইতে বিদূরিত করিবে। কিন্তু, পুরাতন ফ্রান্সের যে ক্ষুদ্র একটি কোণ, পথ হারাইয়া বঙ্গোপসাগরের তীরে আসিয়া পড়িয়াছে, উহা যেমন আমার মনকে আট্‌কাইয়াছে—এই পরমাশ্চর্য্য ভারতে যাহা কিছু এ পর্য্যন্ত আমি দেখিয়াছি, কিংবা পরে আরও যাহা দেখিব, তাহার কিছুই এরূপ করিয়া আমাকে আট্‌কাইতে পারে নাই কিংবা পারিবে না।

হৈদরাবাদের অভিমুখে।

আর সে তৃণশ্যামলা ভূমি নাই; আর সে তালজাতীয় বৃক্ষাদি নাই; আর সে লাল মাটি দেখা যায় না। বেশ একটু শীত পড়িয়াছে।... পণ্ডিচেরী ও মাদ্রাজের হরিৎশ্যামল প্রদেশ ছাড়িয়া আসিবার পর,—সমস্ত-রাত্রি ভ্রমণ করিয়া আজ যখন প্রথম জাগ্রত হইলাম, তখন এই সমস্ত পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইল। সেই "চিরকেলে" কাকদিগের কা-কা-ধ্বনি ছাড়া আর সমস্তই পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। হাজাপোড়া মাটি, ধূসরবর্ণের মাঠ, জোয়ারিশস্যের ক্ষেত, পর্য্যায়ক্রমে দৃষ্টিগোচর হইতেছে। নারিকেলের পরিবর্ত্তে শুধু কতকগুলা বিরল মুসব্বরতরু, শীর্ণকায় তাপশুষ্ক খর্জ্জুরবৃক্ষ—গ্রামপল্লির চতুর্দ্দিকে লক্ষিত হইতেছে। মনে হয়, এখানকার গ্রামগুলিও

যেন একটা কৃত্রিম আর্‌বী-ভাব ধারণ করিয়াছে। অগ্নিস্ফুলিঙ্গবর্ষী মরুভূমির সহিত,·বিষাদময় প্রদেশসমূহের সহিত যে ইস্‌লামজাতির চিরসম্বন্ধ; সেই ইস্‌লামজাতি এখানে আসিয়া যেন তাহাদের জাতীয়ভাবটি মুদ্রিত করিয়া দিয়াছে।

পরিচ্ছদেরও পরিবর্ত্তন। লোকদিগের গাত্র আর নগ্ন দেখা যায় না, পরন্তু শুভ্র পরিচ্ছদে সর্ব্বাঙ্গ আবৃত। আর সে দীর্ঘলম্বিত কেশগুচ্ছ দেখা যায় না, পরন্তু মস্তক উষ্ণীষের দ্বারা আচ্ছাদিত।

মাঠময়দানের উপর দিয়া যতই অগ্রসর হওয়া যায়, ততই দেখা যায়, ঘণ্টায়-ঘণ্টায় যেন শুষ্কতার বৃদ্ধি হইতেছে। যে-সব ধান্যক্ষেত্রের উপর হলকর্ষণের রেখাচিহ্ন বিদ্যমান, সেই ক্ষেতগুলি যেন আগুনে জ্বলিয়া-পুড়িয়া গিয়াছে। জোয়ারি-ক্ষেতগুলি অপেক্ষাকৃত তাপসহ হইলেও, তাহার অধিকাংশই "হল্‌দে-মারিয়া" গিয়াছে। যে-সব ক্ষেত এখনো টিঁকিয়া আছে, সেই সব ক্ষেতের স্বল্পাবশিষ্ট শস্য পাছে পাখী ও ইঁদুরে খাইয়া ফেলে, সেইজন্য কৃষকেরা মাচার উপর বসিয়া পাহারা দিতেছে। হায় হায়! বেচারা মানুষ, দুর্ভিক্ষপীড়িত হইয়া, ক্ষুধাক্লিষ্ট দুঃসাহসী পশুর গ্রাস হইতে দুইচারিমুঠা শস্য বাঁচাইবার জন্য প্রাণপণে যুঝাযুঝি করিতেছে।

শীতরাত্রির অবসানে সূর্য্যদেব চুল্লিসুলভ প্রখর তাপ ভূমির উপর নির্দ্দয়ভাবে ঢালিয়া দিলেন। আকাশ স্বচ্ছ নীলবর্ণ ধারণ করিয়া একটা বিশাল নীলকান্তমণির ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল।

দিবাবসানে, এখানকার ভূভাগ, এক অপূর্ব্বভাব ধারণ করিল। অফুরন্ত তাপদগ্ধ জোয়ারি-ক্ষেতের উপরে, তাপদগ্ধ জঙ্গলের মধ্যে, প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড শ্যামল পাষাণস্তূপ;—বিচিত্র আকারের, মসৃণগাত্র, অসংলগ্ন বড়-বড় গণ্ডশৈল। মনে হয়—যতপ্রকার অদ্ভুত ভঙ্গীতে,—অদৃঢ়ভাবে—কোন-এক পদার্থকে বসান যাইতে পারে, সেইরূপ উহাদিগকে বসানো হইয়াছে। কোনোটা একেবারে খাড়া হইয়া আছে; কোনোটা ঝুঁকিয়া

আছে ; এবং এই বিচিত্র-আকারের প্রস্তরগুলি এরূপভাবে পুঞ্জীভূত যে, উহাতে কতকটা পর্ব্বতের সাদৃশ্য উপলব্ধি হয়। আবার উহাদের মধ্যে কতকগুলি বাস্তবিকই পর্ব্বতের ন্যায় উচ্চ।

অবশেষে, সূর্য্যাস্তসময়ে হৈদরাবাদ দৃষ্টিগোচর হইল। শাদা ধূলায় আচ্ছন্ন — সব শাদা। সেই মুসলমানী-ধরণের বারণ্ডাওয়ালা ছাদ ; সেই লঘুগঠনের ধ্বজচূড়াসমূহ (Minaret)। চতুর্দ্দিকস্থ তরুপল্লব শুষ্ক ও মুমূর্ষু। মনে হয় যেন ঋতুনিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে ;—গ্রীষ্মসায়াহ্নে যেন বিষণ্ণ শরতের আবির্ভাব। নগরের পাদদেশ দিয়া যে নদীটি বহিয়া যাইতেছে, উহার তল-পরিসর বৃহৎ মূলনদীর ন্যায় ; কিন্তু উহার জল প্রায় শুকাইয়া গিয়াছে ; উহার জল এত নিম্নতলে যে, প্রায় দৃষ্টিগোচর হয় না। হাতীরা দলে-দলে (তটভূমিরই ন্যায় ধূসরবর্ণ) ধীরপদক্ষেপে একেবারে নীচে নামিয়া যাইতেছে। নদীতে অবতরণ করিয়া উহারা জলপান করিবে—স্নান করিবে।

দিবাবসানের সঙ্গে-সঙ্গে, নগরের পশ্চাদ্ভাগে, পশ্চিমদিক্‌টা যেন আগুনের মত লাল হইয়া উঠিল। ভস্মাচ্ছন্ন নীলিমায় নগরের সমস্ত শুভ্রতা যেন নির্ব্বাপিত হইল। এ-হেন সুন্দর আকাশে, এই সময়ে বাদুড়েরা নিঃশব্দে সঞ্চরণ করিতেছে।

হৈদরাবাদে।

কিন্তু যাহাই হউক, প্রতিবেশী রাজপুতের ন্যায়, এই রাজ্যের লোকেরা এখনও ক্ষুধার জ্বালায় ততটা অভিভূত হয় নাই এবং পরীস্থানতুল্য উহাদের রাজধানীটি আজ উৎসব-আনন্দে আকণ্ঠ-নিমগ্ন ;—উহারা নিজামের শুভাগমন প্রতীক্ষা করিতেছে। সমস্ত গৃহের পতাকায়, এবং রাজপথে রেশম-মখ্‌মল-মণ্ডিত যে-সব বিজয়তোরণ স্থাপিত হইয়াছে তাহাদের

শিরোদেশে, এই কথাগুলি বড়-বড় সোনালি অক্ষরে লিখিত রহিয়াছে :—
"আমাদের নিজামবাহাদুর দীর্ঘজীবী হউন।"

শুভ্রবর্ণ হৈদরাবাদ। একটি শুষ্কপ্রায় নদী সম্মুখ দিয়া বহিয়া যাইতেছে; হাতীরা দলে-দলে নদীতে নাবিয়া উহার শীতল জলে অবগাহন করিতেছে। এখনো কেন নিজাম স্বরাজ্যে প্রত্যাগমন করিতেছেন না—তাই, উৎসবমত্ত হৈদরাবাদ,—ধ্বজপতাকাভূষিত হৈদরাবাদ, একসপ্তাহ ধরিয়া প্রতিদিন তাঁহার প্রতীক্ষা করিতেছে।

যে বিশাল প্রস্তরসেতু দিয়া নগরে প্রবেশ করিতে হয়, সেই সেতুর মুখে স্বর্ণপত্রখচিত লাল "ক্রেপ্"-বস্ত্রে মণ্ডিত একটি দ্বারপ্রকোষ্ঠ প্রসারিত; —তাহারি ঝালরে লেখা রহিয়াছে;—"স্বাগত নিজামবাহাদুর!"

এই সেতুর উপর দিয়া কত বর্ণের কত লোক পদব্রজে, কত লোক যানে, কত লোক বাহনে চলিয়াছে;—কতপ্রকার যান, কতপ্রকার বাহন, কতই সমারোহ, তাহার আর ইয়ত্তা নাই! বিষাদময় বিজনতার মধ্য দিয়া যখন আমি এখানে আসিয়া পৌঁছিলাম, তখন প্রত্যাশা করি নাই, যে-নগর ক্ষেত্রভূমির মধ্যে,—প্রস্তরময় ধূসর মাঠময়দানের মধ্যে বিলীন, সেই নগরটিকে এমন জীবন-উদ্যমে পূর্ণ দেখিব, এমন উজ্জ্বল বর্ণে রঞ্জিত দেখিব, এমন উৎসবানন্দে মত্ত দেখিব।

শাদা-শাদা, সোজা-সোজা, বড়-বড় রাস্তা—লোকের জনতায় সমাচ্ছন্ন। ফুলের রঙের আভায় যেরূপ নানাপ্রকার সূক্ষ্ম ভেদ লক্ষিত হয়, এই সব লোকদিগের মুখবর্ণেও সেইরূপ সূক্ষ্ম ভেদ বিদ্যমান। নেত্র ঝল্সিয়া যায় প্রথমেই উষ্ণীষের অনন্ত বৈচিত্র্য ও বিলাসলীলা দেখিয়া; পাগ্ড়ির গোলাপি রং—"সামন্"-মাছের রং—পিচ-ফুলের রং। কোনো-টায় কুমুদফুলের, কোনোটায় "অ্যামারান্ত"-ফুলের, কোনোটায় "নার্সিসাস্" ফুলের, কোনোটায় "বটর্‌কপ্"-ফুলের রং। পাগ্ড়িগুলা প্রকাণ্ড-বড়; —ছোট-ছোট একপ্রকার ছুঁচাল-মুখ টুপির চারিধারে জড়াইয়া-বাঁধা;

এবং পাগড়ির আঁচ্‌লাটা, পিছনদিকে, পরিচ্ছদের উপর ঝুলিয়া পড়িয়াছে।

কিঞ্চিৎ-কিঞ্চিৎ ব্যবধানে স্থাপিত রাজপথের বিজয়তোরণগুলা গৃহসমূহের মাথা ছাড়াইয়া উঠিয়াছে। তোরণের উপরে সোনালি-"অর্দ্ধচন্দ্র"-সমন্বিত মস্‌জিদি-ধরণের ধ্বজচূড়া (Minaret)। কোথাও বা, এই তোরণের সহিত—রেশমমণ্ডিত ও বংশনির্ম্মিত লঘুধরণের দ্বারপ্রকোষ্ঠ সংযোজিত; নিজামের স্বাগত-অভ্যর্থনার জন্য এই সমস্ত স্থাপিত হইয়াছে। নগরের মধ্যস্থলে—রাজপথসমূহের কেন্দ্রদেশে,—চৌমাথা রাস্তার উপর, একটা প্রকাণ্ড "চারমুখো" তোরণ,—যাহার ধ্বজচূড়া সহরের সমস্ত ধ্বজচূড়া ছাড়াইয়া, মস্‌জিদের শীর্ণকায় ধ্বজচূড়া ছাড়াইয়া, হৈদরাবাদের শুভ্র ধূলারাশি ছাড়াইয়া, সুনির্ম্মল ধ্রুব আকাশে একেবারে সিধা উঠিয়াছে।

সাদাসিধা ছুঁচাল-মুখ আরবী-খিলান্‌গুলা ভারতে আসিয়া একটু জটিলভাব ধারণ করিয়াছে,—এখন উহাতে কোথাও বা ফুলমালার কাজ—কোথাও বা খাঁজকাটা কাজ দৃষ্ট হয়। ভারতীয় শিল্পীরা মূল-আদর্শের নক্‌সাকে শ্রীসম্পদে আরো যেন সমৃদ্ধিশালী করিয়া তুলিয়াছে। প্রত্যেক গৃহের প্রথম-তলে কত যে বিচিত্রধরণের ছোট-ছোট খিলান সারি-সারি চলিয়াছে, তাহার আর অন্ত নাই। খিলানগুলা খুব ছুঁচাল অথবা খুব "থ্যাব্‌ড়া"-ধরণের; কোনোটা গোলাপ-পাপড়ির আকারে,—কোনোটা বা ত্রিপত্র কিংবা বহুপত্র তৃণের আকারে গঠিত। বরাবর রাস্তার ধারে-ধারে, খোলা বারণ্ডার নীচে, দোকানদারেরা গদি ও গালিচার উপর উপবিষ্ট। দোকানের পশ্চাদ্ভাগে, প্রাচীরের গায়ে বাহিরখিলানের অনু-করণে খিলানের একটা নক্‌সা কাটা—সবুজ, নীল কিংবা সোনালি রঙে রঞ্জিত; এবং উহাতে প্রায়ই ময়ূরাদির ন্যায় কোন বৃহৎ পক্ষীর বিস্তারিত পুচ্ছের অনুকৃতি দৃষ্ট হয়। ভিন্ন ভিন্ন পণ্যদ্রব্যের ভিন্ন ভিন্ন বিভাগ। কোথাও রত্নাদির অলঙ্কার, কোথাও মুক্তার কণ্ঠহার, কোথাও বা বলয়াদি

বিক্রীত হইতেছে। সকল দোকানেই,—বহুমূল্য রত্নাদির পার্শ্বে কাচের জিনিষ, এবং খাঁটি সোনার পার্শ্বে ঝুঁটা চুম্‌কির জিনিষ ঝিক্‌মিক্ করিতেছে। সুগন্ধিদ্রব্যের দোকানে—পুরাতন চীনের বুয়েমের মধ্যে বিবিধ ফুলের আতর সংরক্ষিত। একটা দোকানে চুম্‌কি বসানো, জরির কাজ-করা ঝক্‌মকে তুর্কিচটিজুতা রহিয়াছে। গণ্ডোলা-নৌকার মুখের মত উহাদের অগ্রভাগ উপরদিকে বাঁকানো। মধ্যে-মধ্যে ফুলের দোকান; ছিন্নবৃন্ত গোলাপফুল ছোট-ছোট পাহাড়ের মত স্তূপাকারে সজ্জিত; বালকেরা জুঁইফুলের রাশীকৃত স্তূপ হইতে ফুল উঠাইয়া-লইয়া মুক্তা গাঁথিবার মত মালা গাঁথিতেছে। কোথাও বা অস্ত্রাদি বিক্রীত হইতেছে;—বর্শা, দুই-হাতে ধরিবার বড়-বড় তলোয়ার, একটা বিশেষ-আকারের বাঘ-মারা ছোরা। যখন বাঘ মুখব্যাদান করিয়া মানুষকে আক্রমণ করে, তখন এই ছোরা তাহার গলায় বসাইয়া দেওয়া হয়। কোথাও বা ঝুঁটা-জরির বরের পোষাক,—চুম্‌কি-বসানো বর-কনের টোপর বিক্রীত হইতেছে। আর এক স্থানে, (গৃহাদির সম্মুখে, খানিকটা "পদ-পথ" জুড়িয়া) কতক-গুলি লোক মিহি কাপড়ের উপর নক্‌সা ছাপিতেছে। এই কাপড়গুলা বাষ্পবৎ স্বচ্ছ; লাল, সবুজ কিংবা হল্‌দে জমির উপর,—রূপালি কিংবা সোনালি রঙের ছোট-ছোট নক্‌সা; এই নক্‌সাগুলি আদৌ স্থায়ী নহে; এক ফোঁটা বৃষ্টির জলে সমস্তই ধুইয়া যায়; কিন্তু উহার বর্ণবিন্যাস অতি চমৎকার; এই সকল কাপড় অতি "খেলো" হইলেও, যখন এই মুক্তবায়ু-সেবী শিল্পীদিগের হস্ত হইতে বাহির হইয়া আইসে, তখন যেন উহা কোন পরীর মোহন অবগুণ্ঠন বলিয়া মনে হয়। সোনা, সোনা, এখানে সর্ব্বত্রই সোনা; অথবা তাহার অভাবে ঝুটা-জরি, সোনালি পাত—এমন কোন-কিছু—যাহা দীপ্ত ভানুর উজ্জ্বল কিরণে ঝিক্‌মিক্ করে, কিংবা কুতূহলী দর্শকের নেত্ররঞ্জন করে।

এখানকার ধূলা শুভ্র, গৃহগুলি শুভ্র এবং লোকের পরিচ্ছদ শুভ্র।

তুষারবৎ শুভ্রতা—রাজপথে, জনতার মধ্যে, দোকান-হাটে; এবং লোক-দিগের অম্লান-শুভ্র পরিচ্ছদের উপর—বৃহদাকার মল্‌মল্‌-পাগড়ির সমস্ত "সারিগম" মন্দ্রগ্রাম হইতে তারগ্রাম পর্য্যন্ত চলিয়াছে।

রমণীরা অদৃশ্য; (কেন না, ইহা মুসলমানরাজ্য) একটা শাদা ঘেরা-টোপে উহাদের আপাদমস্তক আবৃত; বিড়ালগর্ত্তের ন্যায় প্রায়ই উহাতে একএকটা ছিদ্র কাটা;—তাহার মধ্য হইতে, কোলের-শিশুর মত ছোট-ছোট সুন্দর মাথা বাহির হইয়া আছে দেখিতে পাওয়া যায়।

এই দীর্ঘপ্রবাসী নৃপতির মহিমা কীর্ত্তন করিবার জন্য যে-সমস্ত রেশম, মল্‌মল্‌, মখ্‌মলের সাজসজ্জা স্থানে-স্থানে সজ্জিত রহিয়াছে, তাহারা সকলেই যেন নীরব ভাষায় বলিতেছে:—"নিজামের জয় হউক্‌!" সমস্ত হৈদরাবাদ আজ উল্লাসভরে নিজামের প্রতীক্ষা করিতেছে। এক সপ্তাহ হইতে সমস্তই প্রস্তুত হইয়া আছে;—এমন কি, সজ্জিত পুষ্পগুলি সূর্য্যোত্তাপে শুকাইয়া যাইতেছে। এখন নিজাম আশিয়িক-আড়ম্বর-সহকারে কলিকাতার রাজপথে ভ্রমণ করিতেছেন;—১২ খানা সোনার গাড়ি তাঁহার পিছনে-পিছনে চলিয়াছে। তিনি স্বরাজ্যে আর ফিরিয়া আসেন না, কোন সংবাদ দেন না, যাহা খেয়াল হইতেছে তাহাই করিতেছেন। কিন্তু ভারতবাসীরা ইহাতে বিস্মিত নহে;—কেন না, তাহারা সকলেই এইরূপ করিয়া থাকে। তাই, নিরাশ না হইয়া তাহারা ক্রমাগত তাঁহার প্রতীক্ষা করিতেছে। তা ছাড়া, এই সকল লঘুবস্ত্রের সাজসজ্জা যে বৃষ্টিতে ভিজিয়া যাইবে, তাহারও কোন আশঙ্কা নাই; কেন না, আকাশ এখন একেবারেই নির্ম্মেঘ।

প্রতিদিন, যেমন বেলা অধিক হইতে থাকে—সেই পরিমাণে, সমস্ত নগরীর ধূলিরাশি, জনকোলাহল, সঙ্গীতাদিরও বৃদ্ধি হইতে থাকে; অবশেষে রাত্রিসমাগমে সমস্তই উপশান্ত হইয়া যায়।

ঘোড়ার গাড়ি, বলদের গাড়ি ক্রমাগত যাতায়াত করিতেছে। রহস্যময়ী

পর্দ্দা-মহিলাদের জন্য, ডিঙির আকারে বাঁখারির গাড়ি—পর্দ্দায় সমস্ত ঢাকা। পর্দ্দার স্থানে-স্থানে ছিদ্র। সেই ছিদ্রের মধ্য হইতে রূপসীগণ সুচিত্রিত "ডাগর-আঁখির" তীক্ষ্ণবাণ জনতার উপর বর্ষণ করিতেছেন। কোথাও কোন সুপুরুষ অশ্বারোহী ছুঁচালটুপির চারিধারে-জড়ানো আলা-দিন-ধাঁচার পাগ্‌ড়ি পরিয়া, জিনের পাশে বল্লম আট্‌কাইয়া—খুব ছুটিয়া চলিয়াছে। বণিক্‌দলের উটগুলা দীর্ঘরেখাকারে সারি-সারি চলিয়াছে। ধূলাধূসরিত, কর্দ্দমলিপ্ত মজুরহাতীরা কর্ম্মান্তে ঘরে ফিরিয়া আসিতেছে। বিলাসী হাতীরা সানাই-বাদ্য-সহকারে বরযাত্রীর সঙ্গে চলিয়াছে;—পৃষ্ঠের উপর, বাসাচ্ছাদিত হাওদার মধ্যে—বর প্রচ্ছন্ন।

পাল্কীবাহকদের, মন্ত্রপাঠের ন্যায়, একঘেয়ে গুঞ্জনধ্বনি শুনা যাইতেছে; জরির কাজ-করা রাশি-রাশি তাকিয়া-বালিশের উপর, চস্‌মাধারী কোন বৃদ্ধকে, অথবা কোন গম্ভীরমূর্ত্তি মোল্লাকে চড়াইয়া, উহারা চটুলপদক্ষেপে চলিয়াছে। ফকিরেরা কড়ি-সমাচ্ছন্ন কাঁথা পরিয়া, পথে-পথে ভ্রমণ করিতেছে;—এই সব আকুলচিত্ত উন্মাদগ্রস্ত লোকেরা সাধু বলিয়া সমাদৃত;—এখন হইতেই উহাদের নেত্র অন্যত্র-পরলোকের দিকে নিয়োজিত। বৃদ্ধ দরবেশদিগের সুদীর্ঘ কেশকলাপ;—সমস্ত ভস্মাচ্ছন্ন। উহারা ঘণ্টা নাড়িতে-নাড়িতে দ্রুতপদে চলিয়াছে। ইয়েমেন্‌বাসী আরবেরা দলে-দলে ভ্রমণ করিতেছে; নিজাম উহাদিগকে সযত্নে নিজরাজ্যে স্থাপন করিয়াছেন; উহারা যাহাতে স্থায়ী হইয়া প্রজাদের মধ্যে মিশিয়া যায়—ইহাই নিজামের মনোগত অভিপ্রায়। ঐ দেখ, দূর অঞ্চলের কোন অশ্বারোহী সর্দ্দার,—জংলি-মূর্ত্তি, মহাকায় ঘোড়াকে বিচিত্র-ভঙ্গীতে দৌড় করাইয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। তাহার পশ্চাতে কতকগুলা বল্লমধারী ঘোড়সওয়ার।

ধূপের সৌরভ,—সাজসজ্জার দোকানে পর্ব্বতাকারে সজ্জিত গোলাপ-ফুলের সৌরভ,—ঝুরিভরা শাদা জুঁয়ের সৌরভ, তুষারপাতের ন্যায় রাস্তার

ধূলির উপর আসিয়া পড়িতেছে।...কে তবে বলিবে, পশ্চিমাঞ্চল হইতে দুর্ভিক্ষ আসিয়াছে—স্বকীয় বিকট দশন বাহির করিয়া দুর্ভিক্ষ ইহারই মধ্যে সীমান্তদেশ পার হইয়াছে। না-জানি তবে কোন্ জলাশয়ের জলসেকে,—কোন্ বিশেষ-রক্ষিত উদ্যানে এই সমস্ত ফুল ফুটানো রহিয়াছে!

অবশেষে, সূর্য্যাস্তসময়ে, "সহস্র-এক রজনীর" ব্যক্তিগণ গৃহ হইতে বাহির হইতে লাগিল—সেই সব সৌখীন লোক, যাহাদের নেত্র নীলাঞ্জনে চিত্রিত, যাহাদের শ্মশ্রুজাল সিন্দূর-রঙ্গে রঞ্জিত, যাহারা কিংখাপের পোষাক কিংবা জরি-বসানো মখ্‌মলের পোষাক পরিয়া বাহির হইয়াছে, কণ্ঠে মণিমুক্তার কণ্ঠহার ধারণ করিয়াছে, এবং যাহাদের বামহস্তের মুষ্টির উপর একএকটা পোষাপাখী রহিয়াছে।

"স্বাগত নিজামবাহাদুর!"—এই কথাগুলি আবার একটা দ্বারপ্রকোষ্ঠের চূড়াদেশে লিখিত রেখিলাম; সেই চূড়াদেশে নারাঙ্গি-রঙের একটা ক্রেপ্-কাপড় টানা—তাহাতে নেবু-হল্‌দে ও গন্ধকি-হল্‌দে রঙের ঝালর ঝুলিতেছে, ঝালরের উপর সবুজ-রঙেব চুম্‌কি বসানো। এই দ্বারপ্রকোষ্ঠের পরেই—স্বর্ণচূড়া ও স্বর্ণ-"অর্দ্ধচন্দ্র"-বিশিষ্ট, তুষার-শুভ্র একটা মস্‌জিদ্। এই সান্ধ্য-নমাজের সময়ে, ভক্ত মুসলমানেরা এই মস্‌জিদে আসিয়া সমবেত হইয়াছে। উহাদের শুভ্র পরিচ্ছদ,—মাথায় মল্‌মলের কাপড় জড়ানো পাগ্‌ড়ি; দূর হইতে মনে হয়—যেন বিচিত্ররঙের একপ্রকার খুব বড়-বড় ফুল ছড়ান রহিয়াছে।...

কিন্তু এই সময়ে একটা জনরব উঠিল,—নিজামের আসিতে এখনও বিলম্ব আছে; রামাদানের মাস নিশ্চয়ই পার হইয়া যাইবে, বোধ হয় আগামী মাসে আসিবেন, কিংবা আরো বিলম্ব হইতে পারে। কবে আসিবেন, আল্লাই জানেন।..

গল্কণ্ডা।

হৈদরাবাদের কোন-এক উপনগর যেখানে শেষ হইয়াছে—সেই বাঁকের মুখে একটা পুরাতন প্রাচীরের গায়ে এই কথাগুলি উৎকীর্ণ রহিয়াছে:—"গল্কণ্ডার পথ"। ভগ্নাবশেষের পথ, নিস্তব্ধতার পথ;—এরূপ লিখিলেও ক্ষতি ছিল না।

ঘোড়াদের দুল্‌কি-চালে পথে খুব ধূলা উড়িয়াছে। এই বিজন পথের ধারে-ধারে প্রথমেই দেখা যায় কতকগুলি ক্ষুদ্র "পোড়ো" মস্‌জিদ, আর কতকগুলি সরু-সরু ক্ষুদ্র ধ্বজমন্দির—যাহা একটু ভগ্নদশাপন্ন হইলেও অতীব শোভন ও সুষমাবিশিষ্ট। তাহার পর আর কিছুই নাই;—কেবল পাংশুবর্ণ তাপদগ্ধ বিস্তীর্ণ ময়দান, আর কতকগুলা পাষাণস্তূপ ছোট-ছোট পাহাড়ের আকারে, ঢিবির আকারে, "পিরামিডের" আকারে, ইতস্তত বিকীর্ণ এবং দেখিতে এরূপ অদ্ভুত যে, উহাদিগকে এই পৃথিবীর কোন পদার্থ বলিয়া মনেই হয় না।

গাড়িতে একঘণ্টার পথ অতিক্রম করিয়া, একটা জনশূন্য আ-তল-শুষ্ক হ্রদের ধারে আসিয়া পড়িলাম। ইহারই পশ্চাদ্ভাগে প্রাচীরবদ্ধ একটা বৃহৎ মৃতনগরের দিগন্তব্যাপী উপচ্ছায়া। অত্রত্য ময়দানভূমির ন্যায় ইহাও ভীষণ ধূসরবর্ণ। ইহাই সেই গল্কণ্ডা, যাহা তিন শতাব্দী ধরিয়া এসিয়ার একটি পরমাশ্চর্য্য দ্রষ্টব্য-পদার্থ বলিয়া প্রখ্যাত ছিল।

কে না জানে, ভগ্নাবশেষের অবস্থাতেই—নগর-প্রাসাদাদি মানুষের সমস্ত কীর্ত্তিমন্দিরগুলিই আসল অপেক্ষা অনেক বড় বলিয়া মনে হয়। কিন্তু এই যে মৃতনগরের উপচ্ছায়াটি দেখা যাইতেছে, ইহা বাস্তবিকই একটা প্রকাণ্ড ব্যাপার। ইহার দস্তুর প্রথম-প্রাকারটি অন্যূন ৩০ফীট্ উচ্চ। বুরুজ, অস্ত্রনিক্ষেপের জন্য রন্ধ্রময় স্থান, প্রস্তরময় আবৃত প্রহরিস্থান—সমস্তই উহাতে বিদ্যমান; এবং উহা আঁকিয়া-বাঁকিয়া চলিতে-চলিতে

সুদূর মরুভূমিতে গিয়া শেষ হইয়াছে। এমনই ত প্রাকারটি ভীমদর্শন—তাহার উপর আবার একটা বিরাট্‌কায় প্রকাণ্ড দুর্গনগর সমুত্থিত;—আসলে পর্ব্বত, কিন্তু মানুষ ইহাকে এইরূপ কাজে লাগাইয়াছে। ইহা সেই শ্রেণীর পর্ব্বত—সেই পাষাণস্তূপ, যাহা অত্রত্য ভূভাগের একটা বিস্ময়জনক অপূর্ব্ব বিশেষত্ব। পূর্ব্বতন রাজাদিগের ও জনসাধারণের চিত্তে বিরাট্ পদার্থের জন্য—অলৌকিক পদার্থের জন্য যে একটা আকাঙ্ক্ষা ছিল, তাহা এই ক্ষেত্রে পূর্ণমাত্রায় পরিতৃপ্ত হইয়াছে। প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড শিলারাশির মধ্যে অসংখ্য প্রাচীর পরস্পরকে বেষ্টন করিয়া আছে—পরস্পরের উপর চাপিয়া আছে;—উহাদের দন্তুর রেখাবলী পরস্পরের সহিত জড়াইয়া গিয়াছে। যে সকল গণ্ডশৈল দুঃসাহসীর ন্যায় অতিমাত্র ঝুঁকিয়া আছে, তাহাদের ঠিক্ ধারেই বুরুজসকল সম্মুখে প্রসারিত;—নীচে অতলস্পর্শ খাত। উচ্চতার বিভিন্ন ধাপে,—কত মস্‌জিদ, কত জটিল-নক্সার খিলান, কত প্রকাণ্ড পোস্তার গাঁথুনি। খেয়ালের ঝোঁকেই হউক্, কিম্বা কোন উপধর্ম্মের খাতিরেই হউক্,—সর্ব্বোচ্চ শিখরের উপর একটা গণ্ডশৈল এরূপভাবে স্থাপিত যে, মনে হয় যেন একটা গোলাকার পশু চূড়ার উপরে আসনপিঁড়ি হইয়া বসিয়া আছে।

এই মৃতনগরের প্রবেশপথে ধাতু ও পাথরের গোলাগুলি স্তূপাকারে সজ্জিত এবং পুরাকালীন সমস্ত যুদ্ধ-আয়োজন প্রস্তুত রহিয়াছে;—ইহাদেরি পাশাপাশি "পুনরাবৃত্তিকারী" আধুনিক বন্দুকসকল পুঞ্জীকৃত। নিজামের সিপাইশান্ত্রীরা পাহারা দিতেছে। প্রবেশপথে উহাদিগকে প্রবেশানুমতিপত্র দেখাইতে হয়। এই সমস্ত ভগ্নাবশেষের মধ্যে ইচ্ছা করিলেই প্রবেশ করা যায় না; এখনও উহা দুষ্প্রবেশ্য দুর্গরূপে বিদ্যমান। শোনা যায়, নিজাম তাঁহার গুপ্তনিধি এইখানেই লুকাইয়া রাখিয়াছেন।

এই গল্কণ্ডার দ্বারগুলি অতীব ভীষণ;—বহুলোকের সমবেত চেষ্টা ভিন্ন উহা উদ্‌ঘাটিত হয় না। প্রাকারভিত্তির গভীরদেশে দ্বারের

ভাঁজ্‌ওয়ালা জোড়া-কপাট্‌গুলি দেওয়ালের গায়ে সংলগ্ন, ধাতুপত্রে মণ্ডিত এবং লম্বা-লম্বা ছোরার মত তীক্ষ্ণধার লৌহকণ্টকে সমাকীর্ণ। পূর্ব্বকালে হস্তিগণ আত্মবিনোদনার্থ নগরের মধ্যে দলে-দলে প্রবেশপূর্ব্বক দন্তের দ্বারা অনেক কাঠের কাজ নষ্ট করিয়া বিস্তর ক্ষতি করিত। উহাদিগকে অপসারিত করিবার জন্যই দ্বারের কপাটগুলি এইরূপ ভীষণ বর্ম্মে আবৃত। আমার ক্ষুদ্র যানবাহন যখন এই নগরের মধ্যে প্রবেশ করিল (যদিও কোচ্‌ম্যানের মাথায় জরির পাগ্‌ড়ি ছিল এবং সহিস একটা লম্বা চামর লইয়া ঘোড়ার গাত্র হইতে মাছি তাড়াইতেছিল), তখনই আমাদের য়ুরোপীয় ক্ষুদ্রতা ও দীনহীনতা সহসা প্রকাশ হইয়া পড়িল!...

এই-সব স্থূলকায় প্রাচীর হইতে বাহির হইয়া প্রথমেই যে রাস্তায় আসিয়া পড়িলাম, সেই রাস্তাটিতেই যা-কিছু লোকের বসতি। কতকগুলি নিঃস্ব লোক প্রাসাদের ভগ্নাবশেষের মধ্যে বাসা করিয়া আছে এবং সেইখানে উহারা দুর্গরক্ষী সৈনিকদিগের ব্যবহারার্থ দুইচারিখানি সামান্য দোকান খুলিয়াছে।

তা ছাড়া, এই বিশাল ঘেরের মধ্যে আর সমস্তই শূন্য ও নিস্তব্ধ। গল্কণ্ডা এখন শুধু ভস্মাচ্ছন্ন একটা শ্মশানক্ষেত্র,—স্বস্থানচ্যুত গণ্ডশৈলে সমাকীর্ণ। প্রকাণ্ডকায় সুপ্ত পশুর পৃষ্ঠদেশের ন্যায় সেই সব পাষাণস্তূপ—যাহা মানবগঠিত পদার্থ অপেক্ষা অধিকতর ঘাতপ্রতিরোধী—ইতস্তত উত্থিত হইয়াছে; সেই সব গোলাকার মসৃণ গণ্ডশৈল,—যাহা সমস্ত দেশময় পরিব্যাপ্ত—পর্ব্বতের ন্যায় ইতস্তত মাথা তুলিয়া আছে। *

* নিজামরাজ্যের এই সব গণ্ডশৈলসম্বন্ধে একটা পৌরাণিকী কথা প্রচলিত আছে। পৃথিবীর সৃষ্টি শেষ হইয়া গেলে ঈশ্বর যখন দেখিলেন, কতকগুলা অতিরিক্ত উপকরণ উদ্বৃত্ত হইয়াছে, তখন তিনি এই সমস্ত লইয়া, হাতে গোলা পাকাইয়া, সেই সব গোলোকপিণ্ড পৃথিবীর উপর—এই প্রদেশে—ইতস্তত নিক্ষেপ করিলেন।

এই দুর্গনগরের দ্বারগুলিও নিম্নস্থ প্রাকারদ্বারের ন্যায় ভীমদর্শন ও লৌহকণ্টকে আচ্ছাদিত। দুর্গাদি অতিক্রম করিয়া, গণ্ডশৈলসমূহ অতিক্রম করিয়া, কখন খোলা-পথে,—কখন বা অন্ধকার-সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতে হয়। সমস্তই এরূপ বিশাল যে, দেখিয়া হতবুদ্ধি হইতে হয়। যে ভারতে প্রকাণ্ড পদার্থ দেখিয়া আর বিস্ময় উৎপন্ন হয় না, সেই ভারতের পক্ষেও এ সমস্ত প্রকাণ্ড বলিয়া মনে হয়। দস্তুর প্রাকারাবলী, নৈসর্গিক গণ্ড-শৈলসমূহ পর্য্যায়ক্রমে উপর্য্যুপরি উত্থিত হইয়া সমস্ত স্থানটিকে দুর্গম করিয়া তুলিয়াছে। অবরোধের সময়ে, জলরক্ষণের জন্য কতকগুলি গভীর-নিখাত চৌবাচ্চা রহিয়াছে। এই গভীর গহ্বরগুলি শৈলগাত্র খনন করিয়া নির্ম্মিত। তা ছাড়া, কতকগুলা কালো-কালো গর্ত্ত রহিয়াছে—যাহা সুরঙ্গপথের মুখ। এই সুরঙ্গটি পর্ব্বতের হৃদয় ভেদ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। যখন শত্রুর আক্রমণে হতাশ হইয়া পলায়ন ভিন্ন আর কোন উপায় থাকে না, তখন এই সুরঙ্গটিই পলায়নের প্রকৃষ্ট পথ। শেষদিন পর্য্যন্ত যাহাতে ভজনার ব্যাঘাত না হয়, এইজন্য উচ্চ হইতে উচ্চতর প্রত্যেক শিখরে একএকটি মস্‌জিদ রহিয়াছে। যাহাতে দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত অসংখ্য শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ করা যাইতে পারে, এই উদ্দেশ্যে কল্পনাচক্ষে বাস্তববৎ প্রত্যক্ষ করিয়াই যেন সমস্ত আয়োজন পূর্ব্ব হইতে সজ্জিত।

আধুনিক কামানসৃষ্টির তিন শতাব্দী পূর্ব্বে গল্কণ্ডার প্রবলপরাক্রান্ত সুল্‌তানগণ এই দুর্গ হইতে কিরূপে দূরীকৃত হইয়াছিলেন, তাহা বুঝা কঠিন।

যতই উচ্চে উঠা যায়, ততই মাথার উপর সূর্য্যের প্রখর উত্তাপ,—ততই যেন চতুর্দ্দিকস্থ মরুদৃশ্যের বিষাদময় মণ্ডলপরিধিটি বিস্তৃত হইতে থাকে। শিখরস্থ ইমারৎগুলি উচ্চতা-অনুসারে একদিকে যেমন অধিকতর ভীমদর্শন, তেমনি আবার ভগ্নদশাপন্ন। উহারা এতটা ঝুঁকিয়া আছে যে, দেখিলে

মাথা ঘুরিয়া যায় ;—মনে হয় যেন নীচে পড়িবার জন্য উন্মুখ। কত ভাঙা খিলান ;—তাহাতে প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড ফাট্ ধরিয়াছে। কতকগুলি দেব-মন্দিরের ভগ্নাবশেষ রহিয়াছে যাহার উদ্দেশ্য অথবা নির্ম্মাণকাল কিছুই নির্ণয় করা যায় না। ইসলামের পূর্ব্ববর্ত্তী কাল হইতে কতকগুলা দেবমূর্ত্তি —বানরমুণ্ডধারী কতকগুলা হনুমান্;—বাদুড়দিগের সহিত গুহাগহ্বরের মধ্যে একত্র বাস করিতেছে। ছোট-ছোট ধূপবর্ত্তিকার ধূমগন্ধে স্থানটি আমোদিত। রহস্যময় ভক্তগণ এখনও বোধ হয় সময়ে-সময়ে এই ধূপ-বর্ত্তিকাগুলি এখানে গোপনে লইয়া আইসে।

সর্ব্বোচ্চ-শিখরে, শেষ ছাদটির উপর একটি মসজিদ রহিয়াছে এবং একটি চতুষ্ক (Kiosk) *—যেখান হইতে পূর্ব্বতন সুল্তানেরা সমস্ত দেশ পরিবীক্ষণ এবং দিগন্তনিঃসৃত শত্রুবাহিনীর আগমন নিরীক্ষণ করিতেন। মাঠ-ময়দান উদ্যান-উপবন প্রভৃতি যে সমস্ত দৃশ্য এখান হইতে দেখা যায়, সমস্তই তখনকার কালে প্রসিদ্ধ ছিল। কিন্তু আজ এই সমস্ত ক্ষেত্র নির্জীব ও প্রাণশূন্য।

দেশের হাওয়া বদ্লাইয়াছে। আর এখন বৃষ্টি হয় না। বেশ মনে হয়, অনাবৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে ভারতের অবনতি হইতেছে—ভারত অবসন্ন হইয়া পড়িতেছে। এই সমস্ত গণ্ডশৈল ও প্রাকারাবলীর পরপারে অবস্থিত দুর্গনগরটি, মহানিস্তব্ধতার মধ্যে,—ভূতল পর্য্যন্ত নামিয়া গিয়াছে। নগরের বহিঃপ্রাচীর,— নিজামের সংরক্ষিত সেই দস্তুর প্রাচীরটি, প্রাচীন গল্কণ্ডার—সেই পরমাশ্চর্য্য হীরকখনি গল্কণ্ডার গঠনরেখাভঙ্গী অঙ্কিত করিবার জন্যই যেন আঁকিয়া-বাঁকিয়া বহুদূর পর্য্যন্ত প্রসর্পিত হইয়াছে। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, ইহাতে লাভ কি? বাহিরের বিস্তীর্ণ মরুক্ষেত্রেরই

* চতুষ্ক=চতুস্তম্ভযুক্ত মণ্ডপ। বোধ হয় এই ফার্সি শব্দ (Kiosk) "চতুষ্ক"শব্দেরই অপভ্রংশ। Kiosk=garden summer-house অর্থাৎ "হাওয়া-খানা"।—অনুবাদক।

অনুরূপ এই যে মরুময় কটিবন্ধটি—ইহাকে বিশেষ করিয়া প্রাচীরে ঘিরিয়া রাখায় কি ফল? এখানেও সেই একই ধূসর মরুভূমি—সেই একই মসৃণ গণ্ডশৈলপুঞ্জ—যাহা দেখিয়া মনে হয়, যেন ভস্মরাশির উপর কতকগুলা বৃহৎকায় পশু দলে-দলে বসিয়া আছে। সুদূরপ্রান্তে হৈদরাবাদ দীর্ঘ শাদা-রেখার ন্যায় অস্পষ্ট দেখা যাইতেছে; এবং ময়দানভূমির সীমান্তদেশে এই সব গণ্ডশৈল—ছিন্নাঙ্গ পর্ব্বতের আকারে বিচিত্রভঙ্গী দুর্গের আকারে ইতস্তত পুঞ্জীকৃত হইয়া ধ্বংসনগরের বিভ্রমটিকে যেন আরো দীর্ঘীকৃত করিয়া সুদূর অসীমে প্রসারিত হইয়াছে।

কিন্তু এই মৃতনগরের প্রাচীর ছাড়াইয়া অদূরে কতকগুলি বড়-বড় গম্বুজ রহিয়াছে, যাহা সুধালেপের দ্বারা সযত্নে ধবলীকৃত এবং যাহাতে ভগ্নাবশেষের ভাব কিছুমাত্র নাই। ছোট-ছোট বনের মধ্য হইতে এই গম্বুজগুলি সমুত্থিত। এই সব বনের উদ্ভিজ্জ এরূপ সরস ও তাজা যে, এই তাপদগ্ধ শুষ্কভূমিতে কিরূপে উৎপন্ন হইল, ভাবিয়া বিস্মিত হইতে হয়। এগুলি গল্কণ্ডার প্রাচীন রাজাদিগের সমাধিমন্দির। মৃত ব্যক্তিদিগের প্রতি ভারতবাসীর যে স্বাভাবিক শ্রদ্ধাভক্তি, তাহারি প্রভাবে এই সকল সমাধিমন্দির অক্ষত রহিয়াছে। আবার সম্প্রতি উহার চারিধারে সমাধি-উদ্যান স্থাপিত রহিয়াছে।

এই পরীরাজ্যের অনেক সুল্‌তান সুল্‌তানাই এই সব গম্বুজতলে চিরনিদ্রায় মগ্ন। কেবল উহাদের মধ্যে একজন এই নীরব সঙ্গীদিগের সহবাস হইতে বঞ্চিত; ইনি গল্কণ্ডার শেষ সুল্‌তান। ইনি পূর্ব্ব হইতেই স্বকীয় পারত্রিক নিবাস প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু বিজয়ী ঔরঙ্গজেব তাঁহাকে তাঁহার রাজ্য হইতে দূরীকৃত করিয়া সেই সঙ্গে তাঁহার সমাধিমন্দির হইতেও তাঁহাকে বহিষ্কৃত করিলেন। তিনি নির্ব্বাসিত হইয়া প্রবাসেই ইহলীলা সংবরণ করেন।

এই চিরবিশ্রামের স্থানগুলি অতীব সুন্দর। আমাদের দেশের ন্যায়

এই প্রাচ্য সমাধিক্ষেত্রেও সেই "সাইপ্রেস্"-ঝাউগাছগুলি দেখিতে পাওয়া যায়;—কেবল ভারতের প্রখর সূর্য্যোত্তাপে একটু ম্লানপ্রভ হইয়াছে, এইমাত্র। ফ্রান্সের "সেকেলে" উদ্যানের ন্যায়, অত্রত্য উদ্যানেও, সরু-সরু বালির পথগুলি সোজা চলিয়াছে; উহার ধারে-ধারে আলবাল-ভূমিতে সারি-সারি গোলাপগাছ। কতকগুলি রমণী ও কতকগুলি বালিকা এই কৃত্রিম মরু-উদ্যানের রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত। উহারা প্রাতঃসন্ধ্যা দুই বেলা মাটির কলসীতে কোন কূপবিশেষের দুর্লভ জল আনিয়া এই সব গাছের তলায় ঢালিয়া দেয়; এবং এই সব অতলস্পর্শ গভীর কূপ হইতে পুরুষেরা অতি কষ্টে উহাদের জন্য জল উত্তোলন করে।

দূর হইতে মনে হয়, যেন এই সব সুধালিপ্ত গম্বুজগুলি জীবন-উদ্যমে পূর্ণ। কিন্তু এই সব বিশাল মস্জিদের অভ্যন্তরে একটিও চিত্র নাই, একটিও অলঙ্কার নাই। পূর্ব্বেকার সমস্ত বিলাসসামগ্রী এক্ষণে এসব জরাজীর্ণতার মধ্যে বিলীন হইয়া গিয়াছে।

তথাপি, এই সব শূন্যগর্ভ গম্বুজের নীচে, সমাধিস্থানের প্রত্যেক প্রস্তর-বেদিকার উপর, এখনও পুষ্পমাল্যাদি দেখিতে পাওয়া যায়। তিনশত বৎসর হইতে যে রাজবংশ বিলুপ্ত হইয়াছে, সেই রাজবংশীয় রাজাদিগের প্রতি শ্লাঘ্য ভক্তির নিদর্শনস্বরূপ এই পূজাপুষ্পাঞ্জলি।

তাপদগ্ধ মরুভূমির মধ্যে শুধু জলসেকের বলে এই যে উদ্যানগুলি সংরক্ষিত—ইহাদের কি-একটা অপূর্ব্ব মোহিনী শক্তি আছে; ইহাদের দেখিলে, স্বদেশে ফিরিবার জন্য কেমন-একটা ব্যাকুলতা উপস্থিত হয়। এই সব উদ্যানে সাইপ্রেস্-ঝাউ প্রতিবেশী তালীবনের সহিত একত্র বাস করিতেছে; এবং গোলাপ-আলবালের চারিধারে, আমাদের দেশে প্রজাপতিরা যেরূপ পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে উড়িয়া বসে, এখানে সেইরূপ মনিয়া-চড়াই ফুলের উপর উড়িয়া-উড়িয়া বসিতেছে।

ভীষণ গুহা।

এই সকল গুহাগহ্বর, পৌরাণিক সমস্ত দেবতাদিগের নামেই উৎসর্গীকৃত; কিন্তু যেগুলি সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ, তাহার প্রায় অধিকাংশই সেই মৃত্যুর দেবতা শিবের নামে প্রতিষ্ঠিত।

পূর্ব্বকালে, যাহাদের চিত্তে নানাপ্রকার ভীষণ ও বিরাট্ কল্পনার উদয় হইত, সেই সব মনুষ্য কত কত শতাব্দী ধরিয়া অতীব আগ্রহসহকারে পর্ব্বতের প্রস্তরপাষাণ খুদিয়া এই সমস্ত গুহাগহ্বর প্রস্তুত করিয়াছে। উহাদের মধ্যে কতকগুলি বৌদ্ধযুগের, কতকগুলি ব্রাহ্মণযুগের এবং কতকগুলি আরো প্রাচীন জৈনরাজাদের আমলের। সভ্যতার বিভিন্ন যুগেব মধ্য দিয়া, বিবিধ ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্য দিয়া, এই সকল আশ্চর্য্য খননকার্য্য অব্যাঘাতে ও ধারাবাহিকরূপে ভারতীয়-তক্ষণশিল্পিগণ-কর্ত্তৃক সম্পন্ন হয়।

এ বিষয়ের যিনি সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন লেখক, সেই মাসুদিনামক একজন আরব এইরূপ বলেন:—প্রায় একসহস্র খৃষ্টাব্দে এই সকল গুহার অসীম মাহাত্ম্য ছিল; ভারতবর্ষের সকল দিক্ হইতেই অসংখ্য যাত্রী এখানে ক্রমাগত আসিয়া উপস্থিত হইত।

এক্ষণে এই সকল গুহা পরিত্যক্ত হইয়াছে। দীর্ঘকালব্যাপী অনাবৃষ্টির ফলে চতুর্দ্দিকৃস্থ রুক্ষ-শুষ্ক প্রদেশটি জনশূন্য হইয়া পড়িয়াছে। এই মৃতকল্প প্রদেশের অভ্যন্তরে এই গুহাগুলি কতকাল হইতে এইরূপ পরিত্যক্ত অবস্থায় ও নিস্তব্ধতার মধ্যে রহিয়া গিয়াছে, তাহাব নির্দ্দেশ নাই।

অধুনা এই সকল গুহায় উপনীত হইতে হইলে, একটা ছোটখাটো মরুভূমি অতিক্রম করিতে হয়; এই ভূমির বর্ণ মৃগচর্ম্মের ন্যায়; ইহা সমুদ্রতটস্থ সৈকতভূমির ন্যায় সমতল; কেবল একএকটি নিঃসঙ্গ পর্ব্বত

ইতস্তত সমুত্থিত হইয়াছে। এই পর্ব্বতগুলা যেন একটু বেশিরকম মানান্‌সই ; মাথায়-মাথায় সব একসমান ;—দেখিতে কারাগারের ন্যায়—বৃহৎ দুর্গনগরের ন্যায়।

আজ আমি ভারতীয় শকটে করিয়া প্রখর রৌদ্রে এই বিজন প্রদেশ অতিক্রম করিলাম। যাত্রাপথের দুই ধারে মরা গাছগুলা খুঁটির মত সারি-সারি পোঁতা রহিয়াছে।

সন্ধ্যার মুখে একটা মৃতনগরের উপচ্ছায়া পার হইয়া গেলাম—যাহা পূর্ব্বে দৌলতাবাদ নামে প্রসিদ্ধ ছিল এবং যেখানে নির্ব্বাসিত হইয়া, তিনশত বৎসর হইল, গল্কণ্ডার শেষ-সুল্‌তান ইহলীলা সংবরণ করেন। পুরাতন চিত্রসমূহে, "ব্যাবেলের টাওয়ার্" যেরূপ দেখা যায়—তাহার সহিত অনেকটা এই মৃতনগরের সাদৃশ্য দূর হইতে উপলব্ধি হয়। ইহা একটি নগরগিরি,—একটি মন্দিরদুর্গ, একটি বৃহৎ শৈলখণ্ড—যাহা হইতে পূর্ব্বকালীন মনুষ্যেরা ইহাকে খুদিয়া-কাটিয়া বাহির করিয়াছে ;—যাহাতে ইমারতের মালমসলা প্রয়োগ করিয়াছে,—যাহার আপাদমস্তক একটু মানান্‌সই করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছে এবং যাহা এক্ষণে বালুরাশি-সমুত্থিত মিশরীয় পিরামিড্ অপেক্ষাও অধিক বিস্ময়জনক বলিয়া বোধ হয়। ইহার কাছাকাছি শতশত সমাধিমন্দির ভগ্নদশাপন্ন হইয়া মাটীর মধ্যে বসিয়া গিয়াছে। কত সূচ্যগ্রচূড়াবহুল দন্তুর প্রাকারাবলী পরস্পরকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে, তাহা নির্ণয় করা যায় না। গল্কণ্ডার ন্যায় এখানেও লৌহশলাকাবৃত ভাঁজওয়ালা ভীষণ জোড়া-কপাটের মধ্য দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলাম। কিন্তু উহার অভ্যন্তরে জনপ্রাণী নাই ;—কেবলি নিস্তব্ধতা, ভগ্নাবশেষ, আর ইতস্তত শুষ্কতরুসমূহ বিরাজমান ; বটবৃক্ষগুলা কঙ্কালসার,—উহার শাখাপ্রশাখা হইতে দীর্ঘ কেশগুচ্ছের ন্যায় শিকড় নামিয়াছে। আবার আমরা সেইরূপ ভাঁজ-কপাটের দরজা দিয়া বাহির হইলাম,—সেইরূপই অকেজো ও সেইরূপই ভীষণ বর্ম্মে আবৃত।

পূর্ব্বদিকে উচ্চ শৈলভূমি দিগন্ত পর্য্যন্ত প্রসারিত। আঁকা-বাঁকা পথ দিয়া উপরে উঠিতে হইল। আমাদের মন্থরগামী শকটের পিছনে-পিছনে আমরা পদব্রজে চলিতে লাগিলাম। এখন সূর্য্যাস্তের সময়। মেঘের অভাবে দেশ মৃতকল্প,—তথাপি সূর্য্যাস্তের সেই একই অপরিবর্ত্তনীয় আরক্তিম ভাস্বর-মহিমা। আমরাও যেমন উপরে উঠিলাম, আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই দৌলতাবাদ—ধ্বজচূড়া-প্রাকার-মন্দির-সমন্বিত সেই ভীষণ দৌলতাবাদ যেন মস্তক উত্তোলন করিয়া খাড়া হইয়া উঠিল; মুক্ত আকাশে, দেবকিরীটের ন্যায় অস্তভানুর কিরণচ্ছটার মধ্যে, দৌলতাবাদের অবয়বরেখা ফুটিয়া উঠিল। এদিকে সেই নিস্তব্ধ অসীম লোহিত ক্ষেত্র-ভূমিতে যেন আগুন জ্বলিতেছে বলিয়া বোধ হইল, সেখানে জীবনের নিদর্শনমাত্র নাই।

এই উচ্চ শৈলভূমির উপর আরো একটা ধ্বংসাবশেষ আমাদের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিল;—"রজাস্"নামক একটা অত্যন্ত-মুসলমানী-ধরণের নগর;—"পোড়ো" মস্জিদ্ ও সরু-সরু ভঙ্গুর ধ্বজস্তম্ভে আচ্ছন্ন। উহার প্রাকারাবলীর সন্নিকটে রাশিরাশি সমাধি-গম্বুজ সন্ধ্যার আলোকে আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হইল। রাত্রি যখন আসন্ন, সেই সময়ে এই সব প্রাণশূন্য রাজপথের ধারে ধারে উষ্ণীষধারী কতকগুলি লোক পাথরের উপর উপবিষ্ট রহিয়াছে দেখিলাম। এই দৃঢ়ব্রত বৃদ্ধগণ এই নগরের শেষ-অধিবাসী; শুধু এই সব মস্জিদের মাহাত্ম্যের খাতিরেই উহারা এখানে "মাটী কাম্ড়াইয়া" পড়িয়া আছে।

তাহার পর প্রায় একঘণ্টাকাল আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না—কেবল সেই একঘেয়ে শ্যামল শৈলরাশি—সায়াহ্নের মহানিস্তব্ধতার মধ্যে সম্মুখে প্রসারিত।...

পরে হঠাৎ এমন-একটা আশ্চর্য্য পদার্থ—অসম্ভব পদার্থ আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হইল—যাহা দেখিয়া এবং আর কিছুই বুঝিতে না পাইয়া,

প্রথম মুহূর্ত্তে মনোমধ্যে যেন একটু ভয়ের উদয় হয়। সমুদ্র! সমুদ্র আমার সম্মুখে উপস্থিত, অথচ আমি মধ্যভারতে নিজামের রাজ্যে রহিয়াছি! অধিত্যকাভূমির উপর একটা কুঠারখনিত বৃহৎ গহ্বর—সেইখানেই যেন সমস্ত সেই "তরঙ্গিত অসীম" পূর্ণমহিমায় প্রসারিত। বিস্তীর্ণ শৈলভূমির উপর হইতে নিম্নস্থ অধিত্যকাভূমি আমাদের নয়নগোচর হইতেছে। এই উচ্চ শৈলভূমির ধার দিয়া আমাদের যাত্রাপথ। এই সময়ে নিম্নদেশ হইতে একটা প্রবল বাতাস উঠিয়া আমাদের নিকটে আসিয়া পৌঁছিল; এ বাতাসটা তেমন গরম নহে—যেন কতকটা খোলা-সমুদ্রের হাওয়া...

এই শৈলভূমির পরপারে হাজাপোড়া গুঁড়া-মাটীর যে শুষ্কক্ষেত্র প্রসারিত—সেইখানেই এই বাতাস ধূলা-বালির ঢেউ উঠাইয়া সমুদ্রের মত সফেন তরঙ্গভঙ্গের সৃষ্টি করিয়াছে।

তা ছাড়া, আমরা আমাদের যাত্রাপথের শেষসীমায় সবেমাত্র আসিয়া পৌঁছিয়াছি, এখনো গুহার * লেশমাত্র আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় নাই। এই গুহাগুলা আমাদের নিম্নে—ঐ বিষাদময় কল্পিত-সমুদ্রতটের ধারে-ধারে—বিস্তীর্ণ শৈলভূমি কাটিয়া প্রস্তুত হইয়াছে; এবং ঐ জলহীন সমুদ্রের সম্মুখেই এই ভীষণ গুহাগুলা মুখব্যাদান করিয়া আছে।

এখন রাত্রি, আকাশে তারা জ্বলিতেছে; আমার শকট একটা ক্ষুদ্র পান্থশালার সম্মুখে আসিয়া থামিল। আমার আতিথ্যকারী—পলিতকেশ দুইজন বৃদ্ধ ভারতবাসী আমার অভ্যর্থনার জন্য তাড়াতাড়ি আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাদের ভৃত্যগণ—যাহারা অলসভাবে নিকটস্থ মাঠে বেড়াইতেছিল—তাহাদিগকে উচ্চৈস্বরে ডাক দিলেন।

আজ রাত্রে আমাকে শিবের গুহায় লইয়া যাইতে কেহই সম্মত হইল না। তাহারা বলিল, আজ রাত্রিটা অপেক্ষা করিয়া কাল দিনে গেলেই ভাল হয়। অবশেষে একজন ছাগপালক রাখাল কিছু অর্থের লোভে

* এলোরা গুহা।

আমাকে লইয়া যাইতে স্বীকৃত হইল। আমরা সঙ্গে একটা হাত-ল্যাণ্ঠান্ লইয়া যাত্রা করিলাম। নীচে অন্ধকারাচ্ছন্ন প্রবেশপথে যাইবার সময় ল্যাণ্ঠান্‌টা জ্বালাইতে হইবে।

আজিকার রাত্রি চন্দ্রহীন, কিন্তু বেশ স্বচ্ছ পরিষ্কার; চক্ষু অন্ধকারে একটু অভ্যস্ত হইলেই, এই রাত্রিকালেও বেশ দেখা যাইবে। এখন সেই সাগরচ্ছদ্মবেশী নিম্নক্ষেত্রে অবতরণ করিতে হইবে। প্রায় ৬।৭ শত-গজ-পরিমাণ একটা সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিলাম। চারিদিক নিস্তব্ধ, আকাশে তারা ঝিক্‌মিক্ করিতেছে। কুঠারাহত খোদিত শৈলগণ যেন মর্ম্মান্তিক যাতনায় অভিভূত। এখানকার সকল পদার্থেরই ন্যায়—"ক্যাক্‌টাস্"-গাছ্‌গুলাও শুষ্কশীর্ণ, কিন্তু তবু এখনো খাড়া হইয়া আছে। ইহার শুষ্ক-কঠিন শাখাগুলা ডালওয়ালা ঝাড়ের বড়-বড় মোমবাতির মত দেখিতে হইয়াছে।

যাহা উপর হইতে সমুদ্রতট বলিয়া মনে হইয়াছিল, সেই তটরেখা অনুসরণ করিয়া যখন চলিতে আরম্ভ করিলাম, তখন সেই নীচে, অন্ধকার যেন আরো ঘনাইয়া আসিল। উচ্চ শৈলভূমির আড়ালে যেখানে ছায়া পড়িয়াছে, সেই শৈলভূমির পাদদেশে এই কল্পিত সমুদ্রটি অবস্থিত। রাত্রির প্রারম্ভে যে-একটা জোর-বাতাস উঠিয়াছিল, তাহা এখন শান্ত হইয়াছে। এখন কোথাও আর সাড়াশব্দ নাই। এই স্থানটির কি অপূর্ব্ব গাম্ভীর্য্য!

পর্ব্বতের পার্শ্বদেশে গুহার প্রবেশপথগুলা মুখব্যাদান করিয়া রহিয়াছে। এই গুহার মুখ চারিদিক্‌কার অন্ধকার হইতে আরো ঘোর কৃষ্ণবর্ণ। গুহাগুলা এত প্রকাণ্ড যে, উহা মানুষের রচনা বলিয়া মনে হয় না—আবার এতটা মানান্‌সই যে, নৈসর্গিক পদার্থ বলিয়াও বোধ হয় না।...

আমরা একটুও না থামিয়া বরাবর চলিতে লাগিলাম। কিন্তু আমার সেই পথপ্রদর্শক একটু ইতস্তত করিতেছিল; কিন্তু একটু পরেই কি জানি কি ভাবিয়া, একটা মুখ-ঝাঁকানি দিয়া, আমাদের সহিত আবার চলিতে

লাগিল। বোধ করি, যেখানে আমাদিগকে লইয়া যাইবে মনে করিয়াছিল, সেইখানে যাইতে তাহার মনে দেবতাদির ভয় কিংবা এম্‌নি-একটা কোন সাদাসিধা ভয়ের উদয় হইয়াছিল। এখানকার এক-একটা স্থান যে অপেক্ষাকৃত একটু বেশি ভয়ানক, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাহার মুখের ভাবে মনে হইতেছিল, সে যেন আমাকে এইরূপ বলিতেছে—"না, আর বেশিদূর গিয়া কাজ নাই—এই পর্য্যন্তই যথেষ্ট।" কিন্তু পরে সে আমার সহিত শৈলস্খলিত প্রস্তররাশির মধ্য দিয়া,—ক্যাক্‌টাস্‌-গাছের মধ্য দিয়া চলিতে চলিতে সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন গুহামুখে প্রবেশ করিল। এখনি এই স্থানটি আমার নিকট ভীষণ-সুন্দর বলিয়া মনে হইল। কিন্তু আমি বেশ বুঝিতে পারিতেছি, পথপ্রদর্শক আমাকে যে-স্থানটি দেখাইতে সাহস করিতেছে না, তাহার কাছে ইহা কিছুই নয়।

ঘোড়সওয়ারদিগের ক্রীড়াস্থানের ন্যায় মুক্তাকাশ বৃহৎ প্রাঙ্গণসমূহ সেই সব প্রকাণ্ড পাষাণস্তূপ হইতে—সেই আদিমকালের পর্ব্বত হইতে কাটিয়া বাহির করা হইয়াছে। উহার দেয়াল এত উচ্চ যে, মনে হয় যেন এখনি মাথায় ভাঙিয়া পড়িবে। দেয়ালের গায়ে,—মোটা-মোটা খাটো থামের চার থাক্‌ বারণ্ডা-দালান উপর্য্যুপরি স্থাপিত। এই দালানের বরাবর ধারে-ধারে অমানুষিক-দেহপ্রমাণ সারি-সারি দেবমূর্ত্তি,—যেন নাট্যালয়ে মৃত্যুর অভিনয়ে কতকগুলা লোক অসাড় ও স্তম্ভিতভাবে দাঁড়াইয়া আছে। রাত্রির অন্ধকারে সমস্তই কালো দেখাইতেছে। এই সব দালানের মাথার উপর তারকাখচিত আকাশ ভিন্ন আর-কিছুই নাই। তারার এই অস্পষ্ট তরল আলোকে আমরা সেই বিরাট্‌ মূর্ত্তিগুলা দেখিলাম। উহারা যেন দর্শকের ন্যায় আমাদের আগমন নিরীক্ষণ করিতেছিল।

এইরূপ এক-এক-সার গুহা যে কত রহিয়াছে, তাহার ঠিকানা নাই। এইরূপ প্রত্যেক গুহার সার,—কোন বিশেষ সময়কার লোকদিগের সমবেত উদ্যম ও প্রভূত শ্রমের ফল।

আমার পথপ্রদর্শক ছাগপালক প্রথমে ভয় পাইয়াছিল, কিন্তু আমাদের সঙ্গে এই সব ভয়ানক স্থানে পরিভ্রমণ করিতে করিতে ক্রমশ তাহার সাহস জন্মিল। এক্ষণে ঘোর-অন্ধকার একটা গুহার মধ্যে প্রবেশ করিবার সময় সে তাহার হাতল্যাণ্ঠান্‌টা জ্বালিল। আর এখন আমাদের মাথার উপর আকাশের তারা নাই—তাহার স্থানে পর্ব্বতের স্থূল প্রস্তর-রাশি প্রসারিত। ইহা একটা ঢাকাপথ—দুই ধারের প্রাচীরের মধ্য দিয়া চলিয়া গিয়াছে। এই গুহা "গথিক্‌ ক্যাথিড্রালের" মধ্য-দালান-মণ্ডপের মত উচ্চ ও গভীর। মসৃণ দেয়ালের গায়ে পশুপক্ষীর মূর্ত্তির অনুকরণে উৎকীর্ণ একপ্রকার ছোট-ছোট খিলান রহিয়াছে। গুহার ভিতরে গিয়া মনে হয়, যেন একটা বিরাট্‌কায় জন্তুর দেহের শূন্যগর্ভ খোলের মধ্যে রহিয়াছি। এই ঘন অন্ধকারের মধ্যে আমাদের ল্যাণ্ঠান্‌টা এমন মিট্‌মিট্‌ করিয়া জ্বলিতেছিল যে, কিছুই প্রায় দেখা যাইতেছিল না। এই দীর্ঘ দালানের মধ্যে মনে হইল, যেন জনপ্রাণী নাই। কিন্তু গুহার পশ্চাদ্ভাগে একটা আকৃতি স্পষ্টরূপে লক্ষিত হইল;—২০ কি ৩০ ফীট্‌ উচ্চ একটি নিঃসঙ্গ বিগ্রহ সিংহাসনে আসীন; পশ্চাৎ হইতে তাহার ছায়া মণ্ডপের খিলান-ছাদ পর্য্যন্ত উঠিয়াছে এবং সেই ছায়া আমাদের ল্যাণ্ঠানের চলন্ত আলোকের সঙ্গে সঙ্গে যেন নাচিয়া বেড়াইতেছে। সমস্ত স্থানটির ন্যায় এই বিগ্রহও সেই-একই শ্যামল প্রস্তরে নির্ম্মিত; কিন্তু তাহার বিরাট্‌ দেহ লাল-রঙে রঞ্জিত। বড়-বড় শাদা চোখ;—কালো-কালো চোখের তারা যেন আমাদের দিকে অবনত; মনে হয়, যেন তাহার নৈশ শান্তির ব্যাঘাত হওয়ায় একেবারে বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছে। এখানকার নিস্তব্ধতা এরূপ মুখর যে, আমাদের কথা শেষ হইয়া গেলেও, আমাদের কণ্ঠস্বরের অনুরণন অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত থাকিয়া যায়। বিগ্রহের একদৃষ্টি-চাহনিতে আমরা যেন স্তম্ভিত হইয়া পড়িলাম। যাই হোক্‌, আমার পথপ্রদর্শক ছাগপালকটির এখন আর কোন ভয় নাই; সে এখন প্রত্যক্ষ দেখিয়াছে, এই সকল

প্রস্তরবিগ্রহ, যেমন দিবসে, তেম্‌নি রাত্রিকালেও অচল, স্থির। গুহা হইতে বাহির হইয়া তাহার ল্যাণ্ঠান্‌ নিবিয়া গেলে, সে ইচ্ছা করিয়া আবার ফিরিয়া চলিল; আমি বুঝিলাম, আগে যে-জিনিষের কাছে যাইতে সাহস করিতেছিল না, এখন আমাকে তাহার কাছে লইয়া যাইতে চাহে। যে বালুকারাশি সমুদ্রের সৈকতবেলাভূমিকে স্মরণ করাইয়া দেয়, সেই বালুকারাশির উপর দিয়া আমরা দ্রুতপদে চলিতে লাগিলাম;—শৈলভূমির রেখা অনুসরণ না করিয়া এবার তাহার উল্টাদিকে চলিলাম। সেই সব প্রবেশপথের সম্মুখে আর থামিলাম না। কেন না, আমরা পূর্ব্বেই তাহার রহস্যভেদ করিয়াছি।

যখন আমরা শেষসীমায় আসিয়া পৌঁছিলাম, তখন রাত্রি অনেক হইয়াছে। আমার পথপ্রদর্শক আবার তাহার ল্যাণ্ঠান্‌ জ্বালিল এবং জ্বালিয়া একটু পিছু হটিয়া দাঁড়াইল। বোধ হয়, যেখানে আমরা যাইতেছি, সে স্থানটা খুব অন্ধকার।

সর্ব্বাপেক্ষা এই প্রবেশপথটি অধিকতর ভীষণ। কারণ, এইমাত্র যে বিগ্রহগুলি দেখিয়া আসিলাম, তাহাদের ন্যায় এই দ্বারদেশের মূর্ত্তিগুলা শান্তচিত্ত নহে—পরন্তু যেন রোষের আবেশে ও কষ্টযাতনায় আড়ষ্ট হইয়া গিয়াছে—অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বাঁকিয়া পড়িয়াছে; এই ঘনঘোর অন্ধকারের মধ্যে এত কম দেখা যায় যে, কোন্‌ মূর্ত্তিগুলি পাথর কাটিয়া গঠিত এবং কোন্‌গুলিই বা পাথরের গায়ে উৎকীর্ণ, তাহা নির্ব্বাচন করা কঠিন। এই গণ্ডশৈলগুলাও, এই অতিভারাক্রান্ত পাষাণ-স্তূপগুলাও যেন অবসন্নভাবে শুইয়া পড়িয়াছে; যেন তীব্র যাতনায় উহাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বাঁকিয়া-চুরিয়া গিয়াছে। আমরা এখন শিবালয়ের সম্মুখে উপস্থিত;—সেই শিব,—যিনি মৃত্যুর দেবতা, সংহারের জন্যই যিনি সংহার করিয়া থাকেন, সংহারেই যাঁহার আনন্দ।

এই দ্বারদেশের নিস্তব্ধতায় কি-যেন-একটা বিশেষত্ব আছে—একটা

বিশেষ প্রকারের ভীষণতা আছে। এই গণ্ডশৈলসমূহ, এই সব মানবাকার বিরাট্‌মূর্ত্তি, এই সব প্রস্তরীভূত মূর্ত্তিমান্‌ কষ্টগুলা, এই সব স্তম্ভিতশ্বাস সাক্ষাৎ যন্ত্রণাগুলা—দশ শতাব্দী হইতে এই মহানিস্তব্ধতার মধ্যে নিমজ্জিত রহিয়াছে ;—এ সেই নিস্তব্ধতা, যাহা একটু নিশ্বাসপাতেই মুখরিত হইয়া উঠে,—যে নিস্তব্ধতার মধ্যে আপনার পদশব্দ শুনিয়া বিচলিত হইতে হয় এবং আপনার প্রত্যেক শ্বাসপ্রশ্বাস যেন স্পষ্ট শুনিতে পাওয়া যায়।

এখানে আর সমস্তই প্রত্যাশা করিতেছিলাম, কিন্তু কোন শব্দ শুনিব বলিয়া প্রত্যাশা করি নাই। কিন্তু গুহার প্রথম মণ্ডপটিতে যেই আমরা পদার্পণ করিয়াছি, অমনি হঠাৎ একটা ভীষণ শব্দ হইয়া সমস্ত স্থান কাঁপিয়া উঠিল। ঘড়ির ঘুম-ভাঙানো ঘণ্টাটির কল-কাটি স্পর্শ করিলে হঠাৎ যেরূপ বাজিয়া উঠে, সেইরূপ একটা শব্দ এক সেকেণ্ডের মধ্যে গুহার গভীরতম দেশ পর্য্যন্ত প্রচারিত হইল। যাহারা উপরের প্রস্তররাশির মধ্যে ঘুমাইতেছিল,—চীল, পেচক, শকুনি প্রভৃতি সেই সব শিকারী পাখী জাগিয়া-উঠিয়া পাখার ঝাপ্‌টা দিতেছিল—পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিতেছিল। ইহা তাহারই শব্দ। এই সমস্ত সমবেত-ধ্বনি গুহার স্বাভাবিক-মুখরতা-প্রভাবে প্রতিধ্বনিত হইয়া অতিরিক্তপরিমাণে বর্দ্ধিত হইল। পরে ক্রমশ প্রশমিত হইয়া শব্দটা দূরে চলিয়া গেল,—থামিয়া গেল। আবার সেই ঘোর নিস্তব্ধতা।…

এই স্তম্ভপরিবেষ্টিত গম্বুজ-আচ্ছাদিত মণ্ডপটি হইতে বাহির হইয়াই মাথার উপর আবার তারা দেখিতে পাইলাম। কিন্তু এই তারাগুলা আকাশের ফাঁকে মাঝে-মাঝে দেখা যাইতেছে—যেন একটা গহ্বরের গভীরদেশ হইতে দৃষ্ট হইতেছে। এখন আমরা কতকগুলা মুক্তাকাশ প্রাঙ্গণের মধ্য দিয়া চলিতেছিলাম। একটা সমগ্র পর্ব্বতের আধখানা তুলিয়া-ফেলিয়া এই প্রাঙ্গণগুলা প্রস্তুত হইয়াছে। ইহা হইতে যে প্রস্তর বাহির হইয়াছিল, তাহাতে নিশ্চয়ই একটা নগর নির্ম্মিত হইতে পারে।

এই প্রাঙ্গণগুলার বিশেষত্ব এই যে, উহার দেয়াল ২০০ ফীট্ উচ্চ এবং উহার গায়ে থাকে-থাকে কতকগুলি বারণ্ডা-দালান উপর্য্যুপরি স্থাপিত এবং অসংখ্য বিগ্রহ যুদ্ধোদ্যত সৈন্যের ন্যায় সারি-সারি সজ্জিত। এই সব প্রাঙ্গণপ্রাচীর ভারকেন্দ্রচ্যুত হইয়া ভীষণভাবে ঝুঁকিয়া রহিয়াছে। এই প্রাচীর এক-একটা অখণ্ড কঠিন প্রস্তরখণ্ডে নির্ম্মিত; উহার আপাদমস্তক কোথাও একটি ফাট্ নাই, চীর নাই। প্রাঙ্গণের এই দেয়ালগুলা খুব ঝুঁকিয়া থাকায় গুহার আকার ধারণ করিয়াছে, এবং এরূপ ভীষণ, যেন আমাদিগকে গ্রাস করিতে উদ্যত।

ওদিক্কার কতকগুলা প্রাঙ্গণ একেবারে খালি। কিন্তু এই প্রাঙ্গণগুলা বিরাট্ পদার্থসমূহে আচ্ছন্ন;—ক্রমসঙ্কীর্ণ চতুষ্কোণ স্তম্ভমন্দির (Obelisk), পীঠের উপর স্থাপিত হস্তী, মন্দিরের দ্বারপ্রকোষ্ঠ, দেবালয় প্রভৃতি। এখন প্রায় দ্বিপ্রহর রাত্রি। এই অন্ধকারের মধ্যে আমাদের ক্ষুদ্র দীপটি বিলীন হইয়া গিয়াছে। সুতরাং এখানকার সমগ্র নক্সা-কল্পনাটি যে কি, তাহা এখন নির্দ্ধারণ করা অসম্ভব। এখন চতুর্দ্দিকে কেবল প্রাচুর্য্য ও ভীষণতাই লক্ষিত হইতেছে। যাইতে যাইতে কোথাও বা প্রস্তরে-অঙ্কিত একটা বৃহৎ শবমূর্ত্তি, কোথাও বা কোন নরকঙ্কালের অথবা দৈত্যের মুখে অঙ্কিত বিকট হাস্যরেখা মুহূর্ত্তকাল বিদ্যুতের ন্যায় স্ফুরিত হইয়া আবার তখনি সেই বিশৃঙ্খল পদার্থরাশির মধ্যে মিশিয়া যাইতেছে।

প্রথমে আমরা শুধু কতকগুলি নিঃসঙ্গ হস্তী দেখিয়াছিলাম; এখন দেখিতেছি, কতকগুলা হস্তী দল বাঁধিয়া সারি-সারি দণ্ডায়মান, তাহাদের শুঁড়গুলা নীচের দিকে ঝুলিয়া আছে। আরো কতপ্রকার জীবজন্তু হাতপা খিঁচাইয়া মরণকে যেন ভ্যাংচাইতেছে। ইহাদের মধ্যে এই হাতীরাই শান্তমূর্ত্তি। মধ্যস্থলে অখণ্ড-প্রস্তরের যে তিনটি বৃহৎ মন্দির—এই হস্তীরা সেই মন্দির পৃষ্ঠে ধারণ করিয়া রহিয়াছে।

এই সকল মন্দির ও গুহার চতুর্দ্দিকে সেই যে ভীষণ দেয়ালগুলা—-এই

উভয়ের মধ্য দিয়া একপ্রকার চক্রাকার পথে আমরা চলিতে লাগিলাম। মধ্যে-মধ্যে তারা দেখা যাইতেছে। তারাগুলা এত দূরবর্ত্তী বলিয়া পূর্ব্বে আমার কখন মনে হয় নাই। সর্ব্বত্রই প্রচণ্ড মূর্ত্তিসমূহের মধ্যে জড়াজড়ি-ঝাপ্‌টাঝাপ্‌টি, দৈত্যদানবের যুদ্ধ ভীষণ মৈথুন, মনুষ্যদেহের ছিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ছড়াছড়ি। উহাদের মধ্যে কাহারো অন্ত্র বাহির হইয়া পড়িয়াছে, তবু পরস্পরকে জাপটাইয়া ধরিরা আছে। এখানে শিব, শিব, ক্রমাগতই শিব! শিব—যাঁহার ভূষণ মণ্ডমালা; শিব—যিনি জগৎ সৃষ্টি করিয়া আবার সংহার করিতেছেন; শিব—যিনি দশ দিকেই সমানভাবে সংহার করিতে পারিবেন বলিয়া বহুবাহু হইয়াছেন; শিব—যাঁহার মুখে মর্ম্মান্তিক প্রচ্ছন্ন উপহাসের কুটিল রেখা; শিব—যিনি পরে বিনাশ করিবেন বলিয়াই এখন নির্দ্দয়রূপে প্রজা উৎপাদন করিতেছেন; শিব—যিনি ধ্বংসাবশেষের উপর, ছিন্নমূল বাহুসমূহের উপর, ছিন্নভিন্ন অন্ত্ররাশির উপর হুঙ্কার ছাড়িয়া তাণ্ডবনৃত্য করিতেছেন; শিব—যিনি কতকগুলি ক্ষুদ্র মৃতবালিকাকে পদদলিত করিয়া উন্মত্ত-আনন্দে হাস্য করিতেছেন এবং তাঁহার পদাঘাতে ঐ সব শবমুণ্ড হইতে মস্তিষ্ক উছলিয়া পড়িতেছে। আমাদের ল্যাণ্ঠানের আলো নীচের দিকে বিকীর্ণ হওয়ায়, শুধু নিম্নস্থ ভীষণ দৃশ্যগুলার মধ্যে কোন-কোনটা একএকবার প্রকাশ পাইয়া আবার তখনি অন্ধকারের মধ্যে মিশিয়া যাইতেছে। স্থানে-স্থানে এইসব মূর্ত্তি ক্ষয় হইয়া গিয়াছে—বহুশতাব্দীর ঘর্ষণ-স্পর্শনে অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। একটা-কিছু দৃষ্টিগোচর হইবামাত্রই অন্ধকার যেন তাহার উপর একটা তুলি বুলাইয়া দেয় এবং তখনি উহা সেই চঞ্চল তমোরাশির মধ্যে কোথায় যেন ছুটিয়া পলায়—শৈলরাশির সহিত মিশিয়া একাকার হইয়া যায়, আর দৃষ্টিগোচর হয় না, কোথায় গিয়া থামিল বুঝা যায় না। তখন এইরূপ মনে হয়, যেন সমস্ত পর্ব্বতটা—তার হৃদয়দেশ পর্য্যন্ত—কেবল কতকগুলা অস্পষ্ট ভীষণ আকৃতিতে সমাচ্ছন্ন; সমস্তই যেন বিলাস ও বিনাশের দৃশ্যে পরিপূর্ণ।

মধ্যস্থলের মন্দিরগুলি পৃষ্ঠে ধারণ করিয়া হস্তিগণ সারি-সারি দণ্ডায়মান; ইহাদের যেরূপ শান্তভাব, তাহাতে এ স্থানের পক্ষে ইহাদিগকে "বেস্থুরো" ও "বেখাপ্পা" বলিয়া মনে হয়। কিন্তু এই মন্দিরগুলির অপর পার্শ্বে গিয়া দেখিলাম, উহাদেরই সমান-উচ্চ আর কতকগুলা হস্তী অন্যান্য জীবজন্তুর ন্যায় যুঝাযুঝি ও যন্ত্রণার ভাবভঙ্গী প্রকটিত করিতেছে; কতকগুলা বাঘ ও কতকগুলা কল্পিত জীবজন্তু এই হস্তীদিগকে চাপিয়া ধরিয়াছে অথবা উহাদের উদরে দংষ্ট্রাঘাত করিতেছে। একে ত উহাদের দেহের পশ্চাদ্ভাগে দেয়ালের ভার চাপিয়া থাকায় উহারা যেন অর্দ্ধনিষ্পেষিত অবস্থায় রহিয়াছে, তাহাতে আবার পরস্পরের মধ্যে প্রাণপণে যুদ্ধ চলিতেছে। এই পাশটাতেই গুহার প্রাচীর—সেই আদিম ভূস্তরের পাষাণরাশি—সর্ব্বাপেক্ষা বেশি ঝুঁকিয়া রহিয়াছে। এই প্রাচীরের দশ কিংবা বিশ ফিট্ উচ্চে অত্রত্য অসংখ্য মূর্ত্তিগুলার প্রথম রেখাপাত আরম্ভ হইয়াছে। প্রাচীরের সমস্ত তলদেশটা স্ফীত উদরের ন্যায় মসৃণ; স্থানে-স্থানে যেন ফুলিয়া উঠিয়াছে—এই ফুলোগুলা দেখিলে মনে হয় যেন খুব তল্‌তলে নরম; এই স্ফীত প্রস্তররাশি মনে হয় যেন কালো ঘূর্ণিজলের পার্শ্বদেশ—মনে হয় যেন অত্রত্য ইমারৎ-আদি হইতে "বানডাকা"র মত স্ফীত জলরাশির একটা প্রবাহ নামিয়া আসিয়াছে, আর যেন সমস্ত ইমারৎ এখনি ভাঙিয়া পড়িবে এবং আমরা সকলেই তাহাতে চাপা পড়িয়া যাইব।···

অখণ্ডপ্রস্তরের যে মন্দিরগুলা হস্তিপৃষ্ঠের উপর সংস্থাপিত এবং যাহা খোদিত পর্ব্বতে পরিবেষ্টিত—তৎসমস্তই আমরা প্রদক্ষিণ করিলাম। এখন কেবল বাকি উহাদের অভ্যন্তরে প্রবেশ করা; কিন্তু আমার পথপ্রদর্শক একটু ইতস্তত করিতেছে—কল্যকার সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে বলিতেছে।

যে সিঁড়ি দিয়া ঐ সকল মন্দিরে প্রবেশ করা যায়, ঐ সিঁড়ির ধাপগুলা ভাঙিয়া-চুরিয়া বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িয়াছে;—লগ্নপদের অবিরত

গতায়াতে মসৃণ হইয়া এরূপ পিছল হইয়াছে যে, বিপদের বিলক্ষণ সম্ভাবনা।

না ভাবিয়া-চিন্তিয়া, কেবলমাত্র স্বাভাবিক সংস্কারের বশে, আমরা নিস্তব্ধভাবে অতি সাবধানে উপরে উঠিতে লাগিলাম। কিন্তু ছোটখাটো কোন-একটা পাথর যেই নড়িয়া উঠে,—কোন-একটা নুড়ি যেই গড়াইয়া যায়, অম্‌নি উহার শব্দে প্রতিধ্বনি জাগিয়া উঠে, আর আমরাও অম্‌নি থম্‌কিয়া দাঁড়াই। এখন আমাদের চতুর্দ্দিকে বিবিধ ভীষণদৃশ্যের ক্রমাগত পুনরাবৃত্তি হইতেছে। কোথাও কোন শিব বিবিধপ্রকার মুখভঙ্গি করিতেছেন; কোথাও কোন শিব কুঞ্চিত-কায় হইয়া আছেন; কোথাও কোন শিব স্বীয় শীর্ণশরীরকে ধনুকের মত বাঁকাইয়াছেন; কোথাও কোন শিব স্বীয় মাংসল-বক্ষ ফুলাইয়া আছেন;—কোথাও জননক্রিয়ায় বিহ্বল, কোথাও হননক্রিয়ায় উন্মত্ত।

এই ঘন-অন্ধকার মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করিবার সময়, সঙ্গে কোন অস্ত্র লই নাই, একগাছি ছড়িও লই নাই, লওয়া আবশ্যকও মনে করি নাই। কোন মনুষ্য কিংবা হিংস্রপশুকর্ত্তৃক আক্রমণের সম্ভাবনা আছে বলিয়া একবার মনেও হয় নাই। তথাপি, কে জানে কেন, আমিও পথপ্রদর্শক ছাগপালকের ন্যায় ভয়ে ক্রমশ অভিভূত হইয়া পড়িলাম;—একপ্রকার "অন্ধকেরে" "কিম্ভুত-কিমাকার" ভয়—যে ভয়ের কোন নাম নাই—যাহা বাক্যে ব্যক্ত করা যায় না।

যে সকল ভীষণ দৃশ্য চারিদিকে প্রসারিত—তাহারই কোন চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত—সাঙ্কেতিক নিষ্ঠুর ব্যাপারসমূহের একটা চরম আতিশয্য,—এইবার মন্দিরের অভ্যন্তরে গিয়া দেখিব, মনে করিতেছিলাম। কিন্তু না,—এখানকার সমস্ত পদার্থেরই সহজ শান্তভাব। ঠিক যেন মরণত্রাসের পর মহাশান্তি আসিয়া মৃত্যুর পরপারে আমাকে অভিবাদন করিল। এখানে মনুষ্য কিংবা পশুর কোন প্রতিকৃতি নাই; একটি মূর্ত্তি নাই; ঝাঁঝির

দৃশ্য নাই; মুখভঙ্গীর রেখামাত্র নাই; কিছুই নাই। কেবল একটা শূন্য দেবালয়; তাহাতে প্রশান্ত গাম্ভীর্য্য বিরাজমান। কেবল এখানকার করাল শব্দমুখরতা বাহিরের অপেক্ষাও বেশী। একটু কথা কহিলে কিংবা পায়ের শব্দ হইলে চতুর্দ্দিক্ ভয়ানক প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠে। তা ছাড়া, বাস্তবপক্ষে এখানে এমন কিছুই নাই, যাহাতে ভয় হইতে পারে। এমন কি এখানে সেই পাখীগুলার কালো পাখার নাড়াচাড়াও নাই। এই সব চৌকোণা থাম—যাহা খিলানছাদের সহিত একই অখণ্ডপ্রস্তরে গঠিত—এই সব থামের অলঙ্কারগুলি নিতান্ত সাদাসিধা ও কঠোরধরণের। কতকগুলি রেখাই উহাদের প্রধান অলঙ্কার।

দারুণ ভগ্নাবস্থা ও সহস্রবর্ষব্যাপী জরাজীর্ণতা সত্ত্বেও এ স্থানটি এখনো পুণ্যতীর্থরূপে বিরাজমান। প্রবেশমাত্রই এই ভাবটি যেন সহসা অন্তরে জাগিয়া উঠে। এখানে আসিয়া যে ভয়ের উদয় হয়, সে ভয়ও ধর্ম্মভাবসংশ্লিষ্ট। মন্দিরের দেয়ালগুলা মশাল ও প্রদীপের ধোঁয়ায় কালো হইয়া গিয়াছে। কুট্টিমের সান্ চক্‌চক্ করিতেছে ও "তেলচুক্‌চুকে" হইয়া উঠিয়াছে। ইহাতেই বুঝা যায়, সময়ে-সময়ে এখানে বহুল জনতা হইয়া থাকে। অন্য যুগের লোকেরা, যে পর্ব্বতে মহাদেবের জন্য গুহা প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিল, মহাদেব এখনো সে পর্ব্বতটিকে পরিত্যাগ করিয়া যান নাই। এই পুরাতন দেবালয়ের মধ্যে এখনো যেন একটা প্রাণ রহিয়াছে।

যে তিনটি দালান, যে তিনটি দেবালয় একটার পর একটা ক্রমান্বয়ে অবস্থিত—ইহারা একই অখণ্ডপ্রস্তরে গঠিত। শেষেরটির পুণ্যমাহাত্ম্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক; তাই, ইহার মধ্যে প্রায় কেহই প্রবেশ করিতে পায় না। অন্য ব্রাহ্মণিক দেবালয়ের এইরূপ স্থানে আমি পূর্ব্বে কখনই প্রবেশ করিতে পাই নাই।

এখানেও আমি মনে করিয়াছিলাম, কি-না-জানি ভয়ানক দৃশ্য দেখিব। কিন্তু এখানেও সেরূপ দৃশ্য প্রায় কিছুই নাই।

কিন্তু এখানে একটি ক্ষুদ্র জিনিষ দেখিলাম, যাহা বাহিরের সমস্ত ভীষণ পদার্থ অপেক্ষাও বিস্ময় উৎপাদন করে, চিত্তকে আকুল করে, সমস্ত স্থানটিকে তমসাচ্ছন্ন করিয়া তুলে। বেদির ক্ষয়িত প্রস্তরের উপর চক্‌চকে মর্ম্মরপাথরের একটা ছোট কালো নুড়ি,—দীর্ঘডিম্বাকৃতি—খাড়া হইয়া রহিয়াছে; তাহার প্রত্যেক পার্শ্বে, বেদির উপর, সেই সব শৈবচিহ্ন উৎকীর্ণ রহিয়াছে, যাহা শৈবগণ প্রতিদিন প্রভাতে স্বকীয় ললাটে ভস্ম দিয়া অঙ্কিত করে। চারিধারের সমস্ত পদার্থ ধোঁয়ায় কালো হইয়া গিয়াছে। দেবালয়ের যে সব কুলুঙ্গিতে পুণ্যদীপ রক্ষিত হয়, সেই সব কুলুঙ্গিতে একপ্রকার কালো ঘন ঝুল জমিয়া গিয়াছে। দীপের পোড়া সলিতাগুলা—যাহা সরাইয়া ফেলিতে কেহই সাহস করে না—দীপ হইতে ঝরিয়া-ঝরিয়া কুলুঙ্গির ভূমিকে তৈলাক্ত করিয়া তুলিয়াছে। এখানকার সমস্তই দীন-হীন-মলিন;—সমস্তই সেই ভীষণ ধর্ম্মানুষ্ঠানের নিদর্শন।

এই কালো নুড়িটিই সকলের কেন্দ্রস্থল; অলৌকিকশ্রমসাধ্য এই সব খনন ও খোদন কার্য্যের ইহাই একমাত্র হেতু ও মূলকারণ। কোন-এক দেবতা কেবল সংহার করিবার জন্যই ক্রমাগত জীব উৎপাদন করিতেছেন—এই ভাবটি পূর্ব্বতন ভারতবাসিগণ সংহতভাবে ও বিশদরূপে প্রকাশ করিবার জন্য যে সাঙ্কেতিক চিহ্নের কল্পনা করিয়াছিলেন, তাহা অতীব অপূর্ব্ব। ইহাই শিবলিঙ্গ; ইহা জননক্রিয়ার সাঙ্কেতিক প্রতিরূপ। কিন্তু এইপ্রকার জননে মরণেরই উদরপূর্ত্তি হইয়া থাকে।

এই ভীষণ গুহাগহ্বর হইতে ফিরিয়া গিয়া যেখানে আমি নিদ্রা গিয়াছিলাম, সেই পান্থশালা হইতে বাহির হইয়াই দেখিলাম,—যে বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড সমুদ্রের মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আছে, তাহা ক্ষীণরেখায় আমার সমক্ষে প্রসারিত। একপ্রকার কুজ্ঝটিকার ন্যায়, ধূলার অবগুণ্ঠনে আচ্ছাদিত হওয়ায়, সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে এই স্থানটি একটু নীলাভ ও বাষ্পবৎ অস্পষ্ট বলিয়া বোধ হইতেছে।

কিন্তু সূর্য্যোদয় হইবামাত্র একটা বিস্তীর্ণ লোহিতক্ষেত্র আমার সমক্ষে প্রসারিত হইল;—শুষ্কবায়ুর প্রভাবে একেবারে শুকাইয়া গিয়াছে; আর, ইতস্তত কতকগুলা মরাগাছ দেখা যাইতেছে।

এই প্রখর দিবালোকে সেই সব শিবমন্দির দেখিবার জন্য যাত্রা করিলাম। যাহা দেখিয়াছি বলিয়া এখন স্মরণ হইতেছে, তাহা বাস্তবিক সেইরূপ কি না, আমার একবার পরখ করিয়া দেখিতে হইবে। এইবার আমি একাকীই নীচে নামিলাম; আমি এখন পথ চিনি; সেই সব শ্যামল শৈলরাশির মধ্য দিয়া, সেইসব শুষ্ক উচ্চ "ক্যাক্‌টাস্"—যাহা হলুদে-রঙের পুরাতন মোমবাতির মত একেবারে কঠিন হইয়া গিয়াছে—সেই সব ক্যাক্‌টাস্‌গাছের মধ্য দিয়া চলিলাম।

এখন সবেমাত্র সূর্য্যোদয়, তবু এই সূর্য্যের প্রখর উত্তাপে আমার বগ্ যেন পুড়িয়া যাইতেছে বোধ হইল। এই দুর্বৃত্ত সর্ব্বসংহারী প্রচণ্ড সূর্য্যের প্রভাবেই প্রতিদিন ভারতভূমির উপর মৃত্যুর ছায়া ক্রমশই প্রসারিত হইতেছে।···ছড়ি-হাতে তিনজন লোক,—গরুর পাল সঙ্গে নাই, অথচ দেখিতে রাখালের মত—ক্ষেত্রভূমি হইতে উপরে উঠিয়া আমাকে নতভাবে সেলাম করিয়া চলিয়া গেল; এরূপ শীর্ণকায় মনুষ্য আমি কখন চক্ষে দেখি নাই; বড়-বড় চোখ—জরবিকারগ্রস্ত রোগীর ন্যায় ঘোর রক্তবর্ণ। নিশ্চয়ই উহারা দুর্ভিক্ষপীড়িত প্রদেশ হইতে আসিয়াছে,—যাহার ঠিক দ্বারদেশে আমি এখন উপনীত হইয়াছি। শতসহস্র ছোট-ছোট চারাগাছ,—যাহা পূর্ব্বে স্থানে-স্থানে পর্ব্বতের গায়ে যেন গালিচা বিছাইয়া রাখিত, তাহা এখন প্রাণশূন্য—এখন যেন জমাটপশমের মত দেখিতে হইয়াছে।

কিন্তু এখানকার জীবজন্তুরা—যেরূপ চিরকাল করিয়া থাকে—সেইরূপ এখনো পরস্পরের সহিত যুঝাযুঝি করিতেছে। মাটীর উপর ছোট-ছোট পাখীদের মৃতদেহ পড়িয়া আছে,—চীলেরা উহাদিগকে কাটিয়া খণ্ডখণ্ড

করিয়াছে। সর্ব্বত্রই দেখা যায়, মোটামোটা লোভী মাকড়্সা শেষাবশিষ্ট প্রজাপতিদিগকে—ফড়িংদিগকে ভক্ষণ করিবার জন্য তন্তুজাল বিস্তার করিয়াছে। নিকটস্থ জলন্ত অঙ্গারের ন্যায় এই মার্ত্তণ্ডের প্রচণ্ড প্রতাপ মিনিটে-মিনিটে যেন বৃদ্ধি পাইতেছে। এই মার্ত্তণ্ডের মহিমা শিবের মহিমারই ন্যায় দারুণ অশিব!...আজ প্রাতে শিবের ভীষণ মন্দিরে অবতরণ করিয়া শিবকে মনে মনে চিন্তা করিতেছিলাম;—ইনি সেই দেবতা, যিনি জীব সৃষ্টি করিতেছেন এবং সৃষ্টি করিয়া আবার সংহার করিতেছেন! এইবার আমি ব্রাহ্মণদের ধরণে শিবকে বেশ কল্পনা করিতে পারিয়াছি! সেই দেবতা, যিনি একপ্রকার প্রচ্ছন্ন উপহাসের সহিত উন্মত্তভাবে মনুষ্য ও পশুদিগের বংশবৃদ্ধি করিতেছেন; কিন্তু সেই সঙ্গে সেই প্রত্যেকজাতীয় জীবের জন্য সাংঘাতিক অস্ত্রে সুসজ্জিত একএকটা শত্রুরও সৃষ্টি করিয়াছেন! কি অশেষ উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দিয়া ক্ষুদ্রক্ষুদ্র কতপ্রকাব কৌশলসহকারে তিনি দংষ্ট্রা, নখর, শিং, ক্ষুধা, ব্যাধি, সর্প ও মক্ষিকার বিষ প্রস্তুত করিয়াছেন! যেখানে মৎস্যগণ ভাষিয়া বেড়ায়, সেই পুষ্করিণীর উপরিস্থ মাছধরা পাখীদের ঠোঁট তিনি ছুঁচাল ও তীক্ষ্ণ করিয়া দিয়াছেন, মানুষের জন্য তিনি নানাপ্রকার রোগ, অবসাদ, জরাবার্দ্ধক্য পূর্ব্ব হইতেই চুপিচুপি সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছেন; প্রত্যেকেরই রক্তমাংসের মধ্যে তিনি মর্ম্মন্তুদ চৈতন্যলোপী সুতীক্ষ্ণ প্রেমের কাঁটা প্রবিষ্ট করিয়া রাখিয়াছেন; সকলের জন্যই তিনি অসংখ্য ছোটখাট দুঃখ সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছেন; স্বচ্ছ নদীর জলেও তিনি শতসহস্র অদৃশ্য ঘাতক রাখিয়া দিয়াছেন;—ভীষণ অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত কীটের বীজ সেই জলে নিহিত করিয়াছেন;—যখনই সেই জল কেহ পান করিতে যাইবে, অমনি তাহারা তাহার অন্ত্রভক্ষণে উদ্যত হইবে।...“আত্মাকে উন্নত করিবার নিমিত্তই দুঃখযন্ত্রণার সৃষ্টি।” ভাল, তাহাই যেন হইল; কিন্তু আমাদের অবোধ শিশুসন্তানেরা যে একটা বিশেষ রোগে (যে রোগটি বিশেষ করিয়া

তাহাদেরই জন্য উদ্ভাবিত) রুদ্ধশ্বাস হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়, সে বিষয়ে কি বক্তব্য?...তা ছাড়া, আমি কত হতভাগ্য ক্ষুদ্র পশুদিগের ভয়বিস্ফারিত নয়নে তীব্র যাতনা, নিষ্ফল প্রার্থনা, স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি।...আর ছোট-ছোট পাখীগুলা যে নির্ব্বোধ-ব্যাধগণকর্তৃক শস্ত্রাঘাতে নিহত হয়, তাহাও কি উহাদের আত্মার উন্নতির জন্য? মাকড়্সারা বায়ুস্থিত ক্ষুদ্র প্রাণীদিগকে শোষণ করিয়া যে উদরস্থ করে সে সম্বন্ধেই বা কি বক্তব্য?... এই সমস্ত অনন্ত নিষ্ঠুরতা যুগযুগান্তরব্যাপী জীব-আবর্ত্তের উপর প্রসারিত। বিধাতার প্রতি এরূপ তিরস্কার নিতান্ত অযথা নহে; সর্ব্বকালের সকল লোকেই এই কথা বলিয়া আসিতেছে—ইহার আলোচনা করিতেছে; কিন্তু শিবের গুহার মধ্যে পুনর্ব্বার অবতরণ করিয়া এ কথা আজ যেমন আমার মনে দারুণ সত্যরূপে প্রতিভাত হইল, এমন আর পূর্ব্বে কখন হয় নাই। অথচ আমি একজন সুখী পুরুষ; সুখস্বচ্ছন্দে আমার জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ হইতেছে; দুর্ভিক্ষ আমার নিকট সহজে পৌঁছিতে পারে না; বিনাশের অপর কোন হেতুও আমার নিকট আপাতত উপস্থিত নাই; বড়-জোর আমি এখন—মধ্যাহ্নসূর্য্যের প্রচণ্ড কিরণ হইতে অথবা শুষ্ক তৃণাচ্ছন্ন কৃষ্ণচক্রধারী কেউটেসাপের দংশন হইতে আমার বিনাশের আশঙ্কা করিতে পারি। তা ছাড়া, আমার আশঙ্কার বিষয় এখন আর কিছুই নাই।...

যখন আমি নীচের সেই বালুকা ও ধূলার ক্ষেত্রে আসিয়া পৌঁছিলাম—সেইখানে ডাহিনে ফিরিয়া কয়েকমিনিটের মধ্যেই আবার সেই "হাঁ-করা" প্রকাণ্ড গুহাদ্বারের সম্মুখে উপনীত হইলাম।

আজ প্রাতে এই ভীষণ মন্দিরে প্রবেশ করিয়া কোন ভীষণ শব্দ শুনিতে পাইলাম না। চীল, শকুনি কিংবা বাজ, যাহারা মন্দিরের ভিতর-ছাদে বাসা করিয়া থাকে, তাহারা ইতঃপূর্ব্বেই শিকারে বাহির হইয়াছে। এখন চতুর্দ্দিক্ নিস্তব্ধ। বিগত দ্বিপ্রহর রাত্রির নিস্তব্ধতার ন্যায় এ নিস্তব্ধতা তত ভীষণ নহে।

স্তম্ভমন্দিরসমূহের পরেই,—হস্তিপৃষ্ঠপরিধৃত অখণ্ডপ্রস্তরখোদিত সেই সব দেবালয় গুহার গভীরদেশে খাড়া হইয়া আছে; অসংখ্য-মূর্ত্তি-উৎকীর্ণ গুহার দেয়ালগুলা দেবালয়ের চতুর্দ্দিকে ঝুঁকিয়া রহিয়াছে কিন্তু উদীয়মান আলোকে এ সমস্ত আর তত বিরাট্—তত অতিমানুষিক বলিয়া বোধ হইল না; সৃষ্টির যিনি দেবতা, তাঁহার বাসস্থানের পক্ষে ইহা যথেষ্ট ভীষণ কিংবা যথেষ্ট অলৌকিক বলিয়া মনে হইল না। এই সমস্ত যে জাতির যেসময়কার হস্তরচনা, সে জাতির তখনো শৈশবদশা উত্তীর্ণ হয় নাই; সুতরাং জীবনের যে কি অপরিমেয় ভীষণতা, সে সময়ে উহারা যথেষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম্ করিতে পারে নাই; অথবা হৃদয়ঙ্গম করিয়াও তাহার উপযুক্ত সাঙ্কেতিক প্রতিরূপ নির্দ্ধারণ করিতে সমর্থ হয় নাই। একে ত তমসাচ্ছন্ন দ্বিপ্রহর রাত্রি, তাহাতে আবার ল্যাণ্ঠানে ভাল আলো হইতেছিল না—এই অবস্থায় গতকল্য এখানে আসিয়া আমার মনে যে ধারণা হইয়াছিল, সেই ধারণার অনুরূপ আজ এখানে কিছুই দেখিতেছি না।

অত্রত্য সমস্ত পদার্থেরই যে চূড়ান্ত ভগ্নদশা, তাহা আজ প্রভাতের আলোকে বিলক্ষণ জানা যাইতেছে। ভাঙা থাম, থামের মাথাল, মূর্ত্তিদের মুণ্ড, মূর্ত্তিদের ভগ্নদেহ—এই সমস্তের উপর দিয়া শুধু যে শতশত শতাব্দী চলিয়া গিয়াছে তাহা নহে; তা ছাড়া, সেই বিজয়ী মুসলমানদিগের আমলে,—যাহারা ঈশ্বরকে ভিন্ন নামে অভিহিত করে, সেই ধর্ম্মোন্মত্ত মনুষ্যেরা অন্য স্থানের শিবমন্দিরের ন্যায় এই শিবমন্দির-গুলিকেও আক্রমণ করিয়াছিল।

গতকল্য সেই গভীর রাত্রে, যাহা আমি সন্দেহ পর্য্যন্ত করি নাই, এখন তাহা স্পষ্ট দেখিতেছি;—পূর্ব্বে এই সমস্ত পদার্থে রং মাখানো ছিল। এই এক-ঝোঁকা শৈলসমূহের আধো-আঁধারে যে সকল অসংখ্য অখণ্ডমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়—চারিধারে যে সকল বিচিত্র-অঙ্গভঙ্গি-বিশিষ্ট মূর্ত্তিদিগের ভগ্ন অবয়বাদি দেখিতে পাওয়া যায়—সে-সমস্তে এখনো

একটু ফিঁকে সবুজের পোঁচ রহিয়াছে;—কতকটা যেন শবের রং। পক্ষান্তরে, উহাদের বাসস্থানের গভীরদেশে শুষ্ক শোণিতের ন্যায় একটু লাল রহিয়া গিয়াছে।

মধ্যস্থলের অখণ্ডপ্রস্তরখোদিত মন্দিরগুলিও পূর্ব্বকালে মিশ্রবর্ণ ছিল। প্রাচীন মিশরের থেরিস্ ও মেম্ফিস্ নগরের গৃহাদিতে যেরূপ সূক্ষ্ম বর্ণভেদ পরিলক্ষিত হয়, সেইরূপ বিচিত্র মিশ্রবর্ণ এখানকার মন্দিরাদিতে এখনো রহিয়া গিয়াছে;—শাদা, লাল, গেরুয়া হল্‌দে।

আজ প্রাতে আমি একাই উপবে উঠিব, এইরূপ স্থির করিয়াছিলাম। আমার পথপ্রদর্শক সেই ছাগপালক যতই মূর্খ বর্ব্বর হউক না কেন, তবু সে চিন্তাধর্ম্মী মনুষ্য। সে আমার সঙ্গে থাকিলে শিবের সহিত মথামুখী করিয়া আলাপ করিবার পক্ষে ব্যাঘাত হইতে পারে।

পূর্ব্বে যেরূপ দেখিয়াছিলাম,—মন্দিরের অভ্যন্তরে এখনো সেইরূপ নিস্তব্ধতা। কিন্তু খিলান-ছাদের নীচে আর একটু বেশি আলো পাইব বলিয়া আমি আশা করিয়াছিলাম, কিন্তু সে আশা পূর্ণ হইল না। এখন সূর্য্যোদয়; ইহারই মধ্যে বাহিরের লোহিত ক্ষেত্রভূমিতে যেন আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু বাহিরের এই প্রখর উজ্জ্বল আলোক সত্ত্বেও এখানে ঘোর অন্ধকার। উপরিস্থ গুরুভার পাষাণরাশির তলদেশে এখনো যেন একটু নিশার শৈত্য কারাবদ্ধ হইয়া আছে। মন্দিরের যে অংশটি সর্ব্বাপেক্ষা পবিত্র, তাহারই পশ্চাদ্ভাগে—যেখানকার দেয়ালগুলা বহুশতাব্দী হইতে মশালের ধোঁয়ায় কালো হইয়া গিয়াছে—সেখানে অনন্ত অন্ধকারে পরিবেষ্টিত সেই দেবতার তীব্র উপহাসব্যঞ্জক মুখচ্ছবি বিরাজমান—যিনি জন্মমৃত্যুর দেবতা;—সেই কৃষ্ণবর্ণ উপলখণ্ড—সেই প্রস্তরখোদিত শিবলিঙ্গ।

দুর্ভিক্ষের গান।

গ্রামের প্রবেশপথে রাস্তার চৌমাথায় কতকগুলি শিশু—কতকগুলি ক্ষুদ্র নরকঙ্কাল বলিলেও হয়—দুই হাতে আপনাদের উদর ধরিয়া একটা-কি

গান গাহিতেছে, অথবা চীৎকার করিয়া কি বলিতেছে। উহাদের উদর ভিতরদিকে ভয়ানক ঢুকিয়া গিয়াছে; চামড়ার খালি বোতলের মত কুঁচ্‌কিয়া চুপ্‌সিয়া গিয়াছে; বড় বড় চক্ষু;—কেন এত দুঃখ যন্ত্রণা সহিতে হইতেছে ভাবিয়াই যেন বিস্ময়বিস্ফারিত।

এই গানের পূর্ণ প্রচণ্ডতা হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে যাইতে হয়, রাজস্থানে যাইতে হয়—যেখানে, শুধু একমুষ্টি চাউলের অভাবে শতসহস্র লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে। এই গুহা হইতে সেই সব স্থান প্রায় দেড়শতক্রোশ দূরে।

এই প্রদেশে,—মৃত বন, মৃত জঙ্গল, সমস্তই মৃত। যে বৃষ্টি পূর্ব্বে আরবসাগর হইতে প্রেরিত হইত, কিয়ৎবৎসর হইতে তাহার অভাব হইয়াছে, অথবা উহা ভিন্নপথে চলিয়া গিয়াছে;—বেলুচিস্থানের মরুভূমির উপর নিরর্থক ছড়াইয়া পড়িয়াছে। স্রোতস্বিনীতে জল নাই; নদী শুকাইয়া গিয়াছে; তরুলতা আর হরিৎ পরিচ্ছদ ধারণ করে না।

আমি এখন রৎলাম ও ইন্দোরের রাস্তা ধরিয়া রেলপথে দুর্ভিক্ষপ্রদেশে যাইতেছি। এক্ষণে সমস্ত ভারতই লৌহপথে ক্ষতবিক্ষত। যে ট্রেণে যাইতেছি, উহার সমস্ত গাড়িই প্রায় খালি;—যাত্রীর মধ্যে দুইটিমাত্র ভারতবাসী।

আমার চোখের নীচে দিয়া—কয়েকঘণ্টাকাল—কেবলই বন চলিয়াছে;—ইহা তালীবন নহে; এই সব বনতরু কতকটা আমাদের দেশীয় গাছের মত। বনগুলা যদি এত বড় না হইত, উহার দিগন্তদেশ যদি বনজঙ্গলে আচ্ছন্ন না হইত, তাহা হইলে আমাদের দেশের বন বলিয়া ভ্রম হইতেও পারিত। সুকুমার শাখা, ধূসর শাখা। উহার সাধারণ রং—আমাদের দেশের ডিসেম্বারের "ওক্"-গাছের পাতার মত। আমাদের ফ্রান্সদেশে, শরতের শেষভাগেই এইরূপ দৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু আমরা এখন এপ্রিলমাসে ভারবতর্ষে রহিয়াছি। গ্রীষ্মদেশসুলভ প্রখর উত্তাপ, অথচ

বহির্দৃশ্য শীতদেশের মত। আজ ভ্রমণের এই প্রথমদিবসে, উৎকট দুঃখ-কষ্টের চিহ্ন এখনো পর্য্যন্ত কোথাও প্রকাশ পায় নাই; তবে মনে হয়, প্রকৃতির কি-যেন-একটা বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে; সমস্ত দেশ নিরুপায় হইয়া যেন একটা উদাসভাব ধারণ করিয়াছে; নিঃশেষিতশক্তি কোন গ্রহের যেন মরণযন্ত্রণা উপস্থিত হইয়াছে।

আমাদের য়ুরোপের পিতামহ ভারত—বলা বাহুল্য, এখন ধ্বংসাবশেষের দেশ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রায় চারিদিকেই সেই সব মৃতনগরের উপচ্ছায়া দেখিতে পাওয়া যায়—যাহা শত-শত বৎসর, সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ধ্বংস হইয়া গিয়াছে; –সেই সব নগর, যাহার নাম পর্য্যন্ত এখন বিলুপ্ত হইয়াছে, কিন্তু যাহা এককালে খুব বড় ছিল;—পর্ব্বতাদির উপর রাজ-মহিমায় অধিষ্ঠিত হইয়া, পাদশায়ী অতলস্পর্শ অবলোকন করিত। তিনক্রোশ দীর্ঘ প্রাকারাবলী, প্রাসাদ ও মন্দিরাদি এক্ষণে পরিত্যক্ত হইয়া কপিবৃন্দ ও ভীষণ সর্পের আবাস হইয়া পড়িয়াছে।…এই সব ভগ্নাবশেষের নিকটে—আমাদের সেকেলে দুর্গপ্রাসাদের চূড়ামন্দির, নগরপালের আবাসগৃহ, আমাদের সেই সামন্ত-যুগের আর সমস্ত কি ক্ষুদ্র বলিয়াই মনে হয়!

আমাদের যাত্রাপথের বরাবর ধারেধারে একটার পর একটা নগর ও অরণ্যের ধ্বংসাবশেষ দেখা যাইতেছে;—সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সেই একই জ্বালাময় বায়ুরাশির মধ্যে নিমজ্জিত। এই উদ্ভিজ্জাবশেষের উপর,—সেই গল্প-কাহিনীর প্রাচীন মৃতনগরাদির অস্থিরাশির উপর—প্রখর সূর্য্য অস্ত যাইতেছে—ধূলায় মলিন, শীতঋতুসুলভ পাণ্ডুবর্ণ।

পরদিন, অসীম জঙ্গলের মধ্যে জাগ্রত হইলাম। যে প্রথম-গ্রামটিতে আসিয়া গাড়ি দাঁড়াইল,—গাড়ির চাকার ঘর্ঘরশব্দ ও লোহালক্কড়ের ঝন্‌ঝনানি থামিবামাত্র, একটা কোলাহল—একটা বিশেষধরণের কোলাহল উঠিল; কি জন্য, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না—কিন্তু শুনিলে শরীরের রক্ত যেন জমাট হইয়া যায়। আবার সেই ভীষণ গান—ইহা আমাকে ছাড়িবে

না দেখিতেছি। এইবার দুর্ভিক্ষের দেশে প্রবেশ করা গিয়াছে। কতকগুলা শিশুর কণ্ঠস্বর,—ছুটির সময়ে, ইস্কুলের ছেলেরা যেরূপ কোলাহল করে, কতকটা সেইরূপ—কিন্তু এই কণ্ঠস্বর কেমন-যেন চেরা-চেরা, খ্যান্‌খেনে, অবসন্নপ্রায় ;—স্পষ্ট শুনা যায় না।···

আহা! বেচারা শিশুগুলা, ঐখানে ঐ রেলিং-বেড়ার ধারে ভিড় করিয়া ঠেলাঠেলি করিতেছে এবং উহাদের শুষ্কবাহু আমাদের দিকে প্রসারিত করিতেছে;—যে অস্থিখণ্ডের শেষপ্রান্ত হইতে হাতটি বাহির হইয়াছে, ঐ অস্থিখণ্ডই উহাদের বাহু! উহাদের শ্যামল গায়ের চামড়া পর্দ্দায়-পর্দ্দায় কুচ্‌কিয়া গিয়াছে, উহাদের শীর্ণ কঙ্কাল বাহির হইয়া পড়িয়াছে—দেখিলে ভয় হয়। উহাদের উদর দেখিলে মনে হয়, যেন একেবারেই অন্ত্রশূন্য—এম্‌নি সমতল। চোখের পাতার উপব, ওষ্ঠের উপর মাছি লাগিয়া রহিয়াছে—শেষাবশিষ্ট আর্দ্রতাটুকু পান করিবে, এই আশায়। উহাদের শ্বাস যেন ফুরাইয়া আসিয়াছে, দেহে যেন আর প্রাণ নাই, তবু দাঁড়াইয়া চীৎকার করিতেছে। উহারা খাইতে চাহে—শুধু একমুঠা খাইতে চাহে। উহারা মনে করিতেছে, যাহারা এমন বড়-বড় গাড়ি চড়িয়া যাইতেছে, অবশ্যই উহারা ধনিলোক হইবে ;—অবশ্যই উহারা সদয় হইয়া কিছু আমাদের নিকট ছুঁড়িয়া দিবে।

—"মহারাজ! মহারাজ!" (মহাশয়, মহাশয়)—ঐ সব ক্ষুদ্র কণ্ঠ গানেব কম্পিতস্বরে একসঙ্গে বলিয়া উঠিল। উহাদের মধ্যে এমন শিশুও আছে, যাহাদের বয়স পূরা পাঁচ বৎসর হইয়াছে কি না, সন্দেহ; তাহারাও "মহারাজ! মহারাজ!" বলিয়া চীৎকার করিতেছে; উহারাও বেড়া-রেলিংএর মধ্যদিয়া শীর্ণ অঙ্গুলিবদ্ধ হস্ত বাহির করিয়া রহিয়াছে।

এই ট্রেণে যাহারা আমার সহযাত্রী, উহারা তৃতীয় কিংবা চতুর্থ শ্রেণীর সামান্য-অবস্থার ভারতবাসী। উহাদের যাহা-কিছু সঙ্গে ছিল,—ছুঁড়িয়া-ছুঁড়িয়া উহারা ঐ শিশুদিগের নিকট ফেলিতেছে ;—চাউলপিঠার উচ্ছিষ্টাংশ

ও পয়সা। ঐ ক্ষুধিত শিশুরা, পশুদের ন্যায়, পরস্পরকে মাড়াইয়া, হুমড়ি খাইয়া সেই সমস্তের উপর আসিয়া পড়িতেছে। ঐ পয়সাগুলা কি উহাদের কাজে আসিবে? তবে কি গ্রামের হাটবাজারে এখনো কিছু খাদ্যসামগ্রী আছে?—উহা শুধু তাহাদেরি জন্য, যাহাদের কিনিবার সম্বল আছে! আমাদের ট্রেণের পিছনেই ত চাউল-বোঝাই চারিটা মালগাড়ি যোড়া রহিয়াছে এবং প্রতিদিনই এই সব মালগাড়ি যাতায়াত করিতেছে। কিন্তু এই চাউল উহাদিগকে দেওয়া হইবে না; উহাদিগকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য উহা হইতে একমুষ্টি কিংবা দুইচারিটি দানাও দেওয়া হইবে না; উহা তাহাদেরি জন্য, যাহাদের এখনো কিছু অর্থ আছে—যাহারা উহার মূল্য দিতে সমর্থ।

এখনো কিজন্য গাড়ি ছাড়িতেছে না? কিজন্য এই বিষাদতমসাচ্ছন্ন গ্রামের সম্মুখে এতক্ষণ অপেক্ষা করা—যেখানে মিনিটে-মিনিটে ক্ষুধিতের দল আসিয়া জমা হইতেছে এবং সেই দুর্ভিক্ষের লোমহর্ষণ গান অবিরত গাহিতেছে!

চতুর্দ্দিকে, মাটি এত শুষ্ক গুঁড়াগুঁড়া হইয়া গিয়াছে যে, পূর্ব্বে যাহা ধানের ক্ষেত ছিল, এক্ষণে তাহা ভস্মাচ্ছন্ন মরুভূমিতে পরিণত হইয়াছে। ঐ দেখ কতকগুলি রমণী—রমণীর কঙ্কাল বলিলেও হয়—উহাদের স্তন শুষ্কচামড়ার টুক্‌রার মত ঝুলিতেছে। উহারা পূতিগন্ধি ভারী বোঝার গাঁট মাথায় লইয়া, বিক্রয়ের আশায়, তাড়াতাড়ি হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়াছে;—এ সমস্ত সেই সব গরুর চামড়া—যাহারা অনাহারে মরিয়াছে এবং পরে যাহাদের গাত্র হইতে উহারা ছাল ছাড়াইয়া লইয়াছে। গরুদের খাওয়াইতে পারে না বলিয়া, আধ-মরা জীবন্ত গরুদের মূল্য চারি-আনা পর্য্যন্ত নামিয়া গিয়াছে। গোমাংস খাইয়া কেহ যে ক্ষুন্নিবৃত্তি করিবে, তাহার জো নাই; কেন না, এই ব্রাহ্মণ্যের দেশে, প্রাণ গেলেও কেহ এ কাজ করিবে না। তবে এই চামড়াগুলা কে ক্রয় করিবে?—এই সব

চর্ম্ম, যাহা হইতে পূতিগন্ধ বাহির হইতেছে এবং যাহাতে ঝাঁকে-ঝাঁকে মাছি আসিয়া বসিতেছে।

আমার কাছে যাহা-কিছু ছিল, সমস্তই উহাদের নিকট ছুঁড়িয়া দিয়াছি ···কি উৎপাত! এখান হইতে গাড়ি কি আর ছাড়িবে না?···আহা! ঐ ৩।৪ বৎসরের শিশুটির মুখে কি হতাশভাব! উহা অপেক্ষা একটু বয়সে বড় আর-একটি শিশু উহার মুষ্টিবদ্ধ হাত হইতে উহার ভিক্ষাসমগ্রীটি ছিনাইয়া লইয়াছে!···

এতক্ষণের পর ট্রেণটা ঝাঁকানি দিয়া নড়িয়া উঠিল, চলিতে লাগিল; সমস্ত কোলাহল ক্রমে দূরে চলিয়া গেল। আবার আমাদিগকে সেই নিস্তব্ধ জঙ্গলের মধ্যে আনিয়া ফেলিল।

এ, মরা জঙ্গল। পূর্ব্বে এই জঙ্গল বসন্তকালে জীবজন্তুতে আকীর্ণ হইত; তৃণাদি, ঝোপ্ঝাড় এখন আর হরিদ্বর্ণ ধারণ করে না; এই ফাল্গুনও রসসঞ্চার করিয়া উদ্ভিজ্জকে বাঁচাইয়া তুলিতে পারিতেছে না। প্রচণ্ড সূর্য্যের প্রখর উত্তাপসত্ত্বেও, অরণ্যাদির ন্যায় এই জঙ্গলও শীতের ভাব ধারণ করিয়াছে। শীর্ণকায় হরিণেরা তৃণ খুঁজিয়া না পাইয়া, জলের সন্ধান না পাইয়া, আকুলভাবে ইতস্তত বিচরণ করিতেছে। দূর-দূর ব্যবধানে, কোন একটি শুষ্কগাছের গুঁড়িতে—কোন একটি তরুণ শাখাগ্র, কোন্ একটি নিঃসঙ্গ ক্ষুদ্র উপশাখায়—যে-কিছু রস অবশিষ্ট ছিল তাহাই শোষণ করিয়া, তাহা হইতে দুইচারিটি নরম পাতা বাহির হইয়াছে, অথবা একটি বড়-রকমের লাল ফুল, এই মরুদৃশ্যের মাঝখানে, উদাসভাবে ফুটিয়া রহিয়াছে।

যে গ্রামেই ট্রেন্ আসিয়া থামে, সেইখানেই এই সব দুর্ভিক্ষপীড়িত ক্ষুধিতের দল রেলিংএর মধ্য দিয়া আমাদের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করে। যাহা শুনিতে ভয় হয়, যাহা সর্ব্বত্রই একই ধরণের—সেই চেরা-চেরা আওয়াজের একসুরো গান কোন গ্রামের নিকটে গাড়ি থামিলেই শুনিতে

পাওয়া যায়। এবং যখন আমরা সেই তাপদগ্ধ বিজন দেশের মধ্য দিয়া —দূরে চলিয়া যাই, তখন দারুণ নৈরাশ্যে উহাদের কণ্ঠস্বর আরো স্ফীত হইয়া আমাদিগকে অনুধাবন করে।

উদয়পুরমন্দিরের ব্রাহ্মণ।

এই ভীষণ গুহা হইতে প্রায় ২২৫ক্রোশ দূরে, যে দিকে শুষ্কতা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে—সেই উত্তরপশ্চিমাভিমুখে, মেওয়ারদেশের শুভ্রনগর, উদয়পুর;—আমাদের যাত্রাপথে থামিবার একটি সুন্দর আড্ডা। এই মহাদুর্ভিক্ষের পথটি ধরিয়া আমি এখন চলিতেছি!

এইখানে পৌছিয়াই বহুদূর হইতে দেখা যায়-রাশীকৃত প্রাসাদ ও মন্দির ধব্‌ধব্‌ করিতেছে; চারিদিক্ পর্ব্বতে বেষ্টিত। বৃষ্টির অভাবে, সরস নবীন শাখাপল্লবের স্থলে, শুষ্ক মরা পাতা; অত্রত্য ধরণীর কি অস্বাভাবিক বিষণ্ণতা!—এই বসন্তকালেও বেশভূষা পরিহার করিয়া পীতবর্ণ ধারণ করিয়াছে। এ সমস্ত সত্ত্বেও, দূর হইতে মনে হয়—নগরটি, বনাচ্ছন্ন ঢালুদেশের পাদমূলে, তরুপুঞ্জের মধ্যে, রহস্যময় শান্তির নীড়ে বেশ আরামে রহিয়াছে।

কিন্তু যতই নিকটবর্ত্তী হইতেছি, দুঃখকষ্টের নিদর্শন চারিদিকে ক্রমশ প্রকাশ পাইতেছে! নগরতোরণ পর্য্যন্ত যে রাস্তাটি গিয়াছে, তাহার দুই ধারে সারি-সারি মরা-গাছ; রাস্তায় ভিক্ষুকেরা বিচরণ করিতেছে—সেরূপ জীব কেহ কখন চক্ষে দেখে নাই; উহাদের কঠিন প্রাণ যেন কিছুতেই বাহির হইতে চাহে না; কিন্তু এবার বোধ হয় শেষ হইয়া আসিয়াছে;—যেন কতকগুলা আরকে-রক্ষিত শব; কতকগুলা শুষ্ক চলন্ত অস্থিপঞ্জর; চক্ষু কোটরে ঢোকা; ভিক্ষা চাহিবার সময় মনে হয়, যেন

উহাদের স্বর কণ্ঠের গভীরদেশ হইতে নিঃসৃত হইতেছে। ইহারা গ্রাম-পল্লির লোক, কিংবা ঐ সব লোকের ভগ্নাবশেষ বলিলেও হয়। ইহারা দেহভার কোনপ্রকারে বহন করিয়া সহরের দিকে চলিয়াছে। উহারা শুনিয়াছে, সেখানে এখনো একমুষ্টি আহার জুটিতে পারে। কিন্তু চলিতে চলিতে প্রায়ই উহারা পথের মাঝে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে; দেখা যায়, কতকগুলা লোক ঘননিবিড় ধূলারাশির উপর ইতস্তত শুইয়া আছে; ক্রমে যন্ত্রণার ছট্‌ফটানিতে তাহাদের সর্ব্বাঙ্গ ধূলায় আচ্ছন্ন হইয়া যায়; তখন উহাদের নগ্নদেহ কঙ্কালের বর্ণ ধারণ করে। এই পথের ধারেই উদয়পুর-মহারাজের প্রাসাদের ঘের—উদাস, বিষাদময়। কতকগুলা মস্‌জিদ্, মন্দিরের ভগ্নাবশেষ, মর্ম্মরপ্রস্তরের ও অন্যান্য প্রস্তরের চতুষ্ক (kiosque), মৃত মহারাজদিগের অগ্নিসৎকারের স্থান, কতকগুলা গম্বুজওয়ালা ইমারৎ, কতকগুলা মরা-গাছ, যাহার শাখার উপর কতকগুলা বানর বসিয়া আছে; —এই সমস্ত প্রাচীর ছাড়াইয়া উঠিয়াছে, দেখিতে পাওয়া যায়।

দ্বারদেশে—উচ্চ ধবল প্রাকারাবলীর দ্বারদেশে, যেখানে খোলা তলোয়ার হস্তে কতকগুলা সিপাহী পাহারা দিতেছে—দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট হতভাগ্য লোকদিগের জনতা প্রবল বন্যার ন্যায় সবেগে আসিয়া যেন কল্‌-কপাটের সম্মুখে আট্‌কাইয়া পড়িয়াছে। এইখানে উহারা সমবেত হইয়া হস্ত প্রসারিত করিয়া রহিয়াছে। কেহ যে উহাদের গতিরোধ করিতেছে, এরূপ নহে; কিন্তু পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ন্যায় নগরের এই সব প্রবেশ-পথগুলিই ভিক্ষুকদিগের মনোমত স্থান।

তিন শতাব্দী হইল, উদয়পুরনগর স্থাপিত হয়। ইহারই পূর্ব্বদিকে কয়েকক্রোশ দূরে পুরাতন রাজধানী চিতোরের ধ্বংসাবশেষ অবস্থিত। এই উদয়পুর ইহারি মধ্যেই যেন জরাজীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে; সমস্ত চূনকাম-করা, —মনে হয় যেন শুভ্র শোকবস্ত্রে আচ্ছাদিত। ইহার অভ্যন্তরে কতকগুলি দেবমন্দির,—শাদা-থাম, শাদা চূড়া; যেটি সর্ব্বাপেক্ষা বড় ও যাহার মাহাত্ম্য

সর্ব্বাপেক্ষা অধিক—সেটি জগন্নাথরায়জির মন্দির। মহারাজের প্রাসাদ-গুলিও খুব শাদা,—একটি শৈলের উপর অধিষ্ঠিত; উহার এক পার্শ্ব হইতে সমস্ত সহর অবলোকন করা যায়। এই সকল প্রাসাদের ধবলপ্রভা একটা গভীর বৃহৎ সরোবরের উপর প্রতিফলিত,—চারিদিকে পর্ব্বত ও বনরাজি ঘিরিয়া আছে।

ঘটনাক্রমে প্রথম হইতেই দুইটি ব্রাহ্মণ যুবকের সহিত আমার আলাপ পরিচয় হয়। ইহারা দুই সহোদর এবং উভয়েই বৃহৎ মন্দিরের পুরোহিত; যে সময়ে আমার আবাসগৃহ হইতে আমি বাহির হই না,—সেই নিস্তব্ধতার সময়ে, সেই জ্বলন্ত উত্তাপের সময়ে—ইহারা বুঝিয়া-সুঝিয়াই আমার সহিত এই পান্থশালায় সাক্ষাৎ করিতে আইসে। এই দুই ভায়ের একইরকম মুখ;—অতীব সুন্দর সূক্ষ্মাবয়ব মুখশ্রী; উভয়েরই বড়-বড় চোখ;—যোগিজনের মত একটু রহস্যময় (Mystic)। ইহাদের বিশুদ্ধ কুল সাঙ্কর্য্যদোষে কলুষিত না হইয়া, তিনসহস্র বৎসর হইতে অক্ষুণ্ণভাবে চলিয়া আসিতেছে। ইহারা সেই সব ধ্যানপরায়ণ ঋষিদের বংশধর—যাহারা প্রথম হইতেই, আমাদের মত অধম মানবকুলের বাহিরে ও বহু ঊর্দ্ধে আপনাদিগকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে; যাহারা অপরিমিত পানাহারে, কিংবা বাণিজ্যে, কিংবা যুদ্ধে কখন লিপ্ত হয় নাই;—যাহারা একটি ক্ষুদ্র পশুকেও কখন হত্যা করে নাই; যাহারা আহারের জন্য কখন জীবহিংসা করে নাই। যে মাটির ছাঁচে ইহারা গঠিত, তাহা আমাদের হইতে ভিন্ন এবং আমাদের অপেক্ষা নির্ম্মল; মৃত্যুর পূর্ব্বেই ইহারা যেন একটু অশরীরী ভাব ধারণ করে; এবং ইহাদের ইন্দ্রিয়চেতনা এতটা স্থূলতাবর্জ্জিত যে, এই অস্থায়ী জীবনের পরপারস্থ জিনিষসকলও বেশ দিব্যচক্ষে দেখিতে পায়।

কিন্তু সে যাহাই হউক, আমি যে আশা করিয়াছিলাম উহাদের নিকট হইতে কিছু জ্ঞানালোক পাইব, এখন দেখিতেছি, আমার সে আশা আকাশ কুসুমবৎ অলীক। অনুষ্ঠান-আড়ম্বরের অপব্যবহারে পুরুষানুক্রমে ইহাদের

ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম তমসাবৃত হইয়া পড়িয়াছে;—সাঙ্কেতিক রূপকের মধ্যে যে অর্থ প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, তাহা এক্ষণে উহারা অবগত নহে।

"আমরা যে দেবতার পূজা করি, সেই দেবতার পরমভক্ত করণসিংহের পুত্র,—রাজশ্রী জগৎসিংহ। ১৬৮৪ সালে সিংহাসনে আরোহণ করিয়া তিনি এই বৃহৎ মন্দিরের নির্ম্মাণকার্য্য আরম্ভ করাইয়া দেন। এই মহারাজা সরোবরের উপর আরও দুইটি মন্দির নির্ম্মাণ করান। উহাদের নির্ম্মাণে ২৪ বৎসর লাগে। উদ্ঘাটন-অনুষ্ঠানের সময় যখন আমাদের দেবতা বিগ্রহমন্দিরের মধ্যে স্থাপিত হয়, সেই ১৭০৮ সালে, পার্শ্ববর্ত্তী অনেক রাজ্‌রাজ্‌ড়া অনুচরবর্গের সহিত মহাসমারোহে এখানে আসিয়াছিলেন,—তাঁহাদেরই সঙ্গে বিস্তর হাতী আসিয়াছিল।"

ঐ দুই ভায়ের মধ্যে একজন এইরূপ আমার নিকট বর্ণনা করিল। তখন বেলা দ্বিপ্রহর,—সমস্ত নিস্তব্ধ; পান্থশালার ভিতরে আধো-আধো অন্ধকার;—সমস্ত দর্‌জা-জান্‌লা বন্ধ; রৌদ্র, মাছি, শুষ্ক বাতাস,—দুর্ভিক্ষের বাতাস, কিছুই ভিতরে প্রবেশ করিবার জো নাই। উদয়পুরের মন্দিরাদিসম্বন্ধে, পৌরাণিক সমস্ত দেবদেবীর সম্বন্ধে, ইহাদের অগাধ পাণ্ডিত্য; কিন্তু মনুষ্যের অনন্ত আশার কারণ কি—পরলোকসম্বন্ধে উহাদের আধ্যাত্মিক দৃষ্টি কিরূপ—এ সমস্ত বিষয় প্রশ্ন করায় উহারা যে উত্তর করিল, তাহা হইতে আমার কিছুই বোধগম্য হইল না; তৎক্ষণাৎ যেন আমাদের পরস্পরের মধ্যে সমস্ত সংস্রব চলিয়া গেল; আমাদের মন যে একজাতীয়, তাহা যেন আর অনুভব করিতে পারিলাম না। আমাদের মধ্যে যেন একটা তমিস্রা রজনীর যবনিকা পড়িয়া পরস্পরকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিল। পুরোহিতসম্প্রদায়ের অধিকাংশ লোক যেরূপ সচরাচর হইয়া থাকে, উহারাও সেইরূপ দিব্যদর্শী, কিন্তু আবার সেইরূপ সরলমতি; উহারা কোন রহস্যেরই ব্যাখ্যা করিতে পারে না।

এই দুই পুরোহিত প্রতিদিনই আমার জন্য কিছু-না-কিছু সাদাসিধা

উপহার লইয়া আইসে,—কখন ফুল, কখন উহাদের ধরণে প্রস্তুত সামান্য মিষ্টান্ন। উহারা খুব ভদ্র ও মধুরপ্রকৃতি। তথাপি আমাদের মধ্যে যেন একটা আকাশ-পাতাল ব্যবধান। উহারা আমার প্রতি যথেষ্ট সম্মানপ্রদর্শন করে, কিন্তু সেই সঙ্গে বর্ণভেদগত অপরিহার্য্য একটু ঘৃণার ভাবও যেন মিশ্রিত। রক্তমাংসকলুষিত যে সব খাদ্যে আমি পুরুষানুক্রমে অভ্যস্ত সেই কদর্য্য সামগ্রী উহারা প্রাণান্তেও ভক্ষণ করিবে না; এমন কি আমার হস্ত হইতে জলপাত্রও গ্রহণ করিবে না; শুধু তাহা নহে, আমার সমক্ষে কোন-কিছু আহার করা কিংবা পান করাও উহারা কলঙ্কের বিষয় মনে করে;—সে কলঙ্ক কিছুতেই ক্ষালিত হইবার নহে।

অন্যদিন যে সময়ে উহারা আইসে, আজ প্রাতে তাহার কিছু পূর্ব্বে আসিয়া আমার ঘরের দরজা খুলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল;—সেই সঙ্গে সূর্য্যের জ্বলন্ত কিরণচ্ছটা, একরাশি উড়ন্ত ধূলা, অগ্নিকুণ্ডবৎ আগুনের একটা তপ্তনিশ্বাসও প্রবেশ করিল। আজ উহাদের একটা উৎসবদিন,—এই কথা আমাকে জানাইতে আসিয়াছে। আজ উহারা আমার নিকট আর আসিতে পারিবে না; সূর্য্যাস্তের পর, ইচ্ছা করিলে আমি উহাদের নিকট যাইতে পারি;—মন্দিরের প্রথম ঘেরটির মধ্যে গেলে উহাদের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইতে পারিবে, ইত্যাদি।

এখানে উৎসবাদির সময়ে যেরূপ মালা লোকে গলায় পরে, সেইরূপ মালা উহারা আমাকে দিয়া গেল; এই মালা খাঁটি জুঁই ফুলের;—এই জাতীয় জুঁইফুল দক্ষিণভারতে অপরিজ্ঞাত—এই ছোট ছোট শাদা-ফুলের মালা আমার শৈশবের পর, আর কখন দেখি নাই—এতদিনের পর আজ আবার দেখিলাম। আমার শৈশবদশায়, আমাদের পারিবারিক গৃহের প্রাঙ্গণে যূথী-অলঙ্কৃত প্রাচীরের ছায়ায় বসিয়া,—আমার বন্ধুদ্বয় আজ আমাকে যে ফুলের মালা উপহার দিয়াছেন—সেইরূপ মালা গাঁথিবার চেষ্টা করিতাম। হঠাৎ আজ সেই সুদূর অতীতের স্মৃতি আমার মনে

জাগিয়া উঠিল। সেই প্রাচীরের ধারে-ধারে,—বৃক্ষপত্রের পতন, সেই প্রাঙ্গণের তৃণগুল্ম, সেই প্রস্ফুটিত কুসুমরাশি আমার মনে পড়িয়া গেল। তখন আমার চক্ষে আমাদের সেই গৃহপ্রাঙ্গণই আমার সমস্ত জগৎ ছিল। অসীম অতীতে ফিরিয়া গিয়া, ক্ষণেকের জন্য আমার মন হইতে এই ব্রাহ্মণ্যের দেশ মুছিয়া গেল; উদয়পুরের সহর, উদয়পুরের দেববৃন্দ, উদয়পুরের সূর্য্য, উদয়পুরের দুর্ভিক্ষও মুছিয়া গেল।

যাহাই হউক, দিবাবসানে শ্রীজগন্নাথ-রায়জির উৎসবস্থলে আমি ঠিক আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

জগন্নাথরায়জির মন্দিরটি সদ্যপতিত তুষারবৎ শুভ্র। ৩০।৪০ ধাপের একটা উঁচু সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতে হয়। কতকগুলা পাথরের হাতী প্রহরিরূপে সোপান রক্ষা করিতেছে।

এই উত্তরভারতের মন্দিরচূড়াগুলিতে দাক্ষিণাত্যের ন্যায় দেবমূর্ত্তি ও পশুমূর্ত্তির অসঙ্গত মিশ্রণ দেখা যায় না; এই চূড়াগুলি বেশ প্রকৃতিস্থ ও শান্তধরণের; দূর হইতে মনে হয়, যেন সমাধিস্থানের "ইউ" (ঝাউ) বৃক্ষ। শ্রীজগন্নাথজির মন্দিরের এইরূপ অনেকগুলি চূড়া আছে;—সমস্তই শুভ্র—সদ্যপতিততুষারবৎ শুভ্র।

আমি জানিতাম হিন্দু ভিন্ন,—উচ্চবর্ণের লোক ভিন্ন—এই মন্দিরের মধ্যে কেহ প্রবেশ করিতে পায় না। তাই আমি মন্দিরের প্রাঙ্গণে থাকিয়া আমার বন্ধুদ্বয়কে ডাকিয়া পাঠাইলাম।

তাহারা আসিল। কিন্তু আমার পান্থশালায় তাদের যেমনটি দেখিয়াছিলাম, এখন আর তারা সেরূপ নাই আমাদের মধ্যে যেন আরও অতলস্পর্শ ব্যবধান পড়িয়া গিয়াছে। প্রথমেই উহারা অন্যদিনের মত আজ আমার হস্তস্পর্শ করিতে পারিবে না বলিয়া ক্ষমাপ্রার্থনা করিল, কারণ আজ তাহাদের পৌরোহিত্যকাজ করিতে হইবে, পবিত্র সামগ্রীসকল স্পর্শ করিতে হইবে।

আজ এই প্রথম উহাদিগকে প্রায়-নগ্ন অবস্থায় দেখিলাম; উহাদের দেবতার সম্মুখে উহারা এইরূপ নগ্নভাবেই অবস্থিতি করে। তাম্রপ্রতিমূর্ত্তির বক্ষোদেশের ন্যায় উহাদের সুন্দর বক্ষের উপর যজ্ঞোপবীতটি তির্য্যগ্‌ভাবে লম্বমান; উহাদের বিস্ফারিত নেত্রযুগলে কেমন একটা অন্যমনস্কভাব, যাহা পূর্ব্বে আমি কখন দেখি নাই।

কিন্তু তবু উহাদের ভদ্রতার কোন ত্রুটি নাই। বিষ্ণুদেবের একটা তাম্রময় বিগ্রহের পাদতলে, এমন কি, মন্দিরদ্বয়ের ঠিক সম্মুখে, একটা সম্মানের আসনে উহারা আমাকে বসাইল।

বেশভূষায়, দোকানদারে, মন্দিরপ্রাঙ্গণ আচ্ছন্ন; তাহাদের ঝুড়িগুলি শাদা জুঁইফুলের মালায় পূর্ণ। এই সমস্ত ফুলরাশির মধ্যে, দুর্ভিক্ষের প্রেতমূর্ত্তিগুলা—ভয়ঙ্করবর্ণবিশিষ্ট কতকগুলা নরকঙ্কাল ইতস্তত বিচরণ করিতেছে;—উহাদের চোখ জ্বরবিকারগ্রস্ত রোগীর ন্যায়।

আমার সম্মুখে ব্রাহ্মণেরা মন্দিরের সোপান দিয়া ওঠানাবা করিতেছে,—সোপানের উপরে দুই পার্শ্বে বড়-বড় পাথরের হাতী আকাশের দিকে শুঁড় তুলিয়া রহিয়াছে। সকলেরই শুভ্র পরিচ্ছদ, কটিদেশে অসি, এবং বক্ষের উপর থাকে-থাকে অনেকগুলি মালার গোচ্ছা। বৃদ্ধদিগের তুষারশুভ্র শ্মশ্রুরাজি—রাজপুতের ধরণে দুই পাশে আঁচ্‌ড়াইয়া তোলা,—দেখিতে কতকটা শাদা বৃদ্ধ মার্জ্জারের মত। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিশু;—পা এত ছোট যে, অতি কষ্টে ধাপের উপর উঠিতেছে; কিন্তু উহাদের মুখে একটা গাম্ভীর্য্যের ভাব ও তীক্ষ্ণদর্শিতা প্রকটিত;—মাথায় জরির কাজকরা মখ্‌মলের টুপি। রমণীগণ দেখিতে চমৎকার,—পুরাতন গ্রীসীয়-ধরণে পরিচ্ছদপরিহিতা;—জরির নক্‌সা-কাটা বিবিধ বর্ণের মল্‌মল্‌বস্ত্র; অথবা, কালো রঙের মল্‌মল্‌বস্ত্রের উপর রূপালি-চুম্‌কি-বসানো। তমসাচ্ছন্ন ও দুর্গম মন্দিরের অভ্যন্তর-প্রদেশ হইতে গুহাসমুত্থিত গভীর নাদের ন্যায় একপ্রকার সঙ্গীতধ্বনি,—মধ্যে মধ্যে বৃহৎ ঢক্কার বজ্রবৎ গর্জ্জনধ্বনি আমার কর্ণকুহরে আসিয়া পৌঁছিতেছে।

মন্দিরের উপরে উঠিবার পূর্ব্বে প্রত্যেকেই অবনত হইয়া সোপানের নিম্নতম ধাপটি চুম্বন করিতেছে এবং উপরে উঠিয়া পবিত্র মন্দিরচ্ছায়া হইতে বাহির হইবার পূর্ব্বেও, দ্বারদেশে ফিরিয়া আসিয়া দ্বারদেশের মাটি চুম্বন করিতেছে—প্রণাম করিতেছে। দুর্ভিক্ষের প্রেতমূর্ত্তিরাও ক্রমশ আসিয়া জমা হইতেছে এবং উৎসবসাজে-সজ্জিত জনতার গতিরোধ করিতেছে—উহাদের শুষ্ক হস্তের দ্বারা যাত্রীদিগকে আট্‌কাইতেছে; মল্‌মলের অবগুণ্ঠনবস্ত্রের মধ্যে অঙ্গুলী প্রবিষ্ট করিয়া দিতেছে; ভিক্ষালাভের উদ্দেশে, বানরের ন্যায় ক্ষিপ্রভাবে বিবিধ চেষ্টা, ও অসংযতভাবে,—অনায়ত্তভাবে নানাপ্রকার অঙ্গচালনা করিতেছে।...

তাহার পর, প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় যেরূপ হইয়া থাকে—হঠাৎ একটা বাতাস উঠিল; কিন্তু তাহাতে তপ্তনগর শীতল হইল না। ধূলার কুজ্ঝটিকার মধ্যে—পীতাভ, বিবর্ণ ও ম্লান সূর্য্য অস্তমিত হইল।

এ সমস্ত সত্ত্বেও, রাস্তায় উৎসবঘটা সমস্তরাত্রি সমান চলিতে লাগিল। সুগন্ধি রঙিনচূর্ণ মুঠামুটা উঠাইয়া লোকেরা পরস্পরের উপর নিক্ষেপ করিতে লাগিল;—উহা লোকের মুখে ও পরিচ্ছদে লাগিয়া রহিল। এইরূপ ঝটাপটি করিয়া যখন উহারা বাহির হইল, তখন দেখা গেল, উহাদের মুখের অর্দ্ধভাগ নীল কিংবা বেগুনী কিংবা লাল রঙে রঞ্জিত;— উহাদের শুভ্র পরিচ্ছদে উজ্জ্বল-রং-মাখানো আর্দ্রহস্ত অঙ্কিত হইয়াছে;— গোলাপী কিংবা হল্‌দে কিংবা সবুজ-রং-মাখানো পাঁচ-আঙুলের দাগ পড়িয়াছে।

উদয়পুরের সুরম্য বনভূমি।

যাত্রাপথের ধারে, একটি রমণীয় বনে, গিরিপাদমূলে দর্পণবৎ প্রশান্ত সরোবরের সম্মুখস্থ একটি কুটীরে, তিনজন সন্ন্যাসীর বাস। ইহারা যুবা-

পুরুষ, সুঠাম-সুশ্রী, নগ্নকায়, দীর্ঘকুন্তল—পাথরের ন্যায় পাংশুবর্ণ একপ্রকার চূর্ণে উহাদের আপাদমস্তক আচ্ছন্ন।

প্রতিদিন সকল সময়েই—যখনই ঐদিক্ দিয়া যাইবে—তখনি দেখিতে পাইবে,—ঐ তিনজন সন্ন্যাসী, ঐ অনাবৃত·কুটীরে, বৌদ্ধধরণে আসনবদ্ধ হইয়া, স্থিরভাবে সরোবরের সম্মুখে বসিয়া আছে। সরোবরের জলে পর্ব্বতের ছায়া,—ঘনঘোর অরণ্যের ছায়া,—উদয়পুর-রাজপ্রাসাদের ছায়া বিপরীতভাবে প্রতিবিম্বিত।

শুভ্রনগরের পশ্চাদ্ভাগে,—গবাক্ষবিশিষ্ট সিংহদ্বার পার হইবামাত্র,—সহসা এই নিস্তব্ধ বনভূমির আরম্ভ হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়;—চতুর্দ্দিক্‌স্থ শৈলচূড়ার উপর দিয়া চলিয়া অবশেষে সুদূর অরণ্যে, ব্যাঘ্রসঙ্কুল জঙ্গলে উহা মিশিয়া গিয়াছে।

মধ্যবনের গাছগুলা, লঘুশাখাবিশিষ্ট গুল্মতরুগুলা, কতকটা আমাদের দেশের মত। আমাদের শরতের শেষভাগে যেরূপ ফুল-ফুটিয়া থাকে,—সেইরূপ খুব ফুল ফুটিয়াছে; যদিও এখানে এখন বসন্তকাল, গ্রীষ্মপ্রধান দেশের বসন্তকাল;—তবু বাতাস আগুনের মত। কিন্তু ভারতের অন্যান্য অংশের ন্যায় এখানকার সুন্দর বনভূমিটিও নিশ্চল-নিষ্পন্দ এবং এই বসন্তকালেও সমস্তই যেন মৃতকল্প। তিনবৎসর ধরিয়া এইরূপ চলিতেছে।

নগরদ্বারের এত নিকটে থাকিয়াও এই ছায়াময় স্থানটি যে এমন নিস্তব্ধ ও শান্ত রহিয়াছে, ইহাই আশ্চর্য্য। নগরের অপরপার্শ্বেই সমস্ত গতিবিধি ও লোকের চলাচল; ধ্যানমগ্ন তিনজন সন্ন্যাসীর সম্মুখ দিয়া এ রাস্তায় কেহ প্রায় যাতায়াত করে না।

এই বনে কৃষ্ণসার আছে, বানর আছে, ঘুঘু ও টিয়াজাতীয় হরেকরকম পাখী আছে। বড় বড় জাঁকাল ময়ূর দলে-দলে বিচরণ করিতেছে। মরাগাছের মধ্যবর্ত্তী স্থানে, শাদাটে ঝোপ্‌ঝাড়ের তলায়, ভস্মাভ মৃত্তিকার উপর, এই ময়ূরগুলা সারীবন্দি হইয়া দৌড়িতেছে দেখা যায়;—পুচ্ছের

কি চমৎকার উজ্জ্বল প্রভা! হরিদ্বর্ণ ধাতুখণ্ড সমূহের যেন একএকটা সমষ্টি। এই সব পশুপক্ষী ছাড়া রহিয়াছে—কিন্তু ইহাদিগকে ঠিক "বুনো" বলা যায় না; কেন না, এদেশে মানুষেরা ইহাদিগকে হত্যা করে না, তাই আমাদের দেশের মত, ইহারা মানুষ দেখিয়া পালায় না। পর্ব্বতের অপর-পার্শ্বে ব্যাঘ্রাদি আছে বটে, কিন্তু এই সুরম্য বনে উহাদিগকে বিচরণ করিতে কস্মিন্‌কালেও কেহ দেখে নাই।

সরোবর প্রদক্ষিণ করিয়া যখন এখানে পৌঁছিলাম, ঠিক রাস্তার ধারে নিস্পন্দনিশ্চল, প্রস্তরবর্ণ এই তিনজন অদ্ভুত সন্ন্যাসীর প্রথম দর্শনেই, আমার অন্তরে একপ্রকার অস্পষ্ট অতিপ্রাকৃতিক ভয়ের সঞ্চার হইল। পাষাণপ্রতিমার সহিত প্রভেদ এই যে, ইহাদের লম্বা চুল, গোঁপ, ভুরু সমস্তই কালো; উহাদের নেত্রের অচল স্থিরদৃষ্টি দেখিয়াই যেন একটু ভয় হয়, তা ছাড়া, আর কিছুই জানা জায় না।

বয়ঃক্রম ২০ বৎসর; ইহারা সন্ন্যাসধর্ম্মে নবব্রতী। তপশ্চর্য্যা ও ব্রত-উপবাস সত্ত্বেও উহাদের সুন্দর দেহগঠনে কোনপ্রকার পরিবর্ত্তন উপস্থিত হয় নাই। আসনপীঁড়ি হইয়া বহুকাল একভাবে বসিয়া থাকিলে, পা শুকাইয়া শীর্ণ হইবার কথা, কিন্তু এখনও তাহা হয় নাই—পা এখনও বেশ স্থূল ও একটু মেয়েলী-ধরণের। চূর্ণলিপ্ত ললাটের উপর শৈবচিহ্ন লালরঙে অঙ্কিত; হঠাৎ রাস্তার সং বলিয়া মনে হইতে পারিত, কিন্তু উহাদের চোখের দৃষ্টি এম্‌নি স্নিগ্ধগম্ভীর যে, সে ভাব একটুও মনে আইসে না।

উহাদের পশ্চাতে, কুটীরের মধ্যে, কতকগুলি তাম্রসামগ্রী,—বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন—সুশৃঙ্খলরূপে সজ্জিত রহিয়াছে। উহাদের প্রাত্যহিক প্রাতঃস্নানে ও মিতাহারে এই সমস্ত সামগ্রী ব্যবহৃত হয়। উহাদের মাথার উপর গাছের মরা-ডালপালা প্রসারিত এবং ইহা পাখীদের একটা আড্ডার স্থান। চারিদিক্‌কার শুষ্কতায় অতিষ্ঠ হইয়া,—টিয়া,

ঘুঘু, বড়-বড় ময়ূর, ছোট-ছোট গায়কবিহঙ্গ এইখানে আসিয়া জড় হইয়াছে এবং এই সন্ন্যাসীরা আহারের পর যে অন্ন উহাদের জন্য রাখিয়া দেয় তাহাই উহারা খুঁটিয়া-খুঁটিয়া খায়।

যদি কোন পথিক সন্ন্যাসিত্রয়ের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ায় এবং উহাদের সহিত কথা কহে—সন্ন্যাসীরা কখন-কখন ইঙ্গিতের দ্বারা ও একপ্রকার অমনস্ক স্মিতহাস্যসহকারে কুটীরচ্ছায়াতলে বসিবার জন্য তাহাকে আহ্বান করে। কিন্তু সেই ভূমিখণ্ডটি এরূপ সযত্নে সম্মার্জ্জিত,—পাছে আবার অপরিষ্কার হয়, এইজন্য উহারা পথিককে দূরে জুতা রাখিয়া আসিতে অনুরোধ করে। পরক্ষণেই আবার তাহাদের স্তিমিতনেত্র ধ্যানে নিমগ্ন হয়; তাহার পর, যখন ইচ্ছা তুমি চলিয়া যাও,—আর উহারা তোমার সহিত কথা কহিবে না—তোমার দিকে একবার চাহিয়াও দেখিবে না।

এই বনমধ্যস্থ সরোবরটি উদয়পুরমহারাজের। কেবল তাঁহার প্রাসাদগুলি এবং চিরশুভ্র কতকগুলি পুরাতন মন্দির এই সরোবরে প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে। সরোবরের মধ্যস্থলে-দুইটি ছোটো-ছোটো দ্বীপ এবং সেই দ্বীপের উপর আরও কতকগুলি প্রাসাদ ও প্রাচারবেষ্টিত উদ্যান রহিয়াছে। তীরভূমির সর্ব্বত্রই ঝোপ্‌ঝাড় ও গাছে-গাছে জড়াজড়ি। চারিধারে উচ্চ খাড়া পাহাড়—মরা-বনের গালিচা যেন তাহাতে বিছানো রহিয়াছে; ইতস্তত, কোন কোন সূক্ষ্মাগ্র চূড়ার উপর পুরাকালের কোন-একটি ধবলপ্রভ দুর্গপ্রাসাদ, কোন-একটি ক্ষুদ্র দেবমন্দির ইগল্‌পক্ষীর ন্যায় খুব উচ্চে বিরাজমান। গাছের যে-সব ডালপালা একেবারে জলের ধারে নুইয়া পড়িয়াছে, সেই সব ডালপালা এখনো সবুজ; তা ছাড়া, যে দিকে দৃষ্টিপাত কর, সর্ব্বত্রই অকালশরতের "ছ্যাত্‌লা" অথবা শীতের একঘেয়ে ছাই-রং।

আজ সর্ব্বপ্রথমে সন্ন্যাসিত্রয়ের একটু বাস্তবিক নড়াচড়া দেখিলাম। আজ সূর্য্যাস্তের সময় এই সুরম্য বনে প্রবেশ করিয়াছিলাম।

এই সময়ে, মহারাজার একটা পোড়ো বাড়ীর উপর দিয়া ঘন ধূমরাশি নিয়ত সমুত্থিত হয়। (ইহা শুধু চতুর্দ্দিকস্থ হরিণদিগের পাদোত্থিত ধূলারাশির আবর্ত্ত; জঙ্গল শুকাইয়া যাইবার পর হইতে, মহারাজা স্বকীয় প্রাসাদের গবাক্ষ হইতে নীচে ভুট্টা নিক্ষেপ করেন; ইহাই খাইবার জন্য হরিণেরা এখানে প্রতিদিন সায়াহ্নে সবেগে দৌড়িয়া আইসে…)

দেখিলাম, একজন সন্ন্যাসী তাহার পশ্চাতে অবস্থিত দর্পণ, চূর্ণ ও লাল-রং আনিবার জন্য আসন হইতে উঠিয়াছে; তাহার পর, আবার সেই ধ্যানাসনে উপবিষ্ট হইয়া, শাদা চূর্ণে মুখমণ্ডল ধবলীকৃত করিয়া ললাটের উপর শৈব চিহ্ন সযত্নে অঙ্কিত করিতেছে। সায়াহ্ন-ভোজের জন্য ময়ূর ও ঘুঘু চারিদিক্ হইতে আসিয়া জড় হইয়াছে। ইহারা ছাড়া সেখানে আর কেহই নাই। সন্ধ্যাগমে, তবে কাহার্ জন্য এত সাজসজ্জা!…

সে যাহাই হোক্, তরুশাখার মধ্য দিয়া একদল অশ্ব খুব ছুটিয়া আসিতেছে, তাহারই পদশব্দ শুনা যাইতেছে। দরবারের ত্রিশজন সর্দ্দার সমভিব্যাহারে রাজা চলিয়াছেন। অশ্বগুলা বিচিত্রবর্ণ সাজে সজ্জিত। ছিপ্‌ছিপে-গঠন অশ্বারোহীরা সুদীর্ঘ শুভ্রপরিচ্ছদ পরিধান করিয়াছে। উদয়পুরী-ধরণে গুম্ফরাজি আচ্‌ড়াইয়া উপরদিকে তোলা; ইহাদের দেহগঠন সুন্দর ও পুরুষোচিত, ফিঁকা তাম্রবর্ণ, এবং এই উত্তোলিত গুম্ফের দরুণ মুখে কেমন-একটু মার্জ্জারভাব প্রকটিত।

মহারাজাও অনুচরবর্গের সহিত ছুটিয়া চলিয়াছেন; তাঁহারও মার্জ্জারবৎ শ্মশ্রুরাজি; তাঁহারও মুখমণ্ডল, ও সাজসজ্জা অতীব সুন্দর এবং যার-পর-নাই বিশিষ্টধরণের।

পত্রশূন্য একটা তরুবীথির মধ্য দিয়া তাঁহারা চলিয়া গেলেন। তাঁহাদের দেখিয়া, আমাদের মধ্যযুগের পাশ্চাত্য অশ্বারোহীদিগকে

মনে পড়িল। মনে হইল, যেন সেই অতীতযুগে কোন য়ুরোপীয় "প্রিন্‌স্‌", কিংবা "ডিউক্‌" অশ্বারোহী অনুচরবর্গ ও "ব্যারন্‌"গণ সমভিব্যাহারে, সুন্দর শরৎসায়াহ্নে, মৃগয়া হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন।...

রাজপুতরাজার গৃহে।

আমাকে পান্থশালায় লইয়া যাইবার জন্য উদয়পুর-মহারাজার আদেশ-ক্রমে একটা "ল্যাণ্ডো" গাড়ি আসিয়া হাজির হইল। অশ্বযুগল নিখুঁৎ সাজসজ্জায় সজ্জিত। বালুকাময় ঢালুভূমির উপর দিয়া ঘোড়ারা ছুটিয়া চলিল। ঢালুভূমির ধারে-ধারে ক্ষুদ্র স্তম্ভশ্রেণী ও গোলাপীরঙের একটা প্রকাণ্ড অট্টালিকা। একটি সরোবরের তীরে—শৈলভূমির উপর—প্রাসাদ-সৌধাবলী অর্দ্ধচন্দ্রাকারে সজ্জিত। পুষ্পপল্লবের মধ্য হইতে কতকগুলা পাথরের হাতী ইতস্তত দেখা যাইতেছে। এই ঢালু-ভূমির উপর দিয়া বলিষ্ঠ অশ্বযুগল বেগভরে অবলীলাক্রমে উঠিতেছে, আমি বেশ অনুভব করিতেছি। শীঘ্রই, আমাদের দৃষ্টিক্ষেত্র প্রসারিত হইল। শীঘ্রই, সেই সুরম্য বনভূমি, সেই নীল সরোবর, সেই-সব ছোট-ছোট দ্বীপ, সেই-সব দ্বীপস্থ প্রাসাদ আমার নেত্রসমক্ষে প্রসারিত হইল। আমরা যেমন উপরে উঠিতেছি—চতুর্দ্দিকের পর্ব্বতপ্রাচীরটিও আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই যেন উঠিতেছে, এইরূপ মনে হইতে লাগিল। উদয়পুরের সব জিনিষেরই পশ্চাতে, এই পর্ব্বত-অরণ্যের রহস্যময় চিত্রপটটি চিরবিদ্যমান।

এই মহারাজা মেওয়ারদেশের অধিপতি। ইহারই সহিত আজ আমি সাক্ষাৎ করিতে যাইতেছি। রাজস্থানে যত রাজবংশ আছে, তন্মধ্যে ইঁহারই বংশ সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন এবং মানসম্ভ্রমেও ইনি সর্ব্বাপেক্ষা

উচ্চ। ইনি সূর্য্যবংশীয়। বহু-বহু শতাব্দী পূর্ব্বে—যখন য়ুরোপের প্রাচীনতম রাজবংশাবলীর অস্তিত্বমাত্র ছিল না—তখন ইঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ দিগ্‌বিজয়ার্থ, অথবা বন্দীকৃত রাণীদের উদ্ধারার্থ বিপুল সৈন্য সংগ্রহ করিতেছিলেন *।

বিষ্ণুর অবতার মহাবীর রাম সূর্য্যবংশীয় রাজাদের আদিপুরুষ—এইরূপ রামায়ণে বর্ণিত হইয়াছে। ইঁহার দুই পুত্র। জ্যেষ্ঠ লাহোরনগর প্রতিষ্ঠা করেন; কনিষ্ঠের কোন উত্তর-পুরুষ একাদশ শতাব্দীতে রাজপুতদিগের উপর আধিপত্য বিস্তার করেন। যাহাই হউক, ৫২৪ খৃষ্টাব্দে, যখন উত্তরদেশীয় বর্ব্বরগণ দেশ আক্রমণ করিয়া লুঠপাট করে, তখন এই বংশের সমস্ত রাজাই নিহত হন; কেবল একজন রাণী—যিনি তীর্থযাত্রায় বহির্গত হইয়াছিলে—তিনিই রক্ষা পান। তিনি গর্ভবতী হইয়া একটা গুহার মধ্যে লুকাইয়া ছিলেন। তিনি সেই গুহার মধ্যেই একটি পুত্র প্রসব করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। পুরোহিতেরা এই শিশুটিকে কুড়াইয়া আনে। কিন্তু ইহাকে আগ্‌লাইয়া রাখা কঠিন হইল; উষ্ণ রাজশোণিতের প্রভাবে, শিশুটি পর্ব্বতবাসী ভীলদিগের বর্ব্বর ব্যায়ামক্রিয়ামোদে লিপ্ত হইল। ভীলেরা উহাকেই সর্দ্দাররূপে বরণ করিল। পরে এই সকল ভীলবীরদিগের মধ্যে একজন,—রাজচিহ্নস্বরূপ, নিজের আঙুল কাটিয়া সেই রক্তে তাহার ললাট চিহ্নিত করিল। অবশেষে, ৭২৩ খৃষ্টাব্দে, এই গুহাকুমারের বংশধরেরাই এখানকার অধিপতিরূপে প্রতিষ্ঠিত হন। সেই অবধি এই রাজবংশ অবিচ্ছেদে চলিয়া আসিতেছে। ১৩শত বৎসর পরে এখনো সেই অভিষেক প্রথাটি অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে; প্রত্যেক নূতন রাজার অভিষেক সময়ে,—সেই আদিমঘটনার স্মরণার্থে,—এখনো নবভূপতির ললাটদেশ ভীলহস্তে রক্তের দ্বারা চিহ্নিত করা হয়।

* রামায়ণে বর্ণিত লঙ্কা-আক্রমণ।

ল্যাণ্ডো-গাড়ি একটা অন্তঃপ্রাঙ্গণে আসিয়া থামিল। এই প্রাঙ্গণটি তাল ও ঝাউগাছে সুশোভিত। শুভ্রপরিচ্ছদধারী, রাজবাটীর একজন কর্ম্মচারী এইখানে আমাকে অভ্যর্থনা করিলেন।

ভারতের অন্যান্য রাজাদিগের ন্যায় এই মহারাজারও অনেকগুলি প্রাসাদ। সর্ব্বপ্রথমে যে প্রাসাদটি আমি দেখিলাম, উহা আধুনিক ধরণের; য়ুরোপীয়-ধরণের বৈঠকখানা-ঘর; বড়-বড় আয়না; রৌপ্যসামগ্রীতে ভারাক্রান্ত সজ্জা-টেবিল; বিলিয়ার্ড-টেবিল;—ভারতের একটি নগরে, এই সমস্ত অপ্রত্যাশিত দ্রব্যসামগ্রী দেখিয়া বিস্ময়বিহ্বল হইতে হয়।

কিন্তু মহারাজা নিজে, তাঁহার পূর্ব্বপুরুষদিগের পুরাতন আবাসগৃহটিই বেশী পছন্দ করেন। সেইখানেই তিনি আমাকে দর্শন দিবেন; সেইখানেই এখন আমার যাইতে হইবে।

প্রথমেই, কতকগুলি ছোট ছোট বাগান-বাগিচা ও কতকগুলি নিস্তব্ধ সুঁড়িপথ পার হইলাম। পরে, কোণালু খিলান ও তাম্রকপাটবিশিষ্ট একটা দ্বার পার হইয়াই হঠাৎ দেখি—সম্মুখে জনতা। জনকোলাহল ও কর্ণরোধী উৎকট বাদ্য। আমরা একটা বিশাল প্রাঙ্গণে আসিয়া পড়িয়াছি। এইখানে হস্তিগণের যুদ্ধক্রীড়া প্রদর্শিত হয়। ইহারই এক পার্শ্বে, শুভ্রমুখচ্ছবি পুরাতন প্রাসাদ পূর্ণমহিমায় বিরাজমান; প্রাচীনধরণের খোদাইকাজে, নীলবর্ণ মৃণ্ময় ঘটে, সোনালি সূর্য্যের নক্সায়, প্রাসাদের সম্মুখভাগ বিভূষিত। প্রাঙ্গণের অপর পার্শ্বে,—প্রাচীরের গায়ে সারি-সারি ঘর। সেইখানে শৃঙ্খলবদ্ধ হস্তিগণ, গা দোলাইতে দোলাইতে তৃণচর্ব্বণ করিতেছে। মধ্যস্থলে, ভীষণ সাজে সজ্জিত তিনচারিশত লোক;—দেবোৎসব-উপলক্ষে সমাগত পর্ব্বতবাসী ভীল; ইহারা যষ্টির দ্বারা পরস্পরকে আঘাত করিতে করিতে একপ্রকার যুদ্ধনৃত্য করিতেছে এবং সেই সঙ্গে সানাই, শিঙা, প্রকাণ্ড ঢাকঢোল ও কাংস্যকর্ত্তালের বাদ্য চলিতেছে। একটা ছাদের উপর, শতশত রমণী উহাদের নৃত্য দেখিবার জন্য ঝুঁকিয়া

রহিয়াছে। আহা! যেন রূপের হাট বসিয়া গিয়াছে;—মল্‌মল্‌বস্ত্রে ঢাকা কি অনিন্দ্যসুন্দর বক্ষোদেশ!

মহারাজ পর্য্যন্ত পৌঁছিতে, আরো কত সুঁড়িপথ আরো কত প্রাঙ্গণ পার হইতে হইল—যেখানে, শাদা মার্ব্বেলের খিলানবীথির মধ্যে, বড়-বড় নারাঙ্গিগাছে ফুল ফুটিয়া আছে এবং তাহার গন্ধে চতুর্দ্দিক আমোদিত। কত প্রবেশ-দালান নাগরাজুতার ভারে ভারাক্রান্ত! প্রত্যেক কোণে, দীর্ঘ-অসিধারী কত লোক! ইঁদুরকলের মত কত সুঁড়িপথ;. কত পুরাতন অন্ধকেরে সিঁড়ি—যাহার ধাপ্‌গুলা দুরারোহ ও পিছল;—এরূপ খাড়া যে, উঠিতে ভয় হয়;—উহা পুরু দেয়ালগাঁথুনির মধ্য হইতে কাটিয়া বাহির করা অথবা আদৎ পাথরে গঠিত। ছায়ান্ধকারের মধ্যে যেখানে-সেখানে রক্ষিপুরুষ; যেখানে-সেখানে নাগরাজুতার ছড়াছড়ি। কুলুঙ্গির গভীর দেশ হইতে কত দেবতা আমাদিগকে নিরীক্ষণ করিতেছেন। কত শৈলমঞ্চের উপর দিয়া, উপর্য্যুপরি-বিন্যস্ত কত ঘরের উপর দিয়া, খুব উচ্চে উঠিয়া, অবশেষে একটা দ্বারদেশে আসিয়া উপনীত হইলাম। যে কর্ম্মচারী আমাকে পথ দেখাইয়া লইয়া যাইতেছিল, সে এইখানে আসিয়া সসম্ভ্রমে থামিল এবং মৃদুস্বরে আমাকে বলিল—"এইখানে মহারাজ আছেন।" আমি একাকীই প্রবেশ করিলাম।

মর্ম্মরেল-খিলান-সমূহের উপর একটা শুভ্র অলিন্দ প্রসারিত;—তলদেশে শুভ্র বিশাল ছাদ; সেই জমির উপর, তুষারশুভ্র একটা চাদব পাতা। রক্ষিপুরুষ কেহ নাই, আস্‌বাব্‌ আদিও নাই। অন্তরীক্ষবৎ এই বিমল নিস্তব্ধতার মধ্যে—দুইটিমাত্র সোনালি গিল্‌টি-করা একইরকমের কেদারা পাশাপাশি স্থাপিত। যিনি একাকী দণ্ডায়মান হইয়া হস্ত প্রসারিত করিয়া আছেন, তাঁহাকে দেখিয়াই চিনিলাম;—তিনি সেই অশ্বারোহী পুরুষ, যাঁহার উদ্দেশে সেদিন সায়াহ্নে, বনের সন্ন্যাসিত্রয় স্বকীয় মুখরাগ সম্পাদন করিতেছিল। ইঁহার পরিচ্ছদ শুভ্র ও সাদাসিধা; কণ্ঠে নীলমণির হার।

এক্ষণে সেই গিল্‌টিকরা হাল্‌কা চৌকির উপর আমরা উপবেশন করিলাম। দস্তুরমত আদবকায়দার সহিত একজন দোভাষী নিঃশব্দে আমাদের পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইল। পাছে তাহার নিশ্বাসবায়ু মহারাজের দিকে যায়, এইজন্য যখনই সে কথা কহিতেছে, অম্‌নি একটা শাদা রেশমের রুমাল নিজের মুখের সম্মুখে ধারণ করিতেছে। এই সতর্কতার কোন প্রয়োজন দেখি না; কেন না; তাহার দন্তপংক্তি বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও তাহার নিশ্বাস বেশ বিশুদ্ধ।

মহারাজা স্বল্পভাষী; সহজে কেহ ইঁহার দর্শন পায় না; তথাপি, ইঁহাতে কেমন-একটা "মোহিনী" আছে—কেমন-একটি লালিত্য আছে;—অতীব মার্জ্জিত শিষ্টতার সহিত কেমন-একটা সঙ্কোচের ভাব মিশ্রিত —যাহা বড়-বড় লাটদিগের মধ্যেই প্রায় দেখা যায়। প্রথমেই তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তাঁহার দেশে আসিয়া আমি যথোচিত আদর-যত্ন পাইয়াছি কিনা;—যে গাড়িঘোড়া তিনি আমার জন্য পাঠাইয়াছেন, তাহা আমার মনোমত হইয়াছে কি না। এইরূপ নিতান্ত সাধারণ-ধরণের সাদামাটা কথা দিয়া আমাদের কথোপকথন আরম্ভ হইল; মাঝে-মাঝে থামিয়া যাইতে লাগিল—বাধিয়া যাইতে লাগিল। কেন না, আমাদের উভয়ের স্বাভাবিক ও কৌলিক সংস্কারের মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। কিন্তু তাহার পর যখন য়ুরোপের কথা উপস্থিত হইল, যে দেশ হইতে আমি আসিয়াছি তাহার কথা উপস্থিত হইল, যে দেশে আমি শীঘ্রই যাইব সেই পারস্যদেশের কথা উপস্থিত হইল,—তখন আমি দেখিতে পাইলাম—যদি আমাদের মধ্যে এই সমস্ত বাধা না থাকিত, তাহা হইলে আমাদের পরস্পরের মধ্যে কত কৌতূহল-জনক নূতন-নূতন কথার বিনিময় হইতে পারিত।...

এই সময়ে একজন আসিয়া মহারাজকে জানাইল,—যেখানে তিন সন্ন্যাসীর বাস, সেই রমণীয় বনে সান্ধ্যভ্রমণার্থ অশ্বারোহণে বাহির হইবার

সময় হইয়াছে। আজ সরোবর প্রদক্ষিণ করিয়া, যেখানে হরিণেরা আসিয়া জড় হয়, সেই বাড়ী পর্য্যন্ত যাইবার কথা। এই ছাদের উপর যে-সকল ভৃত্য বড়-বড় প্রাচ্যধরণের বৃহৎ ছত্র মহারাজার মাথার উপর ধরিয়াছিল, তাহারা নীচে গিয়াও সেই সব ছত্র ধরিয়া মহারাজকে ছায়ায়-ছায়ায় রাখিতে লাগিল। নীচে অশ্বারোহী অনুচরবর্গ মহারাজার সহিত যাইবার জন্য প্রস্তুত।

আমাকে বিদায় দিবার পূর্ব্বেই, তিনি যে নূতন প্রাসাদটি নির্ম্মাণ করাইতেছেন এবং যাহা এখনো শেষ হয় নাই, তাহা আমাকে দেখাইবার জন্য তাঁহার লোকজনকে আদেশ করিলেন; এবং সেই দ্বীপস্থ পুরাতন প্রাসাদগুলিও দেখাইবার জন্য নৌকা প্রস্তুত রাখিতে বলিবেন।

আমাদের এই যুগে, পুরাতন জিনিষ সমস্তই লোপ পাইতেছে। সৌভাগ্যের বিষয়, এই ভারতে এখনো এমন কতকগুলি রাজা আছেন, যাঁহারা খাঁটি ভারতীয় ধরণের গৃহাদি-নির্ম্মাণে প্রবৃত্ত;—সেইরূপ ধরণের গৃহ, যাহা তাঁহার পূর্ব্বপুরুষেরা সেই গৌরবান্বিত পুরাকালে উদ্ভাবিত করিয়াছিলেন।

একটি চক্রাকৃতি ভূমিখণ্ড অন্তরীপের মত সরোবরের অভিমুখে চলিয়া গিয়াছে। এই ভূমিখণ্ডের উপর, খুব উচ্চদেশে, নূতন প্রাসাদটি প্রতিষ্ঠিত;—কতকগুলা শাদাশাদা দালানঘর, কতকগুলা শাদাশাদা চতুষ্কগৃহ;—সমস্তই মাল্যাকৃতি কারুকার্য্যে ভূষিত;—শাদাটে পাথর কিংবা মার্ব্বেলের সান বসানো। প্রাসাদটি এরূপভাবে নির্ম্মিত ও সংস্থাপিত যে, সেখান হইতে সরোবরের বিভিন্নভাগ বেশ দৃষ্টিগোচর হয়; একটা প্রকাণ্ড সোপান সরোবর পর্য্যন্ত নামিয়া গিয়াছে; তাহার দুই ধারে পাথরের হাতী। সরোবরটি অরণ্যসমাচ্ছন্ন পর্ব্বতমালায় পরিবেষ্টিত। প্রাসাদের অভ্যন্তরে,—দেয়ালের গায়ে, কাচ ও চীনেমাটির (mosaic) বিচিত্র নক্‌সা। অমুক ঘরে দেখিবে—শুধু গোলাপেরই শাখাপল্লব;

প্রত্যেক গোলাপটি ২০ রকমের বিভিন্ন চীনেমাটির দ্বারা রচিত। আর-এক ঘরে গিয়া দেখিবে—জলের গাছপালা; পদ্মের গাছ; সেই সঙ্গে বক ও মাছরাঙা পাখী। এইরূপ বিচিত্র নক্সা-কাজের ধৈর্য্যশালী কারিকরেরা এখনো সেইখানে রহিয়াছে। উহারা মাটির উপর উবু হইয়া বসিয়া হাজার-হাজার রঙিন টুক্‌রা-কাচ হইতে, পল্লব ও পাপ্‌ড়ি খুদিয়া বাহির করিতেছে। সম্প্রতি একটা ঘর শেষ হইয়াছে;—শেয়ালা-সবুজ দেয়ালের গায়ে, বড়-বড় লাল গোলাপের নক্সা ছাড়া সেখানে আর কিছুই নাই। এই ঘরটিতে, প্রাচীনধরণের সাজসজ্জা যেরূপভাবে বিন্যস্ত, তাহাতে আমাদের দেশে যাহাকে "নূতন শিল্পকলা" বলে, তাহাই মনে করাইয়া দেয়;—মধ্যস্থলে একটি স্ফটিকের খাট; দেয়ালে যেপ্রকার সবুজ রং—সেই রঙের মশারি; এবং পদ্মনক্সাগুলির যেরূপ লাল রং,—সেই রঙেরই মখ্‌মলের গদী।

একটি ক্ষুদ্র পুরাতন দেবমন্দির;—এরূপ জীর্ণ যে, সরোবরের জলে এখনি ধসিয়া পড়িবে বলিয়া মনে হয়; এই মন্দিরের পাদদেশে, একখানা নৌকা আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। আমি সেই নৌকায় উঠিলাম। মাঝিমাল্লারা আমাকে ক্ষুদ্র দ্বীপটির অভিমুখে লইয়া গেল। একটা জোর-বাতাস উঠিল। প্রতিদিন সন্ধ্যার সময়, এইরূপ বাতাস উঠিয়া থাকে। ধূলারাশি ও মৃত্যু বিকীর্ণ করিয়া এই বাতাস সমস্ত রাজস্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে; কিন্তু এই সরোবরে আসিয়া এই বাতাস বেশ শীতল ও বিমল ভাব ধারণ করিয়াছে; এবং আমাদের চারিধারে অতীব ক্ষুদ্র নীল লহরীলীলা উঠিয়াছে।

দুইটি দ্বীপের মধ্যে যেটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র, সেই দ্বীপের প্রাসাদটি একশত বৎসরের হইবে; উহা সুগভীর সরোবরের মধ্যস্থলে অবস্থিত; সুতরাং এম্‌নিই ত লোকালয় হইতে বিচ্ছিন্ন,—তাতে আবার প্রাচীরবদ্ধ হওয়ায়, আরো নিভৃতভাব ধারণ করিয়াছে। ছোট-ছোট উদ্যানগুলিও

প্রাচীরবদ্ধ ;—সমাধিভূমিসুলভ একপ্রকার উদ্ভিজ্জের দ্বারা আক্রান্ত ;—কাঁটাগাছের ঝোপ্‌ঝাড়, লম্বা-লম্বা উদ্দাম তৃণরাশি, চর্‌কার পাঁইজের মত বড়-বড় Hollyhock,—এই সব তৃণগুল্মে আচ্ছন্ন। প্রাসাদের অভ্যন্তরে, গোলোকধাঁধার মত কতক্‌গুলা অদ্ভুতধরণের ঘর ;—নীচু, অন্ধকেরে, বিচিত্র নক্‌সার কাজে কিংবা চিত্রে বিভূষিত ; কিন্তু এই সব নক্‌সাদি এখন অনেকটা ক্ষয় হইয়া গিয়াছে। প্রাসাদটি এরূপভাবে নির্ম্মিত যে, দিবসের প্রত্যেক মুহূর্ত্তেই, ছায়া ও শৈত্য সকল-দিকেই সমান উপভোগ করা যাইতে পারে ; ইচ্ছা করিলে, এই প্রাসাদেই, কখন তুমি বিষণ্ণ ফুলের কেয়ারীর সম্মুখে, কখন দূরস্থ ব্যাঘ্রসঙ্কুল অরণ্যের সম্মুখে, কখন বা নিকটবর্ত্তী সরোবরতীরস্থ শুভ্র পরীপ্রাসাদের সম্মুখে, আপন কল্পনায় বিভোর হইতে পার। এই দ্বীপের ছোট-ছোট ঘরগুলিতে—এখানকার এই সব "পোড়ো" ঘরগুলিতে,—একসময় না জানি কত জীবননাট্য অভিনীত হইয়াছে,—দীর্ঘকাল ধরিয়া কত লোকে কত কষ্টযন্ত্রণা ভোগ করিয়াছে! এক্ষণে এই ঘরগুলি,—সরোবরের আর্দ্রতা, শৈবাল, ও যবক্ষারের প্রভাবে ধীরে-ধীরে বিনষ্ট-হওয়া-প্রযুক্তই কি পরিত্যক্ত হইয়াছে ?···প্রাচীরের কুলুঙ্গিতে,—সমাধিস্থানের আধো অন্ধকারের মধ্যে—কতকগুলা ছোট-খাটো খেলানাসামগ্রী শাশি-দরজার মধ্যে রুদ্ধ। প্রায় একশত বৎসর হইল, এই সব দ্রব্য য়ুরোপ হইতে আইসে, সুতরাং মহামূল্য হইবারই কথা!—পুরাতন চীনেমাটির পাত্রাদি, যোড়শ লুইর আমলের পোষাকপরা পুতুল, ছোট-ছোট ঘটে বসানো কৃত্রিম পুষ্পাদি।··· না জানি কত রাণী, কত রাজকুমারী এই সকল ক্ষণভঙ্গুর উপঢৌকন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন! তাঁহারা চলিয়া গিয়াছেন—তাঁহাদের জিনিষগুলি এইখানেই রহিয়া গিয়াছে।···

ইহার পরেই, বড় দ্বীপটিতে নামিলাম। এখানকার প্রাসাদগুলি, প্রায় তিনশত বৎসর হইল, একজন-প্রবল-প্রতাপ-নৃপতি-কর্ত্তৃক নির্ম্মিত

হয়। এই প্রাসাদগুলি অপেক্ষাকৃত আরো বিশাল, আরো ভগ্নদশাপন্ন। ঘাটের সিঁড়ি প্রকাণ্ড;—ধাপগুলি শাদা ধপ্‌ধপে—জলে অর্দ্ধনিমজ্জিত; সরোবরের সমরেখাপাতে, সোপানের ধারে-ধারে বড়-বড় পাথরের হাতী সারি-সারি সজ্জিত;—মনে হয় যেন তাহারা নৌকার আগমন নিরীক্ষণ করিতেছে। পার্শ্ববর্ত্তী ছোট দ্বীপটির ন্যায়, এখানকার বিষণ্ণ উদ্যানগুলিও প্রাচীরবদ্ধ; কিন্তু এই সকল প্রাচীরে নক্‌সা-কাজের খুঁটিনাটি আরো বেশী;—কারিকরদিগের ধৈর্য্যের পরিচয় আরো বেশী পাওয়া যায়। দক্ষিণাত্যের বড়-বড় তালগাছ এখানে আছে; এই সব তালগাছ এখানে বন্য-অবস্থায় বর্দ্ধিত হয় না;—রাজপ্রাসাদেরই চতুর্দ্দিকে বিলাস-সামগ্রীরূপে সংরক্ষিত। নারাঙ্গিকুঞ্জের উদ্গিরিত সৌরভে চারিদিক্ আমোদিত; মরাপাতার উপর নারাঙ্গিফুলের পাপ্‌ড়ি ঝরিয়া-পড়িয়া গাছের তলদেশ ছাইয়া গিয়াছে;—মনে হয় যেন জমাট শিশিরবিন্দুর একটা স্তর পড়িয়াছে। আমরা যখন প্রবেশ করিলাম, তখন একটু বেশী বেলা হইয়া গিয়াছে;—উচ্চ ও খাড়া পর্ব্বতগুলার পশ্চাতে সূর্য্য অনেকটা ঢলিয়া পড়িয়াছে; তাই সরোবরের উপরে যেন একটু আগেভাগেই সন্ধ্যা দেখা দিয়াছে। ইহা টিয়াপাখীদের শয়নকাল। এই সব প্রাচীরবদ্ধ সুরক্ষিত নারাঙ্গিগাছের মধ্যেই উহাদের সাধের বাসা। সুরম্য বনভূমি হইতে, সবুজ মেঘের মত উহারা দলে-দলে উড়িয়া আসিতেছে, দেখিতে পাওয়া যায়। এখানকার ম্রিয়মাণ গাছের পাতাগুলি অপেক্ষা উহারা বেশী সবুজ। চতুর্দ্দিকস্থ বনরাজি শীতঋতুসুলভ ধূসরবর্ণ ধারণ করিয়াছে; এমন কি, জলের ধারেও, সমস্ত উদ্ভিজ্জ "হল্‌দে মারিয়া" যাইতেছে। শুষ্ক বায়ু—দুর্ভিক্ষের বায়ু—সোঁসোঁ করিয়া বহিতেছে;—ইহার জোর যেন ক্রমেই বাড়িতেছে। এই দ্বীপে, এই ধ্বংসাবশেষের মধ্যে, সন্ধ্যার বিষাদচ্ছায়া আরো যেন ঘনীভূত হইয়া, ভয় ও উদ্বেগ বর্দ্ধিত করিতেছে।

গোলাপী রঙের সুন্দর পুরী।

আরো দেড়ক্রোশ উত্তরাভিমুখে। উদয়পুরের পর হইতে—মরুভূমির পর মরুভূমি। সমস্ত ভূমিই অভিশাপগ্রস্ত ;—মাটির উপরে যেন একটা শাদা ভস্মের স্তর পড়িয়াছে ; যেন একটা আগ্নেয়গিরির ব্যাপক অগ্ন্যুচ্ছাসে এই ভস্ম চারিদিকে বিকির্ণ হইয়াছে। পূর্ব্বে যেখানে জঙ্গল ছিল, গ্রাম ছিল, কৃষিভূমি ছিল—এখন সমস্তই একাকার,—একই বিষণ্ণ রঙে রঞ্জিত। কিন্তু এই উদাস উজাড় মরুপ্রদেশেও একটি সুরম্য নগর, পূর্ণ প্রাচ্যমহিমায় বিরাজ করিতেছে। সে সকল বীথি, সমুচ্চ দন্তুর প্রাকারাবলী, ছুচাল-খিলান-সমন্বিত দ্বারসমূহ এইখানে আসিয়া মিলিত হইয়াছে,—উহা শুভ্রপরিচ্ছদধারী অশ্বারোহী পুরুষে, পীত কিংবা লোহিত অবগুণ্ঠনে আবৃত রমণী-বৃন্দে পরিপূর্ণ। গরুর গাড়ি যাতায়াত করিতেছে। সুসজ্জিত উটেরা সারিবন্দি হইয়া চলিয়াছে। সু-কালের মত চারিদিকে বিচিত্র রঙের ছড়াছড়ি—জীবন-উদ্যমের উদ্দামস্ফূর্ত্তি।

কিন্তু প্রাকারাবলীর পাদদেশে, ছেঁড়া ন্যাকড়ার বস্তার মত ও সব কি দেখা যায় ?—উহার মধ্যে কতকগুলা মনুষ্যের আকার প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। জমির উপর ঐ লোকগুলা কে ? উহারা কি মাতাল ? উহারা কি রুগ্‌ণ ? আহা! কতকগুলা শীর্ণকায় জীব, কতকগুলা অস্থিপঞ্জর, কতকগুলা "মমি" শব ! কিন্তু না, এখনো যে নড়িতেছে ; চোখের পাতা পড়িতেছে, চোখ মেলিয়া চাহিতেছে ! শুধু তাহা নহে, খাড়া হইয়া উঠিয়াছে। জঙ্ঘাকার লম্বা-লম্বা অস্থিখণ্ডের উপর ভর দিয়া টল্‌মল্ করিতেছে।

প্রথম দ্বারটি পার হইবার পরেই আর একটি দ্বার ! এই দ্বারটি ভিতরকার প্রাচীরগাঁথনির মধ্য হইতে কাটিয়া বাহির করা। দন্তুর চূড়া-দেশ পর্য্যন্ত এই প্রাচীরটা গোলাপী রঙে রঞ্জিত ;—গোলাপী রঙের জমির উপর ভারতীয় নক্‌সার ধরণে নিয়মিত-অন্তরে শাদা শাদা ফুলের নক্‌সা

কাটা। পুরু ধূলার স্তরের উপর, এখনো কতকগুলা শ্যামবর্ণ মনুষ্যের গাদা রহিয়াছে ;—যেন ভস্মরাশির মধ্যে নিমজ্জিত। পুষ্পচিত্র-বিভূষিত এই সুন্দর গোলাপী রঙের প্রাচীরের সম্মুখে উহাদিগকে আরো কদাকার দেখাইতেছে। দেখিলে মনে হয়, যেন অস্থিপঞ্জরের উপর একখণ্ড শুকানো চাম্‌ড়া লাগাইয়া দেওয়া হইয়াছে। হাড়গুলা যেন স্পষ্ট করিয়া গোণা যায়। হাঁটু ও কনুয়ের গাঁট যেন একএকটা মোটা গোলা ;—লাঠির গাঁঠের মত। উরতে শুধু একটা হাড়—নীচের জঙ্ঘা অপেক্ষা শীর্ণ; জঙ্ঘাতেও দুইটি অস্থিখণ্ড ছাড়া আর কিছুই নাই। উহাদের মধ্যে কতকগুলা লোক এক পরিবারের মত দলবদ্ধ হইয়া আছে ; কতকগুলা বিচ্ছিন্নভাবে ইতস্তত রহিয়াছে। কেহ বা দুই হাত ছড়াইয়া মাটির উপর পড়িয়া যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিতেছে ; কেহ বা বোবার মত, স্থাণুর মত, উবু হইয়া নিশ্চলভাবে বসিয়া আছে ; চোখগুলা জ্বরবিকার-গ্রস্ত রোগীর ন্যায় ; লম্বা-লম্বা দাঁত ঠোঁট হইতে বাহির হইয়া পড়িয়াছে—ঠোঁট পিছনে হটিয়া গিয়াছে। এক কোণে—একটি মাংসহীন জীর্ণশীর্ণ বৃদ্ধা ছেঁড়া ন্যাক্‌ড়ার উপর বসিয়া নীরবে ক্রন্দন করিতেছে। বোধ হয়, এ সংসারে তাহার আর কেহ নাই।

এই দ্বারযুগল যেই পার হইলাম, অমনি নগরের অভ্যন্তরদেশ আমার সমক্ষে সহসা প্রকাশিত হইল। আমি এরূপ দেখিব বলিয়া আদৌ প্রত্যাশা করি নাই। কি আশ্চর্য্য কাণ্ড! কি ঐন্দ্রজালিক ব্যাপার!

একটা বৃহৎ নগর সমস্তই গোলাপী ;—উহার প্রাকারাবলী উহার দেবালয়, উহার গৃহাদি, উহার কীর্ত্তিস্তম্ভ—সমস্তই গোলাপী ; সমস্তের উপর একই রকম শাদা ফুলের নক্‌সা। রাজার এ কি অদ্ভুত খেয়াল! দেখিলে মনে হয়, ভারতীয়-ধরণের ফুলের নক্‌সা-কাটা যেন একটি অখণ্ড প্রাচীর বরাবর প্রসারিত। মনে হয়, যেন অষ্টাদশ শতাব্দীর কোন পুরাতন "একরঙা" নগর। কিন্তু এখানে সমস্ত মিলিয়া তাহা

হইতে একটি পূর্ণ সৌন্দর্য্য বিস্ফুরিত হয়, তাহার তুলনা আর কোথাও নাই। অন্যান্য একরঙা নগরের সহিত এই বিষয়েই ইহার প্রভেদ। ইহা একেবারেই অনন্যসদৃশ।

লম্বা-লম্বা রাস্তা, ঠিক সমসূত্রে নির্ম্মিত আমাদের "বুল্‌ভার্‌" (Boulvard) রাস্তা অপেক্ষা দ্বিগুণ চওড়া। রাস্তার দুই ধারে সারি-সারি উচ্চ অট্টালিকা; এই সকল অট্টালিকার সম্মুখভাগ,—প্রাচ্যদেশসুলভ-খাম্‌খেয়ালি-কল্পনানুযায়ী কত যে বিচিত্র আকারে নির্ম্মিত, তাহার আর অন্ত নাই। মাল্য-নক্‌সা-ভূষিত ছোট-ছোট কত খিলান; অট্টচূড়া প্রভৃতি এত অতিরিক্ত পরিমাণে উপর্য্যুপরি বিন্যস্ত যে, এরূপ আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। সমস্তই গোলাপী রঙের। খুব সামান্য ছোটখাটো ঢালাই কাজ কিংবা ফলপুষ্পের নক্‌সা—তাহাও শাদা-শাদা সূত্রাকার কারুকর্ম্মে খচিত। যে সকল অংশ খোদিত, তাহার উপর যেন শাদা "লেসের" কাজ (Lace) বসানো। পক্ষান্তরে, যে সকল অংশ সমতল, তাহার উপর সেই একই গোলাপী রং—সেই একই রকমের ফুলের নক্‌সা চিত্রিত।

এই সব রাস্তার সর্ব্বত্রই জনতার গতিবিধি। সর্ব্বত্রই উজ্জ্বল বর্ণচ্ছটা। শতশত দোকানদার নানাপ্রকার দ্রব্যসামগ্রী মাটির উপর সাজাইয়া রাখিয়াছে। দুই ধারের "পদপথ"—কাপড়ে, তাম্রসামগ্রীতে, অস্ত্রাদিতে সমাচ্ছন্ন। আবার এই জনতার মধ্যে কতকগুলি রমণীও চলাফেরা করিতেছে। উহাদের বিচিত্র রঙের ও বিচিত্র ঢঙের নক্‌সা-কাটা অবগুণ্ঠন; স্কন্ধ পর্য্যন্ত সমস্ত নগ্নবাহু বাজুবন্দে ভূষিত।

এই বড় রাস্তার মধ্য দিয়া রৌপ্য-অস্ত্রধারী আশ্বারোহিগণ ঝক্‌মকে জিনের উপর বসিয়া চলিয়াছে। শিং-রং-করা বলদেরা বড়বড় শকট টানিয়া লইয়া যাইতেছে। রজ্জুবদ্ধ দ্বি-ককুদ উষ্ট্রগণ দীর্ঘরেখায় সারিবন্দি হইয়া চলিয়াছে। জরির পোষাক পরিয়া হস্তিবৃন্দ চলিয়াছে; উহাদের শুণ্ডের উপর চিত্রবিচিত্র নক্‌সা অঙ্কিত। এক-ককুদ উষ্ট্রেরা চলিয়াছে;

তাহাদের পৃষ্ঠে দুইজন করিয়া লোক উপবিষ্ট—একজনের পিছনে আর একজন। এই সকল উষ্ট্র অষ্ট্রিচ্ পাখীর মত সম্মুখে ঘাড় বাড়াইয়া-দিয়া লঘুপদক্ষেপে দুল্‌কি-চালে চলিয়াছে। ফকির-সন্ন্যাসীরা চলিয়াছে—একেবারে নগ্নকায়;—আপাদমস্তক শাদা চূর্ণে আচ্ছন্ন। পাল্‌কী চলিয়াছে, তাঞ্জাম চলিয়াছে। সমস্তই যেন প্রাচ্য পরীদৃশ্যের একটি চিত্রপট—অপূর্ব্ব একরঙা গোলাপী ফ্রেমের মধ্যে আবদ্ধ।

কতকগুলা লোক রাজার পোষা চিতাদিগকে রজ্জুবদ্ধ করিয়া, জনতায় অভ্যস্ত করাইবার জন্য উহাদিগকে লইয়া বেড়াইতেছে। চিতারা সতর্কভাবে পা টিপিয়াটিপিয়া চলিয়াছে। উহাদিগকে দেখিতে অদ্ভুত। মাথায় ছোট-ছোট জরির টুপি; থুঁতির নীচে একটা পুষ্পাকার ফিতার গ্রন্থি। মখ্‌মলের মত পায়ের থাবাগুলা,—একটার পর একটা,—কি সন্তর্পণেই মাটির উপর রাখিয়া চলিতেছে! আরো বেশী নিরাপদ্ হইবার জন্য কতকগুলি লোক উহাদের আংটা-বদ্ধ পুচ্ছ ধরিয়া রহিয়াছে। ইহারা ছাড়া আরো চারিজন পরিচারক পিছনে-পিছনে চলিয়াছে।

তা ছাড়া, সেই প্রাকারদ্বারের সম্মুখে যে-শ্রেণীর জীব দেখা গিয়াছিল, সেইরূপ কতকগুলি লোক এখানেও বিষণ্ণমুখে ইতস্তত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। দেখিলে মনে হয়, যেন গোর হইতে পলাইয়া আসিয়াছে। উহারা সাহস করিয়া এই পুষ্পবর্ণরঞ্জিত সুন্দর পুরীতে প্রবেশ করিয়াছে এবং আপনাদের অস্থিগুলা টানিয়া-টানিয়া লইয়া বেড়াইতেছে!···প্রথমে দেখিয়া যেরূপ মনে হইয়াছিল, তাহা অপেক্ষা এই সব লোকের সংখ্যা আসলে অনেক বেশী। অন্তঃপ্রবিষ্ট নিষ্প্রভ নেত্রে যাহারা টলিয়া-টলিয়া ইতস্তত বেড়াইতেছে, শুধু ইহারাই যে দুর্ভিক্ষ-পীড়িত লোক, তাহা নহে; দোকানদারদের মধ্যে, সুশোভন সুসজ্জিত দ্রব্যসামগ্রীর মধ্যে, ছেঁড়া ন্যাকড়ার বস্তার মত—নরকঙ্কালের মত, এইরূপ আরো কতকগুলা লোক পাথর-বাঁধানো পদপথের উপর পড়িয়া

আছে। পথ-চল্‌তি লোকেরা—পাছে উহাদের মাড়াইয়া ফেলে, এই ভয়ে একটু পাশ কাটাইয়া চলিতেছে…এই প্রেতমূর্ত্তিগুলা চতুষ্পার্শ্বস্থ ক্ষেত্রভূমির কৃষক। যে অবধি বৃষ্টির অভাব হইয়াছে, তখন হইতেই উহারা, শস্যনাশনিবারণার্থ প্রাণপণে যুঝাযুঝি করিয়াছে; এই দীর্ঘকাল, উহারা যে দারুণ কষ্ট ভোগ করিয়াছে,—উহাদের দেহের অসম্ভব কৃশতা তাহারই ফল। এখন সব শেষ হইয়া গিয়াছে। গরুবাছুর সমস্তই মরিয়া গিয়াছে। মৃত গরুর চাম্‌ড়াও উহারা জঘন্য মূল্যে বিক্রয় করিয়াছে। যে সকল জমিতে উহারা চাষবুনানি করিয়াছিল, সমস্তই এখন শুষ্ক মরুভূমিতে পরিণত হইয়াছে। সেখানে এখন আর কিছুই অঙ্কুরিত হয় না। একমুঠা অন্নের জন্য উহারা কাপড়চোপড়, রূপার গহনাপত্র,—উহাদের যাহা-কিছু ছিল, সমস্তই বিক্রয় করিয়াছে। কয়েকমাস ধরিয়া উহাদের শরীর ক্রমশই শীর্ণ হইতেছে। তাহার পর এখন এই দারুণ দুর্ভিক্ষ;—ক্ষুধার অসহ্য যন্ত্রণা। ক্রমে শবদেহের পূতিগন্ধে সমস্ত গ্রামপল্লী আচ্ছন্ন হইয়া গেল।

অন্ন! হাঁ, এই সব লোক একমুঠা অন্নের জন্য লালায়িত; তাই উহারা এই নগরাভিমুখে আসিয়াছে। এইখানে আসিলে লোকে উহাদের প্রতি দয়া করিবে, উহাদের প্রাণ বাঁচাইবে—এইরূপ উহাদের বিশ্বাস ছিল। কেন না, উহারা পরম্পরায় শুনিয়াছিল,—নগর-অবরোধের সময় খাদ্যসামগ্রী যেরূপ নগরের মধ্যে সংগ্রহ করিয়া রাখা হয়, সেইরূপ এইখানে রাশিরাশি চাউল-ময়দা রক্ষিত হইয়াছে; এবং এই নগরে আসিলেই সকলে একমুঠা খাইতে পায়।

বস্তুত রাজার আদেশক্রমে সারিবন্দি উষ্ট্রপৃষ্ঠে বস্তা বস্তা চাউল ও ছোলা দূরপ্রদেশ হইতে সহরে অষ্টপ্রহর আমদানি হইতেছে। ধান্যাগারে—এমন কি, পদপথের উপরেও উহা জমা করিয়া রাখা হইতেছে;—শুধু এই ভয়ে, পাছে চতুর্দ্দিকের দুর্ভিক্ষ এই সুন্দর গোলাপী নগরেও প্রবেশ

করে। এখানে খাদ্যসামগ্রী পাওয়া যায় সত্য, কিন্তু উহা ক্রয় করিতে হয়। ক্রয় করিবার জন্য অর্থ চাই। সত্য বটে, রাজধানীতে যে সকল দরিদ্রের বসতি, রাজা তাহাদিগকে অর্থাদি বিতরণ করিতেছেন। কিন্তু চতুষ্পার্শ্বস্থ ক্ষেত্রভূমির শতসহস্র কৃষক, যাহারা অন্নাভাবে ক্ষুধার জ্বালায় মরিতেছে, তাহাদের সাহায্যের জন্য এই অর্থে কুলায় না। তাই উহাদিগকে আসিতে দেওয়া হইতেছে না। তাই তাহারা রাস্তায়-রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, আহারস্থানের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে—শুধু এই আশাভরে, যদি কেহ একমুষ্টি চাউল তাহাদের নিকট নিক্ষেপ করে। তাহার পর, যখন শয়নের সময় হয়, তখন উহারা যেখানে হয় একস্থানে শুইয়া পড়ে; এমন কি, পদপথের সানের উপরেই শুইয়া পড়ে। বোধ হয়, উহাই তাহাদের অন্তিমশয্যা।

এইমাত্র শ-খানেক বস্তার চাউল উষ্ট্রপৃষ্ঠে এখানে আসিয়া পৌঁছিল। ধান্যাগারগুলা বোধ হয় পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। তাই ধান্যাগারের সম্মুখস্থ পদপথের উপর এই বস্তাগুলা নামাইয়া রাখিতে হইবে। ৫ হইতে ১০ বৎসরের কঙ্কালসার নগ্নকায় তিনটি শিশু সেইখানে বিশ্রাম করিতেছিল। একজন প্রতিবেশী বলিল,—"ইহারা তিনটি ভাই; ইহাদের মা-বাপ—যাহারা উহাদের আনিয়াছিল, তাহারা মরিয়াছে (বলা বাহুল্য, ক্ষুধার জ্বালায়); তাই, উহারা এইখানেই পড়িয়া আছে, উহাদের আর কেহ নাই।" যে স্ত্রীলোকটি এই কথা বলিতেছিল, তাহার কথার ভাবে মনে হইল, এসমস্তই যেন স্বাভাবিক ঘটনা। আকারপ্রকারে স্ত্রীলোকটি দুষ্টা বলিয়াও মনে হয় না!…কি ভয়ানক! ইহারা কিরকম লোক? ইহাদের হৃদয় না-জানি কি উপাদানে গঠিত! এদিকে ইহারা একটি পাখী মারিবে না; অথচ ইহাদের দ্বারের সম্মুখে কতকগুলা অনাথ পরিত্যক্ত শিশু অনাহারে মরিতেছে, তাহা দেখিয়াও উহাদের হৃদয় একটুও বিচলিত হইতেছে না।

যে শিশুটি সব চেয়ে ছোট, তাহার প্রায় সব শেষ হইয়া আসিয়াছে। একেবারে গতিশক্তি রহিত। মুদ্রিত চোখের পাতার ধারে-ধারে যে মাছি বসিয়াছে, তাহাদের তাড়াইবারও শক্তি নাই। রন্ধনার্থ ছাগাদিপশুর অন্ত্র বাহির করিয়া ফেলিলে যেরূপ হয়, উহাদের উদর সেইরূপ দেখিতে হইয়াছে। রাস্তায় সানের উপর শরীরকে ক্রমাগত টানাহ্যাঁচ্ড়া করায়, পিঠের হাড় মাংসের মধ্যে বিঁধিয়া গিয়াছে।

যাহাই হউক, এই শস্যের বস্তাগুলা রাখিবার জন্য উহাদিগকে এক্ষণে সরানো আবশ্যক। যে শিশুটি সব চেয়ে বড়, সে অতীব বাৎসল্যসহকারে ছোটটিকে কাঁধে করিয়া লইল এবং মধ্যমটির হাত ধরিল; কেন না, মধ্যমটির এখনো একটু চলিবার শক্তি আছে। এইরূপে উহারা নীরবে-নিঃশব্দে সেখান হইতে প্রস্থান করিল।

ছোটটির চক্ষু মুহূর্ত্তের জন্য একবার উন্মীলিত হইল। আহা! উহার চোখের দৃষ্টি অন্যায়রূপে দণ্ডিত নির্দ্দোষ বধ্যজনের দৃষ্টির মত। যন্ত্রণার ভাব,—তিরস্কারের ভাব,—কি হেতু সর্ব্বজনপরিত্যক্ত হইয়া এতটা কষ্ট-ভোগ করিতেছে, তজ্জন্য বিস্ময়ের ভাব—সমস্তই যেন ঐ দৃষ্টিতে পরিব্যক্ত!...কিন্তু ক্ষণপরেই তাহার সেই মুমূর্ষু চক্ষু আবার নিমীলিত হইল; আবার মাছিগুলা আসিয়া চোখের পাতার উপর বসিল। বেচারা শিশুটির ক্ষুদ্র মস্তক তাহার বড় ভায়ের শীর্ণ কাঁধের উপর আবার ঢলিয়া পড়িল।

পা একটু টলিল; কিন্তু চোখে জল নাই; মুখে একটি কাতরোক্তি নাই; শিশু-ধৈর্য্য ও শিশু-আত্মত্যাগের যেন সাক্ষাৎ মূর্ত্তি—এইরূপে সে, ভাই-দুটিকে লইয়া চলিয়া গেল। বড়টি আপনাকে বাড়ীর কর্ত্তা বলিয়া মনে করে। তাহার পর সে যখন দেখিল, এতটা দূরে আসিয়াছে যে, এখন আর কাহারো পথের অন্তরায় হইবার সম্ভাবনা নাই, তখন খুব সতর্কতার সহিত, অতি সন্তর্পণে ভাইদুটিকে রাস্তার সানের উপর আবার শুয়াইয়া দিল এবং নিজেও তাহাদের পার্শ্বে শয়ন করিল।

এই চৌমাথা-রাস্তায়—যেখানে সমস্ত সুন্দর রাস্তাগুলি আসিয়া মিলিত হইয়াছে—যে শোভাসৌন্দর্য্য এই নগরের বিশেষত্ব, তাহা যেন পূর্ণমাত্রায় ফুঠিয়া উঠিয়াছে। রাস্তার শেষপ্রান্ত পর্য্যন্ত সমস্তই গোলাপী ও তাহার উপর শাদা গোলাপফুলের নক্‌সা। দেবমন্দিরের গোলাপী চূড়াসমূহ ধূলাচ্ছন্ন আকাশ ভেদ করিয়া উৰ্দ্ধে উঠিয়াছে; তাহার চারিপার্শ্বে কালো-কালো পাখী আবর্ত্তের ন্যায় ঘোরপাক দিয়া উড়িয়া বেড়াইতেছে। রাজপ্রাসাদের সম্মুখভাগও গোলাপী, তাহার উপর শাদা ফুলের নক্‌সা;—আমাদের বড়-বড় গির্জ্জার সম্মুখভাগ অপেক্ষাও উচ্চ; প্রায় একশত সমপ্রমাণ চতুষ্ক উপর্য্যুপরি ন্যস্ত;—প্রত্যেকেরই একইপ্রকার স্তম্ভ শ্রেণী, একই প্রকার গরাদে, একইপ্রকার ছোট-ছোট গম্বুজ; সর্ব্বোপরি রাজনিশান,—শুষ্কবায়ুভরে পতপতশব্দে আকাশে উড়িতেছে। ফুলের নক্সা-কাটা গোলাপী রঙের প্রাসাদগৃহাদি—চতুষ্পথের চারিপার্শ্ব হইতে সুরু করিয়া ধূলিময় রাস্তার সুদূর প্রান্ত পর্য্যন্ত সমসূত্ররেখায় বরাবর চলিয়া গিয়াছে।

এই চতুষ্পথের লোকেরা অলঙ্কারে আরো অধিক বিভূষিত, আরো অধিক জীবন-উদ্যমে পূর্ণ, বিচিত্র বর্ণে আরো অধিক সমুজ্জ্বল। ক্ষুধাক্লিষ্ট পরিব্রাজকদিগের সংখ্যা,—বিশেষতঃ ক্ষুদ্র বালকদিগের সংখ্যা এখানে আরো অধিক। কেন না, এই রাস্তার মাঝখানেই, খোলা জায়গায়,—চাউলের পিঠা, চিনি কিংবা মধু দিয়া প্রস্তুত মিষ্টান্নের পাক হইতেছে; তাহাতেই উহারা আকৃষ্ট হইতেছে। বলা বাহুল্য, উহাদিগকে কিছুই দেওয়া হইতেছে না, তবু উহারা দুর্ব্বল কম্পমান ছোট-ছোট পায়ের উপর ভর দিয়া এইখানেই দাঁড়াইয়া আছে।

এই সকল ক্ষুধিতের সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। উহারা করাল বন্যার মত গ্রাম-পল্লী হইতে ঠেলিয়া আসিতেছে; সহরের দ্বারদেশে

পৌঁছিবার পূর্ব্বেই, দূরত্বের নিদর্শন-খোঁটার মত, উহাদের মৃতশরীরে সমস্ত পথ পরিচিহ্নিত হইতেছে।

একজন বলয়বিক্রেতা দোকানদার গরম গরম কচুরী খাইতেছিল; তাহারি সম্মুখে, একজন রমণী—রমণীর কঙ্কাল বলিলেও হয়—যাজ্ঞার ভাবে সেইখানে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার শুষ্ক স্তনের উপর, তাহার বুকের হাড়ের উপর, সে একটি কঙ্কালসার শিশুকে জাপ্‌টাইয়া ধরিয়া আছে। না, দোকানদার তাহাকে কিছুই দিল না; এমন কি, তাহার দিকে একবার চাহিয়াও দেখিল না। সেই মৃতকল্প শিশুর শুষ্কস্তনা জননী একেবারে যেন পাগলের মত হইল। সে দাঁত বাহির করিয়া নেকড়ে বাঘের মত দীর্ঘস্বরে একটা চীৎকার করিয়া উঠিল। রমণী যুবতী,—বোধ হয় এক সময়ে দেখিতেও সুশ্রী ছিল। তাহার দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট কপোলদেশে এখনো যৌবনের চিহ্ন দেদীপ্যমান। বোধ হয় ১৬বৎসর বয়স; প্রায় বালিকা বলিলেই হয়।…অবশেষে সে বুঝিতে পারিল, কেহই তাহার প্রতি দয়া করিবে না; সে পরিত্যাক্তা অনাথা। কোন বন্যপশু শত্রুকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া পলাইবার পথ না দেখিয়া নিরুপায় হইয়া যেরূপ চীৎকার করিতে থাকে সেইরূপ সে চীৎকার করিতে লাগিল। তাহার নিকট দিয়া প্রকাণ্ডকায় হস্তিগণ নিঃশব্দে ধীরপদক্ষেপে চলিয়া যাইতেছে। তাহাদের আহারের জন্য, বহুদূর হইতে, মহার্ঘ মূল্যে ডালপালা সংগ্রহ করিয়া আনা হইয়াছে।

কাকদিগের কলরব এই সমস্ত জনকোলাহল ছাড়াইয়া উঠিয়াছে। হাজার-হাজার কাক গৃহছাদের উপর বসিয়া কা-কা ধ্বনি করিতেছে। কাকদিগের এই চিরকেলে কলরব ভারতবর্ষে আর সমস্ত শব্দকে ছাড়াইয়া উঠে। আজকাল তাহাদের ডাকের আরো বৃদ্ধি হইয়াছে—এখন উহা উল্লাসের সীমায় পৌঁছিয়াছে। যে সময়ে শবের পূতিগন্ধে চারিদিক্ আচ্ছন্ন হইয়া যায়, সেই দুর্ভিক্ষের সময়ই ইহাদের সু-কাল—প্রাচুর্য্যের কাল।

সে যাহই হউক, প্রাচীরবেষ্টিত উদ্যানের মধ্যে রাজার কুমীরেরা এখন আহার করিবে।

রাজার এই প্রাসাদটি একটি বৃহৎ জগৎ বলিলেই হয়। ইহার সংশ্লিষ্ট কত বিভিন্ন আবাস-গৃহ, কত অশ্বশালা, কত হস্তিশালাই যে আছে, তাহার আর অন্ত নাই। কুম্ভীরসরোবরে পৌঁছিতে হইলে, লৌহ-শলাকা-হর্ষিত কত উচ্চদ্বার পার হইতে হয়, (Louvre) লুভ্‌র-প্রাঙ্গণের মত কত বড়-বড় প্রাঙ্গণ অতিক্রম করিতে হয়। এই সব প্রাঙ্গণের ধারে-ধারে, গরাদেওয়ালা গবাক্ষবিশিষ্ট ঘোরদর্শন কত-কত ইমারত রহিয়াছে। বলা বাহুল্য, উহাদের দেওয়াল গোলাপী রঙে রঞ্জিত এবং উহাতে সাদা ফুলের নক্‌সা কাটা। আজ এই অঞ্চলে খুব লোকের ভিড়। আজ এখানে লোক ডাকিয়া-ডাকিয়া আনা হইতেছে। আজ সৈনিকদিগের বেতন পাইবার দিন। তাই সমস্ত সৈন্য আজ এখানে উপস্থিত। উহাদিগকে দেখিতে একটু জংলি ধরণের, কিন্তু বেশ লম্বা-চওড়া; হস্তে বল্লম অথবা ধ্বজপতাকা। ভারী-ভারী সেকেলে-ধরণের মুদ্রা, অথবা চৌকণা তাম্র-মুদ্রা উহাদিগকে দেওয়া হইতেছে।

থাম-ওয়ালা, খোদাই-করা ছোট-ছোট খিলানবিশিষ্ট মার্ব্বেলের একটা দালানঘরে, একটা প্রকাণ্ড ফ্রেমের উপর বেগ্‌নি-মখ্‌মলের একটা কাপড়ের টানা রহিয়াছে—দশজন কারিকর তাহার উপর "তোল্‌কাজের" (raised work) সোনালি জরির ফুল বুনিতেছে। রাজার একটি প্রিয় হাতীর জন্য নূতন পোষাক তৈয়ারী হইতেছে।

কঠিনশ্রমসহকৃত জলসেকের প্রভাবে উদ্যানগুলা এখনো সবুজ রহিয়াছে। এই তাপদগ্ধ শুষ্কপ্রদেশের মধ্যে এই মরুকাননগুলি দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। এই উদ্যানগুলি উপবনের ন্যায় বিশাল; এবং উহাদের মধ্যে একপ্রকার বিষাদময় শোভা পরিলক্ষিত হয়। উহা ৫০ ফিট্‌ উচ্চ দস্তুর প্রাচীরদ্বারা বেষ্টিত। উহাদের পথগুলি প্রাচীন-ধরণের;—

সোজা-সোজা ও মার্ব্বেল দিয়া বাঁধানো ;—ঝাউ, তাল, গোলাপ ও নারাঙ্গিকুঞ্জে বিভূষিত। নারাঙ্গিফুলের গন্ধে চারিদিক্ আমোদিত। ছায়ায় বসিয়া বিশ্রাম করিবার জন্য সর্ব্বত্রই মার্ব্বেল-পাথরের আরাম-কেদারা। নর্ত্তকীদের জন্য স্থানে-স্থানে চতুষ্ক-মণ্ডপ এবং রাজকুমারদিগের স্নানের জন্য মার্ব্বেলে বাঁধানো চৌবাচ্ছা। এখানে ময়ূর আছে, বানর আছে ; এমন কি, নারাঙ্গিগাছের তলায়, শিকারে বহির্গত ছুঁচাল-মুখ তস্করবৃত্তি শৃগালদিগকেও দেখিতে পাওয়া যায়।

অবশেষে সেই বৃহৎ সরোবর! ইহাও ভীষণ প্রাচীরে আবদ্ধ। দুইতিনবৎসরব্যাপী অনাবৃষ্টির ফলে ইহার প্রায় অর্দ্ধেক জল শুকাইয়া গিয়াছে। ইহার পাঁকের উপর শতবর্ষজীবিত গণ্ডশৈলপ্রায় প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড কুম্ভীর নিদ্রা যাইতেছে। এই সময়ে শুক্লবস্ত্রধারী একজন বৃদ্ধ ঘাটের সিঁড়ির উপর আসিয়া, মস্‌জিদের মুয়েজ্জিনের মত সুস্পষ্টস্বরে টানাসুরে কি-একটা ক্রমাগত আবৃত্তি করিতে লাগিল ;—নানাপ্রকার-বাহুভঙ্গি-সহকারে কুম্ভীরদিগকে ডাকিতে লাগিল। তখন কুম্ভীরেরা জাগিয়া উঠিল। প্রথমে ধীরে ধীরে ও অলসভাবে,—ক্ষণপরেই—ক্ষিপ্র-ভাবে—চটুলভাবে সাঁতার দিয়া নিকটে আসিল। তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে বড়-বড় কচ্ছপও আসিল। তাহারাও ডাক শুনিয়াছে। তাহারাও খাইতে চায়। যেখানে সেই বৃদ্ধ এবং দুইজন ভৃত্য মাংসের ঝুড়ি হস্তে দাঁড়াইয়া ছিল, সেই সোপানপংক্তির নীচে আসিয়া উহারা চক্রাকারে সমবেত হইল এবং সীসাবর্ণ শ্লেষ্মা-চট্‌চটে মুখ ব্যাদান করিয়া ঐ সব মাংস গিলিবার জন্য প্রস্তুত হইল ; তখন উহাদের মুখের মধ্যে ছাগলের পাঁজরা, ভেড়ার পা, ফুস্‌ফুস, অন্ত্রাদি নিক্ষিপ্ত হইল।

কিন্তু বাহিরের রাস্তায়, সেই সব ক্ষুধিত মনুষ্যদিগকে খাওয়াইবার জন্য মুয়েজ্জিনের কণ্ঠস্বরে কেহই তাহাদিগকে ডাকিতেছে না। সেই নবাগত ভিক্ষুকেরা এখনো ইতস্তত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে ; কেহ তাহাদের পানে

চাহিয়া দেখিলে তখনি হাত বাড়াইয়া দিতেছে,—পেট চাপ্‌ড়াইতেছে। যাহারা ভিক্ষা চাহিয়া-চাহিয়া একেবারে হতাশ হইয়াছে, তাহারা জনতার মধ্যে—অশ্বগণের মধ্যে, ভূতলে শুইয়া পড়িয়াছে। প্রাসাদমন্দিরাদির দুইটি বীথি যেখানে মিলিত হইয়াছে, সেইখানকার একটি চত্বর-ভূমিতে,—যেখানে দোকানদার, ঘোড়সওয়ার, মল্‌মল্‌বস্ত্রাবৃত অলঙ্কারভূষিত রমণী প্রভৃতির বহুল জনতা,—সেইখানে একজন বিদেশী, একজন ফরাসী,—শীর্ণকায় বীভৎসদর্শন চলৎশক্তিরহিত একগাদা ভিক্ষুকের নিকট আসিয়া তাহার গাড়ি থামাইল এবং নতকায় হইয়া তাহাদের স্পন্দহীন নিশ্চেষ্ট হস্তে কতকগুলা মুদ্রা অর্পণ করিল। তখন হঠাৎ একদল "মমি"-শব যেন পুনর্জ্জীবিত হইয়া উঠিল; মলিন চীরবস্ত্রের মধ্য হইতে মাথা তুলিল; চোখ মেলিয়া দেখিতে লাগিল। পরে সেই কঙ্কালমূর্ত্তিগুলা খাড়া হইয়া দাঁড়াইল। "ওরে! কে একজন আসিয়া ভিক্ষা দিচ্চে, পয়সা দিচ্চে; এইবার তবে খাদ্য-সামগ্রী কিন্‌তে পারা যাবে।" যে-সব ভিক্ষুকের গাদা,—আর-একটু দূরে—পথ-চল্‌তি লোকের পিছনে, কাপড়ের বস্তার পিছনে, অথবা মিঠাইওয়ালার উনানের পিছনে প্রচ্ছন্ন ছিল, ক্রমশ তাদের মধ্যেও এই পুনর্জাগৃতি সংক্রামিত হইল। সেই সব গাদা নড়িয়া উঠিল, উঠিয়া দাঁড়াইল, অগ্রসর হইতে লাগিল। যাহাদের চোপসানো ঠোঁটের মধ্য হইতে দাঁত বাহির হইয়া পড়িয়াছে, যাহাদের মাছি-লাগা চোখ কোটরে ঢুকিয়া গিয়াছে, কণ্ঠনালীর অস্থিবলয়ের উপর যাহাদের স্তনগুল খালী থলের মত ঝুলিয়া পড়িয়াছে,—সেই সব শ্মশান-প্রেতেরা সেই বিদেশী ফরাসীকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল;—তাহার দিকে ঠেলিয়া আসিতে লাগিল; পক্ষান্তরে তাহাদের দীননেত্র যেন মার্জ্জনাভিক্ষা করিতে লাগিল, আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিল, কাকুতিমিনতি করিতে লাগিল।…

তাহার পর নিস্তব্ধভাবে সকলে সরিয়া পড়িল,—কোথায় যেন মিলাইয়া গেল। ঐ প্রেতগণের মধ্যে একজনের পা দৌর্ব্বল্য-প্রযুক্ত টলিতেছিল;

সে আর-একজনের কাঁধে ভর দিল ;—এইরূপ পরস্পরের ঠেলা ও চাপে, —পুতুলনাচের পুতুলগুলার মত, একতাড়া পাকাটির মত, সবাই একসঙ্গে ভূতলে পড়িয়া গেল। কাহারও এতটুকু শক্তি নাই যে, সেই ঠেলা সাম্‌লাইয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে, উহারা মাটিতে পড়িয়া ধূলায় লুটাইতে লাগিল, মূর্চ্ছিত হইল, আর উঠিতে পারিল না।···

এই সময়ে একটা বাদ্যের রোল ক্রমশ নিকটবর্ত্তী হইল। আবার জনতার গুঞ্জনধ্বনি শোনা গেল। কাল দেবালয়ে উৎসব হইবে—ইহাই ঘোষণা করিবার জন্য মন্দিরের কতকগুলি লোক রাস্তায় সমারোহে বাহির হইয়াছে। এই সময়ে, পথ করিবার জন্য, একজন রক্ষিপুরুষ ক্ষুধাক্লিষ্টা একটি বৃদ্ধাকে ধরিল। এই বৃদ্ধা ধূলিতে মুখ গুঁজিয়া, দুই হাত সটান্ ছড়াইয়া, পুলিস-নির্দ্দিষ্ট লাইন্ ছাড়াইয়া, যাত্রাপথের উপর পড়িয়া ছিল। রক্ষিপুরুষ সেই কম্পিতকায় বৃদ্ধাকে উঠাইয়া-লইয়া পদপথের উপর রাখিয়া দিল।

এই সুন্দর সমারোহের ঠাট্ আবার চলিতে আরম্ভ করিল। প্রথমে একটা কালো হাতী যাত্রা সুরু করিল। ইহার শুণ্ড শেষপ্রান্ত পর্য্যন্ত স্বর্ণবর্ণে রঞ্জিত। শানাই ও কর্ত্তাল বাজাইতে বাজাইতে বাদকেরা সকলের পিছনে চলিয়াছে। শানাইয়ে একটা বিষাদগম্ভীর সুর আলাপ করিতেছিল।

পরে, উচ্চ মুক্তার মুকুটে সুশোভিত হইয়া, দেবসজ্জায় সজ্জিত একদল বালককে পৃষ্ঠে লইয়া, চারিটা ধূসরবর্ণ হস্তী অগ্রসর হইল। গজারূঢ় সুসজ্জিত বালকেরা, রঙিন সুগন্ধি চূর্ণরাশি জনতার উপর নিক্ষেপ করিতে লাগিল। এই চূর্ণ এত পাতলা ও লঘু যে, উহা জলদজাল বলিয়া মনে হয়। প্রথমেই এই চূর্ণ নিজ্ হাতীদের উপর নিপতিত হইল। এই সব হাতীদের মধ্যে কেহ বা বেগ্‌নি, কেহ বা হল্‌দে, কেহ বা সবুজ, কেহ বা লাল—এইরূপ চিত্রিত রঙে রঞ্জিত হইল। এই মোহনমূর্ত্তি বালকেরা স্মিত-হাস্যসহকারে মুঠা-মুঠা চূর্ণ জনতার মধ্যে নিক্ষেপ করিতে লাগিল ;

লোকদের পরিচ্ছদ, পাগ্ড়ী, মুখ,—নানারঙে রঞ্জিত হইল। যে সকল দুর্ভিক্ষপীড়িত কঙ্কালসার ক্ষুদ্র বালকেরা ভূতলশায়ী হইয়া এই সমারোহ-যাত্রা দেখিতেছিল,—এমন কি—তাহাদের উপরেও এই চূর্ণমুষ্টির বর্ষণ হইতে লাগিল। তাহাদের দুর্ব্বল হস্ত ক্ষিপ্রতার সহিত আপনাদিগকে রক্ষা করিতে না পারায়, তাহাদের চক্ষু সেই চূর্ণে আচ্ছন্ন হইয়া গেল।

সহসা দিবাবসান হইল। চতুর্দ্দিকস্থ সেই শাদা ফুলের নক্সা-কাটা একঘেয়ে গোলাপী রং ক্রমে ম্লান হইয়া আসিল। আকাশ Periwinkle ফুলের রং ধারণ করিল। উহা ধূলায় এরূপ আচ্ছন্ন যে, রজতরঞ্জিত চন্দ্রমাও পাংশুবর্ণ বলিয়া মনে হইতে লাগিল। ঘুমাইবার জন্য পাখীর ঝাঁক নীচে নামিয়া আসিল। গোলাপী প্রাসাদসমূহের কানাচের উপর,—পায়রা ও কাক কৃষ্ণবর্ণ দীর্ঘরজ্জুর আকারে সারিবন্দি হইয়া ঘেঁষাঘেঁষি বসিল। কিন্তু শকুনি ও চিলেরা এখনো বিলম্ব করিতেছে—এখনো গয়ংগচ্ছভাবে আকাশে ঘোরপাক দিতেছে। যে সকল মুক্ত বানর গৃহাদিব উপর বাস করে, এখন নিদ্রার সময় উপস্থিত হওয়ায়, তাহারা চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে;—থাবার উপর ভর দিয়া, ঊর্দ্ধপুচ্ছ হইয়া, পরস্পরকে অনুধাবন করিতেছে। উহাদের অপূর্ব্ব ছায়ামূর্ত্তিগুলা গৃহছাদের ধারে ধারে ছুটাছুটি করিতেছে। নীচে, বড় রাস্তা জনশূন্য হইয়া পড়িয়াছে। কেন না, প্রাচ্য নগরসমূহে, রাত্রি-কালে কোন কাজকর্ম্ম হয় না।

একটা পোষা চিতাবাঘিনী শুইবার জন্য এখনি প্রাসাদে যাইবে। টুপিটা তাহার পাশে রহিয়াছে,—একটা রাস্তার কোণে বেশ ভালমানুষের মত উবু হইয়া বসিয়া আছে। তাহার পরিচারকেরাও তাহাকে ঘিরিয়া ঐকৃগভাবে বসিয়া আছে। তাহাদের মধ্যে সেই পুচ্ছধারী ভৃত্যটিও আছেন। দুই-পা দূরে, একদল দুর্ভিক্ষপীড়িত বালক ভূমিতে পড়িয়া

হাঁপাইতেছে; বাঘিনীর Jude-মণির মত ফিঁকা হরিদ্বর্ণ চক্ষুর প্রহেলিকা-পূর্ণ দৃষ্টি তাহাদের উপর নিপতিত রহিয়াছে।

দোকানদারেরা তাড়াতাড়ি তাহাদের বিচিত্ররঙের বস্ত্রাদি ভাঁজ করিয়া রাখিতেছে; তাহাদের ঝক্‌ঝকে তাম্রসামগ্রী—তাহাদের থালা, তাহাদের ঘটিবাটী ঝুড়ির মধ্যে উঠাইয়া রাখিতেছে। এই সমস্ত জিনিষপত্র উঠাইয়া তাহারা নিজ নিজ গৃহে চলিয়া গেল। এই সব নেত্ররঞ্জন দ্রব্যসামগ্রীর মধ্যে যে সকল কঙ্কালমূর্ত্তি, দল বাঁধিয়া ইতস্তত শুইয়া ছিল;—দ্রব্যসামগ্রী অপসারিত হইলে ক্রমে তাহারা একটু-একটু করিয়া নেত্রসমক্ষে প্রকাশ পাইতে লাগিল। এখানে ইহারাই এখন অবশিষ্ট;—এই পদপথের উপর এখন ইহাদেরই একাধিপত্য।

ক্রমশ এই দুর্ভিক্ষপীড়িত লোকেরা, দল ছাড়িয়া পৃথক্ হইয়া পড়িল। এখন চারিদিক জনশূন্য—এখন ইহাদিগকেই অধিক সংখ্যায় দেখা যাইতেছে। একটু পরেই দেখিতে পাইবে, তাহাদের মৃতশরীরে—তাহাদের মলিন চীরবস্ত্রে সমস্ত পদপথ পরিচিহ্নিত।

নগরপ্রাচীরের বাহিরে, উদাস-উজাড় ক্ষেত্রভূমির মধ্যে, এই সন্ধ্যা-কালে,—প্রাণিপুঞ্জে সমস্ত মরা-গাছগুলা আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে। চিল, শকুনি, বড়-বড় ঝাঁকালো ময়ূর, এক এক পরিবারের মত দল বাঁধিয়া গাছের উপর বিশ্রাম করিতেছে। পত্রহীন লঘু শাখাপ্রশাখার মধ্যে যে-সব স্থান শূন্য ছিল, এক্ষণে উহাদের দ্বারা পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। উহাদের দিবসের ডাক অনেকটা থামিয়া আসিয়াছে; অনেকক্ষণ পরে-পরে এক-একবার ডাকিয়া উঠিতেছে। একটু পরে একেবারেই নীরব হইবে। ময়ূরদের প্যান্‌পেনে ছিঁচ্‌কাঁদুনি ডাক সন্ধ্যার প্রাক্কাল পর্য্যন্ত চলিতে থাকে, তাহার পরেই শৃগালেরা শোকোচ্ছ্বসিত কণ্ঠস্বরে উহার “উতর” গাইতে আরম্ভ করে।

রাত্রি দশটা। এ নগরের পক্ষে অনেক রাত্রি; কেন না, এখানে

দিবাবসানের সঙ্গে-সঙ্গেই সমস্ত কাজকর্ম্ম বন্ধ হইয়া যায়। চতুর্দ্দিকস্থ মাঠময়দান একেবারেই নিস্তব্ধ। দূর দিগন্তে, মনে হয়, যেন কুয়াশা হইয়াছে। উহা ধূলি বই আর কিছুই নহে। সমস্তই শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। শাদা গুঁড়ায় ঢাকা মাটির উপর, মরা-গাছের উপর, চন্দ্রালোক পতিত হইয়াছে। আবার এই অমল শুভ্রতার উপর হঠাৎ নৈশশৈত্যের আবির্ভাব হওয়ায় মনে হইতেছে যেন তুষার পড়িয়াছে, শীতঋতু আসিয়াছে, যে-সব আসন্নমৃত্যু দুর্ভিক্ষপীড়িত বালকেরা নগ্নাবস্থায় ভূতলে পড়িয়া কষ্টে শ্বাসগ্রহণ করিতেছে, না জানি, তারা এখন শীতে কতই কাতর। এখন খুবই ঠাণ্ডা পড়িয়াছে।

বাহিরের ন্যায়, নগরপ্রাচীরের অভ্যন্তরেও সমস্ত নিস্তব্ধ। কদাচিৎ কোথাও, দেবালয় হইতে চাপা-সঙ্গীতধ্বনি শোনা যাইতেছে। তা ছাড়া আর কিছুই শোনা যায় না। এই সকল দেবালয়ের গজমূর্ত্তিশোভিত উচ্চ সোপান দিয়া শুক্লপরিচ্ছদধারী কতকগুলি লোক এখনো উঠা-নামা করিতেছে; তা ছাড়া একটিও প্রাণী নাই। রাস্তাঘাট সমস্তই শূন্য। লোকের চলাচল না থাকায়, এই সকল রাস্তা যেন আরো চওড়া ও বিশাল বলিয়া মনে হইতেছে। নৈশ নিস্তব্ধতার মধ্যে, এই গোলাপী নগর * চন্দ্রালোকেও গোলাপী দেখাইতেছে; এবং ইহার সৌধপ্রাসাদ ও প্রাসাদের দন্তুর চূড়াবলী যেন আরো বর্দ্ধিতায়তন হইয়া উঠিয়াছে।

দুর্ভিক্ষের আশঙ্কায় যেখানে চাউলের বস্তা গাদা করিয়া রাখা হইয়াছে এবং যেখানে বেত্রধারী রক্ষিপুরুষেরা পাহারা দিতেছে—সেই পদপথের উপর এবং সেই বস্তাগুলার পার্শ্বে, এখনো সেই সব কালো-কালো পঞ্জর-মূর্ত্তির গাদা! দূরদূরান্তরে, ছোট-ছোট পাথরের কুলুঙ্গি-ঘর যাহা দিনমানে জনতার মধ্যে প্রচ্ছন্ন ছিল, তাহা এখন নেত্রসমক্ষে প্রকাশ পাইতেছে।

* জয়পুর—অনুবাদক

প্রত্যেক কুলুঙ্গির মধ্যে একএকটি বিগ্রহ—গজমুণ্ডধারী ঘোরদর্শন গণেশ, কিংবা মৃত্যুর দেবতা শিব অধিষ্ঠিত। সকলেরই গলায় মালা এবং সকলেরই নিকটে একএকটা প্রদীপ জ্বলিতেছে;—এই প্রদীপ সমস্ত রাত্রি জ্বলিবে।

এই সব ময়লা ছেঁড়া ন্যাকড়ার গাদা—যাহার কোন-একটা বিশেষ রূপ নাই, নাম নাই, যাহা অনির্দ্দেশ্য—ইহাই এই সুরম্য গোলাপী নগরের একমাত্র কলঙ্ককালিমা। মধ্যে-মধ্যে এই ন্যাকড়ার গাদা হইতে, কখন বা কাশির শব্দ, কখন বা গোঙানি-শব্দ, কখন বা নাভিশ্বাসের শব্দ শুনা যায়; আবার কখন-কখন দেখা যায়,—সেই ন্যাকড়ার গাদা হইতে কেহ বা বাহুরূপ অস্থিখণ্ড বাহির করিয়া নাড়িতেছে; কেহ বা সেই ন্যাকড়াগুলা জ্বরবিকারগ্রস্ত রোগীর ন্যায় উন্মত্তভাবে ঝাঁকাইতেছে;—গাঁট-বাহির-করা অস্থিসার পাগুলা ছুঁড়িতেছে। যাহারা এইরূপ মাটির উপর মুক্তাকাশতলে পড়িয়া আছে, তাহাদের পক্ষে, কি জ্বালাময় দিবস, কি প্রশান্ত রাত্রি, কি প্রভাময় প্রভাত—সকলি সমান। তাহাদের কোন আশাভরসা নাই। তাহাদের প্রতি কাহারও মায়া-মমতা নাই। তাহাদের ভারক্লান্ত মস্তক যেখানে একবার ঢলিয়া পড়িয়াছে, সেইখানেই পড়িয়া থাকিবে; সেই পদপথের সানের উপরই উহাদিগকে মৃত্যুর প্রতীক্ষায় থাকিতে হইবে; এবং সেই মৃত্যুতেই উহাদের সকল যন্ত্রণার অবসান হইবে।

রাজাদিগের চাঁদ্‌নী-দরবারের ছাদ।

যে ভগ্নাবশেষরাশি আমার পদপ্রান্ত পর্য্যন্ত ক্রমশ নামিয়া আসিয়াছে, তাহার উপর সান্ধ্যগগনবিলম্বিত পাণ্ডুবর্ণ পূর্ণচন্দ্র স্বকীয় ম্লানজ্যোতি এখনো বিস্তার করিতে আরম্ভ করে নাই। একঘণ্টাকাল হইল, যদিও সূর্য্যদেব চতুর্দিকস্থ শৈলমালার পশ্চাতে অস্তমিত হইয়াছেন, তথাপি এখনো তাঁহার পীতাভ আলোকে দিগন্ত আলোকিত। আমি আজ একাকী, বিভবমহিমান্বিত ও বন্যভীষণ কোন এক স্থানে,—একটা পুরাতন রাজপ্রাসাদের ছাদের উপর

অবস্থিত হইয়া, রাত্রির প্রতীক্ষা করিতেছি। ইহা যেন একটা গরুড়পক্ষীর প্রকাণ্ড নীড়; পূর্ব্বে ধনরত্নে পূর্ণ ছিল; শত্রুর ভীতিজনক ও দুরধিগম্য ছিল। কিন্তু আজ ইহা শূন্য; একটা পরিত্যক্ত বৃহৎ নগরের মধ্যে অবস্থিত; কতকগুলি ভৃত্য ইহার রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত।

আমি আকাশের খুব উচ্চদেশে উঠিয়াছি। সুচারুরূপে খোদিত যে সব প্রস্তরফলক ছাদের গরাদে-বেষ্টনের কাজ করিতেছে, সেই সব প্রস্তরের উপর হইতে ঝুঁকিয়া দাঁড়াইলে দেখিতে পাওয়া যায়—নীচে সুগভীর খাত মুখব্যাদান করিয়া আছে; সেই খাতের তলদেশে,—গৃহ, মন্দির, মস্‌জিদ্ প্রভৃতির ভগ্নাবশেষ।

যদিও আমি খুব উচ্চে উঠিয়াছি,—তথাপি আমার চতুর্দ্দিকে আরো কত উচ্চতর ভূমি রহিয়াছে। যে শৈলভূমির উপর এই প্রাসাদটি অধিষ্ঠিত, উহা চক্রাকারে-পরিবেষ্টিত আর একটা উচ্চতর পর্ব্বতমালার কেন্দ্রস্থল। আমার চতুর্দ্দিকে, সরু-সরু তীক্ষ্ণাগ্র লালপাথরের বড়-বড় শৈলচূড়া;—সমস্তই প্রাকারে বেষ্টিত। এই প্রাকারাবলী—উচ্চতম চূড়াপ্রান্ত পর্য্যন্ত বরাবর সমান চলিয়া গিয়াছে; এবং এই দন্তুর বপ্রের করাতী-দন্ত, পীতাভ আকাশের গায়ে, অতীব নির্দ্দয়ভাবে অঙ্কিত রহিয়াছে। এই অন্তরীক্ষের প্রাচীরটি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রস্তরখণ্ডের দ্বারা গঠিত এবং এরূপ সঙ্কটস্থানের উপর স্থাপিত যে, উহা দুরধিগম্য বলিলেও হয়;—একটা চক্রের পরিধিরূপে কয়েকক্রোশ ঘিরিয়া রহিয়াছে। ইহা অতীতযুগের এমন একটি কীর্ত্তি—যাহার ঔদ্ধত্য ও প্রকাণ্ডতায় একেবারে বিস্ময়বিহ্বল হইয়া পড়িতে হয়। এই সব প্রাকারাদি এত উচ্চে উঠিয়াছে—এমন বেপরোয়া-ভাবে খাড়া হইয়া রহিয়াছে যে, দেখিলে মাথা ঘুরিয়া যায়। বহু পুরাকালে, এই নগরের জন্য,—নিম্নস্থ এই রাজপ্রাসাদের জন্য,—একটি অপূর্ব্ব প্রাচীর নির্ম্মাণ করা আবশ্যক বিবেচিত হইয়াছিল; তাই, এই চতুর্দ্দিকস্থ শৈল-মালাকে দুর্ভেদ্য গিরিদুর্গে পরিণত করা হয়। এই প্রাকারপরিধির মধ্যে

প্রবেশ করিবার একটিমাত্র ফুকর আছে; ইহা একটা বৃহৎ প্রাকৃতিক "ফাটলের" মত; উহার মধ্য দিয়া সুদূরপ্রসারিত একটা মরুভূমি অস্ফুটভাবে পরিলক্ষিত হয়।

এইখানে আসিবার জন্য, আমি দিবাবসানে জয়পুর হইতে ছাড়িয়াছি। যে সকল ভগ্নাবশেষ আমার চারিদিকে ঘিরিয়া আছে,—ইহাই পুরাতন রাজধানী অম্বর। দুই শতাব্দী হইল, ইহার স্থান জয়পুর অধিকার করিয়াছে।*

কতকগুলি পথপ্রদর্শক সঙ্গে লইয়া—এবং "সুন্দর গোলাপীনগরের" রাজা আমার ব্যবহারের জন্য যে ঘোড়া দিয়াছেন, সেই সব ঘোড়া লইয়া আমি যাত্রা করিয়াছি। এই অম্বর-প্রাসাদে যে সব ছাদের উপর আমি এইমাত্র উঠিয়াছি—এই সব ছাদে বর্ত্তমান রাজার পূর্ব্বপুরুষেরা পূর্ব্বে বাস করিতেন। আমি জয়পুরের রমণীয় পরীদৃশ্য ও দান্তে-বর্ণিত ভীষণ নরকদৃশ্য,—এই উভয়ই এড়াইবার জন্য তাড়াতাড়ি জয়পুর হইতে বাহির হইয়া এই পল্লিপ্রদেশে আসিয়াছি। আর-কিছু না হোক্—অন্তত এখানে সমস্তই শেষ হইয়া গিয়াছে,—এখন শুধু মৃত্যুর নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতেছে।

কিন্তু আমি জানিতাম—দুর্গপ্রাকারের দ্বারদেশ পার হইবামাত্র, আমাকে আরো একটা ঘোরতর ভীষণ পথ অতিক্রম করিতে হইবে। যুদ্ধের অনেকদিন পরে, যুদ্ধক্ষেত্রের মত একটা-কোন দৃশ্য হয় ত আমাকে দেখিতে হইবে;—হয় ত দেখিতে হইবে, সূর্য্যাতপশুষ্ক রাশি রাশি মৃতশরীর বহুদিন হইতে ইতস্তত পড়িয়া রহিয়াছে; হয় ত দেখিব, কতকগুলা শবশরীর নিশ্বাস ফেলিতেছে,—নড়িতেছে—কখন-কখন উঠিয়া দাঁড়াইতেছে, —আমার অনুসরণ করিতেছে এবং কষ্টের আকস্মিক আবেগে প্রার্থনাচ্ছলে আমার হস্ত জাপ্‌টাইয়া ধরিতেছে।

---

* ১৭২৮ খৃষ্টাব্দে জয়পুর স্থাপিত হয়।

আমি যা ভাবিয়াছিলাম, তাই। আজ দেখিলাম, এই শ্মশানভূমে অনেকগুলি বৃদ্ধা পড়িয়া রহিয়াছে—যেন কতকগুলো অস্থি ও ন্যাকড়ার বস্তা। ইহারা কোন মাতামহী কিংবা পিতামহী—যাহাদের বংশধরেরা নিশ্চয়ই মরিয়াছে; এবং এইবার নিজেদের মরিবার পালা, এইরূপ মনে করিয়া ইহারাও অদৃষ্টের হস্তে আত্মসমর্পণ করিয়া মৃত্যুর প্রতীক্ষায় শান্তভাবে শুইয়া আছে। ইহারা কিছুই চাহে না; একটুও নড়ে-চড়ে না; কেবল ইহাদের বড় বড় উন্মীলিত নেত্রে দারুণ বিষাদ-নৈরাশ্য পরিব্যক্ত হইতেছে। উপরে, মরাগাছের ডালে বসিয়া কাকেরা ইহাদিগকে নজরে-নজরে রাখিতেছে;—আসল সময়ের প্রতীক্ষা করিতেছে।

আজ কিন্তু অন্যদিন অপেক্ষাও অধিক-সংখ্যক শিশু দেখিলাম। আহা! এই ক্ষুদ্র শিশুগুলি,—কেন তাহারা এত কষ্ট পাইতেছে, কেন সকলে তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছে, এইরূপ ভাবিয়াই যেন বিস্মিত; এবং বিচারপ্রার্থনার ভাবে আমার দিকে যেন দীনভাবে চাহিয়া আছে!...এই ছোট ছোট দুর্ব্বল মাথাগুলির ভার—তাহাদের শীর্ণ কঙ্কালশরীর যেন আর বহন করিতে পারিতেছে না; একএকবার আস্তে আস্তে মাথা তুলিতেছে, আবার বিশ্বস্তভাবে চক্ষু নিমীলিত করিয়া আমার হাতের উপর ঢলিয়া পড়িতেছে,—যেন আমার আশ্রয়ে নিশ্চিন্তমনে একটু ঘুমাইতে চাহে। কখন-কখন দেখা যায়, সাহায্যের কাল উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু অনেক-সময়ে ইহাও দেখিতে পাই,—হাতে পয়সা দিবামাত্র উহারা উঠিয়া দাঁড়াইতেছে এবং কিছু খাদ্যসামগ্রী কিনিবার জন্য কষ্টেস্রষ্টে চাউলের দোকানে যাইতেছে।

আশ্চর্য্য! কি সামান্য ব্যয়েই এই শিশুগুলির প্রাণরক্ষা করা যায়! *

এই গোলাপীরঙের সিংহদ্বারগুলি পার হইবার পরেই, সম্মুখে তিনক্রোশ-

* একজন ভারতবাসীর মিতভোজনের দৈনিক ব্যয় প্রায় দুই-আনা মাত্র!

ব্যাপী রাশিরাশি ভগ্নাবশেষ; তাহার পরেই পল্লিপ্রদেশের প্রকৃত মরুভূমি; মরা-গাছের বাগান-বাগিচার মধ্যে কত গম্বুজ, কত মন্দির, স্বচ্ছপ্রস্তরে নির্ম্মিত কত চতুষ্কমণ্ডপ একটার পর একটা চলিয়াছে, তাহার আর অন্ত নাই। বানর, কাক ও শকুনি ছাড়া এখানে আর কেহই বাস করে না। এদেশের প্রত্যেক নগরের আশপাশে এই সকল জীবের নিত্য গতিবিধি। এই সমস্ত শ্মশানভূমি, পূর্ব্ববর্ত্তী সভ্যতার ধ্বংশাবশেষে সমাচ্ছন্ন।

বলা বাহুল্য, কর্ষিত ক্ষেত্রের চিহ্নমাত্রও আর লক্ষিত হয় না। জনপ্রাণী নাই; কেবল মাছিতে গ্রামপল্লি ভরিয়া গিয়াছে।

তাহার পর যখন গিরিমালার পাদদেশে—সেই লাল-পাথরের রাজ্যে আসিয়া পৌঁছিলাম, মনে হইল, যেন সর্ব্বত্রই জ্বলন্ত অঙ্গার। এমন কি, ছায়াময় স্থানেও, ধূলা-ভরা এমন এক একটা শুক্না দম্‌কা-বাতাস আসিতেছে যে, তাহাতে যেন মুখ একেবারে ঝল্‌সিয়া যায়।

উদ্ভিজ্জের মধ্যে বড়-বড় cactus ছাড়া আর কিছুই নাই—সেই মরা-গাছগুলা শুধু খাড়া হইয়া রহিয়াছে;—সমস্ত শৈলখণ্ড উহাদের কণ্টকময় বৃন্তে কণ্টকিত।

আমার দুইজন পথপ্রদর্শক পৃষ্ঠে ঢাল ও হস্তে বল্লম লইয়া অশ্বপৃষ্ঠে চলিয়াছে। বাহাদুর ও আকবরের আমলে, সৈনিকদের এইরূপ সাজ ছিল।

অপরাহ্ণ পাঁচঘটিকার সময় সূর্য্যের প্রখরকিরণে আমাদের চক্ষু যেন ঝল্‌সাইয়া গেল। অম্বরের রুদ্ধ-উপত্যকার গায়ে, যেখানে একটা সরু ফাঁক আছে, সেই ফাঁকটি অবশেষে আমাদের নেত্রগোচর হইল। একটা ভীষণ দ্বার, এই একমাত্র প্রবেশপথটিকে রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। তাহার পরেই হঠাৎ সেই প্রাচীন রাজধানীটি আমাদের নেত্রসমক্ষে উদ্‌ঘাটিত হইল। সান-বাঁধানো ঢালু সোপান দিয়া আমাদের ঘোড়ারা পিছ্‌লাইয়া পিছ্‌লাইয়া চলিতে লাগিল;—এইরূপে আমরা রাজাদিগের পুরাতন প্রাসাদে

আরোহণ করিলাম। বেলে-পাথর ও মার্ব্বেলে গঠিত এই প্রাসাদটি শৈলরাশির উপর রাজসিংহাসনের মত সদর্পে বিরাজ করিতেছে; এবং সেখানে অধিষ্টিত হইয়া চতুর্দ্দিকস্থ ধ্বংশাবশেষগুলি অবলোকন করিতেছে।

প্রবেশ করিয়া,—উপরে উঠিতে উঠিতে, যে-ই একটা মোড় ফিরিলাম, অম্‌নি কৃষ্ণবর্ণ ঘোরদর্শন একটি মন্দির দৃষ্টিপথে পতিত হইল;—যাহার ভূমি শোণিতধারায় কলঙ্কিত, এবং যেখান হইতে মৃতপশুর পূতিগন্ধ সর্ব্বদা নিঃসৃত হইতেছে। ইহা পুরাতন পশুবলির স্থান। মন্দিরের গর্ভদেশে, একটা কুলুঙ্গির মধ্যে, প্রচণ্ডভাবা দুর্গা অধিষ্ঠিত; মূর্ত্তিটা অতীব ক্ষুদ্র ও অস্ফুটাবয়ব;—একটা ক্রূরকর্ম্মা রাক্ষসী, লাল ন্যাকড়ায় জড়ানো। ধ্বজ-স্তম্ভের ন্যায় একটা প্রকাণ্ড ঢাক তাহার পদতলে স্থাপিত। ঐখানে, বহুশতাব্দী হইতে, প্রতিদিন প্রাতে, ছাগবলি হইয়া আসিতেছে; সেই ছাগের তপ্তশোণিত একটা পিতলের গামলায় ও তাহার সশৃঙ্গ মুণ্ডটা একটা থালায় রক্ষিত হইয়া থাকে। আশ্চর্য্য! সংহারদেবতার পত্নী দুর্গারূপে এই ভীষণ কালী কিরূপে হিন্দুদেবতাদিগের মধ্যে স্থান পাইল? যে দেশে জীবহিংসা নিষিদ্ধ, সেই দেশে, কিছুদিন পূর্ব্বে এই স্থানে, রক্তপিপাসু কালীর সম্মুখে কিনা নরবলি হইত! না জানি, কোন্ পুরাকালের গর্ভ হইতে—কোন্ অমানিশার মধ্য হইতে এই কালীমূর্ত্তি নিঃসৃত হইয়াছে!...

আমরা পথের প্রত্যেক আড্ডায় যেখানেই থামিতেছি, সেই খানেই আমাদের সম্মুখে "গজাল-মারা" পিতলের দ্বারসমূহ উদ্‌ঘাটিত হইতেছে। তাহার পর অশ্বপৃষ্ঠ হইতে নামিয়া পদব্রজে,—প্রাঙ্গণের মধ্য দিয়া, বাগানের মধ্য দিয়া, সিঁড়ি দিয়া—বরাবর উপরে উঠিতে লাগিলাম।

মোটা-মোটা থামওয়ালা মার্ব্বেলের দালান; তাহাতে কত সূক্ষ্ম বিচিত্র কারুকার্য্য; উহার খিলানমণ্ডপ পূর্ব্বে ছোট ছোট কাচের টুকরা ও আয়নার টুকরায় আচ্ছাদিত ছিল; গুহাগাত্রের ন্যায় এখন সমস্ত "ছাতা-পড়া" হইলেও, স্থানে-স্থানে এখনো ঝক্‌মক্ করিতেছে। দরজাগুলা

কাঠের—গজদন্তখচিত। কতকগুলা চৌবাচ্ছা, খুব উচ্চদেশে স্থাপিত, এখনো উহাতে একটু জল রহিয়াছে। অন্তঃপুরমহিলাদের জন্য শৈলগর্ভ খনন করিয়া কতকগুলা স্নানাগার নির্ম্মিত হইয়াছে; এবং সকলের মধ্যস্থলে, প্রাচারবদ্ধ একটা "ঝোলানো"-বাগান;—তাহার সম্মুখেই কতকগুলা অন্ধকেরে ঘর সমুদ্ঘাটিত—উহাই রাজকুমারীদিগের, রাণীদিগের ও অবরুদ্ধ সমস্ত সুন্দরীদিগের অন্তঃপুর। আরো উচ্চতর ছাদে উঠিবার উদ্দেশে যখন ঐখান দিয়া চলিয়া গেলাম, তখন দেখিলাম, শতবর্ষ-বয়স্ক নারাঙ্গি-বৃক্ষসমূহের সৌরভে সমস্ত স্থানটা আমোদিত। কিন্তু এখানকার বৃদ্ধ রক্ষক অতীব তীব্রভাবে বানরদিগের নামে অভিযোগ করিয়া বলিতেছিল যে, উঁহারাই এখানকার মালিক বলিলেই হয়; উহাদের উৎপাতে সমস্ত লেবু হস্তগত হওয়া দুষ্কর।

আমি এখন, এই শেষপ্রান্তবর্ত্তী ছাদটির উপর বসিয়া রাত্রির প্রতীক্ষা করিতেছি। চন্দ্রালোকে রাজসভার অধিবেশনের জন্য জম্‌কালো-বারণ্ডা-বেষ্টন সমন্বিত এই ছাদ রাজারা নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। এখনি জ্যোৎস্না হইবে, আমিও জ্যোৎস্নালোকে এই স্থানটির সহিত একটু পরিচয় করিয়া লইব।

চীল, শুকুনি, ময়ূর, ঘুঘু, তালচঞ্চু প্রভৃতি পক্ষীরা সকলেই এখন নিজ-নিজ নীড়ে শয়ন করিয়াছে; তাই এই পরিত্যক্ত প্রাসাদটি এখন আরো নিস্তব্ধ। উচ্চ শৈলমালার অন্তরালে সূর্য্য অনেকক্ষণ আমার নিকটে প্রচ্ছন্ন ছিল, কিন্তু এইবার নিশ্চয়ই অস্তমিত হইয়াছে! কেন না নীচেকার কেল্লার একটা ময়দানে কতকগুলি মুসলমান রক্ষিপুরুষ মেক্কার দিকে মুখ করিয়া নেমাজ করিতেছে। উহারা নেমাজের এই পবিত্র সময়টি যথাকালে ঠিক জানিতে পারে।

ঠিক এই সময়ে রক্তাপ্লুত কালীমন্দির হইতেও একটা গহন-গম্ভীর ধ্বনি নিম্নদেশ হইতে আমার নিকট আসিয়া পৌছিল। ব্রাহ্মণ্যিক

পূজা-অর্চ্চনারও এই সময়। লোহিতবসনা রাক্ষসীদেবীর ঢাক তাহারই "গৌরচন্দ্রিমা" আরম্ভ করিয়াছে।

প্রথম-সঙ্কেতের মত ঢাকের উপর দুই চারিবার সজোরে ঘা পড়িল; তাহার পরেই ভীষণ শব্দঘটা; পরক্ষণেই, আর্ত্তনাদী শানাই ও কাংস্য-কর্ত্তাল তাহার সহিত যোগ দিল। আর একটা শঙ্খ স্বরগ্রামের দুটিমাত্র স্বর অবলম্বন করিয়া ঘোররবে অবিশ্রামে বাজিতে লাগিল।

এই শব্দ যেন ভূগর্ভ হইতে আমার নিকট আসিয়া পৌছিতেছে; ক্রমেই স্ফীত হইয়া উঠিতেছে; এবং উপর্যুপরি-বিন্যস্ত অসংখ্য শূন্যগর্ভ ও শব্দযোনি দালানের মধ্য দিয়া, এই উচ্চ ছাদ পর্য্যন্ত পৌছিতে পৌছিতেই অনেকটা রূপান্তরিত হইতেছে। সহসা, উচ্চ আকাশ হইতে, প্রত্যুত্তরচ্ছলে কাঁশরঘণ্টার ধ্বনি নিঃসৃত হইল।

এই ধ্বনি, একটি ক্ষুদ্র শিবমন্দির হইতে যেন পূর্ণপক্ষভরে এই দিকে উড়িয়া আসিতেছে। আমার চতুর্দ্দিকে যে সকল উদগ্র শৈলচূড়া রহিয়াছে, তাহারি একটার উপরে এই মন্দিরটি প্রতিষ্ঠিত।

যাহার দন্তুর চূড়াবলী কালো চিরুণীর দাঁতের মত পীতাভ ম্লান অম্বরে পরিস্ফুটরূপে অঙ্কিত—সেই গগনচুম্বী প্রাকারের গায়ে এই মন্দিরটি ঠেস্ দিয়া রহিয়াছে।

এই সকল ধ্বংসাবশেষের মধ্যে এতটা শব্দকোলাহল আমি প্রত্যাশা করি নাই। কিন্তু ভারতবর্ষে, নগরাদি যতই জনপরিত্যক্ত হউক না,—মন্দিরাদি যতই ভগ্নদশাপন্ন হউক না, পূজা-অনুষ্ঠানের কোথাও গতিরোধ হয় না; দেবসেবা বরাবরই সমান চলিতে থাকে।

কয়েক মিনিট ধরিয়া, কাঁশর-ঘণ্টা মুখরিত সেই ক্ষুদ্র মন্দিরটির দিকে আমি মাথা তুলিয়াছিলাম; তাহার পর যে-ই ভূতলের দিকে দৃষ্টিপাত করিলাম, অমনি আমার নিজের ছায়া দেখিয়াই চমকিত হইলাম,—ছায়াটি বেশ পরিস্ফুট ও সহসা-অঙ্কিত। সহজবুদ্ধিতে প্রথমে আমার এইরূপ

মনে হইল, বুঝি কেহ আমার পিছনে কোন-এক অপূর্ব্ব আলোকের দীপ ধরিয়াছে—কিংবা হয় ত কেহ বৈদ্যুতিক দীপের শুভ্ররশ্মি আমার উপর প্রক্ষেপ করিয়াছে;—কিন্তু আসলে তাহা নহে। যাহার কথা আমি ভুলিয়া গিয়াছিলাম, সেই গোলাকার পূর্ণচন্দ্র—সেই রাজদরবারের চন্দ্রমা, ইহারি মধ্যে স্বপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া স্বকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন;—এতই সহসা এদেশে দিবাবসান হয়। অন্য স্থাবরপদার্থেরও সুপরিস্ফুট ছায়া সর্ব্বত্র পতিত হইয়াছে;—মধ্যে-মধ্যে ছায়া আলোকের দ্বন্দ্ব চলিতেছে। চান্দ্র-দরবারের ছাদের উপর চন্দ্রমা স্বকীয় শুভ্রমহিমায় বিরাজ করিতেছেন।

উক্ত উৎকট বর্ব্বর বাদ্যধ্বনি থামিয়া গেলে আমি নীচে নামিব; এই সময়ে, কত খাড়া সিঁড়ি দিয়া, কত সরু বারণ্ডা-পথ দিয়া, কত দালানের মধ্য দিয়া একাকী এই রাত্রিকালে আমায় নামিতে হইবে;—আর রাত্রিকালে এই প্রাসাদটি বানর ও অপচ্ছায়াদিগেরই আশ্রয়স্থান। তাই, ওই বাদ্যধ্বনি না থামিলে আমার চলিতে সাহস হইতেছে না।

বড়ই বিলম্ব হইতেছে,—বড়ই বিলম্ব হইতেছে। এই সময়ের মধ্যে আকাশে সমস্ত তারাই ফুটিয়া উঠিল।

এই স্থানটি যেমন একদিকে রাজমহিমায় মহিমান্বিত—তেমনি আবার নিভৃত-নিরালয়। যে রাজারা এই চাঁদনী-দরবারের কল্পনা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের কল্পনার দৌড় না জানি কতটা ছিল!

যাহা হউক, অর্দ্ধঘণ্টার পরে, ঢাকের বাদ্য ও পবিত্র শঙ্খের নিনাদ একটু প্রশমিত হইল। শঙ্খনাদের টানটা এখনো চলিয়াছে—তবে, একটু মৃদুভাবে; মধ্যে-মধ্যে আবার যেন প্রাণপণে ধ্বনিত হইতেছে;—তবে এখন একটু রহিয়া-রহিয়া। এইবার যেন শব্দটার মরণযন্ত্রণা উপস্থিত,—এইবার মরিল;—সমস্ত শক্তি নিঃশেষিত হওয়াতেই যেন মরিল। আবার সব নিস্তব্ধ। সকলের তলদেশ,—উপত্যকার গভীর অন্তস্তল—অম্বরের

ধ্বংসাবশেষে সমাচ্ছন্ন। সেইখান হইতে শৃগালের শোকবিষন্ন তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর আবার শুনা যাইতে লাগিল।

আবার যখন আমি নীচে নাবিতে লাগিলাম, তখন সিঁড়ির মধ্যে—প্রাসাদের নিম্নস্থ দালানগুলার মধ্যে, তেমন অন্ধকার আর নাই। সে সমস্তই চন্দ্রমার শুভ্রকিরণে—নীলাভ কিরণে—অনুবিদ্ধ হইয়াছে; দন্তাকৃতি ছোট ছোট জান্‌লার ফাঁক দিয়া রজতকিরণ প্রবেশ করিয়া, গবাক্ষের সুন্দর গঠনরেখা হর্ম্ম্যতলের সানের উপর অঙ্কিত করিয়াছি; অথবা, প্রাচীরের প্রস্তরফলকের উপর বিলুপ্ত খচিত-কাজগুলিকে (mosaic) আবার যেন ফুটাইয়া তুলিয়াছে; মনে হয়, যেন সমস্ত দেওয়ালের গায়ে রত্নবাজি অথবা সলিলবিন্দু বিকীর্ণ। যখন আমি কুসুমসৌরভাভিসিক্ত উদ্যানের মধ্য দিয়া চলিতে লাগিলাম, নারাঙ্গিনেবুর উচ্চতম শাখাগুলির হেলন-দোলনে ও মর্ম্মরশব্দে কপিবৃন্দ চকিত চঞ্চল হইয়া উঠিল।

নীচে, প্রথম-দ্বারগুলির সম্মুখে,—যেখানে ছাদের স্বল্প শৈত্যের পরেই বায়ু যেন আবার হঠাৎ গরম হইয়া উঠিয়াছে—সেইখানে বল্লমহস্তে অশ্বপৃষ্ঠের উপর আমার পথ প্রদর্শকেরা আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। এই নৈশশান্তির মধ্যে ঘোড় সওয়ার হইয়া শান্তভাবে আবার আমরা জয়পুর অভিমুখে ফিরিলাম। কাল প্রভাতে নিশ্চিতই জয়পুর হইতে প্রস্থান করিব মনে করিয়াছি।

এখান হইতে দেড়শতক্রোশ দূরে, বিকানীয়াবে যাইব মনে করিয়াছিলাম; কিন্তু সে সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়াছি। শুনিলাম, সেখানে দুর্ভিক্ষের ভীষণতা চূড়ান্তসীমায় উঠিয়াছে; রাস্তাঘাট সমস্তই মৃতদেহে আচ্ছন্ন। না, এ ভীষণ দৃশ্য আমার যথেষ্ট দেখা হইয়াছে; আর দেখিতে ইচ্ছা নাই। এখন আমি সেই সব প্রদেশের অভিমুখে যাত্রা করিব, যেখানে দুর্ভিক্ষের প্রকোপ ততটা নাই; অথবা বঙ্গোপসাগরের সমীপবর্ত্তী সেই সব প্রদেশে যাইব, যেখানে এখনো লোকের প্রাণরক্ষা হইতেছে।

জালিকাটা বেলে-পাথরের নগর।

এই দুর্ভিক্ষপ্রদেশ ছাড়িয়া বঙ্গোপসাগরতটে ফিরিয়া যাইবার সময় গোয়ালিয়ার আমার পথে পড়িল। দুর্ভিক্ষপ্রদেশে ইহাই আমার শেষ থামিবার আড্ডা। সমস্ত নগরটি খোদিত-কারুকার্য্যে, শুভ্র 'জালির' কারুকার্য্যে সমাচ্ছন্ন। সমস্ত ভারতবর্ষের মধ্যে গোয়ালিয়ার প্রস্তরের উপর সুন্দর ও বিচিত্র তক্ষণকার্য্যের জন্য প্রসিদ্ধ। এখানে যাহা কিছু দেখা যায়, প্রায় সবই সুন্দর; সবই খোদাইকাজে—জাফ্‌রির কাজে বিভূষিত।

এই শোভাগৃহগুলি দেখিলে মনে হয়, যেন পাৎলা তাস-কাগজের উপর ফোঁড় কাটা; কিন্তু আসলে কঠিন বেলে-পাথরে নির্ম্মিত এবং উহার সূক্ষ্ম সুকুমার কাজগুলি আদৌ ক্ষণভঙ্গুর নহে। দ্বারপ্রকোষ্ঠের উপর পুষ্পমালার নক্‌সা; গবাক্ষের উপর ঝালরের নক্‌সা। দ্বারপ্রকোষ্ঠলগুলা ছোট-ছোট অসংখ্য থাম দিয়া ঘেরা; থামের মাথালগুলা বৃক্ষপত্রের অনুকরণে এবং থামের তলদেশ পুষ্পকোষের অনুকরণে গঠিত। উপর্য্যুপরিন্যস্ত রাশিরাশি অলিন্দ ও বারণ্ডা,—স্বসীমা অতিক্রম করিয়া রাস্তার উপর বাহির হইয়া পড়িয়াছে। সমস্তই বেলে-পাথরের। এই গোয়ালিয়ার-নগরে, যদি কেহ গবাক্ষের গরাদে, কিংবা সুন্দরীদিগকে প্রচ্ছন্ন রাখিবার জন্য ঝাঁজরী-জান্‌লা নির্ম্মাণ করিতে চাহে, তাহা হইলে সে বেলে-পাথরের একটা বৃহৎ চাক্‌লা লইয়া তক্তার মত চাঁচিয়া পাৎলা করে এবং তাহাতে ছিদ্র করিয়া লতা-পাতার আকারে অনেকগুলা সূক্ষ্মচারু ফুকর বাহির ক'রে। দেখিলে মনে হয়, যেন উহা হাল্‌কা কাঠের কাজ কিংবা কাগজের কাজ। সমস্তই চুনকামের মত তুষারশুভ্র শ্বেতবর্ণে ধবলিত; মধ্যে-মধ্যে, দেয়ালের উপর পুষ্প, হস্তী ও দেবদেবীর চিত্র উজ্জ্বলবর্ণে অঙ্কিত। এদিকে গ্রামপল্লী ক্রমেই উজাড় হইয়া পড়িতেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও, এই ইন্দ্রপুরীতুল্য নগরটিতে

প্রবেশ করিলে দুর্ভিক্ষের দুঃস্বপ্নটা যেন প্রায় ভুলিয়া যাইতে হয়। এখানকার লোকের এতটা অর্থসম্বল আছে যে, তাহারা শস্যাদি অনায়াসে ক্রয় করিতে পারে; এবং তাহাদের এখনো এতটা জলসঞ্চয় আছে যে, তাহাতে উদ্যানাদি সংরক্ষিত হইতে পারে।

আতর প্রস্তুত করিবার জন্য ও সাজসজ্জার জন্য নগরচত্বরে ঝুড়িঝুড়ি গোলাপফুল বিক্রী হইতেছে।

গোয়ালিয়ার আসলে হিন্দুনগর; কিন্তু এখানকার লোকের পাগ্‌ড়ীগুলা মুসলমানীধরণের। তবে একরকম বিশেষধরণের পাগ্‌ড়ী আছে—যাহা খুব আঁটসাঁট করিয়া জড়াইয়া বাঁধা; বর্ণভেদ অনুসারে এই সকল পাগ্‌ড়ী অসংখ্যরকমের। কোনটার শাঁখের মত গড়ন, কোনটার বা একাদশ-লুই-রাজার আমলের টুপির মত গড়ন। আবার একরকম পাগ্‌ড়ী আছে—যাহার লম্বা দুই পাশ উর্দ্ধে উত্তোলিত ও দুইদিকে সিং-বাহিরকরা। এই পাগ্‌ড়ীগুলা,—লালরঙের কিংবা পীচফল-রঙের, কিংবা ফিঁকা-সবুজ-রঙের রেশমী কাপড়ের। হাইদ্রাবাদে যেরূপ দেখা গিয়াছিল—সেইরূপ এখানেও, জনতার শুভ্র পরিচ্ছদের উপর—রাস্তার শাদা রঙের উপর, পাগড়ীর এই টাট্‌কা রংগুলা যেন আরো বেশী ফুটিয়া উঠিয়াছে। এখানকার লোকেরা ললাটে যে শৈবচিহ্ন ধারণ করে, তাহা দেখিতে কতকটা শাদা প্রজাপতির মত, ও খুব সযত্নে চিত্রিত। ললাটের মধ্যস্থলে একটা বড় লাল ফোঁটা;—তাহার দুইপাশ হইতে যেন দুইটা ডানা বাহির হইয়াছে। পক্ষান্তরে এখানকার বৈষ্ণবচিহ্ন দাক্ষিণাত্যের বৈষ্ণবচিহ্নেরই মত।

গোয়ালিয়ারকে ঘোড়্‌সওয়ারের নগর বলিলেও হয়;—সর্ব্বত্রই দেখা যায়, ঘোড়সওয়ারেরা জরির জিন-লাগানো তেজী ঘোড়ার উপর চড়িয়া ছুটিয়া চলিয়াছে কিংবা চক্রাকারে ঘুরিতেছে; অনেকে হাতীর উপরেও চড়িয়াছে, দলে-দলে উষ্ট্রগণ সারিবন্দি হইয়া চলিয়াছে; অশ্বতরী ও ছোট ছোট ধূসরচর্ম্ম গর্দ্দভেরও অভাব নাই।

গাড়ি যে কত রকমের, তার সংখ্যা নাই। ঝক্‌ঝকে তামার ছোট-ছোট ভাড়াটে গাড়ি—তাহার ছাদ সূচ্যগ্র মন্দিরচূড়ার মত;—গাড়িটা ঘোটকের পশ্চাদ্দেশে যেন আটা দিয়া জোড়া; আর ঘোড়াগুলা ক্রমাগত পিছনদিকে লাথি ছুঁড়িতেছে। কোন কোন শকট স্থূলকায় দুইটা অলস বলদে টানিতেছে; শকট "গদাইনস্করি" চালে চলিয়াছে; একটা লম্বা পিতলের ডাণ্ডা দুইটা বলদকে পরস্পর হইতে একগজপরিমাণ পৃথক্ করিয়া রাখিয়াছে,—তাহাতে অনেকটা রাস্তা জুড়িয়া যায়; এই শকটের গঠন কতকটা সেকেলে তিন-সারি-দাঁড়ওয়ালা নৌকার মত;—খুব অলঙ্কারভূষিত নৌকার অগ্রভাগের মত; কিন্তু এই অগ্রভাগটি একেবারে সূচ্যগ্র; ইহার উপর আরোহীরা, অশ্বপৃষ্ঠে বসিবার ধরণে সারি-সারি বসিয়াছে। এই ধরণের বড় শকটগুলা প্রচ্ছন্নকায় রহস্যময়ী সুন্দরীদিগের ব্যবহারের জন্য; ইহাদের গঠন কোন বৃহদাকার পক্ষীর অণ্ডের মত; একেবারে গোলাকৃতি; লাল কাপড় দিয়া অতি সাবধানে চারিদিক্ ঢাকা; এই শকটগুলাও ধীরে-ধীরে চলিয়াছে। কখন-কখন এই ঢাকা কাপড়ের আধ-খোলা ফাঁক হইতে স্বর্ণবলয়ভূষিত, তৃণমণিবর্ণের একটা বাহু, কিংবা স্বর্ণনূপুরভূষিত একটা নগ্ন পদ, কিংবা অঙ্গুরীভারাক্রান্ত কতকগুলা আঙুল বাহির হইয়া আছে, দেখিতে পাওরা যায়। তা ছাড়া, কতরকমের পাল্কি-তাঞ্জাম; এই সকল যানে চড়িয়া তরুণবয়স্ক সর্দ্দারেরা হাওয়া খাইতে বাহির হইয়াছেন। তাঁহাদের পরিচ্ছদ নারাঙ্গিরঙের কিংবা Mallow-তরু-রঙের রেশমী কাপড়ের; চোখে কাজলের দীর্ঘ রেখা এবং কাণে হীরকের অলঙ্কার। অথবা কোন নবাব বাহির হইয়াছেন; তাঁহার পাটল কিংবা বেগনি রঙের আচ্‌কান; সেই আচকানের উপর তুষারশুভ্র কিংবা সিন্দূরবর্ণে রঞ্জিত শ্মশ্রুরাজি বিলম্বিত।

শাদা পাথরের এই সকল সুন্দর রাস্তায় চলিতে চলিতে লোকেরা পরস্পরকে ক্রমাগত সেলাম করিতেছে দেখিতে পাওয়া যায়। গোয়ালিয়ারের লোকেরা বড়ই ভদ্র।

এ কথা নিশ্চিত, এ দেশের উচ্চবর্ণের মধ্যে আর্য্যজাতীয় দৈহিক শ্রীসৌন্দর্য্য চরম উৎকর্ষে উপনীত হইয়াছে,—উহাদের মুখের রং প্রায় ইরাণীদিগেরই ন্যায় ফর্শা।

স্বচ্ছ মল্‌মল্‌-বস্ত্রে রোমীয় ধরণে আবৃত হইয়া এবং উজ্জ্বল বর্ণচ্ছটা বিচ্ছুরিত করিয়া যে সকল রমণী দলে-দলে রাস্তায় চলিয়া বেড়াইতেছে, তাহাদের কি সুন্দর চোখ!—কি অনিন্দ্যসুন্দর দেহের গঠন!

তালীবনসঙ্কুল ভারত হইতে—তাম্রবর্ণ নগ্নতার ভারত হইতে—আলুলিত দীর্ঘকুন্তলের ভারত হইতে, এই প্রদেশটি কত দূরে!

রাজপুতানার এই সকল মল্‌মলের ওড়্‌না—যাহার দ্বারা রমণীদের আপাদমস্তক আবৃত—এই সকল ওড়্‌নার কাপড়ে যে নক্সা কাটা আছে, তাহাতে ইচ্ছা করিয়াই যেন একটু বর্ব্বররুচির পরিচয় দেওয়া হইয়াছে; উহাতে যেন কেবল কতকগুলা রঙের ধ্যাবড়া ছোপ্—কতকগুলা বেঢপ চক্রাকার রেখা।

একজন রমণী যে ওড়নাটা পছন্দ করিয়া গায়ে পরিয়াছেন, তাহার রং শ্যাওলা-সবুজ;—তাহার উপর গোলাপীরঙের চক্র কাটা; তাঁহার সঙ্গিনীটি যে ওড়না পরিয়াছেন, উহা সোনালী-রঙের,—তাহার উপর নীলের ছোপ্ অথবা Lilacপুষ্প-রঙের ছোপ্। ওড়নার কাপড় যেরূপ সূক্ষ্ম ও লঘু, তাহাতে সূর্য্যরশ্মি ও ছায়া ভিতরে প্রবেশ করায়, বেলোয়ারী কাচের সমস্ত আভাই যেন বস্ত্রের উপর খেলাইয়া বেড়াইতেছে। এই সব বিচিত্র কুসুম-বর্ণের মধ্যে—প্রাভাতিক বর্ণচ্ছটার মধ্যে—কোন সুন্দরী সাক্ষাৎ নিশাদেবীর ন্যায় দীর্ঘ-রজত-রেখাঙ্কিত কৃষ্ণবর্ণ ওড়না পরিধান করিয়া সকলকে চমকিত করিতেছেন।

গোয়ালিয়ারের লোকেরা এই রঙের খেলা দেখিতে এতই ভালবাসে যে, একএকটা রাস্তার সমস্তটা জুড়িয়া কেবলি কাপড়-রঙানোই হইতেছে, এবং মিলাইয়া-মিলাইয়া তাহার উপর বিচিত্র রঙের ছোপ্ দেওয়া হইতেছে।

পথ-চল্‌তি লোকদিগের সম্মুখেই এই সব কাজ চলিতেছে;—তাহারা দেখিবার জন্য সেইখানে দাঁড়াইতেছে এবং আপনাদের মতামতও প্রকাশ করিতেছে। একটা কাপড়ের রং-করা শেষ হইবামাত্র অম্‌নি উহা গৃহ-বারণ্ডার উপর বিছাইয়া রাখা হইতেছে; অথবা দুইজন বালক রৌদ্রে শুকাইবার জন্য ঐ কাপড়টার দুই প্রান্ত ধরিয়া ক্রমাগত নাড়া দিতেছে। এই রঞ্জকদিগের অঞ্চলটিতে যেন একটা উৎসব অবিরাম চলিয়াছে। পাৎলা কাপড়গুলা গৃহাদির উপর ঝুলিতেছে; বালকেরা কোন কোন কাপড়ের দুই প্রান্ত ধরিয়া দুলাইতেছে; ঠিক্ যেন চারিদিকে উৎসবের নিশান উড়িতেছে।

কখন-কখন দেখা যায়, বরযাত্রীর দল ধীরে-ধীরে অগ্রসর হইতেছে; আগে-আগে ঢাক-ঢোল-শানাই চলিয়াছে; অশ্বপৃষ্ঠে বর; ভৃত্যগণ একটা বৃহৎ ছত্র তাহার মাথার উপর ধরিয়া আছে। আবার কখন-কখন দেখা যায়, শবযাত্রীর দল ছুটিয়া চলিয়াছে; শবশরীর দৃঢ়বন্ধনে বদ্ধ;—কাপড় দিয়া জড়ানো; শববাহকেরা দ্রুতপদে চলায়, শবশরীর ঝাঁকাই-তেছে; সহযাত্রীরা হাঁপাইতে হাঁপাইতে পিছনে চলিয়াছে এবং কুকুরেরা আকাশের দিকে মুখ তুলিয়া যেরূপ চীৎকার করে, সেইরূপ একএকবার চীৎকার করিয়া উঠিতেছে। রাস্তার কোণে-কোণে ফকীর-সন্ন্যাসীরা গায়ে ভস্ম মাখিয়া অপস্মার-রোগাক্রান্ত ব্যক্তির ন্যায় ধূলায় পড়িয়া নানা-প্রকার অঙ্গবিক্ষেপ করিতেছে, এবং যেন মরণযন্ত্রণা উপস্থিত, এইভাবে কাতরস্বরে ভিক্ষা চাহিতেছে; বাজার-চত্বরের চারিধারে সূক্ষ্ম খোদাই-কাজে বিভূষিত কত দেবমন্দির ও চতুষ্কমণ্ডপ। যাহাদের ওড়না ইন্দ্রধনুর সমস্ত বর্ণে রঞ্জিত—সেই সব রমণী গালিচার দোকানে, রেশমি-বস্ত্রের দোকানে, ফলের দোকানে, মেঠায়ের দোকানে, শস্যের দোকানে প্রবেশ করিতেছে। আমাদের দেশে বিক্রয়ের জন্য যাহা দোকানে সাজাইয়া রাখা হয়—সেই সব শবদেহের বীভৎস দৃশ্য,—পচা মাছ, অস্ত্র ও টুক্‌রা-

টুক্‌রা মাংস, এখানে কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। তাহার কারণ, হিন্দুরা আহারের জন্য কখনই জীবহিংসা করে না। এখানে বেশীর ভাগ বিক্রী হয় – নির্গন্ধ গোলাপফুল। আতর প্রস্তুত করিবার জন্য, কিংবা শুধু ফুলের মালা বানাইবার জন্য রাশিরাশি গোলাপ বাজারে আনীত হয়।

চূড়াসমন্বিত অতি শুভ্র সিংহদ্বারসমূহের মধ্য দিয়া সুবিশাল রাজ-প্রাসাদাঞ্চলে প্রবেশ করিতে হয়। এই সব প্রাসাদ একেবারে তুষারশুভ্র; প্রাসাদের চারিধারে গোলাপের কেয়ারী; তাহার চতুর্দ্দিকে অবসাদ ম্রিয়মাণ বৃহৎ তরুরাজি,—যাহারা এই এপ্রিলমাসেও শারদীয় বর্ণ ধারণ করিয়া আছে। এই সকল বিজন উপবন দিন-দিন শুকাইয়া যাইতেছে; রাজা তাহার কোন প্রতিবিধান করিতে পারিতেছেন না। এই সব ক্ষুদ্র হ্রদ —এখন শুষ্ক; উহাদের তটদেশে চমৎকার খোদাই-কাজ-করা চতুষ্কমণ্ডপ-সমূহ; যে সময়ে একটু বৃষ্টি হইয়াছিল, তাহারই একটু জল চতুষ্কপ্রাঙ্গণে এখনো জমিয়া আছে; এবং তাহারই প্রভাবে অঙ্গনভূমি এখনো নিবিড় শাখা-পল্লবে বিভূষিত।

গোলাপের কেয়ারীতে শরতের ভাব থাকিলেও, যত্নপ্রভাবে গাছগুলা এখনো সতেজ রহিয়াছে; ময়ূর ও বানরেরা বিচরণ করিতেছে; ভূমির এই শুষ্কতায়,—এই দুর্ভিক্ষের সূচনায়, বানরগুলা যেন বিমর্ষ হইয়া পড়িয়াছে।

রাজা এখন জ্বরে ভুগিতেছেন; তাই আরোগ্যলাভের জন্য তিনি এখন পার্শ্ববর্ত্তী কোন শৈলচূড়ায় বিশ্রাম করিতেছেন। তথাপি আমি তাঁহার প্রাসাদে প্রবেশ করিবার অনুমতি পাইয়াছি। আমার জন্য প্রাসাদদ্বার উদ্‌ঘাটিত হইল।

ঘরদালানগুলা য়ুরোপীয় ধরণে সজ্জিত; সর্ব্বত্রই সোনালী-গিল্টির কাজ, জরির কার্জ ও ঝাড়-লণ্ঠন। মনে হয়, যেন Palais-Bourbon-প্রসাদে কিংবা Elysce-প্রাসাদে আসিয়া পড়িয়াছি। কিন্তু এই সব দস্তুরমত-

সাজানো বিলাসদ্রব্যের মধ্যে থাকিয়াও, যখন সেই সব বিগতবসন্ত উপবনগুলির বিষণ্ণতা মনে করি,—দুর্ভিক্ষের কথা মনে করি, তখন যে ভারত দুকূলবস্ত্রাবৃত দেয়ালের বাহিরে অবস্থিত, সেই ভারত আবার আমার মনে পড়িয়া যায়। সর্দ্দার-শ্রেণীর যে যুবকটি আমাকে এই প্রাসাদে আনিয়াছিলেন এবং যিনি মধুর-সৌজন্য-সহকারে আমাকে সমস্ত দেখাইতেছিলেন, তিনি যেন পরীরাজ্যের লোক। তাঁহার শুভ্র পরিচ্ছদ; মাথায় গোলাপী রেশমের টুপি; কানে মুক্তা; এবং গলায় দুই নহরের পান্নার কণ্ঠি। ভারতীয় ও পারস্যদেশীয় পুরাতন ক্ষুদ্রায়তন চিত্রপটে যেরূপ চেহারা সচরাচর দেখা যায়, তাঁহার মুখশ্রী সেইরূপ অপূর্ব্বসুন্দর। এম্নিই ত তাঁহার দীর্ঘায়ত চক্ষু, তাহাতে আবার কজ্জল-রেখায় আরো দীর্ঘীকৃত হইয়াছে। নাক খুব সরু; রেশমনিন্দী কালো গোঁপ; গালের রক্ত সিন্দূরের মত লাল;—স্বচ্ছ তৃণমণিসদৃশ ত্বকের উপর যেন একটা গোলাপীরঙের ছোপ্ দেওয়া।

নগরের অপর পার্শ্বে গোয়ালিয়ারের প্রচীন রাজাদিগের সমাধিমন্দির; এই অঞ্চলটি একেবারে নিস্তব্ধ। উদ্যানের মধ্যে এই সকল বেলে-পাথরের কিংবা মার্ব্বেলের মন্দিরগুলি অবস্থিত, উহার চূড়াগুলা প্রকাণ্ড 'সাইপ্রেস্'-তরুর মত উদ্ধদিকে ক্রমসূক্ষ্ম।

এখানে যতগুলি গগনস্পর্শী সমাধিমন্দির আছে, তন্মধ্যে যেটিতে ভূতপূর্ব্ব মহারাজ কিয়ৎ-বৎসর হইতে চিরনিদ্রায় নিমগ্ন, সেই মন্দিরটি সর্ব্বাপেক্ষা জম্‌কালো। তাহাতে বেলে ও মার্ব্বেল পাথরের চমৎকার কাজ। এবং খুব পশ্চাদ্ভাগে যে স্থানটি সর্ব্বাপেক্ষা পবিত্র—সেইখানে একটা কালো মার্ব্বেলের বৃষ বসিয়া আছে। ইহা ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের একটি পরমারাধ্য সাঙ্কেতিক চিহ্ন। এই রাজকীয় সমাধিমন্দিরটির নির্ম্মাণকার্য্য শেষ না হইতে হইতেই, ইহারি মধ্যে পক্ষীরা ইহাকে আক্রমণ করিয়াছে। পেচক, ঘুঘু, টিয়াপাখী ঝাঁকে-ঝাঁকে আসিয়া মন্দিরের চূড়ায় বাসা

বাঁধিয়াছে। চূড়ায় উঠিবার সিঁড়ি সবুজ ও ধূসর পক্ষীর পক্ষে সমাকীর্ণ। চূড়াটা খুব উচ্চ; চূড়ার উপর হইতে—"চিকণে"র মত কাজকরা বাড়ী, প্রসাদ, অবসাদ-ম্রিয়মাণ উদ্যান, পাথরের বড়বড়-মন্দিরচূড়াসমেত সমস্ত নগরটাই দৃষ্টিগোচর হয়। মাথার উপর—আকাশে, কাকচিলেরা ঘোরপাক দিয়া উড়িতেছে। ভারতবর্ষে প্রায়ই যাহা দেখা যায়—নগরের আশপাশ ভগ্নাবশেষে আচ্ছন্ন; পুরাতন গোয়ালিয়ার, পুরাতন বাসস্থান,—দুর্নিবার কালপ্রভাবে, খেয়ালের অবসানে, কিংবা যুদ্ধবিগ্রহের ভাগ্যবিপর্য্যয়ে পরিত্যক্ত হইয়াছে। যে সময়ে মহাভাগ হিন্দুজাতি বিদেশীয় দাসত্ব স্বীকার করে নাই, স্বাধীনভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিত, বীরগর্ব্বে গর্ব্বিত ছিল, লড়াক্কা ছিল—সেই বীরযুগের বিরাট্ দুর্গসমূহ এ দেশের সর্ব্বত্র যেরূপ দেখিতে পাওয়া যায়, সেইরূপ একটি দুর্গ দিগন্তের একটা কোণ জুড়িয়া রহিয়াছে। ঐ অদূরে, একশত গজের অধিক উচ্চ খাড়া শৈলের উপর, দেড়ক্রোশব্যাপী বপ্রপ্রাকার, ঘোরদর্শন প্রাসাদসৌধাবলী, রাজমুকুটের ন্যায় শোভা পাইতেছে।

পরিশেষে, ভস্মের আভাবিশিষ্ট—পাংশুবর্ণ পত্রের আভাবিশিষ্ট দূর দিগন্ত, গড়াইতে-গড়াইতে কোথায় চলিয়া গিয়াছে। এখনো এই নগরটি নিরুদ্বেগ ও আমোদ-উল্লাসে পূর্ণ; কিন্তু ঐ সব মরা বন, ঐ সব মরা জঙ্গল, যাহা এখান হইতে অস্পষ্ট দেখা যাইতেছে—উহা নগরের উপর একটা যেন বিভীষিকার ছায়া নিক্ষেপ করিয়াছে—আসন্ন দুর্ভিক্ষের সূচনা করিতেছে।

গত সায়াহ্নে, রাজদরবারের একজন সৌম্যদর্শন পুরুষের সহিত, হাতী চড়িয়া সারা সহরটা ঘুরিয়া আসিলাম। বেলে-পাথরের নগরের নিকট আজ আমার এই শেষ বিদায়। এ সময় ততটা গরম নহে; এই সময়ে রমণীরা রঙীণ ওড়না পরিয়া—রূপালি জরির ওড়না পরিয়া, হাওয়া খাইবার জন্য সুন্দর-কাজ-করা নিজ নিজ গৃহের বারাণ্ডায় বসিয়া আছে।

আমার সঙ্গীটিকে চিনিতে পারিয়া এবং গাড়ির আগে-আগে দুই জন ক্রুপ্-সোয়ার দেখিয়া, লোকেরা খুব সেলাম করিতে লাগিল।

একটা প্রকাণ্ডকায় হাতীর উপর চড়িয়া আমরা সহরের সরু সরু রাস্তাদিয়া চলিয়াছি। এটি হস্তীনী—উহার বয়স ৬৫ বৎসর; এই হাতীর উপর বসিয়া আমাদের মাথা একতলা পর্য্যন্ত ঠেকিল; এমনকি, যেখানে সুন্দরীরা বসিয়াছিল, সেই খোদাই-কায-করা বারাণ্ডাটা সেখান হইতে ঝুঁকিয়া দুই হাত বাড়াইয়া স্পর্শ করা যায়।

চৌমাথা-রাস্তার উপর একটা স্থান—একমানুষ-পরিমাণ উচ্চ দর্ম্মা দিয়া ঘেরা; কিন্তু আমরা এত উচ্চে বসিয়া আছি যে, হাতীর উপর হইতে নাচের সমস্তই দেখা যায়। এখানে একটা বিবাহোৎসব হইতেছে; বরের বাড়ী নিতান্ত ছোট বলিয়া রাস্তার উপরেই এই উৎসবের আয়োজন হইয়াছে। অলঙ্কারে বিভূষিতা কতকগুলি তরুণী চুম্‌কিবসানো ওড়না পরিয়া গানবাদ্য শুনিবার জন্য সেইখানে চক্রাকারে বসিয়া আছে।

বাজার-চত্বর দিয়া যখন আমরা চলিতে লাগিলাম, তখন লোকেরা কতই সেলাম করিতে লাগিল! সামান্য দোকানদারেরা, দরিদ্রলোকেরা, খুব নত হইয়া ভক্তিভরে সেলাম করিতে লাগিল। ইঙ্গিতমাত্রে, সুন্দর অশ্বারোহিগণ রাশ-টানিয়া নিজ নিজ অশ্বকে থামাইয়া রাখিল। কেন না, ঘোটকেরা হাতী দেখিলে ভয় পায়। ভয় পাইয়া ঘোড়াগুলা পিছনের পা ছুঁড়িতে লাগিল, চক্রাকারে ঘুরিতে লাগিল, গোলাপের ঝুড়িগুলাকে ওলট্‌পালট্ করিয়া দিল। পাঁচ-ছয় বৎসরের ছোট-ছোট সুন্দর কাজল-পরা মেয়েগুলি—এমন কি, শিশুগুলি পর্য্যন্ত সেইখানে থামিয়া গম্ভীরভাবে আমাদিগকে সেলাম করিতে লাগিল। খুব নীচে হইতে, এমন কি, হাতীর পায়ের কাছে দাঁড়াইয়া তাহারা অতি ভদ্রভাবে ও মজার ধরণে সেলাম করিতে লাগিল এবং পাছে তাহাদের কোন

হানি হয়, এইজন্য হাতীও মাতৃসুলভ সতর্কতার সহিত একটার পর আর-একটা পা অতি সন্তর্পণে ফেলিতে লাগিল।

আমার স্মরণ হয়, যখন এমন-একটা সরু রাস্তা দিয়া চলিয়াছি, যেখানে হাতীর দুই পাশ দুইদিক্‌কার দেয়াল ঘেঁষিয়া যাইতেছে, তখন হঠাৎ একটা ঝাঁকানি হইল, হাতী সহসা থামিয়া পড়িল।

আমাদের হাতী অপেক্ষাও বড় আর একটা দাঁতালো পুরুষ-হাতী বিপরীত দিক্ হইতে ঠিক্ আমাদের সম্মুখে আসিয়া পড়িল।...

আমাদের হাতীটা ক্ষণেকের জন্য যেন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িল। কিন্তু তাহার পরেই সৌজন্যসহকারে দুইজনের মধ্যে কি-একটা পরামর্শ হইয়া গেল। এক হস্তিশালাতেই দুইজনে একত্র বাস করে; এক পাত্র হইতেই দুইজনে একসঙ্গে আহার করে,—সুতরাং উভয়েই উভয়ের সুপরিচিত। পরিশেষে অন্য হাতীটা ত্রিশ-পা পিছু হটিয়া একটা প্রাঙ্গণের মধ্যে প্রবেশ করিল,—যাইবার সময় আমাদের গায়ে শুধু একটু শুঁড় বুলাইয়া গেল। তাহার পর আমরা আবার চলিতে লাগিলাম।

রাজাদের শৈলনিবাস।

ভারতের এই উদাস মরুদৃশ্যের উপর ভাস্বর ও বিষণ্ণ মধ্যাহ্ন ক্রমশ অগ্রসর হইতেছে। হস্তী শান্তভাবে পর্ব্বতের উপরে উঠিতেছে; অতি-মানুষপ্রমাণ একটা খোদিত ঢালু-সিঁড়ি দিয়া হস্তী পর্ব্বতের পার্শ্বদেশে আরোহণ করিল। এই স্থানটি ভগ্নাবশেষে সমাচ্ছন্ন; যেন ইহা দেবতা-দের—মন্দিরসমূহের—প্রাসাদ-সৌধাবলীর একটা প্রকাণ্ড সমাধিক্ষেত্র।

সহজভাবে ও মৃদুভাবে যাহাতে উপরে উঠিতে পারে, এইজন্য হাতী বাঁকা-চোরা পথদিয়া চলিতেছে। তাহার দোদুল্যমান প্রকাণ্ড দেহপিণ্ডটা আমাদিগকেও মৃদুমৃদু দুলাইতেছে। তাহার "গোদা-পায়ের" প্রতি পদক্ষেপে ধূলারাশি যেরূপভাবে নিষ্পেষিত হইতেছে, তাহাতেই তাহার

প্রকাণ্ড শরীরের গুরুত্ব আমি বেশ অনুভব করিতে পারিতেছি। হাতী নিঃশব্দে চলিয়াছে; চারিদিক্ নিস্তব্ধ; কেবল তাহার দুই পার্শ্বে যে দুইটি রূপার ঘণ্টিকা ঝুলান রহিয়াছে, তাহা হইতে বিষণ্ণ-গম্ভীর ধ্বনি মধ্যে মধ্যে নিঃসৃত হইতেছে। কখন-কখন, উষ্ণ স্থির আকাশে উড়ন্ত পাখীর পক্ষোত্থিত শাঁই-শাঁই শব্দ শুনা যাইতেছে;—মাথার উপর দিয়া একটা শকুনি, একটা চিল চলিয়া গেল।

পর্ব্বতটা একেবারে খাড়া হইয়া উঠিয়াছে;—উহার উপরে উঠা কষ্টকর। পর্ব্বতের যে পাশে 'খদ্', তাহার উপর দিয়া দুর্গবপ্র-সমন্বিত একটা প্রাচীর প্রসারিত হইয়া ধূলিসমাচ্ছন্ন সূর্য্যরশ্মি-উদ্ভাসিত ধূসরবর্ণ দূর-দিগন্তকে বিখণ্ডিত করিয়াছে। পর্ব্বতের অপর পার্শ্বের উপর হইতে বিরাট্-আকৃতি পদার্থসকল দৃষ্টিগোচর হইতেছে; তিনশত ফিটেরও অধিক স্থান ব্যাপিয়া একটা গণ্ডশৈল—তাহার উপর দুর্গপ্রাসাদসমূহ অধিষ্ঠিত; সেরূপ সৌধপ্রাসাদাদি একালে নির্ম্মাণ করা দুঃসাহসের কাজ,—এক প্রকার অসাধ্য বলিলেও হয়। মাথা তুলিলেই দেখিতে পাওয়া যায়—এই সব প্রাচীনকালের প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড প্রাসাদ কতদূর পর্য্যন্ত চলিয়াছে, তাহার আর শেষ নাই; ইহাদের গঠনভঙ্গী আমাদের নিকট সম্পূর্ণ-রূপে অপরিচিত; কত-কত শতাব্দী হইতে, এই সকল সৌধপ্রাসাদ অতলস্পর্শ খাতের ধারে অঘূর্ণিতমস্তকে অটলভাবে দণ্ডায়মান। এই নৈসর্গিক দুর্গশৈলের উপর কত-কত রাজবংশ—যাঁহাদের অস্তিত্বও এখন আমরা কল্পনা করিতে পারি না—ঐ উচ্চদেশে দুর্গম নিরাপদ্ আবাস-স্থান নির্ম্মাণের জন্য কত সহস্র বৎসর হইতে প্রস্তরের উপর প্রস্তর রাশীকৃত করিয়াছেন। ভারতের সর্ব্বত্রই যেসব প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড ধ্বংসাবশেষ সমাকীর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার নিকটে আমাদের দেশের ক্ষুদ্র ভূপতিদিগের দুর্গপ্রাসাদাদি কি হাস্যজনক!

হাতী থপ্থপ্ করিয়া মন্থরগমনে উপরে উঠিতেছে। মধ্যে মধ্যে

তাহার গাত্রবিলম্বিত ঘণ্টিকা হইতে একঘেয়ে মৃদুমধুর ধ্বনি নিঃসৃত হইতেছে। মধ্যাহ্নসূর্য্য, হাতীর তলদেশে হাতীর চলন্ত ছায়াচ্ছবি অঙ্কিত এবং মাটির উপর তাহার দোদুল্যমান শুণ্ডটি কালোরঙে চিত্রিত করিয়াছে। আদবকায়দার দস্তর অনুসারে দুইজন লোক আমাদের আগে-আগে চলিয়াছে এবং রূপালী-মাথাওয়ালা দুইটা লম্বা ছড়ি হস্তে ধারণ করিয়া তন্দ্রাগ্রস্ত ব্যক্তির ন্যায় অলসভাবে উপরে উঠিতেছে। উপরে উঠিতে উঠিতে একএকটা দ্বার আমাদের সম্মুখে আসিয়া পড়িতেছে; আমরা প্রাচ্যদেশসুলভ ঢিমা-চালে তাহার মধ্য দিয়া চলিয়াছি। দ্বারগুলা—বলা বাহুল্য—ভীষণ-দর্শন; তাহার উপরে প্রহরীদের ঘর; গোয়ালিয়ারের সৈনিকেরা পাহারা দিতেছে; কেন না, অতীত-গৌরবের নিদর্শনস্বরূপ বিপুল ভগ্নাবশেষের মধ্যে, পর্ব্বতের ঐ উচ্চচূড়ায়, তাহাদের রাজা এখন অবস্থিতি করিতেছেন। আমাদের চতুর্দ্দিকে, দূর দিগন্তের অস্পষ্ট পরিধি-মণ্ডল ক্রমশ বিস্তৃত হইতেছে। গগনবিলম্বিত একপ্রকার ভস্ম-কুয়াসার নীচে শুষ্ক তরুগণের বিচিত্রবর্ণ যেন ধূসরে বিলীন হইয়াছে।

স্ফুলিঙ্গবৎ দীপ্যমান ধূলিকণায় পরিষিক্ত ধূসর দিগন্তদেশ ধূসর আকাশে মিলাইয়া গিয়াছে। সেই আকাশতলে বড়-বড় শিকারি-পাখী প্রাতঃকাল হইতে আবর্ত্তের ন্যায় ক্রমাগত ঘোরপাক দিয়া এক্ষণে শ্রান্ত-ক্লান্ত-অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে।

শৈলরাশির মধ্য হইতে যেন একটা তপ্ত-নিশ্বাস উচ্ছ্বসিত হইল; আকাশে বায়ুর হিল্লোলমাত্র নাই। মধ্যাহ্নসূর্য্যের প্রচণ্ড কিরণে অভিভূত হইয়া পাখীরাও নিস্পন্দ ও নিদ্রামগ্ন; চিল ও শকুনিরা পাখা গুটাইয়া স্থিরভাবে বসিয়া আছে এবং আমাদিগকে নিরীক্ষণ করিতেছে। গণ্ডোলা-নৌকার অবিশ্রান্ত দোলনের ন্যায় হাতীর চলন-ভঙ্গীতে আমাদের মন ক্রমশ অসাড় হইয়া পড়িতেছে; সূর্য্যের দুর্নিরীক্ষ্য আলোকে প্রতিহত হইয়া চক্ষু নিমীলিত হইতেছে; তাহার পরেই, এই সব ধূসর পদার্থরাশির

মধ্যে,—বর্ষণহীন বহুবর্ষের ধূলায় লোহিতীকৃত এই সব প্রস্তররাশির মধ্যে,—সম্মুখের ভূমি ছাড়া, কাছের জিনিষ ছাড়া আমি আর কিছুই দেখিতে পাইতেছি না। প্রথমে চোখে পড়িল একটা জরির পাগ্‌ড়ি, একটা শ্যামল-রঙের ঘাড়, শাদা কাপড়ে আচ্ছাদিত একটা স্কন্ধ, একটা ছোট তীক্ষ্ণ বল্লম; হিন্দু মাহুত হাতীর স্কন্ধের উপর বুদ্ধের ন্যায় উপবিষ্ট; তাহার হাতে অঙ্কুশ। তাহার পর, হাতীর মাথায় জড়ান এক-টুকরা লাল কাপড়, কালো-ডোরা-কাটা গোলাপী-রঙের বৃহৎ কর্ণযুগল; মাছি ও ডাঁশ তাড়াইবার জন্য হাতী তাহার কানদুটা হাতপাখার মত ক্রমাগত নাড়িতেছে।

গুরুপদভরে পথ দলিত করিয়া, শান্ত-শিষ্ট বশ্য অক্লান্ত হস্তী পর্ব্বতের উপরে উঠিতেছে। তাহার পার্শ্বদেশে একটা গোলাকার গণ্ডশৈল, দেখিতে তাহারি মত; না জানি, তিমিরাবৃত কোন্ দূর অতীতের মনুষ্যগণকর্ত্তৃক কতকটা হস্তিদেহের অনুকরণে এই গণ্ডশৈলটি খোদিত হইয়াছিল; উহাতে হস্তীর শুণ্ড, দীর্ঘদন্ত-সমন্বিত মস্তক, হস্তীর পশ্চাদ্ভাগ অস্পষ্টরূপে উৎকীর্ণ রহিয়াছে। তা ছাড়া, বিলুপ্তভাষায় লিখিত কতকগুলা উৎকীর্ণ-লিপি এবং পর্ব্বতের গায়ে খোদিত কুলুঙ্গির মধ্যে বহুসংখ্যক খোদিত দেব-দেবীর প্রতিমাও রহিয়াছে। যাহারা এই ভীষণ স্থানের প্রথম অধিবাসী, সেই পাল-রাজাদিগের ও জৈনদিগেরই এই সমস্ত কীর্ত্তি।

নীচে,—জ্বলন্ত উত্তাপময় প্রসারিত ক্ষেত্রের মধ্যে ভাসমান একপ্রকার ভস্মময় বাষ্পের তলদেশে, প্রাচীন গোয়ালিয়ারের ভগ্নাবশেষসমূহ একটু-একটু দেখা দিতে আরম্ভ করিয়াছে; তা ছাড়া, নূতন গোয়ালিয়ার—সব শাদা—যাহাকে দেশীয় লোকেরা অবজ্ঞাসহকারে "লথ্‌থর" (সৈন্য-ছাউনী) বলে—তাহারও পাথরের বড়-বড় সৌধচূড়া, ও মন্দিরচূড়াদি অল্প-অল্প দৃষ্টিগোচর হইতেছে। এখন মধ্যাহ্ন। আমাদের মাথার উপর প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড অনলকণা বর্ষণ করিতেছেন; পাথরগুলা এরূপ তাতিয়া উঠিয়াছে,

মনে হয় যেন অগ্নিকুণ্ড হইতে আগুনের কিরণ নিঃসৃত হইতেছে। নিস্তব্ধতা ও উত্তাপে বিহ্বল হইয়া চিল, শকুনি ও কাকেরা নিদ্রা যাইতেছে।

ক্রমাগত উপরে উঠিয়া অবশেষে ভীষণদর্শন প্রাসাদসমূহের পাদমূলে আসিয়া উপনীত হইলাম। এই প্রাসাদগুলা একেবারে "খদের" ধারে অধিষ্ঠিত এবং উহাদের দ্বারা পর্ব্বতচূড়ার উচ্চতা যেন আরো বর্দ্ধিত হইয়াছে। ছোট-ছোট-চূড়াসমন্বিত প্রাসাদের মুখভাগটি অতুলনীয়। সমানভাবে বসান প্রস্তরপিণ্ড উপর্য্যুপরি বিন্যস্ত হইয়া বরাবর প্রসারিত এবং বিবিধ-জীবজন্তু-ও-মনুষ্য-আকৃতির অনুকরণে রচিত নীল, সবুজ সোণালি রঙের প্রভৃত খচিত-কাজে অলঙ্কৃত। এই সকল উত্তুঙ্গ দুর্গম প্রাসাদে গোয়ালিয়ারের ভূতপূর্ব্ব প্রবলপ্রতাপ ভূপতিগণ ষোড়শশতাব্দী পর্য্যন্ত বাস করিয়াছেন।

শেষের একটা প্রকাণ্ড দ্বার—নীলরঙের মিনা-র কাজে আচ্ছাদিত। এখনও মহারাজের সিপাহিরা এখানে পাহারা দেয়; এই দ্বার দিয়া একটা চূড়ার উপরিস্থ ময়দানে উপনীত হইলাম। এই ময়দানটি প্রায় দেড়মাইল দীর্ঘ; উহার সমস্তটাই দুর্গবপ্রে পরিবেষ্টিত। সমস্ত পশ্চিমভারতের মধ্যে ইহা সর্ব্বাপেক্ষা দুরধিগম্য বলিয়া প্রসিদ্ধ। ঐতিহাসিক যুগ হইতে যোদ্ধৃরাজামাত্রেই এই স্থানটিকে আকাঙ্ক্ষার সামগ্রী বলিয়া মনে করিয়া আসিয়াছেন—এই স্থানটি কত লোমহর্ষণ যুদ্ধবিগ্রহ দেখিয়াছে,—যাহার বর্ণনায় রাশিরাশি গ্রন্থ পূর্ণ হইতে পারে। এই উত্তুঙ্গ শিখরভূমি,—সৌধপ্রাসাদে, সমাধিমন্দিরে, দেবালয়ে, সকল সভ্যতাস্তরের—সকল যুগের পুত্তলিকাসমূহে সমাচ্ছন্ন। য়ুরোপের এমন কোন স্থান নাই, যাহার সহিত ইহার তুলনা হইতে পারে; বিলুপ্ত পুরাতন বৈভবাদির শোকোদ্দীপক 'জাদুঘর' ইহার মত আর নাই।

মিনা-র কাজকরা প্রথম প্রাসাদের সম্মুখে হাতী হাঁটু গাড়িয়া বসিল; আমরা নামিয়া প্রাসাদের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। এই প্রাসাদটি

ততটা ঘোরতর "সেকেলে" ধরণের নহে—এবং ততটা ভগ্নদশাপন্নও নহে।

ইহা হদ্দ পাঁচশত বৎসরের; কিন্তু ইহার বিরাট্ পত্তনভিত্তি সেই সব পালরাজাদের আমলের—যাঁহারা তৃতীয় শতাব্দী হইতে দশম শতাব্দী পর্য্যন্ত গোয়ালিয়ারে রাজত্ব করিয়াছিলেন। বড় বড় পাথরের মঞ্চের উপর কতকগুলা ঘোরদর্শন নীচু দালান সংস্থাপিত। ধ্বংসাবশেষের নিস্তব্ধতা, হঠাৎ অর্দ্ধচ্ছায়ান্ধকার এবং আমরা যে জলন্ত বহির্দেশ হইতে আসিতেছি আমাদের নিকট হঠাৎ একটু শৈত্যের আবির্ভাব হইল। আগেকার বিলাস-বৈভবের মধ্যে, এখন কেবল রাশিরাশি খোদাই-কাজ এবং দেয়ালে চমৎকার মিনা-র কাজ অবশিষ্ট রহিয়াছে; এই সমস্ত ডানাওয়ালা পশু, অদ্ভুত বিহঙ্গ, সবুজ ও-নীল-পক্ষবিশিষ্ট ময়ূর প্রভৃতির প্রতিকৃতি। ময়ূরের পাখায় যেরূপ দুরপনেয় উজ্জ্বল বর্ণচ্ছটা দেখা যায়—সে বর্ণবিন্যাসের গুহ্যকলা এখন বিলুপ্ত হইয়াছে। দেয়ালের গাঁথুনির মধ্যে, ছোট-ছোট-ছিদ্র-করা একএকটা প্রস্তরফলক বসানো রহিয়াছে—বহির্জগতের দৃশ্য তাহার মধ্য হইতেই যাহা-কিছু দেখা যায়। এইরূপ গবাক্ষের নিকটে বসিয়াই তখনকার বন্দীকৃত সুন্দরীরা আপন-আপন কল্পনায় বিভোর হইত এবং রাজারা আকাশের মেঘ, দূর দিগন্তদেশ, সৈন্যবাহিনী ও যুদ্ধাদি নিরীক্ষণ করিতেন।

"খন্দ"প্রান্তবর্ত্তী প্রাসাদসমূহের সমস্ত মুখভাগ—যাহা উচ্চতায় প্রায় একশত ফিট্ ও দৈর্ঘ্যে প্রায় তিনশত ফিট্—সুরঙ্গগৃহের মত অষ্টে-পৃষ্ঠে বদ্ধ সমস্ত দালান, সমস্ত কক্ষ,—শুধু এই সকল সচ্ছিদ্র প্রস্তরফলকের মধ্য দিয়াই বায়ুগ্রহণ করে; কি পলায়ন, কি আত্মহত্যা, কি প্রেমের ব্যাপার, কোন কারণেই এই সকল প্রস্তরফলক খুলিতে পারা যায় না। আমাদের কারাগারের লৌহগরাদে অপেক্ষাও ইহা দারুণ কঠোর। সানের নীচে সর্ব্বত্রই,—সুরঙ্গপথে নামিবার জন্য গুপ্তসোপান, সুরঙ্গ ও

সুরঙ্গকারাগার। না জানি, কত গভীর পর্য্যন্ত পর্ব্বতগর্ভ কাটিয়া এই সকল অন্ধকূপ—এই সকল সুরঙ্গ প্রস্তুত হইয়াছিল।

এই প্রাসাদের পাশাপাশি আরও কতকগুলি প্রাসাদ সারিসারি চলিয়াছে; এগুলি পর-পর অধিকতর বর্ব্বর-ধরণের। উহার মধ্যে একটি পালরাজাদিগের আমলের—আরও বেশী গুরুভার প্রস্তরপিণ্ডে গঠিত। আর একটি জৈনদিগের আমলের;—বিশেষ কোন গঠন নাই বলিলেও হয়;—পর্ব্বতগাত্রের সহিত যেন মিশিয়া গিয়াছে; গুপ্তভাবে বন্দুক ছুঁড়িবার দুর্গরন্ধ্রের ন্যায়, ত্রিকোণাকৃতি শুধু কতকগুলা ছোট-ছোট গবাক্ষচ্ছিদ্র প্রাসাদগাত্রে পরিলক্ষিত হয়।

তা ছাড়া, এখানকার গড়বন্দী ময়দানটা বিভিন্ন-ধরণের দেবালয়ে সমাচ্ছন্ন; উহাদের এই বিচিত্রতার মধ্যে হিন্দুধর্ম্মের সকল বিভাগেরই নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। এইখানে গর্ত্ত খুঁড়িয়া কতকগুলা চৌবাচ্ছা প্রস্তুত হইয়াছে; এই চৌবাচ্ছাগুলা এত বড় যে, শত্রুকর্ত্তৃক দুর্গ অবরুদ্ধ হইলে হাজার-হাজার লোককে অনেকদিন পর্য্যন্ত পানীয়জল জোগাইতে পারা যায়। সমস্ত স্থানটাই দেবপ্রতিমায় ও সমাধিমন্দিরে আচ্ছন্ন।

একটা জৈনমন্দিরে গিয়া একটু দাঁড়াইলাম; পূর্ব্বে মোগলসৈন্য আসিয়া অত্রত্য প্রতিমাদিগকে বিকলাঙ্গ করে। আমাদের প্রাচীনকালের খৃষ্টধর্ম্মের কীর্ত্তিচিহ্নগুলার সহিত তুলনা করিবার জন্যই এইখানে একটু দাঁড়াইলাম।… আমাদের খুব সুন্দর গির্জ্জাগুলিও ছোট-ছোট অ-সমান প্রস্তরে গঠিত এবং আটা দিয়া জোড়া। কিন্তু এখানে, বড়-বড় পাষাণপিণ্ড—সব বাছা-বাছা ও সব সমান—এরূপভাবে পরস্পরের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট এবং ঘড়ির কল্-কব্জার মত এরূপ যথাস্থানে স্থাপিত যে, মনে হয় যেন এই প্রস্তরসমষ্টি একখণ্ড প্রস্তরের মত অনাদিকাল হইতে একইভাবে রহিয়াছে।…

এক্ষণে, আমার ভারতবাসী লোকদিগের সহিত আবার আমি সেই মন্থরগামী দোদুল্যমান হস্তীর পৃষ্ঠে আরোহণ করিলাম; আবার হস্তিপার্শ্ব-

বিলম্বিত ঘন্টিকা হইতে মধুর নিক্কণ নিঃসৃত হইতে লাগিল; আবার সেইরূপ পর্ব্বতের অপর পার্শ্বের ঢালু দিয়া আমরা শান্তভাবে নামিতে লাগিলাম এবং ক্রমশ একটা লালপাথরের গুহার মধ্যে প্রবেশ করিলাম;—হঠাৎ আমাদের মাথার উপর একটা ছায়া আসিয়া পড়িল। কতকগুলা ঘোড়সোয়ার আমাদের সম্মুখ দিয়া যাইতেছিল; হাতী দেখিয়া তাহাদের ঘোড়া ভড়্‌কাইয়া লাফালাফি করিতে লাগিল; একটা উট হঠাৎ মাথা-ঝাঁকানি দেওয়ায় উটের সোয়ার উষ্ট্রপৃষ্ঠ হইতে ভূতলে পতিত হইল। এই হাতীর দেশে এমন কোন জীবজন্তু নাই যে, হাতীর পাশ দিয়া গেলে ভয় না পায়।

যে গুহাপথ দিয়া আমরা নামিতেছি, এই পথটি বড়-বড় প্রস্তরপ্রতিমায় সমাচ্ছন্ন *। এই গুহাটি তীর্থঙ্কারদিগের প্রকাণ্ড প্রতিমাসমূহের নিবাস-ভূমি;—এই সমস্ত মূর্ত্তি পর্ব্বতগাত্র হইতে খুদিয়া বাহির করা হইয়াছে; কুলুঙ্গির মধ্যে, গুহার মধ্যে, কোন মূর্ত্তি উপবিষ্ট, কোনটি বা দণ্ডায়মান। বিশ-ফিট্ উচ্চ, সম্পূর্ণরূপে নগ্ন; সে নগ্নতায় কোন খুঁটিনাটিই বাদ যায় নাই—এমন কি, অশ্লীলতার মাত্রায় উপনীত হইয়াছে। উপত্যকার এক পার্শ্ব হইতে অপর পার্শ্ব পর্য্যন্ত এই সকল মূর্ত্তি অধিষ্ঠিত;—আমরা তাহার মধ্য দিয়া চলিয়াছি।

ষোড়শ শতাব্দীতে, প্রতিমাধ্বংসী মোগলসৈন্য এই পথ দিয়া—এই সকল মূর্ত্তির মধ্য দিয়া যাত্রা করিবার সময়, কাহারও মস্তক, কাহারও পুরুষাঙ্গ, কাহারও হস্ত ভাঙ্গিয়া ফেলে। এইরূপে সকল মূর্ত্তিগুলিই ছিন্নাঙ্গ হইয়া রহিয়াছে। †

---

* পরেশনাথ ও তীর্থঙ্কার আদিনাথের প্রতিমা সর্ব্বাপেক্ষা বড়। অনাদিনাথ জৈনধর্ম্মের প্রবর্ত্তক। এই প্রতিমাগুলি ১৫ শতাব্দীর অধিক প্রাচীন নহে।

† ১৫২৭ খৃষ্টাব্দে মোগল-বাদশা বাবর এইরূপ অঙ্গচ্ছেদ করিবার হুকুম জারি করেন।

ঐ অদূরে—যে তপ্তধূলার কুজ্ঝটিকায় সমস্ত দেশ আচ্ছন্ন—সেই কুজ্ঝটিকার মধ্য দিয়া আবার যেন এইরূপ কতকগুলি মূর্ত্তি দেখিতে পাইলাম।···অন্যান্য উপত্যকা—অন্যান্য গণ্ডশৈল আমাদের নেত্রসমক্ষে ক্রমশ উদ্ঘাটিত হইল। সেখানেও এই সকল মূর্ত্তি সারিসারি চলিয়াছে, ইহাদের আর শেষ নাই। সমস্ত আকাশে যেন একপ্রকার ভস্মরাশি বিলম্বিত এবং সূর্য্যের জ্বলন্ত কিরণ সর্ব্বত্রই দীপ্যমান। এই উত্তাপ ও মধুরনাদী ঘন্টিকার প্রশান্ত নিক্বণ আমার নিদ্রাকর্ষণ করিতেছে; যতই আমরা নীচে নামিতেছি, ততই যেন সমস্তের উপর একটা আবরণ পড়িয়া যাইতেছে; এইরূপ আধ-ঘুমন্ত অবস্থায় আমরা ঢুলিতে-ঢুলিতে চলিয়াছি; এই বিরাট্ মূর্ত্তিগুলার রূপ একটু-একটু করিয়া অস্পষ্ট হইতে লাগিল;—ক্রমে মন হইতে একেবারেই তিরোহিত হইল।

মাদ্রাজে থিওসফিষ্টদের গৃহে।

"স্বর্গ বিনা ঈশ্বর, আত্মা বিনা অমরত্ব, প্রার্থনা বিনা চিত্তশুদ্ধি"...

আমাদের কথাবর্ত্তা যখন থামিয়া গেল, চরম সিদ্ধান্তের আকারে পরিব্যক্ত উপরি-উক্ত বীজমন্ত্রটি, ঘোর নিস্তব্ধতার মধ্যে, বিষাদগম্ভীরস্বরে আমার কর্ণে যেন ক্রমাগত ধ্বনিত হইতে লাগিল।

গৃহটি নির্জ্জন;—ময়দানের উপর, নদীর ধারে, তালীবন ও অপরিচিত একপ্রকার বৃহৎ-জাতীয় পুষ্পরাশির মধ্যে অবস্থিত, এবং সন্ধ্যার বিষাদ-চ্ছায়ায় আচ্ছন্ন। তখন আমরা গৃহের পুস্তকাগারে ছিলাম। জান্‌লা-শাশির মধ্য দিয়া ঘরটিতে এখনো বেশ আলো আসিতেছিল; অল্পে-অল্পে আলো কমিয়া আসিল; শাশির রঙিন কাচখণ্ডের উপর যে সব স্বচ্ছপ্রভ ক্ষুদ্র চিত্র ছিল, তাহা ক্রমশ বিলীন হইয়া গেল;—সমস্ত মানবীয় ধর্ম্মমতের

বাহ্যচিহ্নের এই চিত্রগুলি যেন একটা জাদুঘরে একত্র সংরক্ষিত হইয়াছে;—খৃষ্টের ক্রুস্, সলোমনের মোহর, জিহোবার ত্রিকোণ, শাক্যমুনির পদ্ম, মহাদেবের ত্রিশূল, মিশরদেশীয় আইসিস্‌দেবের চিহ্নাবলী। ইহা মাদ্রাজস্থ থিওসফিষ্টদিগের গৃহ। আমি থিওসফিষ্টদিগের সম্বন্ধে অনেক আশ্চর্য্য কথা শুনিয়াছিলাম। যদিও আমি সে-সব কথায় বিশ্বাস করি নাই, তবু মনে করিলাম,—দেখি না কেন, উঁহাদের নিকটে যদি কোন আশার কথা শুনিতে পাই। এই আমার শেষ চেষ্টা। কিন্তু উঁহারা আমাকে কি দিতে চাহিলেন, শোনোঃ—বৌদ্ধধর্ম্মের সেই সুবিদিত হৃদয়হীন উদাসীনভাবের কথা,—"আমার নিজের জ্ঞানালোক!"

—"প্রার্থনা?" তাঁহারা বলিলেন—"প্রার্থনা শুনিবে কে?...মানুষের দায়িত্ব মানুষের নিজের কাজেই। মনুবচন স্মরণ করিয়া দেখ,—'মনুষ্য একাই জন্মগ্রহণ করে, একাই জীবিত থাকে, একাই মৃত হয়, কেবল ধর্ম্মই তাহার অনুগমন করে'...তবে প্রার্থনা শুনিবে কে? কাহার নিকট প্রার্থনা করিবে, তুমি যখন নিজেই ঈশ্বর? তোমার আপনার নিকটেই প্রার্থনা করিতে হইবে—তোমার নিজ কর্ম্মের দ্বারা।"

আমাদের মধ্যে একটা গভীর নিস্তব্ধতা আসিয়া পড়িল; এরূপ বিষাদময় নিস্তব্ধতা আমার জীবনে কখন দেখি নাই। সব নিস্তব্ধ—কেবল শূন্য আকাশে এক একটি করিয়া পাতা ঝরিয়া পড়িতেছে, তাহারই অস্পষ্ট মৃদু শব্দ শুনা যাইতেছে; মনে হইল,—যাঁহাদের সহিত আমার কথাবার্ত্তা হইতেছিল, তাঁহাদের নিশ্বাসবায়ুতে আমার মনের মধুর ও অস্পষ্ট বিশ্বাস-গুলি যেন একে-একে ঝরিয়া পড়িতেছে। কিন্তু তাঁহারা স্বকীয় যুক্তি-বিচারে অটল,—স্বকীয় সিদ্ধান্তে বেশ সন্তুষ্ট।

যে দুইটি লোকের সহিত আমার কথা হইতেছিল, দুজনেই বেশ এদিকে আতিথেয়, সহৃদয় ও আদর-অভ্যর্থনায় সুপটু। প্রথমটি য়ুরোপীয়,—আমাদিগের নানাপ্রকার আন্দোলন ও অনিশ্চিততায় শ্রান্তক্লান্ত হইয়া ইনি

বুদ্ধপ্রবর্ত্তিত সন্ন্যাস অবলম্বন করেন, এবং এক্ষণে থিওসফিষ্টসভার সভাপতি হইয়াছেন; অন্যটি একজন হিন্দু;—আমাদের য়ুরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধি অর্জ্জন করিয়া ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন এবং এক্ষণে ইনি আমাদের পাশ্চাত্যদর্শনাদি কতকটা অবজ্ঞার চক্ষে দেখিয়া থাকেন।

আমি উত্তর করিলাম,—"তুমি বলিতেছ, আমাদের অন্তরস্থ কোন-এক পদার্থ,—আমাদের ক্ষণস্থায়ী ব্যক্তিত্বের একটু অংশ,—কিয়ৎকালের জন্য মৃত্যুর আঘাতকে প্রতিরোধ করে, তাহার অকাট্য প্রমাণ তোমরা পাইয়াছ। অন্তত এই অকাট্য প্রমাণটি কি, তুমি আমাকে দেখাইতে পার?"...

তিনি বলিলেন,—"যুক্তির দ্বারা আমরা তাহা সপ্রমাণ করিব; কিন্তু চাক্ষুষ প্রমাণ যদি চাহ, তাহা আমরা দিতে পারিব না...যাহাদিগকে লোকে অযথারূপে মৃত বলে—(কেন না, আসলে কেহই মরে না) সেই মৃত ব্যক্তিকে দেখিবার জন্য বিশেষ ইন্দ্রিয় আবশ্যক, বিশেষ অবস্থা ও বিশেষ মানসিক প্রকৃতি আবশ্যক। কিন্তু আমাদের কথায় তুমি বিশ্বাসস্থাপন করিতে পার; আমরা দেখিয়াছি এবং আমাদের ন্যায় বিশ্বাসযোগ্য আরো অন্য লোকে মৃতব্যক্তিদিগের অপচ্ছায়া দেখিয়াছে এবং তাহার সমস্ত পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছে। দেখ, এই পুস্তকাগারের এই সকল পুস্তকে ঐ সমস্ত বিবরণ পাওয়া যায়—কাল যখন তুমি আসিয়া আমাদিগের সঙ্গে বাস করিবে, তখন এই সকল পুস্তক পাঠ করিও।"...

আমি তবে কেন এত কষ্ট করিয়া ভারতে আসিলাম,—যে ভারত সমস্ত মানবীয় ধর্ম্মমতের পুরাতন আদিমনিবাস—যদি এই পুস্তকাগারের পুস্তকেই সমস্ত কথা জানা যাইতে পারে; মন্দির সমূহের মধ্যে,—ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম পৌত্তলিকতার অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন; আর এখানে,—শাক্যমুনিকৃত এক প্রকার প্রত্যক্ষবাদের (Positivism) নব-সংস্করণ এবং সমস্ত পৃথিবী হইতে সংগৃহীত প্রেতবাদের কতকগুলা গ্রন্থ দেখা যাইতেছে।...

আরো খানিকটা নিস্তব্ধতার পর, আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—মনে-মনে বুঝিতেছি, এবার আমি ছেলেমানুষি-কৌতুহলের নিম্নভূমিতে নামিয়া আসিতেছি—তাই ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করিলাম ;—"আপনারা কি সাধু সন্ন্যাসীদিগের সন্ধান আমাকে বলিতে পারেন,—ভারতের সেই-সব সাধু-সন্ন্যাসী, যাঁহারা সিদ্ধপুরুষ বলিয়া প্রখ্যাত, যাঁহারা নানাপ্রকার অদ্ভুতকার্য্য এমন কি, অলৌকিক কার্য্য সাধন করিতে পারেন ; অন্তত তাহা হইলে ইহা সপ্রমাণ হইতে পারে যে, এখানে এমন কিছু আছে, যাহা আমাদের বুদ্ধির অতীত—যাহা অতিভৌতিক, যাহা অতিমানুষিক।"

আমার সম্মুখে যে হিন্দুটি বসিয়াছিলেন, তিনি তাঁহার তাপসসুলভ নেত্রদ্বয় ঊর্দ্ধে তুলিলেন ; একটা মুখভঙ্গীর দ্বারা তাঁহার সূক্ষ্ম ও কঠোর মুখমণ্ডল সঙ্কুচিত হইল ; তাঁহার মুখটি যেন শাদা পাগ্‌ড়ি দিয়া ঘেরা 'দান্তে'র (Dante) মুখস্‌।

—"সাধু-সন্ন্যাসী ?—সাধু-সন্ন্যাসী ? সাধু-সন্ন্যাসী এখন আর নাই"—তিনি উত্তর করিলেন।

এই বিষয়ে যাঁহার বিশেষ জ্ঞান আছে, তাঁহারই মুখে যখন শুনিলাম, সেরূপ সাধু-সন্ন্যাসী এখন আর নাই,—তখন এই পৃথিবীতেই যে অলৌকিক কাণ্ড দেখিব বলিয়া আশা করিয়াছিলাম, সে আশা আর রহিল না।

—"বারাণসীতেও নাই ?"—আমি এই কথা ভয়ে-ভয়ে জিজ্ঞাসা করিলাম। আমি আশা করিয়াছিলাম বারাণসীতে...আমি শুনিয়াছিলাম...

আমি "বারাণসী" এই নামটি উচ্চারণ করিতে ইতস্তত করিতেছিলাম; কেন না, ঐটি আমার 'হাতের রেস্তোর' শেষ তাস ; যদি সেখানে গিয়াও কিছু দেখিতে না পাই।...

—"শোনো বলি। ভিক্ষু-সন্ন্যাসী, চেতনাহীন সন্ন্যাসী, হঠযোগসিদ্ধ অঙ্গবিক্ষেপকারী সন্ন্যাসী এখনো অনেক রহিয়াছে ; তাহাদিগকে দেখিবার জন্য আমাদের সাহায্য তোমার প্রয়োজন হইবে না। কিন্তু যাঁহারা প্রকৃত

সিদ্ধপুরুষ, যাঁহারা অষ্টসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, সেইরূপ কতকগুলি সন্ন্যাসীকে আমরা জানি। এ বিষয়েও আমাদের কথার উপরেই তোমার বিশ্বাসস্থাপন করিতে হইবে। সেরূপ সন্ন্যাসী এক সময়ে ভারতে ছিলেন, কিন্তু এই শতাব্দীর অবসানের সঙ্গে-সঙ্গেই তাঁহারা তিরোহিত হইয়াছেন। ভারতের সেই পুরাতন যোগিভাব আর নাই। জড়বিজ্ঞানবাদী রাজসিক পাশ্চাত্য জাতির সংসর্গে আমাদের অবনতি হইয়াছে; পাশ্চাত্য লোকেরাও আবার এক সময়ে অবনতি প্রাপ্ত হইবে; এই অবনতির হস্তে আমরা নিশ্চিন্তভাবে আত্মসমর্পণ করিয়া দিয়াছি; কেন না, ইহাই জগতের অবশ্যম্ভাবী নিয়ম।...হাঁ, আমাদের দেশে সিদ্ধপুরুষ যোগিসন্ন্যাসী এক সময়ে ছিলেন; এই দেখ না, আল্‌মারির এই তক্তাটি শুধু তাঁহাদের বিবরণঘটিত হস্তলিপি পুথির জন্য সংরক্ষিত।"...

জান্‌লা-শাশির উপর চিত্রিত মাননীয় সমস্ত ধর্ম্মসম্প্রদায়ের বিশেষ চিহ্নগুলি অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে, এই কঠোর পুস্তকাগারে একেই ত একটু বিষাদময় অন্ধকার ছিল, তাতে আবার রাত্রি হওয়ায়, আরো ঘোর অন্ধকারে ইহা আচ্ছন্ন হইল। থিওসফিষ্টদিগের সহিত দীর্ঘকাল বাস করিব মনে করিয়া আমি মাদ্রাজে আসিয়াছিলাম; কল্য হইতে তাঁহাদের গৃহে আমার থাকিবার কথা; কিন্তু আজ সায়াহ্নে আমি মাদ্রাজ ছাড়িয়া চলিয়া যাইব স্থির করিয়াছি, আর ফিরিয়া আসিব না। এই নাস্তিত্ব ও শূন্যবাদের কঠোর আশ্রমে বদ্ধ হইয়া থাকিব কিসের জন্য? বরং যেরূপ চিরজীবন করিয়া আসিয়াছি, এই পৃথিবীর বিচিত্র পদার্থ দেখিয়া আমার নেত্রবিনোদন করিব; এই পদার্থগুলি ক্ষণস্থায়ী হইলেও, অন্তত এক মুহূর্ত্তের জন্যও বাস্তব। তা ছাড়া, অমরত্বসম্বন্ধে তাঁহাদের যেরূপ ধারণা, সেরূপ অমরত্বের প্রমাণ পাইলেই বা কি যায়-আসে? একবার যাহারা বাস্তবিক ভালবাসিয়াছে, দেহের বিনাশ কল্পনা করাও তাহাদের পক্ষে বিষম যন্ত্রণা। যে অমরত্বে তাহারা সন্তুষ্ট, আমাদের মত লোক সেরূপ অমরত্ব লইয়া

কি করিবে? খৃষ্টানদিগের যাহা ধ্যানের বিষয়, আমি সেইরূপ অমরত্ব চাই;—আমি চাই আমার আমিত্ব, আমার নিজত্ব, আমার বিশেষত্বটুকু বরাবর থাকিয়া যাইবে; আমি যাহাদের ভালবাসিতাম, তাহাদিগকে আবার আমি দেখিতে পাইব—পূর্ব্বের মতই তাহাদিগকে ভালবাসিব, তাহা না হইলে আর কি হইল?

আমি যখন আবার নগরের পথ ধরিয়া চলিতে লাগিলাম, তখন কাকেরা মহা-কোলাহল আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। সকলে মিলিয়া মৃত্যুর গান গাহিতেছে; এই সময়ে নিদ্রা যাইবার জন্য তাহারা দলে-দলে বৃক্ষশাখায় বসিয়া গিয়াছে। বরাবর সমস্ত পথটায়, বট ও তালবৃক্ষের তলদেশে, গজমুণ্ডধারী গণেশের ছোট-ছোট মূর্ত্তি সন্ধ্যালোকে দেখা যাইতেছে। যে সকল লোকের নিকট হইতে আমি চলিয়া আসিলাম, তাহাদের মতবাদটি এই সকল বিগ্রহেরই ন্যায় নিতান্ত শিশুজনোচিত ও অকিঞ্চিৎকর।

সন্ধ্যাব সময়, ঐ সকল থিওসফিষ্টদিগের নিকট আমার অসম্মতিসূচক পত্র পাঠাইলাম। তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ জানাইলাম, আর বলিলাম, "আমি যত শীঘ্র পারি, মাদ্রাজ ছাড়িব বলিয়া স্থির করিয়াছি; তাই শেষবিদায় লইবার জন্য কাল আমি তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিব।"

যাহাদিগকে আমি খুব ভালবাসিতাম, রাত্রির স্বপ্নে আমার সেই সব মৃত প্রিয়জনদিগকে আমি পুনর্ব্বার দর্শন করিলাম; আমার শৈশবের সেই পুরাতন বিকৃতভাবাপন্ন অশুভদর্শন বাসভবনের মধ্যে সেই পাণ্ডুবর্ণ গলিত মূর্ত্তিগুলি দেখিলাম। আর এক রাত্রি,—যেরূপ জেরুস্থালেমে আমার ঘটিয়াছিল—যে সময়ে আমার প্রথমকালের বিশ্বাসগুলি চিরকালের মত ভাঙিয়া যায়—সেই রাত্রির মত আজও সমস্ত রাত্রি অশেষপ্রকার বিষাদের চিন্তা, দুর্নিবার ভয়ের চিন্তা, একটার পর একটা, মনোমধ্যে ক্রমাগত উদয় হইতে লাগিল; তাহার পর যেই প্রভাত হইল, অমনি একটা

দাঁড়কাক আমার ঘরের জান্‌লায় বসিয়া, উদয়োন্মুখ সূর্য্যের সমক্ষে মৃত্যুগান গাহিয়া আমাকে জাগাইয়া দিল।

অপরাহ্নে, বিদায় লইবার জন্য থিওসফিষ্টদিগের সহিত আবার সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। থিওসফিষ্টদিগের দলপতি আমার পত্র পাইয়া সমস্ত ব্যাপারটা বুঝিয়াছিলেন, তথাপি তিনি স্নেহপূর্ণ মধুরভাবে আমাকে আদরঅভ্যর্থনা করিলেন; আমি এরূপ অভ্যর্থনা প্রত্যাশা করি নাই।

অনেকক্ষণ হস্তে হস্ত চাপিয়া তিনি বলিলেন—"খৃষ্টান, আমি ভাবিয়াছিলাম, তুমি বুঝি নাস্তিক!

"বুদ্ধদেব আমাদের জন্য যে সকল জড়বিজ্ঞানবাদের উপদেশ রাখিয়া গিয়াছেন, আমি তোমার নিকট তাহারই ব্যাখ্যা করিয়াছিলাম; কেন না, সাধারণত এইরূপভাবেই আমরা আরম্ভ করি— তোমার আত্মার যেরূপ প্রকৃতি দেখিতেছি, তাহাতে তোমার পক্ষে গুহ্যাঙ্গের ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মই উপযোগী; আর সে গুহ্যতন্ত্র আমাদের অপেক্ষা আমাদের বারাণসীর বন্ধুগণ ভাল জানেন; তুমি যে প্রার্থনা-উপাসনাদির কথা বলিতেছিলে,—কোন-না-কোন আকারে তুমি সেইখানেই তাহা প্রাপ্ত হইবে; কিন্তু শুধু প্রার্থনা-উপাসনাদি করিলেই যথেষ্ট হইবে না, পুণ্যসঞ্চয় করিবার জন্যও তাঁহারা তোমাকে উপদেশ করিবেন—'অন্বেষণ করিলেই প্রাপ্ত হইবে'; আমি ৪০ বৎসর যাবৎ অন্বেষণ করিয়াছি; তুমি সাহসপূর্ব্বক আরো কিছুকাল অন্বেষণ কর। আমাদের মধ্যে তুমি থাকিবার চেষ্টা কর;—না না, যাও! —আমাদের শিক্ষাদীক্ষা তোমার উপযোগী হইবে না।" তাহার পর একটু হাসিয়া বলিলেন—"তা ছাড়া, এখনো তোমার সময় আসে নাই; এখনো তুমি সংসারের ভীষণ মায়াপাশে আবদ্ধ।

—"বোধ হয় তাই।"

"তুমি অন্বেষণ করিতেছ, কিন্তু অন্বেষণ করিয়া পাছে তুমি কিছু পাও, সেজন্যও তোমার ভয় হইতেছে।"

—"তাই বোধ হয়।"

"আমরা তোমাকে ত্যাগের কথা বলিতেছি, আর তুমি কিনা ভোগের বাসনা করিতেছ!—তবে তুমি ভ্রমণই কর; যাও, দিল্লি দেখিয়া আইস, আগ্রা দেখিয়া আইস; যাহা তোমার ইচ্ছা হয়, যাহা তোমার ভাল লাগে, যাহাতে তোমার আমোদ হয়, তাহাই কর। শুধু এইটুকু আমাদের নিকট অঙ্গীকার কর যে, ভারত হইতে চলিয়া যাইবার পূর্ব্বে তুমি আমাদের বারাণসীর বন্ধুদিগের নিকট গিয়া কিছুকাল বিশ্রাম করিবে; আমরা তাঁহাদিগকে সংবাদ দিব, এবং তাঁহারা তোমার জন্য প্রতীক্ষা করিয়া থাকিবেন।"

যে হিন্দুটিকে আমি কাল দেখিয়াছিলাম, তিনি নিস্তব্ধ ছিলেন; তিনিও অনুকম্পার স্মিতহাস্য মুখে প্রকটিত করিয়া অতীব মধুর দৃষ্টিতে আমাকে দেখিতেছিলেন। এই সময়ে এই বিভিন্নজাতীয় তাপসযুগলকে সহসা অতীব উন্নত, অতীব নমনীয়, অতীব রহস্যময় ও বুদ্ধির অগম্য বলিয়া আমার মনে হইতে লাগিল। সহসা তাঁহাদের এরূপ পরিবর্ত্তন কেন হইল বুঝিতে না পারিয়া, আমি বিশ্বস্তভাবে ও কৃতজ্ঞচিত্তে তাঁহাদের নিকট আমার মস্তক অবনত করিলাম।

ভারত ছাড়িয়া যাইবার পূর্ব্বে, উঁহাদের বারাণসীর বন্ধুদিগের গৃহে কিছুকাল অবস্থিতি করিতে হইবে,—বেশ ত! সে ত ভাল কথাই! আমি আনন্দের সহিত এ প্রস্তাবে সম্মতি দিলাম। আমার মনে কেমন-একটা অগ্রসূচনা উপস্থিত হইল যে, সেখানকার আধ্যাত্মিক হাওয়াই আমার উপযোগী হইবে।

সর্ব্বশেষে বারাণসী; উহাকে এখন আমি হাতে রাখিলাম। আমার ভয় হয়, পাছে কোন অকাট্য প্রমাণ পাইয়া দুইটি বিভীষিকার মধ্যে একটি বিভীষিকাকে আমার গ্রহণ করিতে হয়। হয়—চিরকালের মত ব্যর্থ-মনোরথ হইব; নয়—অন্বেষণ করিয়া কিছু পাইব; যদি পাই, তাহা হইলে

আমার জীবনে একটা নূতন পথ উন্মুক্ত হইবে,—আমার মধুর মরীচিকা-গুলি অন্তর্হিত হইবে।—

গোধূলি-আলোকে জগন্নাথমন্দির।

ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের পীঠস্থান একটি পুরাতন নগরে, সমস্ত হইতে দূরে, সৈকতভূমি ও বালুকাস্তূপের মধ্যে, বঙ্গোপসাগরের ধারে, জগন্নাথের বিরাট্ মন্দির অধিষ্ঠিত।

ভারতের মধ্যদেশ হইতে যাত্রা করিয়া, সূর্য্যাস্তসময়ে এইখানে আসিয়া পৌঁছিলাম। আমার গাড়িটা সহসা নিঃশব্দ হইল,—যেন মখ্‌মলের উপর দিয়া চলিতে লাগিল;—আমরা এখন বালুরাশির মধ্যে আসিয়াছি। নিঃশব্দতা-দ্বারা জানাইয়া-দিয়া, নীল রেখার আকারে সমুদ্র আমাদের সম্মুখে প্রকাশিত হইল।

বালুকাস্তূপরাশির উপর, ক্যাক্টস্ (cactus)-ঝোপের ভিতরে, প্রথমে ধীবরদিগের কতকগুলি ইতস্ততোবিক্ষিপ্ত কুটীর। তাহার পরেই জগন্নাথের মন্দির দৃষ্টিপথে পতিত হইল। তালপাতায়-ছাওয়া হাজার-হাজার ধূসরবর্ণ খোড়ো-ঘরের ঊর্দ্ধে,—রাশি-রাশি কোঠাবাড়ীর মধ্যে, মন্দিরের চূড়াটি সমুত্থিত; বিশেষত এই সামুদ্রিক ভূভাগে, আকাশভেদ করিয়া মন্দিরচূড়া অতি উচ্চে উঠিয়াছে বলিয়া, মন্দিরের এই দৃশ্যটি অতীব অপূর্ব্ব; চতু-ষ্পার্শ্বের আর সমস্ত পদার্থ উহার পাদদেশে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র বলিয়া মনে হইতেছে। চূড়ার আকারটি দীর্ঘ এবং উহার মাঝখানটা যেন ফুলিয়া উঠিয়াছে;—যেন একটা কুম্ভীরের অণ্ডকে—একটা বৃহদাকার অণ্ডকে—মাটীর উপর দাঁড় করান হইয়াছে। চূড়াটি শুভ্র; তাহার উপর ইষ্টক-গোলাপী রঙের একপ্রকার শিরাজাল, ইহা ভিন্ন আর-কোন অলঙ্কার নাই। চূড়ার উপরে যে-সকল পিতলের চাকৃতি ও সূচ্যগ্র তাম্রখণ্ড ভল্ল-মুকুটরূপে শোভা পাইতেছে, সে সমস্ত গণনার মধ্যে না আনিলেও চূড়াটি দুইশত ফীট্

উচ্চ। গঙ্গামোহানার অন্বেষণে, জাহাজগুলা যখন বহিঃসমুদ্র দিয়া চলিতে থাকে, তখন এই মন্দিরটি তাহাদের নজরে পড়ে; এবং সামুদ্রিক নকসায়, দিগ্‌দর্শনের চিহ্নরূপে ইহা অঙ্কিত রহিয়াছে। কিন্তু এই স্থানের উপকূলে নোঙর ফেলিবার সুবিধা নাই; সুতরাং নাবিকগণ, দূর দিগন্তপটে অঙ্কিত একটি চিত্র ভিন্ন, এই পুরাতন মন্দিরসম্বন্ধে আর কিছুই অবগত নহে।

একটা চওড়া ও সোজা রাস্তা মন্দির পর্য্যন্ত গিয়াছে। যে সময়ে আমি পৌঁছিলাম, রাস্তাটা লোকে লোকাকীর্ণ। কিন্তু এখানকার ভারত যেন একটু বন্যভাবাপন্ন;—বিদেশীকে দেখিলে এখনো যেন বিস্মিত হয়;—বিদেশীকে দেখিবার জন্য পথপরিবর্ত্তন করে, শিশুরা পিছনে-পিছনে চলিতে থাকে। নগ্ন লোকগুলা, সমুদ্রবায়ুর প্রভাবে একটু কালো হইয়া গিয়াছে; মল্‌মল্‌-ওড়নায় আচ্ছাদিত রমণীগণের পায়ে এত অধিক মল্‌-নূপুর যে, তাহার ভারে তাহাদের গমন মন্থর হইয়া পড়িয়াছে; হস্তের প্রকোষ্ঠ হইতে স্কন্ধ পর্য্যন্ত এত অধিক বলয়-বাজুবন্ধ যে, দেখিলে মনে হয়, যেন তাহাদের সমস্ত হাত আগাগোড়া একটা রৌপ্য কিংবা তাম্রকোষের মধ্যে আবদ্ধ। এখানকার কোন ক্ষুদ্র গৃহই রঙের চিত্রে একেবারে আচ্ছন্ন নহে; গৃহের চুনকাম-করা শুধু মুখভাগের উপর দেবদেবীর মূর্ত্তি অঙ্কিত; কাহারও দেহ নীল, কাহারও দেহ লাল, কাহারও মুখে নিষ্ঠুরভাব—এইরূপ সারি-সারি বরাবর চলিয়াছে; Thebes কিংবা Memphis—নগরের "ফ্রেস্‌কো" চিত্রে যেরূপ মূর্ত্তিগুলি সজ্জিত, ইহা কতকটা সেই ধরণের। তা ছাড়া, গৃহের গঠনরীতি মিশরকে স্মরণ করাইয়া দেয়—সেইরূপ অনুচ্চ ও স্থূল ধরণের, সেইরূপ পোস্তার গাঁথুনি, সেইরূপ থাম, সেইরূপ গুরুভার দেয়াল—যাহা ভারাতিশয্যে পশ্চাতে ঝুঁকিয়া রহিয়াছে।

মন্দিরটি একটি বিশাল ভীষণ দুর্গবিশেষ; চতুষ্পার্শ্বে উচ্চ দস্তুর

চতুষ্কোণ প্রাকার; প্রত্যেক পার্শ্বের মধ্যস্থলে একএকটি দ্বার। যে রাস্তা দিয়া আমরা এখন পদব্রজে চলিতেছি, মন্দিরের প্রধান দ্বারটি সেই রাস্তার ঠিক সোজাসুজি। দ্বারের দুই পার্শ্বে দুইটা প্রকাণ্ড প্রস্তরময় পশুমূর্ত্তি; পশুর চোখদুটা গোলাকার, নাক থ্যাবড়া ও মুখের 'হাঁ' ভীষণ। এই দুই পশুমূর্ত্তির মাঝখান দিয়া একটি বৃহৎ শুভ্র সোপান মন্দিরের উপর উঠিয়াছে; সোপানের ধাপগুলা শ্যামবর্ণ নগ্নকায় লোকদিগের যাতায়াতে ভারাক্রান্ত।

বলা বাহুল্য, এই মন্দিরে আমার প্রবেশাধিকার নাই। মন্দিরের সম্মুখস্থ সানের উপর যেই আমি ধৃষ্টতাসহকাবে পদার্পণ করিয়াছি, অমনি কতকগুলি পুরোহিত আমাকে একটু পিছনে হটিয়া যাইতে—একটু দূরে গিয়া সেই বালির উপর দাঁড়াইতে অনুনয় করিল—যাহার উপর সকলেরই অধিকার আছে;—সমুদ্রের সেই বেলাভূমি,—সমুদ্রের সেই বালুকারাশি, যাহাতে করিয়া জগন্নাথপুরীর সমস্ত রাস্তা তূলাভরা গদির মত 'থস্থসে' বলিয়া মনে হয়।

কিন্তু এই চতুষ্কোণ ভীষণ প্রাকারটি লঙ্ঘন করিয়া ভিতরে যাইতে না পারিলেও উহা প্রদক্ষিণ করিবার আমার অধিকার আছে। ঐ প্রাকারের প্রত্যেক দিকে বরাবর একএকটা বীথি চলিয়া গিয়াছে; তাহার দুই ধারে শুষ্ক মৃত্তিকানির্ম্মিত গৃহাবলী। এই পুরাতন গৃহগুলা গুরুভার ঘন-পিণ্ডাকৃতি; উহার দেয়াল ভিতর-দিকে ঝোঁকা; গৃহের মুখভাগের উপর সারি-সারি দেবদানবের প্রতিকৃতি প্রায়ই নীল ও লাল রঙে চিত্রিত, তাহার শিখরদেশে যে বারণ্ডা স্থাপিত—সেই বারণ্ডা পর্য্যন্ত একটা ক্ষয়গ্রস্ত সিঁড়ি উঠিয়াছে। এই সময়ে সায়াহ্নের শৈত্য-মাধুর্য্য উপভোগ করিবার জন্য রজতবলয়বিভূষিতা হিন্দুরমণীগণ ঐ বারণ্ডায় বসিয়া সমস্ত নিরীক্ষণ করিতেছে, অথবা আপন-আপন ভাবে ভোর হইয়া রহিয়াছে। ওড়নার ভাঁজের মধ্য হইতে তাহাদিগকে বড়ই সুন্দর দেখাইতেছে।

যে সময়ে আমি মন্দির প্রদক্ষিণ করিতেছি, কতকগুলি ক্ষুদ্র বালিকা

আমার পিছনে-পিছনে চলিয়াছে; অক্লান্ত তাহাদের কৌতূহল। উহাদের যে সর্দ্দার, তাহার বয়স হদ্দ ৮ বৎসর, সকলেই বেশ সুন্দর-সুশ্রী; তাহাদের নেত্রযুগল কজ্জলরেখায় দীর্ঘীকৃত হইয়া কৃষ্ণকুন্তলে মিশিয়া গিয়াছে; তাহাদের দৃষ্টি অতীব সরল। তাহাদের কানে সোনার কানবালা, নাকে নথ্।

রাত্রির পূর্ব্বেই বহুল যাত্রীর সমাগম হইবে জানিয়া, আমি সেই প্রতীক্ষায় ধীরে-ধীরে মন্দির প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলাম। মন্দিরের পশ্চাদ্ভাগে, বীথিটি খুবই নির্জ্জন। যদি এই বালিকাগুলি আমার পথের সাথী হইয়া আমার সঙ্গে-সঙ্গে না থাকিত, তাহা হইলে এই বীথিটি আরও বিষাদময় বলিয়া বোধ হইত, সন্দেহ নাই। উহারা আমার দুইফীট্ অন্তরে থাকিয়া সঙ্গে-সঙ্গে চলিয়াছে; আমি যেখানে থামিতেছি, উহারাও সেইখানে থামিতেছে; যখন আমি দ্রুত চলিতেছি, উহারাও নূপুর ঝঙ্কৃত করিয়া দীর্ঘপদক্ষেপে চলিতেছে।

গোলাপী রেখা-জালে বিভূষিত বৃহৎ মন্দিরচূড়াটি বরাবরই আমা হইতে সমান দূরে রহিয়া যাইতেছে; কেন না, উহা প্রাচীরবদ্ধ চতুষ্কোণ প্রাঙ্গণের কেন্দ্রবর্ত্তী; উহা আমার অলঙ্ঘনীয়; আমি উহার চতুর্দ্দিক্ প্রদক্ষিণ করিতেছি মাত্র। কিন্তু আরও অন্য কতকগুলি ছোট-ছোট মন্দির ভিতরদিকে প্রাচীরে ঠেস্ দিয়া রহিয়াছে,—সেই সকল মন্দির আমি নিকট হইতে দেখিতে পাইতেছি। এই সকল মন্দিরের চূড়া কুষ্মাণ্ডাকৃতি অথবা কুম্ভীরের অণ্ডের ন্যায়,—কিন্তু একটু কালিমাগ্রস্ত, 'ফাট্-ধরা' ও অতীব জরাজীর্ণ। কেবল মধ্যস্থলের বৃহৎ মন্দিরচূড়াটি—যাহা দূর হইতে দেখা যায়,—তাহাই ধব্‌ধবে শাদা, ও নূতন-টাট্‌কা বলিয়া মনে হয়, কিন্তু উহার ধরণটা আমাদের একেবারেই অপরিচিত! উহার গঠন যেরূপ বর্ব্বর-ধরণের, যেরূপ 'ছেলেমানুষি'-ধরণের, উহার উপরে যেরূপ পিত্তলবিম্ব ও ঝক্‌ঝকে তিক্ষ্ণাগ্র ধাতুখণ্ড সকল দৃষ্ট হয়, তাহাতে মনে হয়,

যেন উহা অন্য গ্রহনিবাসী কিংবা চন্দ্রনিবাসী লোককর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছে। উহা বিহঙ্গকুলের আবাসস্থান। ইহারই মধ্যে উহারা সান্ধ্যভ্রমণে বহির্গত হইয়া আকাশে অবাধে ঘোরপাক্ দিতেছে।

আমি ও এই ক্ষুদ্র বালিকাগুলি—আমরা এই নিষিদ্ধ ঘেরের তৃতীয় দিকে আসিয়া পৌঁছিলাম! চতুষ্পার্শ্বের গৃহছাদ সুন্দরী রমণীগণ-কর্ত্তৃক বিভূষিত হইয়াছে; রাস্তার উপর বাজার বসিয়াছে; বাজারে রং-করা মল্‌মল্‌ বস্ত্র, শস্যদানা, ফলফুল বিক্রয় হইতেছে!

আমরা নীচে রহিয়াছি—আমাদের নিকট সূর্য্য অস্তমিত; কিন্তু বৃহৎ মন্দিরচূড়াটি সূর্য্যকে এখনো দেখিতে পাইতেছে;—উহার সমস্ত অংশই গোলাপী আভায় উদ্ভাসিত।

মনে হইল, পবিত্র বানরদিগের সান্ধ্যভ্রমণের ঠিক এই সময়। উহাদের মধ্যে প্রথমটি পবিত্র প্রাচীরের উপরে আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং প্রাচীরের একটি দন্তুর অংশের উপর উঠিয়া-বসিয়া গা চুল্‌কাইতে লাগিল। প্রাচীরের শিখরদেশে দেবদানবের ছোট-ছোট মূর্ত্তি ইতস্তত খোদিত রহিয়াছে; বানরটা যদি না নড়িত, তাহা হইলে উহাকে উহাদেরই একটি বলিয়া মনে হইত, সন্দেহ নাই। তাহার পর, আর একটা বানর বাহির হইয়া পার্শ্ববর্ত্তী অন্য এক দন্তুর-অংশের অগ্রভাগে আসিয়া বসিল; এইরূপে তিনটা, পরে চারিটা বানর আসিয়া বসিল; প্রাকারের দন্তুরাংশগুলি কপিবৃন্দে বিভূষিত হইল।

অতি শীঘ্রই বেলা পড়িয়া আসিল; ধূসর ও পুরাতন মন্দিরের শুধু চূড়ার অগ্রভাগটি গোলাপী-আভায় রঞ্জিত হইয়া রহিল। প্রাচীরের উপর,—প্রস্তরবর্ণের বানর, বানরবর্ণের ছোট-ছোট খোদিত প্রস্তরমূর্ত্তি ও শকুনি-বৃন্দ। আকাশে—কাক ও পায়রার ঝাঁক্ বৃহৎ চক্রাকারে পাক্ দিতে দিতে, ক্রমে তাহাদের কক্ষপথ সঙ্কীর্ণ করিয়া আনিয়া, চূড়াশিখরস্থ পিত্তলবিম্বের চারিধারে ঘুরিতে আরম্ভ করিল।

এইবার বানরদিগের প্রস্থান করিবার সময়। উহাদের মধ্যে একটা বানর পিছ্‌লাইতে পিছ্‌লাইতে নীচে নামিয়া মাটীর উপর লাফাইয়া পড়িল; এবং ধৃষ্টতাসহকারে রাস্তা পার হইয়া বিক্রেতাদলের মধ্যে গিয়া উপস্থিত হইল; বিক্রেতাগণ পথ ছাড়িয়া দিল। অন্য বানরগুলা তাহার পিছনে-পিছনে সারিবন্দি হইয়া চার পায়ে চলিতে লাগিল। দেখিলে মনে হয়, যেন কতকগুলা কুকুর,—কেবল পিছনের পা তাহাদের অপেক্ষা বেশী উচ্চ—ঊর্দ্ধপুচ্ছ হইয়া লাফাইতে লাফাইতে চলিয়াছে। যাইতে যাইতে প্রথম বানরটা বাজারের ঝুড়ি হইতে একটা কুল চুরি করিল; পরবর্ত্তী বানরগুলাও সেই একস্থান হইতেই ঐরূপ চুরি করিল; দোকানদার প্রতিবারই কোন আপত্তি না করিয়া তাহাদের অভিবাদন করিল। এক্ষণে উহারা চটুলভাবে একটা বাড়ীর গা বাহিয়া উঠিয়া দূরে চলিয়া গেল এবং ছাদের উপর দিয়া কোথায় অদৃশ্য হইয়া পড়িল।

বহির্দিকে, মন্দিরপ্রাকারের গায়ে, তাল-তরুর ডালপালা ও দর্ম্মা দিয়া নির্ম্মিত প্রহরিস্থানের ন্যায় একটা ঘরে পাণ্ডবের একটা মূর্ত্তি,—তুইমানুষ-প্রমাণ উচ্চ, দেখিতে ভীষণ, কৃষ্ণবর্ণ, লম্বা-লম্বা দাঁত, হাঁ করিয়া রহিয়াছে। একজন বৃদ্ধ পুরোহিত একটা পাদপীঠের উপর উঠিয়া তাহার গলায় হলদে ফুলের মালা পরাইয়া দিল; তাহার সম্মুখে একটা প্রদীপ জ্বালিল, একটা ছোট ঘণ্টা বাজাইল, প্রণাম করিল, তাহার পর একটা মশারির মধ্যে বদ্ধ করিয়া, তাহাকে আবার প্রণাম করিতে করিতে প্রস্থান করিল। কি-একটা দ্রুতগামী ও দুর্লক্ষ্য জিনিষের হাওয়া আমার মুখে লাগিল! একটা বাদুড় অসময়ে বাহির হইয়া, খুব নিম্নদেশে উড়িয়া বেড়াইতেছে; জনতার মধ্যে বেশ বিশ্বস্তভাবে যাওয়া-আসা করিতেছে।

মন্দিরচূড়ার অগ্রবিন্দুতে শেষ গোলাপী আভাটুকু এখনো রহিয়াছে; ইহাই পূজার সময়; মন্দির জনকোলাহলে ও বাদ্যনিনাদে পূর্ণ হইল। উভয়ই মিশ্রভাবে আমার কানে আসিয়া পৌঁছিল। ঐ গুপ্তস্থানের

অভ্যন্তরপ্রদেশে না জানি কি কাণ্ড হইতেছে! না জানি কোন্ প্রতিমা (অবশ্যই খুব ভীষণ) এক্ষণে সান্ধ্যপূজা গ্রহণ করিতেছে। মন্দিরেরই মত লোকদিগের যে অন্তরাত্মা আমার নিকট দুরধিগম্য, তাহা হইতে না জানি কিরূপ আকারে প্রার্থনা উত্থিত হইতেছে!...

সে যাই হোক্,—একটা বানর ভ্রমণে পরাঙ্মুখ হইয়া, নিম্নে লেজ ঝুলাইয়া, বহির্লোকের দিকে পিঠ ফিরাইয়া, মন্দিরপ্রাকারের শিখরদেশে একাকী বসিয়া আছে; এবং ঐ উর্দ্ধে, মন্দিরচূড়ার উপরে, দিবসের মুমূর্ষু দশা বিষণ্ন-ভাবে নিরীক্ষণ করিতেছে। যে সকল পায়রা ও কাক আকাশে ঘোরপাক্ দিতেছিল, এক্ষণে উহারা ঘুমাইবার জন্য মন্দিরচূড়ায় আশ্রয় লইয়াছে। ঐ প্রকাণ্ড চূড়াটার সমস্ত শিরাজাল, সমস্ত খোঁচ্খাঁচ্ এক্ষণে ঐ সকল পক্ষীর সমাগমে কালো হইয়া গিয়াছে; পাখীরা এখনো পাখার ঝাপ্টা দিতেছে। শুধু ছায়ারেখা ছাড়া বানরটার আর-কিছুই এখন আমি দেখিতে পাইতেছি না। তাহার পৃষ্ঠদেশ প্রায় মানুষেরই মত, তাহার ক্ষুদ্র মস্তক চিন্তামগ্ন; প্রকাণ্ড মন্দিরচূড়ার ঈষৎ-গোলাপী-মিশ্রিত পাণ্ডুবর্ণ 'জমি'র উপর, বানরের পৃথক্ দুইটা কান পরিস্ফুটভাবে প্রকাশ পাইতেছে!...

আবার যেন সেই নিঃশব্দ পাখার বাতাস আমি অনুভব করিলাম; বাদুড়টা যে কক্ষপথে ঘুরিতেছিল, তাহার কোন পরিবর্ত্তন না করিয়া এখনো সেই পথে যাতায়াত করিতেছে।

বানরটা বৃহৎ মন্দিরচূড়া দেখিতেছে; আমি বানরটাকে দেখিতেছি; সেই ছোট মেয়েগুলি আমাকে দেখিতেছে, এবং আমাদের সকলেরই মধ্যে দুর্ব্বোধ্যতার একটা বিশাল খাত প্রসারিত রহিয়াছে।...

এক্ষণে আমি মন্দিরের মুখ্য প্রবেশদ্বারের নিকটস্থ সেই সৈকতভূমিতে আসিয়াছি যেখানে জগন্নাথপুরীর সর্ব্বাপেক্ষা লম্বা রাস্তাটা আসিয়া মিলিত হইয়াছে। তীর্থযাত্রীরা আসিতেছে বলিয়া খবর হইয়াছে; তাহারা প্রায়

নজরে আসিয়াছে। তাহাদের সহিত মিলিত হইবার জন্য, প্রতি মিনিটেই জনতার বৃদ্ধি হইতেছে।

সেই পবিত্র গাভীবৃন্দও এইখানে রহিয়াছে,—উহারা জনতার মধ্যে বিচরণ করিতেছে। উহাদের মধ্যে একটা গরু, যাহাকে শিশুরা খুব আদর করিতেছে—সেই গরুটা প্রকাণ্ডকায়, একেবারে ধব্‌ধবে শাদা, ও খুব বৃদ্ধা। একটা ছোট কালো গরু, তাহার পাঁচটা পা; একটা ধূসর রং-এর গরু, তাহার ছয়টা পা; এই অতিরিক্ত পাগুলা এত ছোট যে, উহা মাটী পর্য্যন্ত পৌঁছে না—অসাড় মৃত অঙ্গের মত গরুর পায়ের উপর ঝুলিয়া রহিয়াছে।

ঐ হোথা, রাস্তার শেষপ্রান্তে, তীর্থযাত্রীদিগকে দেখা যাইতেছে। সংখ্যায় দুই তিন শত হইবে। উহারা রং-করা বাখারির বড়-বড় চ্যাপ্টা ছাতা ধরিয়া আছে; এই ভরপুর সন্ধ্যার সময় এইরূপ ছাতা খুলিয়া রহিয়াছে দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়; উহাদের কটি হইতে ভিক্ষার ঝুলি ও তাম্রকমণ্ডলু ঝুলিতেছে; বক্ষের উপর কতকগুলা মাদুলি, কতকগুলা রুদ্রাক্ষমালা, জটাপটি হইয়া রহিয়াছে; গাত্র ও মুখমণ্ডল ভস্মাচ্ছন্ন; উহারা খুব তাড়াতাড়ি চলিয়াছে, পরমারাধ্য মন্দির-চূড়াটি দর্শনমাত্রে যেন জ্বরবিকারের ঝোঁকে তাড়াতাড়ি চলিয়াছে।

মন্দিরের প্রবেশদ্বারের উপরিস্থ নহবৎখানায়, যাত্রীদিগের স্বাগত-অভ্যর্থনা-উদ্দেশে নহবৎ বাজিতে আরম্ভ হইয়াছে; উপরে ঢাকঢোলের বাদ্য, তাহার সহিত লোকদিগের দীর্ঘোচ্চারিত জয়ধ্বনি ও শুভশঙ্খের বিকট নিনাদ মিলিত হইয়া দিগ্‌বিদিক্‌ প্রতিধ্বনিত করিতেছে।

উহারা তাড়াতাড়ি,—খুব তাড়াতাড়ি চলিয়াছে। মন্দিরসম্মুখস্থ সৈকত-ভূমিতে আসিয়া উহারা ছাতা, বোঁচ্‌কা-বুঁচ্‌কি, ঝোলা-ঝুলি মাটীর উপর ফেলিয়া গন্তব্যপথে চলিতে লাগিল; বিকট প্রস্তরমূর্ত্তিগুলা যে দ্বার রক্ষা করিতেছে, সেই প্রবেশদ্বারের মধ্য দিয়া তুমুল কোলাহল-সহকারে উহারা

প্রবেশ করিল, বিকারগ্রস্তের ন্যায় উন্মত্ত হইয়া সিঁড়ির উপর উঠিতে লাগিল, এবং অবারিতদ্বার মন্দিরের মধ্যে কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল।

এখন রাত্রি হইয়াছে, পান্থশালার অন্বেষণে আমি চলিলাম। ভারতীয় নগরমাত্রেই দেখা যায়, এই পান্থশালাগুলি প্রায়ই সহর হইতে দূরে—সহরের বাহিরে অবস্থিত।

সৈকতময় একটি ক্ষুদ্র নির্জ্জনস্থানে একটা পান্থশালা পাইলাম। স্বচ্ছ সুন্দর মধুময় রাত্রি। সমুদ্রের দোলনশব্দ শুনা যাইতেছে; সমুদ্র-উপকূলমাত্রেই এইরূপ শব্দ শোনা যায়। জগন্নাথের মন্দির কিংবা মন্দিরের সেই অপূর্ব্ব চূড়া আর দেখা যাইতেছে না; ঐ হোথায় নীলাভ ছায়ার মধ্যে সমস্তই ডুবিয়া গিয়াছে। এখানকার সামুদ্রিক গন্ধ, বালির উপর যে সকল ছোট-ছোট বুনো গাছের চারা যেন গালিচা বিছাইয়া রাখিয়াছে, সেই সকল চারা-সমুত্থিত সৌরভ,—অতীব বিষণ্ণভাবে আমার শৈশবের জন্মস্থানকে স্মরণ করাইয়া দিতেছে; বঙ্গোপসাগরের ধারে, আমার সেই (Ile d' Oleron) ওল্রোঁ-দ্বীপের সাগরতটকে স্মরণ করাইয়া দিতেছে।...

একমাত্র তাহারাই ভ্রমণের সমস্ত মাধুর্য্য, সমস্ত কঠোরতা অনুভব করিতে পারে, যাহাদের অন্তরের অন্তস্তলে স্বকীয় জন্মস্থানের প্রতি একটা দুর্ব্বিজয় আসক্তি বিদ্যমান।

মোগলবিভবের ধবল প্রভা।

আমাদের দেশের ন্যায় ভারতবর্ষেও, রেলের ডাক-গাড়ি আজ আকাশকে যেন দগ্ধ করিয়া চলিয়াছে। জগন্নাথ হইতে—বঙ্গোপসাগরের প্রান্তদেশ হইতে ছাড়িয়া, উত্তরাঞ্চলের সেই একঘেয়ে সমতলভূমি অতিক্রম করিয়া, বারাণসী ছাড়াইয়া, (যাহার জন্য আমার মন চঞ্চল হইয়া, রহিয়াছে, এবং যেখানে আবার আমাকে পিছাইয়া আসিতে হইবে)

আবার আমি সেই প্রদেশে আসিয়া পড়িয়াছি—যেখানে দুর্ভিক্ষের শুষ্কবায়ু নিশ্বসিত হইতেছে। আমি মুসলমান-আগ্রায় আসিয়া পৌঁছিয়াছি।

আমার মত যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণ্যিক ভারত হইতে আইসে, প্রথমেই একটা খুব পরিবর্ত্তন তাহার চোখে ঠ্যাকে; ধর্ম্মাধিষ্ঠানসমূহের যে চিত্র তার মনে অঙ্কিত ছিল, তাহা রূপান্তর প্রাপ্ত হয়; মস্‌জিদ্‌, মন্দিরের স্থান অধিকার করে। বিরাট্‌ কাণ্ডের পর, অতিপ্রাচুর্য্যের পর—সুসংযতা ক্ষুদ্রকায়া তন্বী শিল্পকলার সহসা আবির্ভাব হয়। স্তূপাকৃতি পদার্থসমূহের বদলে, পুরাণবর্ণিত দেবদানবের উদ্দাম প্রমোদচিত্রের বদলে, আগ্রার এই সমস্ত ভজনালয় শুভ্র মার্ব্বেলপ্রস্তরে মণ্ডিত এবং ঐ মার্ব্বেলের শুভ্রতার মধ্যে জ্যামিতিক-আকারের কতকগুলি বিশুদ্ধ নক্‌সা আড়া-আড়িভাবে পরস্পরের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট; চক্‌চকে পাথরের গায়ে শুধু কতকগুলি সাদাসিধা ফুল ইতস্তত অঙ্কিত।

মহামোগল! আজ এই নামটি ঔপন্যাসিক বলিয়া মনে হয়—প্রাচ্য-দেশীয় কোন পুরাতন গল্পের সামিল বলিয়া মনে হয়।

পৃথিবীর মধ্যে বিশালতম সাম্রাজ্যের অধিস্বামী সেই মহামহিম নৃপতিগণ এইখানেই বাস করিতেন। তাঁহারা কতকগুলি প্রকাণ্ড প্রাসাদ পশ্চাতে রাখিয়া গিয়াছেন;—কেবল, তাঁহাদের আমলে উহাদের এরূপ ভগ্নদশা ও দৈন্যদশা উপস্থিত হয় নাই। উহাদের মধ্যে একটি প্রাসাদ হইতে সমস্ত আগ্রা দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে।

তপ্তধূলিসমাকীর্ণ, কাক-চিল-শকুনি-সমাচ্ছন্ন আকাশের নীচে সেকালের পুরাতন ও সুবিশাল আগ্রাসহর প্রসারিত।

আজ যে সময়ে এই সহরে প্রবেশ করিলাম, একদল বরযাত্রী বাহির হইতেছিল; ২০টা প্রকাণ্ড ঢাক তাহাদের আগে-আগে চলিয়াছে; বরটির বয়স ১৬বৎসর;—জরির কাজ-করা লাল মখ্‌মলের পোযাক-পরা; একটা শাদা-রঙের ঘোটকীর উপর আরূঢ়; একটি ছোট অদৃশ্য 'কনে'

পাল্কির মধ্যে বদ্ধ; তাহার পশ্চাতে একদল ভৃত্য—দানসামগ্রীতে পূর্ণ সোনার গিল্টি-করা কতকগুলা ক্ষুদ্র সিন্দুক মাথায় করিয়া চলিয়াছে। সর্ব্বশেষে, জরির আস্তরণে ঢাকা বরের খাট চারিজনের স্কন্ধে মহা-আড়ম্বর-সহকারে চলিয়াছে।

অতি-উচ্চ অতি-পুরাতন গৃহের শীর্ষদেশ হইতে বারাণ্ডা ও 'হাওয়াখানা'-ঘর বাহির হইয়াছে; নীচের কুট্টিমভূমির উপর নানাপ্রকার জিনিষের বিক্রেতাগণ উপবিষ্ট, সেখানে রাশিরাশি রেশমী কাপড় ও চুম্কি ঝিক্‌মিক্ করিতেছে; প্রথম-তলায়, নর্ত্তকী ও বারাঙ্গনাগণ মুক্ত গবাক্ষের ধারে বসিয়া আছে; উহাদের কালো চোখের মদালস দৃষ্টি বেশ স্পষ্ট দেখা যাইতেছে; উপরে কতকগুলি লোক রহিয়াছে; ঘরের দ্বার রুদ্ধ; ছাদের উপর বড় বড় শকুনি অষ্টপ্রহর বসিয়া আছে; কিংবা কতকগুলা বানর সপরিবারে বসিয়া, লেজ ঝুলাইয়া, লোকের গমনাগমন নিরীক্ষণ করিতেছে ও চিন্তায় মগ্ন রহিয়াছে—বানরেরা বহুশতাব্দী হইতে আগ্রা দখল করিয়া বসিয়াছে; উহারা টিয়াপাখীদের মত ছাদের উপর মুক্তভাবে অবস্থিতি করে; ধ্বংসদশাপন্ন কোন কোন অঞ্চল, প্রায় উহাদের নিমিত্তই ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে; সেখানে উহারা বাগান-বাগিচা লুণ্ঠন করিয়া, চতুষ্পার্শ্বস্থ হাটবাজার লুণ্ঠন করিয়া, নির্ব্বিবাদে রাজত্ব করে।

এই আগ্রার প্রাসাদটিকে দূর হইতে দেখিলে মনে হয় যেন একটা পর্ব্বত,—ধূসর-লোহিত প্রস্তরপিণ্ডে নির্ম্মিত এবং প্রাকারস্থ ভীষণ দন্তুর চূড়াগুলির দ্বারা কণ্টকিত।

যখন কারাগারসদৃশ গুরুপিণ্ডাকার রক্তবর্ণ এই প্রাকারাবলী নিরীক্ষণ করি, তখন মনে এই প্রশ্নটি স্বতই উপস্থিত হয়,—এই সকল বিলাসী বাদশারা, কেমন করিয়া এই প্রাকারবেষ্টিত স্থানটিকে স্বকীয় খামখেয়ালী বিলাসবিভবের লীলাক্ষেত্ররূপে নির্ব্বাচন করিয়াছিলেন। সে যাই হোক্— নদীর পাশ দিয়া—জুম্মামস্‌জিদের পাশ দিয়া এই লোহিত পর্ব্বতটিকে

প্রদক্ষিণ করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, Alhumbra-প্রাসাদের মত, শাদাপাথরের স্বপ্নময় লঘুধরণের একটি প্রাসাদ এই বিরাট্ দুর্গের উপর স্থাপিত; এবং তলদেশের কঠোর স্থূলপিণ্ডাকার গাঁথুনি হইতে এই প্রাসাদটি এতটা বিভিন্ন যে, এই বৈপরীত্য দেখিয়া সহসা বিস্মিত হইতে হয়। ঐ উপরে মহামোগল এবং তাঁহার সুলতানেরা বাস করিতেন; এবং প্রায় অন্তরীক্ষবাসী হইয়া, দুরধিগম্য হইয়া, শুভ্র-স্বচ্ছ প্রস্তর-রাশির মধ্যে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া, সমস্ত রাজ্য শাসন করিতেন।

ছুঁচাল-খিলান-বিশিষ্ট দ্বারের মধ্য দিয়া, খিলানের মধ্য দিয়া, একপ্রকার সুড়ঙ্গপথের মধ্য দিয়া, 'তেহারা' পুরু প্রাকার পার হইয়া, তবে ভিতরে প্রবেশ করিতে হয়। বড় বড় সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতে হয়;—চারি-দিকে সেই একই রক্তাভ ধূসরবর্ণ।

তাহার পরেই সহসা স্বচ্ছপাণ্ডুবর্ণ;—নীরব ও শুভ্র ভাস্বরতা; এইবার মার্ব্বেলের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছি।

শুভ্র সান্, শুভ্র প্রাচীর, শুভ্র স্তম্ভ, শুভ্র খিলানঘর, ছাদের ধারে খোদাই-কাজ-করা যে প্রস্তরময় গরাদে-বেষ্টন রহিয়াছে এবং যেখান হইতে দূর-দিগন্ত পরিলক্ষিত হয়, তাহাও শুভ্র;—সমস্তই শুভ্র। কেবলমাত্র, অমল-ধবল দেয়ালের গায়ে ইতস্তত কতকগুলি ফুল—'agat' ও 'Parphyre' পাথরের ফুল— উৎকীর্ণ রহিয়াছে; কিন্তু ঐ সমস্ত ফুল এত সূক্ষ্ম, এত মৃদুপ্রভ, এত বিরলবিন্যস্ত যে, এই প্রাসাদস্থ তুষারশুভ্রতার কোন বৈলক্ষণ্য হয় না। যেদিন এখানকার শেষ-বাদ্শা এই স্থান হইতে নির্ব্বাসিত হন, সেইদিন যেমনটি ছিল,—এই পরিত্যক্ত অবস্থার মধ্যেও, এই মরু-নিস্তব্ধতার মধ্যেও ঐ সমস্ত ঠিক্ তেম্নি টাট্কা, তেম্নি শুভ্র-স্বচ্ছ রহিয়াছে। মার্ব্বেলের উপর কালের হস্ত অতি বিলম্বে প্রকটিত হয়, তাই এই অপূর্ব্বসুন্দর জিনিষগুলি দেখিতে এমন ক্ষণভঙ্গুর ও সুকুমার হইয়াও, আমাদের নিকট ধ্রুবনিত্য বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে।

ঐ উপরে কৃত্রিম পর্ব্বতের উপর, প্রাকারবদ্ধ প্রকাণ্ড দুর্গের কেন্দ্রস্থলে, একটি বিষণ্ণ উদ্যান সংস্থাপিত। উহার চতুর্দ্দিকে বড়বড় দ্বার-প্রকোষ্ঠ। যে জমাট্-প্রস্তরচূর্ণের দ্বারা ভূগর্ভের খিলান-ঘর নির্ম্মিত হইয়া থাকে, ঐ সকল দ্বারপ্রকোষ্ঠ—সেইরূপ মাল মস্‌লায় গঠিত কৃত্রিম গুহার প্রবেশ-পথ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। কিন্তু এই সকল কৃত্রিম গুহার গঠনে বিশুদ্ধ জ্যামিতিক রেখাবিন্যাসের সুষমতা পরিলক্ষিত হয়। বৃহৎ খিলানের প্রত্যেক ক্ষুদ্র অলঙ্কারটি পর্য্যন্ত, ক্ষুদ্র খিলানের ক্ষুদ্র খুব্‌রিকাটা ঘরটি পর্য্যন্ত, 'চুল-চেরা' সমান মাপে গঠিত। সূক্ষ্ম কালো জালি-কাটা সৌধঅলঙ্কারের কিনারার সূতাটিও মনে হয় যেন তুলি দিয়া আঁকা, কিন্তু আসলে সেইস্থলে Onyx-মণি অতীব নিপুণভাবে বসান হইয়াছে।

এই ভাস্বর অথচ বিষণ্ণ দালানগুলি একেবারেই অবারিত; এক দালান হইতে আর এক দালানে আবাধে যাতায়াত করা যায়; অথবা সারি-সারি অবারিত খিলানদ্বার দিয়া একেবারেই অলিন্দের উপর আসিয়া পড়া যায়। যখন ভাবি, কি সতর্ক সন্দিগ্ধতার সহিত পূর্ব্বে এই স্থানটি নিম্নস্থ ভীষণ প্রাকারাদির দ্বারা সংরক্ষিত হইয়াছিল, তখন খোলা-খালা বিশ্বস্তভাবের এই সমস্ত নিদর্শন নিতান্ত অলীক বলিয়া মনে হয়! তা ছাড়া, এইখানে একটা আম্‌দরবারের ময়দান আছে; এই মুক্তস্থানে রাজদরবার বসিত। এই স্থানের অনাড়ম্বর সরলতা মার্জ্জিত-রুচির পরিচায়ক; কেবল, পাথরের উপর যে খোদাই-কাজগুলি দেখা যায়, তাহা একেবারে নিখুঁত। এইখানে প্রায় কিছুই নাই; মোগল-বাদ্‌শার জন্য কেবল একটি কালো-পাথরের সিংহাসন রহিয়াছে; তাহার পাশে, বিদূষকের জন্য একটা শাদা মার্ব্বেলের আসনপীঠ;—ইহা ছাড়া আর কিছুই নাই। (মনে হয়, সেকালে রাজদরবারের এতটা গাম্ভীর্য্য ছিল যে. লোকের চিত্তভারলাঘব করিবার জন্য বিদূষকের অধিষ্ঠান

আবশ্যক হইত। সকলেই জানে, আজকালকার রাষ্ট্রীয় মহাসভায় এই কাজের জন্য কোন বিশেষ লোকের প্রয়োজন হয় না।)

বাদ্‌শার স্নানাগার শুভ্র—বলা বাহুল্য, একেবারে তুষারশুভ্র; আর তাহাতে কত জটিল রেখাবিন্যাস, কত ছোট-ছোট খিলান পরস্পরের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট, সহস্র-ভাঁজ-বিশিষ্ট কত ছুঁচাল খিলান, খুদিয়া বাহির-করা বহু ঘর-কাটা শব্দযোনি কত খিলানমণ্ডপ, তাহার আর সংখ্যা নাই; মার্ব্বেল-দেয়ালের উপর এক-একটা ফুলের ডাল ইতস্তত বিক্ষিপ্ত—যাহার এক-একটি টুক্‌রাই পরমাশ্চর্য্য;—উহা স্বর্ণ ও lapis-মণি দিয়া উৎকীর্ণ।

যে সমস্ত প্রাকার এই অট্টালিকাকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে—সেই প্রাকারাবলীর শেষ প্রান্তভাগে, জুম্মামস্‌জিদের পাশে—খোলা ময়দানের পাশে, কত ছোট-ছোট হাওয়াখানা, লঘু গঠনের ছোট ছোট কত চতুষ্কমণ্ডপ; সেখান হইতে সমস্ত সহর দৃষ্টিগোচর হয়; এই সমস্ত গৃহ সুলতানাদিগের জন্য, অন্দরমহলের সমস্ত বেগমদের জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল। প্রাসাদের এই অঞ্চলেই, মার্ব্বেলের জালি-কাজের, জাফ্রি-কাজের বাহার খুলিয়াছে। দেয়ালের সর্ব্বাংশের মধ্য দিয়াই তুমি দেখিতে পাইবে, কিন্তু তোমাকে কেহই দেখিতে পাইবে না। এই দেয়ালগুলা আপাদমস্তক যে সব অখণ্ড প্রস্তরফলকে নির্ম্মিত, সেই সব প্রস্তরফলকে এত সূক্ষ্ম ছিদ্র কাটা যে, দূর হইতে মনে হয়, যেন সরু-সরু সুন্দর থামের মধ্যে শাদা জরির জাল টানা রহিয়াছে। কিন্তু এই সব কারুকার্য্য—যাহা সহসা ভঙ্গুর ও ক্ষণস্থায়ী বলিয়া মনে হয়—আসলে উহা খুবই পাকাপোক্ত; একটা মানুষ বিপুল অর্থক্ষয় করিয়া কত স্থায়ী ও সুন্দর জিনিষ নির্ম্মাণ করিতে সমর্থ—ইহাই তাহার একটি জলন্ত দৃষ্টান্ত।

এই বিরাট্ বাসগৃহের নিম্নস্থ গাঁথুনিসমূহের মধ্যে, যে নৈসর্গিক

শৈলের উপর ইহা স্থাপিত সেই শৈলের মধ্যে, আরো কত দালান সুকৌশলে সন্নিবেশিত, আরো কত অর্দ্ধচ্ছায়াচ্ছন্ন স্থান অধিষ্ঠিত যাহার বিরাট্‌ মহিমার মধ্যে কি-জানি কেমন-একটা গুপ্তভাবের আভাস পাওয়া যায়। তন্মধ্যে, প্রধানা সুল্‌তানার স্নানাগারের মধ্যে প্রবেশ করিলে কেমন-একটা সুড়ঙ্গ-সুলভ শৈত্য অনুভব করা যায়; সেখানে আলোকের একটু ক্ষীণ রশ্মিমাত্র প্রবেশ করে; ইহা যেন জাদুকরের একপ্রকার মন্ত্রপূত গুহাবিশেষ, উহার খিলান-মণ্ডপের কাজ দেখিলে মনে হয়, ঠিক্‌ যেন বৃষ্টিধারা ঠাণ্ডায় জমিয়া গিয়াছে.; উহার দেয়ালগুলা অতিসূক্ষ্ম দর্পণকাচে খচিত; আর্দ্রতা ও যবক্ষারের প্রভাবে এই সহস্র সহস্র ক্ষুদ্র কাচখণ্ড-গুলির 'জলুস্‌' কমিয়া গিয়াছে; চুম্‌কি-বসানো কোন পুরাতন জরির কাপড়ের মত 'ম্যাড়্‌মেড়ে' হইয়া পড়িয়াছে।

পূর্ব্বকালে, ভারতের রূপযৌবনসম্পন্না সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুন্দরীরাই এই অবরোধের মধ্যে বাস করিত; এবং এই সকল সান্‌, এই সকল বিশ্রামমঞ্চ—যাহার অমল ধবলতা কালও কলুষিত করিতে পারে নাই—উহারা বহুকাল যাবৎ ঐ সব বাছা-বাছা শ্যামাঙ্গিনী ললনার গাত্রস্পর্শ উপভোগ করিয়াছে।

বিজয়ী মোগলদের আসিবার বহুশতাব্দী পূর্ব্বে এইখানে একটি দুর্গ ছিল; মোগলেরা আসিয়া এই দুর্গে দুইটি নূতন জিনিষের আমদানি করিয়াছে;—দুগ্ধধবল মর্ম্মরপ্রস্তর ও জ্যামিতিক রেখাবিন্যাসের অলঙ্কার-পদ্ধতি। এই সকল দালানে এখনো ধূসর-লোহিত বর্ণের খোদাই-কাজ দেখা যায়; এই সকল কাজ বহুপুরাতন—জৈনরাজাদিগের আমলের। ছায়ান্ধকার সিঁড়ি দিয়া নামিয়া, গুরুভার স্থূল প্রস্তররাশির মধ্য দিয়া এমন এক স্থানে আসিয়া পড়িলাম, যাহা অতীব ভীতিজনক ও শোকাবহ ঘটনায় পূর্ণ;—সেই সব অন্ধকূপ, যেখানে হতভাগ্য লোকসকল বিষাক্ত ভীষণ সর্পের মুখে পরিত্যক্ত হইত;—একটা ঘর, যেখানে সুল্‌তানা-

দিগকে ফাঁসি দেওয়া হইত; এবং তাহার পর তাহাদের মৃতদেহ এমন একটা কূপের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইত—যাহার অন্তঃসলিল, নদীর সহিত মিশিয়া গিয়াছে; কতকগুলা অতলস্পর্শ কালো গর্ত্ত;—কতকগুলা সুড়ঙ্গ, যাহার ভিতর দিয়া যাইতে সাহস হয় না এবং যেখানে হয় অস্থিরাশি, নয় ধনভাণ্ডার লাভ করা যায়। উপরে যে অমল-ধবল প্রাসাদরূপ পদ্মটি ফুটিয়া আছে, তাহারই যেন তমসাচ্ছন্ন শিকড়গুলা মাটি ফুঁড়িয়া পাতাল-গভীরে প্রবেশ করিয়াছে।

তমসাচ্ছন্ন আনুসঙ্গিক-ঘরগুলির উপর পুনর্ব্বার উঠিয়া, আবার সেই সব জালি-কাজকরা চতুষ্কমণ্ডপে ফিরিয়া আসিলাম;—এই সূক্ষ্ম-খোদিত চতুষ্কগুলি প্রাকারবপ্রের ধারে খাড়া হইয়া রহিয়াছে এবং উহাদের গবাক্ষগুলা ফাঁকায় বাহির হইয়া আসিয়াছে। আমি কতকটা গয়ংগচ্ছভাবে সেই সব দ্বার-গৃহে দাঁড়াইয়া রহিলাম—যেখানে অতীতকালের সুন্দরীরা কিংবা কৃত্রিম-পর্ব্বত-শিখরস্থ অবরুদ্ধ সুলতানারা, গগনবিহারী ভ্রাম্যমান বিহঙ্গদের ভ্রমণপথেরও ঊর্দ্ধদেশ হইতে, জালি-কাটা মার্ব্বেল-ফলকের মধ্য দিয়া কিংবা থামের ফাঁক দিয়া চতুর্দ্দিক্ নিরীক্ষণ করিতেন। এখানকার সমস্তই চারু-সূক্ষ্ম কারুকার্য্যে বিভূষিত; এখানকার সমস্ত খোদাইকার্য্যে ধৈর্য্যের পরাকাষ্ঠা লক্ষিত হয়; শাদা 'জমির' উপর মণিখচিত ছোট ছোট ফুল ইতস্তত ছড়ান রহিয়াছে; অন্যাংশ অপেক্ষা এই অংশটি আরো বেশী শাদা বলিয়া মনে হয়—সর্ব্বত্রই যেন একপ্রকার বিষাদের ধবল কিরণ বিচ্ছুরিত।

আজ আমরা এখানকার যতটা উজাড়-ভাব দেখিতেছি, অবশ্য সেকালে সুলতানারা সে ভাব দেখেন নাই। তখনও এই সব সমভূমি গড়াইয়া-গড়াইয়া অনন্তের মধ্যে বিলীন ছিল; তখনও এই একই নদী সুদূরে আঁকিয়া-বাঁকিয়া চলিয়াছিল, কিন্তু তখন উহার উপর দিয়া দুর্ভিক্ষের শুষ্কনিশ্বাস বহিয়া যায় নাই; তখন সমস্ত দেশ মৃত্যুর কুজ্ঝটিকায় আচ্ছন্ন

হয় নাই। ঐ সকল চতুষ্কমণ্ডপের উপর হইতে সুন্দরীরা নিম্নস্থ উৎসব-আমোদ নিরীক্ষণ করিতেন; তাঁহাদের চিত্তবিনোদনার্থ যে বাঘের লড়াই ও হাতীর লড়াই হইত, তাহাই তাঁহারা অবলোকন করিতেন; কিন্তু এখন সেই ক্রীড়াভূমি কণ্টকগুল্মে আচ্ছন্ন, বৃক্ষলতায় আচ্ছন্ন; অনাবৃষ্টির শুষ্কতায়, এই সব বৃক্ষলতা এক্ষণে পল্লববিরহিত; এই সায়াহ্নে গ্রীষ্মের জ্বলন্ত উত্তাপ যদি না থাকিত, তাহা হইলে শীতঋতুর আবির্ভাব হইয়াছে বলিয়া সহজেই মনে হইত।

এখানে পাখীতে-পাখীতে একেবারে আচ্ছন্ন; এত পাখী ভারতের আর কোন প্রদেশে নাই। পাখীর কণ্ঠস্বর ছাড়া আর কোন শব্দই এখন আমার কানে আসিতেছে না। এই সব গৃহছাদের নিস্তব্ধতা উহাদেরই চাৎকারে ভরপূর; এই সব শব্দযোনি ধবল মার্ব্বেল উহাদেরই চীৎকারে প্রতিধ্বনিত। সন্ধ্যা নিকটবর্ত্তী হইলে, পক্ষীদের মধ্যে স্থাননির্ব্বাচনের মহাধুম পড়িয়া যায়। আমার নিম্নস্থ ঐ গাছটি কাকে-কাকে ভরিয়া একেবারে কালো হইয়া যাইতেছে; আর একটি গাছ টিয়াপাখীতে আচ্ছন্ন;—মরাগাছের ডালের উপর যেন কতকগুল সবুজ পাতা গজাইয়া উঠিয়াছে। ধবলকায় চিল, বড়-বড় 'হ্যাড়া' শকুনি, চতুষ্পদ পশুদের মত ভূমির উপর বিচরণ করিতেছে।

দূরস্থ সমভূমির উপর ছোট ছোট ধবল গম্বুজ দেখা যাইতেছে; কোন চিত্রই, কোন বস্ত্রই, মার্ব্বেলের এই স্বচ্ছ ধবলতার অনুকরণ করিতে পারে না। যে ধূলার কুজ্ঝাটিকায় সমস্ত ভূমি আচ্ছন্ন এবং যাহা সন্ধ্যাগমে নীল বর্ণ অথবা ইন্দ্রধনুর বিচিত্রবর্ণ ধারণ করে, সেই কুজ্ঝাটিকার মধ্য হইতে,—স্থানে-স্থানে এই স্বচ্ছ ধবলতা ফুটিয়া বাহির হইতেছে। পূর্ব্বে ঐ সব উচ্চ প্রাসাদ বেগমদিগের নিবাসগৃহ ছিল; জরির পাড়ওয়ালা ওড়না পরিয়া, মণিরত্নে বিভূষিত হইয়া, সুন্দর বক্ষোদেশ অনাবৃত করিয়া ঐ সব সুন্দরী ঐখানে বিচরণ করিত। ঐ সব গম্বুজের মধ্যে তাজের গম্বুজটাই

সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ—সেই অতুলনীয় তাজ,—যেখানে মহা-সুলতানা মস্তাজি-মহল ২৭০ বৎসর হইতে মহানিদ্রায় নিমগ্না।

সকলেই তাজ দেখিয়াছে, সকলেই তাজের বর্ণনা করিয়াছে—সেই তাজ, যাহা পৃথিবীর একটি আদর্শস্থানীয় পরমাশ্চর্য্য পদার্থ।

ক্ষুদ্রায়তন চিত্রে, 'মিনা'র কারুকার্য্যে,—ঝক্‌মকে-শ্রীপচ্‌কল্‌কা-বিভূষিত-উষ্ণীষধারিণী মস্তাজি-মহলের * মুখশ্রী এখনো সংরক্ষিত;—সেই মুখশ্রী, যাহা নিজ পতি সুল্‌তানের এতটা প্রেম উদ্দীপিত করিয়াছিল যে, তিনি সেই প্রেমে বিমুগ্ধ হইয়া এ-হেন অশ্রুতপূর্ব্ব মূর্ত্তিমতী মহিমাচ্ছটার মধ্যে মৃত্যুকে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন।

দুর্গের ন্যায় প্রাকারবদ্ধ একটি বৃহৎ গোরস্থান-উদ্যানের মধ্যে তাজ অবস্থিত; এরূপ প্রকাণ্ড অমল-ধবল মর্ম্মরপ্রস্তরস্তূপ জগতে আর দ্বিতীয় নাই। উদ্যানের প্রাচীর ধূসর-লোহিত-বর্ণ; বিশাল ঘেরের চারি কোণে বহির্দ্বারের মাথা ছাড়াইয়া শ্বেতপ্রস্তরখচিত যে সব উচ্চ গম্বুজ উঠিয়াছে, তাহাও ধূসর-লোহিত-বর্ণ। তাল ও সাইপ্রেস্‌-ঝাউর পংক্তি, জলের ছোবাচ্ছাগুলা, সুচ্ছায় yoke-elm-বৃক্ষশ্রেণী,—সমস্তই একেবারে ঠিক্ সরল-রেখায় স্থাপিত। এবং ঐ পশ্চাৎ-প্রান্তে কল্পনার আদর্শমূর্ত্তি এই সমাধিমন্দিরটি মহাগৌরবে রাজসিংহাসনে বিরাজমান; এই সমস্ত হরিৎ-শ্যামল উদ্ভিজ্জের মধ্যে, উহার তুষার-ধবলতা আরো যেন ফুটিয়া উঠিয়াছে। একটা ধবল প্রস্তরপীঠের উপর একটা প্রকাণ্ড গম্বুজ এবং 'ক্যাথিড্রাল্‌'-গির্জ্জার চূড়া অপেক্ষাও উচ্চ চারিটা 'মিনার'-স্তম্ভ স্থাপিত রহিয়াছে। ঐ সমস্তের রেখাবিন্যাস কি প্রশান্ত, কি বিশুদ্ধ! উহার মধ্যে কি শান্তিময় সামঞ্জস্যের ভাব! কি উচ্চধরণের সহজ সরলতা! উহার সমস্তই বিরাট্-

* শাহাজানবাদশার পত্নী; বিবাহ হইবার চোদ্দবৎসর পরে, অষ্টম সন্তান প্রসব করিয়া, ১৬২৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

পরিমাণে-গঠিত; এবং এরূপ প্রস্তরে নির্ম্মিত, যাহাতে লেশমাত্র দাগ নাই—ধূসর-পাণ্ডু রঙের একটি শিরাও নাই।

তাহার পর, নিকটে গিয়া দেখা যায়, অতি সুকুমার-ধরণের লতা-পাতার কাজ দেয়াল বাহিয়া উঠিয়াছে, কার্ণিসের ধার দিয়া গিয়াছে, দ্বারের চারিধার ঘিরিয়া আছে; 'মিনারেটের' উপর গড়াইয়া চলিয়াছে; খুব সরু সরু কালো মার্ব্বেলের টুক্‌রা বসাইয়া এই সব লতাপাতা রচিত হইয়াছে। যে গম্বুজটি সুলতানার অন্তিমশয্যাকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে, সেই ৭৫-ফীট্‌-উচ্চ মধ্য গম্বুজের নিম্নস্থ স্থানটিতে সহজ সরলতার আতিশয্য,—ধবল-মহিমার পরাকাষ্ঠা পরিলক্ষিত হয়। আশ্চর্য্য! যেখানে অন্ধকার হইবার কথা, সেখানেও আলোক; যেন ধবলতার সমস্ত কিরণ একস্থানে পুঞ্জীভূত হইয়াছে; মার্ব্বেলের এই মহা-আকাশে কি-জানি কেমন-একটা অপূর্ব্ব অস্ফুট স্বচ্ছতা বিদ্যমান। ধূসর-মুক্তাবর্ণ শিরাজালে ঈষৎ লাঞ্ছিত উচ্চ দেয়ালের গায়ে আর কিছুই নাই; কেবল ছোট-ছোট কতকগুলা দস্তুর খিলান এমন বেমালুমভাবে বাহির হইয়াছে যে, উহাদিগকে রেখাচিত্র বলিয়া মনে হয়। বিশাল গম্বুজের ভিতর-পিঠে আর কিছুই নাই—কেবল জ্যামিতিক-রেখায় বিন্যস্ত খুদিয়া-বাহির-করা বহুল খুব্‌রি-কাটা ঘর। কেবল তলদেশে,—এই সব সুন্দর দেয়ালের চারিধারে পদ্মফুলের যেন একটা কেয়ারী রচিত হইয়াছে; যেন উহার বৃন্তগুলা ভূমি হইতে উঠিয়াছে এবং উহার খুদিয়া-বাহির-করা পাপ্‌ড়িগুলা ঝরিয়া পড়িতেছে·· আধুনিক পাশ্চাত্য শিল্পকলা ন্যূনাধিকপরিমাণে এই ভূষণের অনুকরণ করিয়াছে, কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে এইপ্রকার সৌধ-অলঙ্কার খুবই প্রচলিত ছিল।

সমস্ত আশ্চর্য্য পদার্থের মধ্যে আশ্চর্য্যতম পদার্থ সেই ধবল পাথরের 'গরাদে', যাহা স্বচ্ছ দালানের মধ্যস্থলে সমাধিপ্রস্তরটিকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে; এ সমস্ত কতকগুলি 'খাড়া' মার্ব্বেল-ফলক; উহাতে এত সূক্ষ্ম

জালি-কাটা কাজ যে, মনে হয়, যেন গজদন্ত-ফলকে কোঁড় কাটা ; উহার চারিধারে সেই ছোট-ছোট ফুলের মালার পাড় ; Lapis, ফিরোজা, পদ্মরাগ, porphyre প্রভৃতি মণি বসাইয়া এই সকল ফুল রচিত হইয়াছে।

এই ধবল গম্বুজটির শব্দযোনিতা এত অধিক যে, মনে একটু ভয়ের সঞ্চার হয় ;—উহার প্রতিধ্বনি যেন আর থামে না। যদি কেহ 'আল্লা'র নাম উচ্চারণ করে, তাহার সেই অতিবর্দ্ধিত কণ্ঠস্বর কয়েক সেকেণ্ড পর্য্যন্ত স্থায়ী হয় এবং 'অর্গ্যানে'র আওয়াজের মত আকাশে উহার রেশ চলিতে থাকে—যেন আর শেষ হয় না।

৯০মাইল আরো উত্তরে, দিল্লীনগরের ভীষণ প্রাকারের পশ্চাদ্ভাগে, মোগল বাদ্‌শাদিগের আর একটি প্রাসাদ ; উহা বিভবমহিমায় আগ্রার প্রাসাদকেও অতিক্রম করে।

বড়-বড়-ছুঁচাল-খিলান-সমন্বিত দিল্লির এই প্রাসাদটি একটা অদৃশ্য পুরাতন উদ্যানের মধ্যে অধিষ্ঠিত ; চারিদিক্ রুদ্ধ ; উহার দস্তুর অত্যুচ্চ প্রাকারাবলী দর্শকের মনে বিষাদময় ঘোর কারাগারের ভাব আনিয়া দেয়।

কিন্তু উহা যে-সে কারাগার নহে—উহা দৈত্যদানবের কিংবা পরীদিগের কারাগার ; সুকুমার শিল্পগরিমায় কোন মানবপ্রাসাদ উহার সমকক্ষ হইতে পারে না। বলা বাহুল্য, উহারও সমস্তই ধবল মার্ব্বেল নির্ম্মিত ; সমস্তই খুদিয়া বাহির-করা ;—গম্বুজের প্রকাণ্ড ভিতর-পিঠ প্রস্তরচূর্ণের মস্‌লায় নির্ম্মিত। কিন্তু ইহার এই স্থায়ী ধবলতার সহিত সোনার রং প্রচুরপরিমাণে মিশিয়াছে। মার্ব্বেলের চেক্‌নাই-এর উপর সোনার কাজ বসাইলে তাহার যে একটা বিশেষ "খোল্‌তাই' হয়, তাহা সকলেই জানে। দেয়ালের ও গম্বুজের ভিতর-পিঠে যে সব অগণ্য লতাপাতার অতি সূক্ষ্ম কাজ খুদিয়া বাহির করা হইয়াছে, তাহা স্বর্ণ দিয়া রঞ্জিত।

দেয়ালের যে-সকল বড়-বড় ফুকর দিয়া বিষণ্ণ উদ্যানটি দেখা যায়,

শুধু সেই সকল ‘ফুকরের মধ্য-দিয়াই যাহা-কিছু আলো ভিতরে প্রবেশ করে। স্তম্ভশ্রেণী ও খাঁজ-কাটা ‘খিলান—একটার-পর-একটা সারি-সারি বরাবর চলিয়া-গিয়া, দূর প্রান্তের অর্দ্ধচ্ছায়াচ্ছন্ন নীলিমার গর্ভে বিলীন হইয়াছে, কিন্তু সমস্ত প্রাসাদটিতে ধবল-প্রস্তরের শুভ্র স্বচ্ছতা পূর্ণভাবে বিরাজমান।

যে দালানে সিংহাসন ছিল (সেই জনশ্রুত নিরেট স্বর্ণপিণ্ড ও পান্নার সিংহাসন), সেই সমস্ত দালানটি শাদা ও সোনালি রঙের। তা ছাড়া, উচ্চ মার্ব্বেল-দেয়ালে গোলাপগুচ্ছ বিকীর্ণ; চীনাংশুকের ফুলকাটা কাজের মত উহাতে টকটকে গোলাপ ও ফিঁকা গোলাপের আভা অতি সুন্দররূপে মিশ্রিত হইয়াছে। এবং আজকাল আমাদের দেশে যাহাকে ‘নূতন শিল্পকলা’ বলে, সেই শিল্পকলার পদ্ধতি অনুসারে প্রত্যেক পাপ্‌ড়িটির চারিধার দিয়া সূক্ষ্ম সোনালি পাড় বেমালুমভাবে চলিয়া গিয়াছে। তা ছাড়া, lapis-ও ফিরোজা-রচিত নীলরঙের ফুলও ইতস্তত ছড়ান রহিয়াছে।...আমাদের স্থূলধরণের ‘screen’ পর্দ্দার বদলে ভারতবর্ষে যে জালি-কাটা মার্ব্বেল-ফলকের ব্যবহার-ছিল, সেইরূপ জালি-কাটা মার্ব্বেল-ফলকের মধ্য দিয়া দালানের পর দালান ক্রমাগত দৃষ্টিপথে পতিত হইতেছে।

প্রাচীরবদ্ধ উদ্যানের তরুকুঞ্জে দুর্ভিক্ষ-বায়ুর উৎপীড়ন স্পষ্ট লক্ষিত হইতেছে;—শরতের বায়ুর মত উহা উদ্যানতরুর শেষ পাতাগুলা চতুর্দ্দিকে উড়াইয়া দিতেছে; আজ ঐ সব মরা-পাতা ঘূর্ণাবাতাসে উড়িয়া এই মহানিস্তব্ধ প্রাসাদের মধ্যেও আসিয়া পড়িতেছে। উদ্যানের একটি গাছে এখনো ফুল ফুটিয়া আছে; বড়-বড় লাল ফুল বৃষ্টিধারার মত ঐ বৃক্ষ হইতে ঝরিয়া সমস্ত ধবলকুট্টিমকে—সিংহাসন-দালানের সেই অপূর্ব্ব প্রস্তরকুট্টিমটিকে ছাইয়া ফেলিয়াছে।

যেখানে মোগলবাদশারা বাস করিতেন, সেই সমস্ত দেশই এখন

ধ্বংসাবশেষের মধ্যে।

নগরপ্রাসাদের বিস্তীর্ণ কঙ্কালস্তূপে পরিণত হইয়াছে। এখানকার মরা-মাটীর উপর যত ধ্বংসাবশেষ, মিশরের বালুরাশির উপরেও তত নাই। সেখানে, নীল-নদের ধারে, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাষাণস্তূপ; এখানে—খোদিত মার্ব্বেল, জালিকাটা ধূসরবর্ণের প্রস্তর, প্রস্তরময় জাফ্রির কাজ—বিষণ্ণ মাঠময়দানের মধ্যে হারাণ জিনিষের মত ইতস্তত পড়িয়া আছে। যেখানে কত শতাব্দী ধরিয়া মানবচিন্তা ও মানব-উদ্যম অসাধারণ স্ফূর্ত্তিলাভ করিয়াছিল, সেই এই ভারতবর্ষে পূর্ব্ব-পূর্ব্ব যুগের অসংখ্য ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান; এবং উহাদের প্রাচুর্য্যে, উহাদের সৌন্দর্য্যে, আমাদের আধুনিক কল্পনা দিশাহারা হইয়া যায়। অনেকগুলি নগর যুদ্ধবিগ্রহ ও লোকহত্যার পরেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়; আবার কতকগুলি বিলাসশোভন নগর অমুক অমুক রাজার খামখেয়ালী-আদেশক্রমে গঠিত হইতে আরম্ভ হয়, কিন্তু সময়ের মধ্যে শেষ হয় নাই; কতকগুলি প্রাসাদ অমুক সুলতানার জন্য পরিকল্পিত হয়, কিন্তু উহা ভাস্কর-শিল্পীদিগেরই ব্যবহারে আসিয়াছে,—অন্য কেহ সেখানে কখনো বাস করে নাই।

দিল্লি এবং প্রাচীন রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ, যেখানে পৃথিবীর মধ্যে বোধ হয় উচ্চতম কীর্ত্তিস্তম্ভ সেই গোলাপী পাথরের কুতব-মিনার সমুত্থিত—এই দুই স্থানের মধ্যবর্ত্তী সমস্ত পথটার দুই ধারে, কত নগর ও কত দুর্গেরই ছায়ামূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়;—ত্রিশ-চাল্লিশ ফীট্ উচ্চ দস্তুর প্রাকার, পরিখা ও পরিখার যন্ত্রসেতু; ভিতরে জনপ্রাণী নাই; সমস্তই নিস্তব্ধ; কিংবা ভিতরে প্রবেশ করিলে দেখা যায়, গড়াইয়া-পড়া শিলারাশির মধ্য হইতে, কাঁটাগাছের ঝোপ্ঝাড়ের মধ্য হইতে, বানরের পাল ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া পলাইতেছে।

তা ছাড়া, কত গোরস্থান, তাহার আর শেষ নাই। কত ক্রোশ পর্য্যন্ত সমস্ত ভূমি মৃতদেহে পরিপূর্ণ; গোরস্থানের চতুষ্কমণ্ডপ, সকল যুগেরই সমাধিস্তম্ভ পর-পর চলিয়াছে;—রাশিরাশি ভাঙাচুরা জিনিষের মধ্যে গোলকধাঁধার মত পরস্পরের সহিত যেন জড়াইয়া-পাকাইয়া রহিয়াছে।

ইহার মধ্যে কতকগুলি সমাধিমন্দির এখনো ভক্তিসহকারে বহুব্যয়ে সংরক্ষিত; আবার কতকগুলি একেবারেই প্রচ্ছন্ন—ধসিয়া-পড়া পরিত্যক্ত আরো অসংখ্য সমাধিমন্দিরের পিছনে যেন ডুবিয়া রহিয়াছে। প্রস্তর-রাশির মধ্য দিয়া, গর্ত্তসমূহের মধ্য দিয়া, 'হাঁ-করা' প্রাচীন গুহাগহ্বরের মধ্য দিয়া যে সকল পথ গিয়াছে এবং যে সকল পথ ঐ গোরস্থানে আসিয়া মিলিয়াছে, ঐ সকল পথ চেনা দুষ্কর হইত,—যদি ভিক্ষুকের দল, খঞ্জ কিংবা কুষ্ঠরোগী লোক খোঁটাচিহ্নের মত উহার চারিধারে না থাকিত। উহারা তীর্থযাত্রীদের নিকট ভিক্ষা পাইবার আশায় ঐখানে বসিয়া থাকে। এই সকল ধূলিসমাচ্ছন্ন পথ অতিক্রম করিবার পর হঠাৎ একএকটা চমৎকার মস্‌জিদ দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়;—জালিকাটা মার্ব্বেলের দেয়াল, লাল রেশমের কাপড়ে যেন সোনালি প্যাড় বসান, জম্‌কালো কার্পেট—যাহার উপর টাট্‌কা gardenia ও tubereuse পুষ্পসকল সজ্জিত রহিয়াছে। ইহার মধ্যে প্রাচীন ফকীরদর্ব্বেশের বাসগৃহগুলিই সর্ব্বাপেক্ষা বিভবময়। উহারা নিজে ইচ্ছা করিয়াই দৈন্যের মধ্যে বাস করিত ও পরম সন্ন্যাসব্রত অবলম্বন করিত; কিন্তু কোন কোন রাজা উহাদের স্মৃতিরক্ষার জন্য এইরূপ মুক্তহস্তে অর্থব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না।

প্রাকারাবলী ও খোদিত প্রাসাদাদির বহুপূর্ব্বেই গোলাপী পাথরের মিনারটি এই মৃত্যুর দেশের দিগন্তভাগে, বহুদূর হইতে নেত্রসমক্ষে প্রকাশ পায়। শুষ্ক পাথুরে জমির তরঙ্গায়িত ক্ষেত্রের উপর দিয়া এই প্রাকার-প্রাসাদাদি মিনারের পাদদেশ পর্য্যন্ত প্রসারিত রহিয়াছে। এই সমস্ত শুষ্ক পাথুরে ভূমিখণ্ডের উপর এখন শুধু রাখালরা ছাগল চরাইয়া থাকে।

এখন প্রায় মধ্যাহ্ন ; দুঃসহ প্রখর উত্তাপ ; এই সময়ে আমি কোণালু-খিলান-বিশিষ্ট যুগলদ্বার পার হইয়া এই ছায়ামূর্ত্তি নগরের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। একটা শ্মশানের মত ভূমিখণ্ড—বড় বড় দস্তুর প্রাকারে বেষ্টিত এবং এত বিশাল যে, সেই ঘেরের সমস্ত আয়তন সম্পূর্ণরূপে দৃষ্টিগোচর হয় না। উহার ভিতরে কতকগুলা গাছ, যাহা জলাভাবে মরিয়া যাইতেছে এবং উষ্ণবায়ু যাহার স্বর্ণ-পীত পত্রপুঞ্জ চারিদিকে উড়াইয়া ফেলিতেছে ; আকার-গঠনহীন কতকগুলা প্রস্তরস্তূপ ; ইতস্তত দৃশ্যমান কতকগুলা গম্বুজ, কতকগুলা মিনার—এতটা ক্ষয়গ্রস্ত হইয়াছে যে, উহাদিগকে শৈলখণ্ড বলিয়া ভ্রম হয় ; কেবল ঐ আশ্চর্য্যজনক মিনারের সন্নিকটে যে সকল গুরুভার বৃহদাকার ইমারতের অবশেষগুলি আছে, তাহা রাজকীয় মহল বলিয়া বেশ বুঝা যায়। কিন্তু এই গৌরবান্বিত ভগ্নাবশেষগুলির গঠনরীতি একপ্রকার নহে—বিভিন্ন গঠনরীতি একত্র মিশিয়া গিয়াছে ; এত যুদ্ধবিগ্রহ, এত আক্রমণ এই প্রাচীন ভূমির উপর দিয়া গিয়াছে, এতবার ধ্বংস হইয়াছে, আবার অমানুষিকভাবে এতবার নূতন করিয়া গঠিত হইয়াছে যে, ইহার কোন ঠিক ঠিকানা পাওয়া যায় না। পৃথিবীর এই কোণটির ইতিহাস ঘোর তিমিরজালে সমাচ্ছন্ন।

ঐখানে—উপকথা বর্ণিত কোন রাজার প্রাসাদের মধ্যে, সহস্রবৎসর-ব্যাপী প্রস্তররাশির সুশীতল ছায়াতলে, আমি আজ সমস্ত নিস্পন্দ মধ্যাহ্ন-কালটা আপনাকে আবদ্ধ করিয়া রাখিব। কয়েকঘণ্টা একাগ্রচিন্তায় কিংবা নিদ্রায় অতিবাহিত করিবার জন্য, একটি ভৃত্যও সঙ্গে না লইয়া একাকী আমি একটা উচ্চ বারাণ্ডার কোণে আপনাকে স্থাপন করিলাম—অসংখ্য চৌকো-থাম-বিশিষ্ট ও প্রাচীন ভাস্করকার্য্যে আচ্ছন্ন একটা দালানঘর হইতে এই বারাণ্ডাটি বাহির হইয়াছে। এই সমস্ত ধ্বংসাবশেষের সহিত ঘনিষ্ঠরূপে পরিচিত হইবার উদ্দেশে—আজ এখানকার যাহারা গৃহস্বামী, সেই সব পশুদের সহিত ঘনিষ্ঠরূপে পরিচিত হইবার উদ্দেশেই আমি একাকী

এখানে আসিয়াছি। বাহিরে—প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড এই বিস্তীর্ণ মরুভূমির উপর অনলবর্ষণ করিতেছে; পতঙ্গের গান, মক্ষিকার গুঞ্জন এখানে শোনা যায় না, কেবল দূরদূরান্তর হইতে কোন নিঃসঙ্গ টিয়াপাখীর তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর ছাড়া আর কিছুই শোনা যায় না; উপরে, প্রাসাদের খোদাই-কাজের মধ্যে তাহার নীড়, সে প্রাসাদের মধ্যে প্রবেশ করিয়া নিদ্রা যায়। অথবা, দুর্ভিক্ষের দম্‌কা-বাতাসে তাড়িত হইয়া যে-সব শুক্‌না-পাতা ঘোরপাক খাইতে খাইতে স্তম্ভশ্রেণীর মধ্যে আসিয়া পড়ে,—তাহারই মর্ম্মর শব্দ ক্বচিৎ-কখন শুনা যায়।

দালান-ঘরের গুরুভার ছাদটা যে সকল প্রস্তরখণ্ডে আচ্ছাদিত, সেই প্রস্তরখণ্ডগুলা আড়াআড়িভাবে এবং কৌণিক স্তূপের আকারে উপর্য্যুপরি স্থাপিত; এগুলি অতিদীর্ঘ অখণ্ড প্রস্তর; আমাদের পুরাতন ছাদের কাঠাম যেরূপ বড়-বড় গুঁড়িকাঠের উপর স্থাপিত হইত, ইহা কতকটা সেই ধরণের। যে সময়ে গম্বুজ অজ্ঞাত ছিল, বক্র-খিলান অজ্ঞাত ছিল, কিংবা তাহার উপর লোকের সম্পূর্ণ বিশ্বাস ছিল না—সেই সময়কার মানবজাতির শৈশব-কালোচিত এই গঠনপদ্ধতি। আমার নীচে, প্রথমেই স্তম্ভের অরণ্য। থামগুলা প্রকাণ্ড,—বলা বাহুল্য, অখণ্ড পাথরের—এবং উহার চৌকোণা ধরণ দেখিয়া খুব পুরাতন হিন্দু-আমলের বলিয়া কল্পনা করা যায়। আমি যে অন্ধকারাচ্ছন্ন ছায়াময় কোণটিতে বসিয়া সমস্ত দেখিতেছি, সেখানকার কতকগুলি 'গুল্‌গুলি'-গবাক্ষ হইতে বাহিরের জিনিষও দেখিতে পাইতেছি, লাল পাথর দেখিতেছি, ধূসরবর্ণের পাথর দেখিতেছি, বেগ্‌নি রঙের পাথর দেখিতেছি,—মনে হইতেছে, বাহিরের সমস্ত ধ্বংসাবশেষ অগ্নিময় সূর্য্য-কিরণে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে। আরো একটু দূরে, বায়ু এরূপ স্বচ্ছ এবং আলোটা এরূপ ঠিকভাবে পড়িয়াছে যে, আমি এখান হইতে স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি—কতকগুলা দ্বারপ্রকোষ্ঠ খাড়া হইয়া রহিয়াছে—উহার কোণালু খিলানে চমৎকার খোদাই-কাজ এবং আদিম-কালের coufique

অক্ষরে মুসলমানি লিপি লিখিত রহিয়াছে। এবং কোন * অজ্ঞাতযুগের একটি লৌহ-ধ্বজস্তম্ভ সমুত্থিত—সমস্তই কৃষ্ণবর্ণ ও সংস্কৃত অক্ষরে সমাচ্ছন্ন; উহার চারিদিকে কতকগুলা সমাধিস্তম্ভ এবং সান-বাঁধানো একটা মুক্ত প্রাঙ্গণ। পূর্ব্বে এই প্রাঙ্গণটি একটি খুব পবিত্র মস্‌জিদের অন্তঃপ্রাঙ্গণ ছিল। 'পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর' বলিয়া সেই সময়ে এই মস্‌জিদের খ্যাতি ছিল।

নীচে, সানের উপর 'তুড়ুক্-তাড়ুক্' লম্ফঝম্ফ!...বাচ্ছারা পিছনে-পিছনে চলিয়াছে—তিনটা ছাগল প্রাসাদের মধ্যে প্রবেশ করিল এবং কোন ইতস্তত না করিয়া, যেন চিরাভ্যস্ত এইভাবে আমার এই উপরের বারাণ্ডায় উঠিয়া আসিল এবং মাধ্যাহ্নিক নিদ্রার জন্য ছায়ায় আসিয়া শয়ন করিল। কতকগুলি কাক এবং কতকগুলি ঘুঘুও আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিল। সকলেই এখন ঠাণ্ডা জায়গা খুঁজিতেছে এবং ছায়ায় বসিয়া নিদ্রা যাইবার উদ্যোগ করিতেছে। এখন নিস্তব্ধতার একাধিপত্য; সেই উড়ন্ত মরা-পাতার মর্ম্মরশব্দও এখন আর শুনা যায় না; কেন না, অন্যান্য পদার্থের ন্যায় বায়ুও এখন নিদ্রামগ্ন। আমার ঢাকা-বারাণ্ডার প্রান্তদেশে একটি ক্ষুদ্র গবাক্ষ আছে, সেখান হইতে বহির্দ্দেশ দেখা যায়; সেখান হইতে আকাশও দেখা যাইবার কথা: কিন্তু না, দেখিলাম শুধু গোলাপী 'জমি'র উপর একটা শাদা জমি যেন অস্পষ্ট দূরদিগন্তে সটানভাবে বিলম্বিত; দেখিলাম বৃহৎ মিনারের পার্শ্বদেশ, তাহার পাথরের গোলাপী রং এবং তাহাতে যে মার্ব্বেলের টুক্‌রাসকল বসানো আছে, তাহার শাদা রং।...

* স্মৃতিস্তম্ভটি ২০ ফিট উচ্চ; উহার শিলালিপিতে এইরূপ লিখিত আছে যে, বাহ্লিকদিগের উপর জয়লাভ করিয়া রাজা ধব এই স্মৃতিস্তম্ভটি উঠাইয়াছেন। বোধ হয় •৩ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি কোন সময়ে। প্রাচীনকালের ইহা একটি অপূর্ব্ব অতুলনীয় স্মৃতিস্তম্ভ।

যে বারাণসীসম্বন্ধে আমি ভয়ে-ভয়ে আছি, সেই বারাণসী-অভিমুখে যাইবার পথে এইটি আমার শেষ আড্ডা; ছুইদিনের মধ্যেই আমি সেখানে পৌঁছিব; সেখানে গিয়া নিশ্চয়ই বিড়ম্বিত হইব, কিন্তু সেই মহাবিড়ম্বনা হইতে এখন আর পিছাইবার জো নাই।...এই সব ধ্বংসাবশেষের রহস্যময় শান্তির মধ্যে, সেই বিষয়ে আমি অনেক চিন্তা করিয়াছি; আমার মন সেই সাধুসন্ন্যাসীদিগের গৃহাভিমুখে ধাবিত হইতেছে যাঁহাদের শাকান্নের আতিথ্য —যাঁহাদের অদ্ভুত বিস্ময়জনক আতিথ্য আমি গ্রহণ করিব বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছি।...

কিন্তু চারিদিক্‌কার জড়তাপ্রভাবে আমার মন নিদ্রা ও স্বপ্নে অভিভূত হইলেও, আমার কল্পনাকে এখনো সেই বৃহৎ মিনারটি অধিকার করিয়া রহিয়াছে—যাহা এক্ষণে আমার খুবই নিকটে রাজসিংহাসনে বিরাজমান। গল্প আছে, রাজকন্যার খেয়াল হইল, দিগন্তপটে দূরবাহিনী একটি নদী দেখিবেন; রাজা স্বীয় দুহিতার খেয়াল চরিতার্থ করিবার জন্য ঊর্দ্ধগামী নদীর আকারে ঐ মিনার নির্ম্মাণ করাইলেন। আমার বারাণ্ডার জানালা দিয়া উহা যেমন স্পষ্ট দেখা যায়, এমন আর কোথা হইতেও নহে। একটা গোলাপী-রঙের দ্বারপ্রকোষ্ঠের পার্শ্বদেশে, ঐ গোলাপী মিনারটি অমলশুভ্র আকাশ ভেদ করিয়া ঊর্দ্ধে উঠিয়াছে। উহার তন্বী শ্রী, উহার উচ্চতা দর্শনে নেত্র বিহ্বল হইয়া পড়ে; অন্যান্য জানিত মিনার ও মিনারেটের যেরূপ পরিমাণ, * তাহা ছাড়াইয়া উঠিয়াছে; তলদেশ যেরূপ ফুলিয়া উঠিয়াছে, তাহাতে মনে হয়, যেন মিনারটি ঝুঁকিয়া রহিয়াছে; তা ছাড়া, বড়ই আশ্চর্য্য —এমন যে চমৎকার জিনিষ—এখনো এমন অক্ষত ও অক্ষুণ্ণ—উহা ধ্বংসাবশেষ-বিকীর্ণ মরুভূমির মধ্য হইতে উত্থিত হইয়াছে। উহার পাথর

* এই মিনারটি ২৪০ ফাট্‌ উচ্চ; ইহা প্রাচীন ভারতের একটা পরমাশ্চর্য্য সামগ্রী।

এমন মসৃণ ও উহার উপাদান-রেণু এমন সূক্ষ্ম যে, এত শতাব্দী হইয়া গেল, তবু উহাতে ‘মোর্চ্চে’ ধরে নাই এবং উহার রং এখনো যেন টাটকা রহিয়াছে *। গোলাকার খোদিত-‘খোল’, যাহা তলদেশ হইতে চূড়া পর্য্যন্ত উঠিয়াছে, উহা স্ত্রীলোকদিগের গাউনের একপ্রকার রেশ্‌মি ভাঁজের মত; ছাতা বন্ধ করিলে যেরূপ ভাঁজ পড়ে, সমস্ত যেন সেইরূপ ভাঁজবিশিষ্ট। সমস্তটা দেখিলে মনে হয়, যেন অর্গ্যান্‌-পাইপের একটা বাণ্ডিল, বড়-বড় তালকাণ্ডের একটা গুচ্ছ; এবং বিভিন্ন উচ্চদেশে যেন একএকটা আংটার মধ্যে ঐগুলা আবদ্ধ—যাহাকে আংটা বলিতেছি, উহা পাথরের বারণ্ডা-ঘের; শাদা খচিত-কার্য্যের আকারে মুসলমানি লিপির দ্বারা ঐ সকল বারণ্ডা সমাচ্ছন্ন…

আমি প্রায় ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম। সহসা মানুষের পায়ের শব্দ—দ্রুতগমনের শব্দ! এত ঘণ্টা নিস্তব্ধতার পর, এ একটা অচিন্তিতপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন। ১০জন লোক, একঘেয়ে-লাল বড়-বড় পাথরের উপর দেখা দিল; উত্তর প্রদেশের মুসলমান, ছুঁচাল টুপি দেখিয়া আফ্‌গান বলিয়া চিনিলাম; পাগ্‌ড়ির প্যাঁক এত নীচে দিয়া গিয়াছে যে, উহাদের কান ও চোখের কোণ তাহাতে ঢাকিয়া গিয়াছে, কেবল শুকচঞ্চু-নাসিকামাত্র বাহির হইয়া আছে। দাড়ির রং মিষ্‌-কালো। উহারা খুব দ্রুত চলিতেছে; মুখে খলতা ও বদমাইসি প্রকাশ পাইতেছে। আমার কোটরে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া, আমি যে উপরে আছি তাহা ইঙ্গিতেও প্রকাশ না করিয়া, উহাদের দেখিয়া আমোদ উপভোগ করিতেছিলাম। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, উহারা ভক্ত তীর্থযাত্রী, ভক্তির দ্বারা আকৃষ্ট হইয়াই এইখানে আসিয়াছে। লুপ্তপ্রায় মস্‌জিদের সুন্দর দ্বারপ্রকোষ্ঠের সম্মুখে আসিয়া উহারা দাঁড়াইল; সমাধিস্থান চুম্বন করিবার জন্য সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইল; তাহার পর তাড়াতাড়ি উঠিয়া আরো দূরে চলিয়া গেল; ভগ্নাবশেষের মধ্যে কোথায় মিলাইয়া গেল—আর দেখা গেল না।

এখন প্রায় তিনটা বাজিয়াছে। আবার জীবন-উদ্যম আরম্ভ হইল। সবুজ টিয়াগুলা খিলানের গর্ত্ত হইতে বাহির হইল, খোদাই-কাজের ফাঁকের ভিতর পায়ের নখ বসাইয়া কি করিবে ভাবিতে লাগিল, বহির্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল; তাহার পর চীৎকার করিতে করিতে সাঁ করিয়া উড়িয়া গেল। ছাগত্রয়ও জাগিয়া উঠিল, মুড়া ও শুক্না ঘাসের সন্ধানে বাচ্ছাদের লইয়া বাহির হইল। এবং আমিও ছায়াদেহসার নগরটিতে ভ্রমণ করিবার জন্য নীচে নামিলাম।

গৃহের ভগ্নাবশেষ, মন্দিরের ভগ্নাবশেষ, প্রাসাদ ও মস্‌জিদের ভগ্নাবশেষ; হেথা-হোথা শীর্ণ গাভীবৃন্দ প্রস্তরাদির মধ্যে তৃণচর্ব্বণের চেষ্টা করিতে করিতে ক্রমে প্রাচীরবদ্ধ সেই শ্মশান-বিষণ্ন ভূমিখণ্ডের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িল। যাহারা গরু চরাইতে আসিয়াছিল, সেই বুনো রাখালেরা চাপা আওয়াজে বাঁশী বাজাইতেছিল। তাহাদের মুখে চিন্তার ভাব, ভয়ের ভাব; চতুর্দ্দিকস্থ দেবালয়ের ধ্বংসদশা তাহাদের মনে এই ভীতির উদ্রেক করিয়াছে। চারিদিক্ হইতেই দেখা যায় ঐ গোলাপী মিনারটি মাথা তুলিয়া রহিয়াছে; এই সার্ব্বভৌম ধ্বংসদৃশ্যের মধ্যে, উহা যেন সাক্ষিরূপে দণ্ডায়মান।

অস্পষ্ট-অনির্দ্দেশ্য চৌমাথা-রাস্তার উপর, কতকগুলা দেয়ালের গায়ে এখনো কতকগুলা গবাক্ষ রহিয়াছে; এখনো কতকগুলা বারণ্ডা বাহির হইয়া রহিয়াছে; পূর্ব্বে সেখান হইতে সুন্দরীরা বেগ্‌নী পরিচ্ছদে আচ্ছাদিত গজবৃন্দের গমনাগমন, সারিবন্দি বৃহৎ ছত্রের উৎসব-ঠাট্, অশ্বারোহী যোদ্ধ্‌বর্গের রণযাত্রা, গৌরবান্বিত, প্রাচীনকালের জনতা—এই সমস্ত নিরীক্ষণ করিত।...আহা। লুপ্ত রাজপথের কোণে-কোণে অবস্থিত এই সব নহবৎখানার কি বিষণ্ন মুখশ্রী!

১৮২৭ খৃষ্টাব্দে ইহার পুনরুদ্ধার হয়।

চিতাসজ্জা।

শীতকাল; গঙ্গার উপর; ধূসরবর্ণ সন্ধ্যা আগতপ্রায়। দিবাবসানে পবিত্র নদীবক্ষ হইতে কুয়াসা উত্থিত হইয়া, সন্ধ্যা না হইতে হইতেই অস্তমান সূর্য্যকে ম্লান করিয়া ফেলিল। অবনত মন্দির ও চূর্ণপ্রাসাদসমন্বিত বারাণসীর বিপুল ছায়াচিত্র পশ্চিমদিগের সম্মুখে খাড়া হইয়া উঠিয়াছে। পশ্চিমগগন এখনো প্রভাময়।

আর-সব নৌকা নিদ্রিত; কেবল আমার নৌকাখানি চলিতেছে,—এই পবিত্র নগরীর পাদদেশ দিয়া, উহার বিরাট্ ছায়াতল দিয়া, অত্যুচ্চ ভগ্নমন্দির ও অতীব ঘোরদর্শন প্রাসাদাদির নীচে দিয়া—ধীরে ধীরে চলিতেছে।

তিনবৎসরব্যাপী যে অনাবৃষ্টি দেশে দুর্ভিক্ষ আনিয়াছে, তাহাতেই নদী শুকাইয়া গিয়াছে; এবং এই কারণেই সকল জিনিষেরই উচ্চতা যেন আরো বেশী বলিয়া মনে হইতেছে। এই শুষ্কতাবশতই বারাণসীর অনাদিকালের মূলগুলা পর্য্যন্ত, ভিত্তিগুলা পর্য্যন্ত অনাবৃত হইয়া পড়িয়াছে। শতশত বৎসর হইতে, যে সকল প্রাসাদ জলের নীচে নামিয়া গিয়াছিল, তাহারই খণ্ডাংশসমূহ অচল নৌকাগুলার মধ্য হইতে ইতস্তত মাথা বাহির করিয়া রহিয়াছে। জলমগ্ন জনবিস্মৃত ভগ্নাবশেষগুলা আবার দেখা দিতে আরম্ভ করিয়াছে। বৃদ্ধা গঙ্গার ভগ্নাবশেষপূর্ণ রহস্যময় তলদেশ অল্প অল্প দেখা যাইতেছে।

এই যে সব তটভূমি বিবস্ত্রা হইয়া পড়িয়াছে, ইহাতেই এই গঙ্গাদেবীর বিকট স্বৈরলীলার পরিচয় পাওয়া যায়; ইনি পালনকর্ত্রী ও সংহারকর্ত্রী—উভয়ই। যিনি জনয়িতা ও সংহারকর্ত্তা, সেই শিবের সহিত ইঁহার তুলনা হইতে পারে; প্রাবৃটে যখন নদী ভরিয়া উঠে, তখন তাঁহার ভীষণ বেগ কেহই প্রতিরোধ করিতে পারে না। সর্ব্বোন্নত পাষাণপ্রাচীর,

সমগ্র প্রাকার-বপ্রাদি একটা অখণ্ড প্রস্তরখণ্ডের মত নদীর উচ্চতটের উপর গড়াইয়া পড়িয়াছে এবং পড়িয়া সেইখানেই থাকিয়া গিয়াছে ; কোন জাগতিক প্রলয়বিপ্লবের পর যেভাবে ঝুঁকিয়া থাকে, সেইরূপ অচল ভঙ্গীসহকারে বিস্ময়স্তম্ভিত হইয়া যেন আপনার আসন্নপতন প্রতিমুহূর্ত্তে প্রতীক্ষা করিতেছে।

ত্রিশচাল্লিশ ফীট্ উচ্চতার কমে নিরাপদ্ স্থানের আরম্ভ হয় নাই ; সেইখানেই মনুষ্যগৃহের প্রথম গবাক্ষ উদ্ঘাটিত হইয়াছে, বারণ্ডা বাহির হইয়াছে, বলভী উঠিয়াছে। আরো নীচে গঙ্গারই একাধিপত্য, বৎসরের মধ্যে অন্তত একবার সকলকেই উহাতে ডুব দিতে হইবে ; চিরদিনই উহার পবিত্র মৃত্তিকা লইয়া গায়ে লেপিতে হইবে ; উহারই জন্য নিবাস-আদি নির্ম্মাণ করিতে হইবে ; দুর্গের গুপ্ত-গারদের মত প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড চতুষ্কমণ্ডপ—তাহার মধ্যে গুরুভার, স্থূল ও খর্ব্বকায় দেববিগ্রহ রক্ষিত, প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড ভিত্তিভূমি, বিকট-ভীষণ প্রস্তরস্তূপ—এই সমস্ত অচল-প্রতিষ্ঠ বলিয়া মনে হয় ; কিন্তু কোন-কোন সময়ে নদীর স্রোতে এরূপ ভীষণ বেগ উপস্থিত হয় যে, উহাদিগকে ঝাঁপাইয়া তুলে—গ্রাস করিয়া ফেলে।

গৃহাদির ঊর্দ্ধে, প্রাসাদাদির ঊর্দ্ধে, হিন্দুমন্দিরের অসংখ্য চূড়া পশ্চিম-গগনে সমুত্থিত ; রাজস্থানের ন্যায় এখানকার মন্দিরের চূড়াগুলাও বড়-বড়-প্রস্তরময় ঝাউএর আকারে গঠিত, কিন্তু এখানকার এই মন্দির-চূড়াগুলা লাল—ঘোর লাল,—তাহার সহিত ম্লানাভ সোণালি-কাজ মিশ্রিত। সমস্ত বারাণসীর মন্দিরচূড়াগুলি রক্তিম—কেবল চূড়ার অগ্রবিন্দুগুলি সোনালী। নদী যেমন-যেমন বাঁকিয়া গিয়াছে—সেই অনুসারে নগরীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত প্রস্তরময় সোপানাবলী তটভূমির উপরে যেন পক্ষ বিস্তার করিয়া রহিয়াছে—যেন একটা প্রকাণ্ড পাদপীঠ (pedestal) উপর হইতে—যেখানে মানুষের বসতি,

সেইখান হইতে—নামিয়া-আসিয়া পবিত্র জলরাশির অভিমুখে প্রসারিত হইয়াছে।

আজিকার সন্ধ্যায়, এই বৃহৎ ঘাটের শেষ-ধাপটি পর্য্যন্ত, এমন কি, ঘাটের ভিত-দেয়ালটি পর্য্যন্ত বাহির হইয়া পড়িয়াছে। দুর্বৎসর ছাড়া এই ভিত-দেয়াল কখনো বাহির হইয়া পড়ে না—ইহা দুর্ভিক্ষ ও দুঃখদৈন্যের পূর্ব্বসূচনা। এই মহিমান্বিত বৃহৎ সোপানপংক্তি এখন একেবারেই জনশূন্য—এখানে ফলবিক্রেতা, পবিত্র গাভীবৃন্দের জন্য যাহারা তৃণবিক্রয় করে সেই তৃণবিক্রেতা, বিশেষত এই লোকপাবনী পরমরাধ্যা বৃদ্ধা নদীর উপর যে পুষ্পাঞ্জলি নিক্ষিপ্ত হয়, সেই সকল ফুলের তোড়া ও ফুলের মালাবিক্রেতা—ইহাদের দ্বারাই সোপানের ধাপগুলা দিবা দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত আচ্ছন্ন হইয়া থাকে। এবং অসংখ্য বাঁখারির ছাতা—যাহা সকলকেই ছায়াদান করে,—সেই সকল ছাতার বাঁট মাটির মধ্যে স্থায়িভাবে পোঁতা এবং ঐ সকল ছাতা যেন প্রাতঃসূর্য্যের প্রতীক্ষায় উদয়াচলের দিকে ঝুঁকিয়া রহিয়াছে।

এই ভাঁজবিহীন আতপত্রগুলি দেখিতে কতকটা ধাতুময় চাকৃতির মত, এবং যতদূর দৃষ্টি যায়, নগরীর সমস্ত প্রস্তরময় তলদেশ এই সকল আতপত্রে সমাচ্ছন্ন। দেখিলে মনে হয়, যেন ঢালের ক্ষেত্র প্রসারিত।

ম্লানপ্রভ আলোকচ্ছায়া সন্ধ্যার আগমনবার্ত্তা জানাইয়া দিল এবং হঠাৎ শৈত্যের আবির্ভাব হইল। বারাণসীতে আসিয়া ধূসর আকাশ ও শীতের লক্ষণ দেখিব, এরূপ প্রত্যাশা করি নাই।

প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড তমোময় পাষাণপিণ্ডের পাদদেশ দিয়া, তটভূমি ঘেঁষিয়া আমার নৌকা স্রোতের মুখে নিঃশব্দে চলিয়াছে।

নদীতটের একটা বীভৎস কোণে, প্রাসাদের ভাঙাচূরার মধ্যে, কালো মাটি ও পাঁকের উপর, তিনটি ছোট-ছোট চিতা সজ্জিত; 'ন্যাকড়া'-পরা কতকগুলা কদাকার লোক তাহাতে আগুন ধরাইবার চেষ্টা করিতেছে;

উহা হইতে ধোঁয়া বাহির হইতেছে—কিন্তু আগুন জ্বলিতেছে না। এই চিতাগুলা অদ্ভুদ আকারের,—দীর্ঘ ও সরু। এইগুলা শবদাহের কাঠ। নদীর দিকে পা করিয়া প্রত্যেক শব আপন-আপন চিতাশয্যায় শয়ান; কাছে গিয়া দেখিতে পাইলাম, ডালপালার টুক্‌রার মধ্যে পায়ের বুড়ো-আঙুল কানি দিয়া জড়ান; কানি হইতে আঙুলটা একটু বাহির হইয়া রহিয়াছে—উঠিয়া রহিয়াছে। এই চিতাগুলা কি ক্ষুদ্রাকার; সমস্ত শরীরটা এত অল্প কাষ্ঠে দগ্ধ হয়!

আমার নৌকার হিন্দু-মাঝি আমাকে বুঝাইয়া দিল—"ও-সব গরিবদের চুলো। ওর চেয়ে ভাল কাঠ কিন্‌তে ওদের পয়সা জোটে না—তাই খারাপ ভিজে-কাঠ এনেছে।"

এক্ষণে পূজা-অর্চ্চনার সময় উপস্থিত। মহাসমারোহে সান্ধ্যপূজার অনুষ্ঠানাদি আরম্ভ হইল। উত্তরীয়বস্ত্রে অবগুণ্ঠিত হইয়া ব্রাহ্মণেরা সোপান-ধাপ দিয়া নামিতে লাগিল; পবিত্র জল লইবার জন্য, স্নানের জন্য, এবং ব্রাহ্মণের অবশ্য-পাল্য কতকগুলি ধর্ম্মানুষ্ঠান সম্পাদনের জন্য তারা সিঁড়ির নীচে পর্য্যন্ত নামিয়া আসিল; পাথরের ধাপগুলা, যাহা একেবারেই জনশূন্য ছিল, এক্ষণে নিঃশব্দে জনপূর্ণ হইল; সর্ব্বসাধারণের পূজা-অর্চ্চনার জন্য নদীর ধারে অসংখ্য ডোঙা, প্রাসাদমন্দিরাদির ছায়াতলে অসংখ্য বাঁশের মাচা সাজান রহিয়াছে; এই সমস্ত বসিবার স্থান ভক্তজনে পূর্ণ হইয়া গেল; তাঁহারা সংযতচিত্ত হইয়া স্থিরভাবে ধ্যানাসনে উপবিষ্ট হইলেন। এবং অনতিবিলম্বেই, এই বিপুল জনতার চিন্তারাশি সেই অতলস্পর্শ পরপারের অভিমুখে উড্ডীন হইল—যাহার মধ্যে কিছুকাল পরে আমাদের সকলেরই এই ক্ষণস্থায়ী 'অহং'গুলা বিলীন হইবে—তমসাচ্ছন্ন হইয়া পড়িবে।

সেই শ্মশানকোণটিতে সেই ধূমায়মান তিনটি চিতার সন্নিকটে, কাপড়-জড়ানো আরো দুইটি মনুষ্যমূর্ত্তি দেখা যাইতেছে—উহারা নদীর জলে

অর্দ্ধনিমজ্জিত ; উহাদের প্রত্যেকেই একএকটা হাল্‌কা খাটিয়ার উপর শুইয়া আছে ; উহাদের জন্য যে চিতা সজ্জিত হইতেছে, তদুপার স্থাপিত হইবার পূর্ব্বেই পার্শ্ববর্ত্তী অন্যান্য জীবন্ত লোকের ন্যায় উহারাও গঙ্গার পূতজলে স্নান করিয়া লইতেছে।

পরপারের তটভূমি—পঙ্ক ও তৃণাদিতে আচ্ছন্ন অসীম ক্ষেত্র, যাহা প্রতিবৎসরেই গঙ্গার মধ্যে নিমজ্জিত থাকে—এই তটভূমির উপর সন্ধ্যার কুয়াসা ক্রমেই ঘনাইয়া আসিতেছে ; প্রথমে ঐ তটভূমির উপর একট অনির্দ্দেশ্য ধোঁয়া-ধোঁয়া ভাব দেখা যাইতেছিল ; ক্রমে এই সব কুয়াসা আকাশের মেঘের মত একএকটা সুগঠিত আকার ধারণ করিতে লাগিল। মনে হইল, যেন এই পবিত্র বৃহৎ-নগরী, পদতলস্থ জলদ-চূড়াগুলা নিরীক্ষণ করিবার জন্য অর্দ্ধচক্রাকারে খাড়া হইয়া উঠিয়াছে।

শ্মশানের ঐ কোণটিতে একজন যুবা সন্ন্যাসী দণ্ডায়মান, বক্ষের উপর বাহুদ্বয় আড়াআড়িভাবে বিন্যস্ত এবং ঐ আর্দ্র চিতার মধ্যে কি-একটা ঘোর ব্যাপার চলিতেছে, তাহাই দেখিবার জন্য সেই দিকে মাথা ঝুঁকাইয়া রহিয়াছে। তাহার চুলগুলা কাঁধের উপর ঝুলিয়া পড়িয়াছে, তাহার নগ্নদেহ—যাহা এখনো পর্য্যন্ত সুন্দর ও মাংসল—শ্বেতচূর্ণে আচ্ছন্ন ; এবং যেরূপ ফুলের মালা প্রতিদিন নদীতে নিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে, সেইরূপ একটা ফুলের মালা তাহার বক্ষের উপর বিলম্বিত।

চিতাগুলার একটু উপরে,—বহুকাল হইতে নদীব উপর গড়াইয়া পড়িয়াছে এমন একটা পুরাতন প্রাসাদের উপরিভাগে, ধূতি-কাপড়ে আচ্ছাদিত ৫।৬জন লোক উবু হইয়া বসিয়া আছে, ঐ সন্ন্যাসীর মত উহারাও অনন্যমনে ঐ দিকে তাকাইয়া রহিয়াছে! উহারা ঐ মৃতদিগের আত্মীয়জন ; বিশেষত উহাদের মধ্যে দুইজন, যাহাদের দেহ বার্দ্ধক্যে নত হইয়া পড়িয়াছে, উহারা—তিনটা চিতার মধ্যে যেটি সর্ব্বাপেক্ষা ছোট ও গরিব-ধরণের, সেইটির দিকে আকুলভাবে তাকাইয়া রহিয়াছে। আমার হিন্দুমাঝি বলিল;

"ওটি দশবৎসরের একটি ছোট ছেলে,—উহাকে পোড়াইবার জন্য উহারা খুব অল্প কাঠ আনিয়াছে।" ঐ চিতা হইতে ধূমরাশি উত্থিত হইয়া ঐ অচল-মূর্ত্তি লোকগুলার দিকে ধাবিত হইল। যাহারা দাহ করিতেছিল, তাহাদের মধ্যে দুইজন একটা অতীব কদর্য্য ন্যাকড়া কটিদেশ হইতে টানিয়া-লইয়া চিতায় ক্রমাগত বাতাস দিতে লাগিল—ক্রমে চিতাটা ধোঁয়াইতে আরম্ভ করিল; এইবার উহাদের শিশুটির দেহ ভস্মসাৎ হইবে। এবং চতুর্দ্দিকের এই সমস্ত মন্দিরপ্রাসাদাদি—যাহা কুয়াসাচ্ছন্ন আকাশ ভেদ করিয়া ঊর্দ্ধে উঠিয়াছে, উহারা সদর্প ঔদাস্যসহকারে ও পরমনির্ব্বিকারচিত্তে এই শ্মশান-কোণটির উপর দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া দরিদ্র শবের বিলম্বিত দাহকার্য্য অবলোকন করিতেছে—সেই শ্মশান, যেখানে সমস্ত রক্তমাংসের শেষ হয়, মৃত্যুতে সমস্ত দুঃখকষ্টের অবসান হয়।

এই সময়ে, বিরাট্ সোপানাবলীর শীর্ষদেশে, চিতার আর একটি নূতন আহুতি আসিয়া উপস্থিত হইল; এই পঞ্চম শবটি, ঐ উপরের একটি ছায়াময় সরুপথ হইতে বাহির হইয়া এই বৃদ্ধা গঙ্গার অভিমুখে আসিতেছে; উহারও ভস্মরাশি গঙ্গায় নিক্ষিপ্ত হইবে। ডুলির আকারে বাঁশের কতকগুলা শাখা পাশাপাশি বাঁধা, তাহার উপর শবটি রহিয়াছে; 'ট্যানা'-পরা অর্দ্ধনগ্ন ছয়জন লোক উহাকে লইয়া আসিতেছে। শবের পা সম্মুখে বাহির হইয়া রহিয়াছে এবং পথটা এত বেশী ঢালু যে, মনে হইতেছে যেন শবটা প্রায় খাড়া হইয়া রহিয়াছে। কেহই অনুগমন করিতেছে না, কেহই কাঁদিতেছে না। কতকগুলি বালক, যাহারা স্নানের জন্য নীচে নামিতেছে, তাহারাও যেন উহাকে দেখিয়াও দেখিতেছে না, উহার চতুর্দ্দিকে উৎফুল্লভাবে লাফালাফি করিতেছে। বারাণসীতে আত্মাই শুধু ধর্ত্তব্যের মধ্যে; তাই আত্মা চলিয়া গেলে যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাকে তৎক্ষণাৎ বিযুক্ত ও অপসারিত করা হয়। প্রায় দরিদ্রেরাই শবের সঙ্গে সঙ্গে শ্মশানে আইসে; তাহাদের ভয় হয়, পাছে দাহের জন্য কাঠে না

কুলায় এবং পাছে দাহের পর দাহকেরা শবের অদগ্ধ অংশ গঙ্গায় নিক্ষেপ করে।

বড়-বড় উজ্জ্বল নক্‌সা-কাটা একটা লাল মল্‌মল্‌বস্ত্রে এই শবের দেহ আচ্ছাদিত; এবং উহার কটিদেশে কতকগুলা শাদা ও লাল ফুল গোঁজা। ইহা যে একটি রমণীমূর্ত্তি, প্রথমত এই পুষ্পসজ্জাতেই তাহা জানা যায়; তা ছাড়া, মৃত্যুর হিমময়-বিকৃতাবস্থা-সত্ত্বেও পাত্‌লা কাপড়ের ভিতর দিয়া উহার নারীসৌন্দর্য্য দিব্য প্রকাশ পাইতেছে! আমার মাঝি বলিল—"উনি একজন ধনিলোকের মেয়ে; দেখ না, ওঁর জন্য কেমন খাসা কাঠ আনা হয়েছে।"

এই শবের দাহ দেখিবার প্রতীক্ষায়, এই গঙ্গার উপর,—এই আবিল, পীতাভ, পঙ্কিল জলের উপর আমার নৌকা থামাইলাম,—যে জল তৃণাদিতে, আবর্জ্জনারাশিতে, ফুলের পাপ্‌ড়িতে, ফুলের মালায় নিত্য আচ্ছন্ন এবং যাহা হইতে পচাগন্ধ নিয়ত উচ্ছ্বসিত হইতেছে। গোলাপ, রজনীগন্ধ, বিশেষত হল্‌দেফুল গাঁদা, কুঁদফুলের মালা প্রভৃতি যাহা এই পবিত্র বৃদ্ধা গঙ্গার বক্ষে পুষ্পাঞ্জলিরূপে প্রতিদিন নিক্ষিপ্ত হয়—এই সমস্ত ফুল জলের উপর ভাসিতেছে, গাঁজিয়া উঠিতেছে। ধবল ফেনপুঞ্জ, কিনারায় সঞ্চিত কাদার ফেনা, তাহার উপর ছড়ান গাঁদাফুল—ইহার সহিত মনুষ্যবিষ্ঠা মিশ্রিত হইয়া সমস্তই পচিয়া উঠিয়াছে।

শববাহকেরা, একটা পরিত্যক্ত জঘন্য জিনিষের মত এই সুন্দরীর মৃতদেহকে লইয়া নীচে নামিতেছে; যখন একেবারে জলের ধারে আসিল—আমার খুব নিকটে আসিল,—অন্তর্জ্জলীর জন্য শবকে জলের মধ্যে নিমজ্জিত করিল; এবং উহার মধ্যে একজন লোক শবের উপর ঝুঁকিয়া জন্মের মত শেষবার তাহার মুখটি দেখিয়া লইল এবং অন্ত্যেষ্টির পদ্ধতি অনুসারে করতলে একটু গঙ্গাজল লইয়া তাহার মুখের মধ্যে ঢালিয়া দিল। সেই সময়ে আমি দেখিতে পাইলাম—

দুইটি দীর্ঘায়ত চক্ষু মুদ্রিত—নেত্রপল্লব কৃষ্ণ পক্ষ্মরাজিতে বিভূষিত; ঋজু নাসিকা,—নাসিকার পার্শ্বদ্বয় সুকুমার; ফুল্ল কপোল; ওষ্ঠাধরের গঠন অতীব সুন্দর—ধবলকান্তি মুখের উপর ওষ্ঠদ্বয় অর্দ্ধোদ্ঘটিত হইয়া রহিয়াছে। রমণী যে পরমা সুন্দরী ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই; যখন ইঁহার দেহ সবল-সুস্থ ছিল, পূর্ণ-যৌবনে ইঁহার রূপ ঢল্‌ঢল্ করিতেছিল, বোধ হয় সেই সময়ে হঠাৎ কোন রোগে আক্রান্ত হইয়া ইনি মৃত্যুগ্রাসে পতিত হন; তাই ইঁহার মুখে এখনো বিকৃতির লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। তা ছাড়া, ইনি যে লাল বস্ত্রখণ্ডে আচ্ছাদিত, তাহা জলে ভিজিয়া স্বচ্ছ হইয়া উঠিয়াছে এবং উঁহার বক্ষ ও কটিদেশের উপর এমন আঁটিয়া ধরিয়াছে যে, উঁহার সৌন্দর্য্যকে যথেষ্টপরিমাণে ঢাকিয়া রাখিতে পারিতেছে না।...এই সৌন্দর্য্যরাশি কতকগুলা স্থূলরুচি বাহকের হস্তে সমর্পণ করা হইয়াছে এবং মুহূর্ত্তের মধ্যে সমস্তই ধ্বংস হইয়া যাইবে।...আর যে দুইজনের শব সেখানে অপেক্ষা করিতেছিল, তাহার মধ্যে একজনের পালা এইবার উপস্থিত; ইহা একজন পুরুষের শব, শাদা মলমলে আচ্ছাদিত; পবিত্র জলে স্নান করাইয়া, তাহাকেও চিতার উপর রাখা হইল। ইহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এখনো কঠিন ও আড়ষ্ট হইয়া যায় নাই; মুহূর্ত্তের জন্য উহার মস্তক একবার ডাইনে ও একবার বামে ঢলিয়া পড়িল; তাহার পর, কাষ্ঠউপাধানের উপর একেবারে স্থির হইয়া রহিল; ডাল-পালায় উহাকে আচ্ছাদিত করিয়া, পায়ের দিকে আগুন ধরান হইল। সেই ছোট বালকটির মৃতদেহ এখনো দাহ হইতেছে; তাহার কৃষ্ণাভ ধূমরাশি তাহার সেই জনকজননীর দিকে উড়িয়া আসিতেছে;—সেই অচলমূর্ত্তি দুইটি প্রাণী, যাহারা একদৃষ্টে তাহার দিকে তাকাইয়া রহিয়াছে।

এইবার পাখীদের শয়নকাল নিকটবর্ত্তী; ভারতে, বিশেষত বারাণসীতে পাখীদের গৌরব চিরকালই খুব বেশী; দাঁড়কাকেরা মৃত্যুকে ডাকিতেছে, পায়রার ঝাঁক, পাণ্ডুবর্ণ আকাশতলে যাতায়াত করিতেছে; এবং প্রত্যেক

মন্দিরচূড়ায় একএকটা বিশেষ ঝাঁক আছে, তাহারা সেই চূড়ারই চতুর্দ্দিকে ঘোরপাক দিয়া চক্রাকারে উড়িয়া বেড়ায়। নদীসমুত্থিত কুয়াসা ক্রমেই ঘনাইয়া আসিতেছে, সন্ধ্যাবায়ু ক্রমেই শীতল হইয়া আসিতেছে এবং গলিত দ্রব্যাদির দুর্গন্ধে ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিতেছে। সেই নবযৌবনা দেবীমূর্ত্তির চিতারোহণ দেখিবার জন্য আরো কিছুক্ষণ আমার এখানে থাকিবার ইচ্ছা ছিল; কিন্তু তাহা হইলে অনেক বিলম্ব হইবে; তা ছাড়া, বিশ্বাসঘাতক ঐ লাল বস্ত্রখণ্ড দেবীর সমস্ত দেহযষ্টিকে এমনভাবে অনাবৃত করিয়া রাখিয়াছে যে, দেখিতে বড়ই সঙ্কোচবোধ হয়; এ সময়ে এতটা দেখা একপ্রকার দেবাবমাননা;—কেন না, উনি এখন মৃত। না, যখন দাহের সময় হইবে, বরং সেই সময়ে, একটু পরে আবার এখানে অসিব। এখন এখান হইতে যাওয়া যাক্।

কি অক্লান্ত-প্রলয়ঙ্করী এই গঙ্গা! কত প্রাসাদ ইহার স্রোতে চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে! প্রাসাদসমূহের সমগ্র মুখভাগ স্খলিত হইয়া অটুটভাবে নীচে নামিয়া আসিয়াছে এবং অর্দ্ধনিমজ্জিত হইয়া ঐখানেই রহিয়া গিয়াছে। আর এখানে দেবালয়ই বা কত! নীচেকার যে সকল মন্দির নদীর খুব ধারে, উহাদের চূড়াগুলা ইটালীর ‘পিজা’-স্তম্ভের ন্যায় ঝুঁকিয়া রহিয়াছে এবং উহার মূলদেশ এরূপ শিথিল হইয়া গিয়াছে যে, প্রতি-বিধানের কোন উপায় নাই। কেবল উপরের মন্দিরগুলা প্রস্তররাশির দ্বারা—সর্ব্বকালের রাশীকৃত পাষাণভিত্তির দ্বারা সংরক্ষিত হওয়ায়, উহাদের রক্তিম চূড়াগ্রভাগ কিংবা সোনালী চূড়াগ্রভাগ এখনো সিধা রহিয়াছে এবং আকাশ ভেদ করিয়া ঊর্দ্ধে উঠিয়াছে, এবং এই প্রত্যেক চূড়ার সঙ্গে এক-এক ঝাঁক কালো পাখাও রহিয়াছে।—খুঁটিনাটি করিয়া দেখিতে গেলে, এ দেশের এই মন্দিরচূড়াগুলার আকারে একপ্রকার রহস্যময় ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। আমি ইতিপূর্ব্বে আমাদের “গোর-স্থানের বৃহৎ ঝাউগাছের” সহিত ইহার তুলনা দিয়াছি, কিন্তু কাছে

আসিয়া দেখিলে আরো অদ্ভুত বলিয়া মনে হয়; ইহা যেন, বাণ্ডিলের মত বাঁধা ছোট-ছোট চূড়ার সমষ্টি, ছোট-ছোট অসংখ্য একইরকমের জিনিষ, ইহার এই অপরিবর্ত্তনীয় আকার শতশত বৎসর হইতে সমান চলিয়া আসিতেছে। আমাদের পাশ্চাত্য বাস্তুবিদ্যার পরিজ্ঞাত কোন-কিছুরই সহিত ইহার সাদৃশ্য নাই।

এক্ষণে বারাণসীর সমস্ত ব্রাহ্মণমণ্ডলী এই গভীরসলিলা নদীর ঘাটে আসিয়া সমবেত হইয়াছে; তীরে বাঁধা ছোটছোট অসংখ্য ডিঙীনৌকা উপাসকদিগের ভারে নত হইয়া পড়িয়াছে—জলের ভিতর অনেকটা ডুবিয়া গিয়াছে। উহাদের মধ্যে কেহ বা অঞ্জলিবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে, কেহ বা জলের উপর পুষ্পনিক্ষেপ করিতেছে। এই সমস্ত লোকের উর্দ্ধদেশে ধূসরবর্ণের সোপান, ধূসরবর্ণের সোপানভিত্তি; এই সমস্ত গাঁথুনির গঠন ভারী-ধরণের ও রং পাঁকের মত। দেখিলে মনে হয়, যেন পবিত্র বারাণসীর মূলগুলা পর্য্যন্ত বাহির হইয়া পড়িয়াছে।

আবার আমার নৌকা ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল, অপেক্ষাকৃত নির্জ্জন ঘাটের সম্মুখ দিয়া চলিতে লাগিল; এই অঞ্চলটায় কেবল পুরাতন প্রাসাদ, নদীর ধারে কোন ডিঙী বাঁধা নাই। গঙ্গার উপর চতুষ্পার্শ্ব-বর্ত্তী রাজাদিগের একএকটা নিবাসগৃহ—একটু 'পোড়ো'-ধরণের—তাহারা সময়ে সময়ে সেইখানে আসিয়া বাস করেন। প্রথমেই গুরুপিণ্ডাকার প্রকাণ্ড প্রাকার সিধা উঠিয়াছে, তাহাতে কোনপ্রকার ছিদ্রপথ নাই, কেবল খুব উপরদিকে,—এই সমস্ত দুর্ভেদ্য আবাসগৃহের গবাক্ষ, বারণ্ডা, জীবন আরম্ভ হইয়াছে। আজ সন্ধ্যায় প্রাসাদের ভিতরে সঙ্গীত হইতেছে—এ সঙ্গীতের সুর চাপা, কাঁদুনে, ও অবদমের। শানাইয়ের কাঁদুনি শুনা যাইতেছে—শানাইয়ের আওয়াজটা কতকটা আমাদের hautbois-যন্ত্রের আওয়াজের মত। মাঝে মাঝে একটি মাত্র তান, একটি-মাত্র বিলাপধ্বনি উপরে উঠিতেছে, আবার মরিয়া যাইতেছে; তাহার

পর, ক্ষণকাল নিস্তব্ধ,—এই নিস্তব্ধতার সময়ে কাক একবার ডাকিয়া গেল—তাহার পরেই আবার একটা তান যেন উত্তরের মত অন্য এক প্রাসাদ হইতে আসিয়া পৌছিল। তা-ছাড়া, ঢাকঢোলের বাদ্যও শুনা যাইতেছে—যেন গুহাগহ্বরের মধ্য হইতে আওয়াজ বাহির হইতেছে। আর যেন খুব বিলম্বে-বিলম্বে ঢাকের উপর ঘা পড়িতেছে।...ঐ অতি উচ্চে, অতি দূরে, ঐ সমস্ত সঙ্গীতের রহস্যময় অনির্দ্দেশ্য বিষণ্ণ সুর আমার মাথার উপর দিয়া চলিয়া যাইতেছে—এদিকে, এই নীচে জলের উপর আমার নৌকা মৃত্যু আঘ্রাণ করিতে করিতে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে! আমার নিকট এই সমস্ত বাদ্যধ্বনি যেন সেই তরুণীর মৃত্যুজনিত শোকসঙ্গীত। সেই মৃত্যুর দৃশ্যই অষ্টপ্রহর আমার মাথায় যেন ঘুরিতেছে,—আমার কল্পনায় জাগিতেছে। আমার নিকট ইহা শোকসঙ্গীত বলিয়া মনে হইতেছে—আরো অন্যলোকের জন্য, যাহারা আর নাই—আরো অন্য জিনিষের জন্য, যাহা আর নাই।

যেমন আমি মনে করি নাই,—এই পবিত্র নগরীতে আসিয়া ধূসর আকাশ দেখিব, শীতের ভাব দেখিব, সেইরূপ ইহাও ভাবি নাই—আমার মনের ভাব পূর্ব্বের মতই থাকিবে,—পূর্ব্বেরই মত জীবজগতের ও বাহ্যজগতের নবনব সৌন্দর্য্যে বিমুগ্ধ হইব। বারাণসী—যাহার দ্বিতীয় নাই—যাহা ধর্ম্মের কেন্দ্রস্থল, যাহা পৃথিবী হইতে বিচ্ছিন্ন একটি বৃহৎ দেশের হৃদয়,—সেই বারাণসীতে আসিয়া, সাধুদের সংসর্গে ও তাঁহাদের প্রসাদে আমারও কিছু বৈরাগ্য জন্মিবে, আমিও কিছু শান্তি পাইব—এই আমার আশা ছিল। সাধুরা কৃপা করিয়া আমাকে গুহ্যধর্ম্মে অল্পস্বল্প দীক্ষা দিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছেন—এই দীক্ষার অনুষ্ঠান কল্য হইতে আরম্ভ হইবে। কিন্তু দেখ, এইখানে আসিয়া,—যাহা-কিছু দেখিতে সুন্দর, যাহা কিছু ভৌতিক, যাহা-কিছু মায়াময় ও মৃত্যুর অধীন, তাহাতেই যেন আমি পূর্ব্বাপেক্ষা আরো অধিক আসক্ত

হইয়া পড়িতেছি—ঘোরতর আসক্ত হইয়া পড়িতেছি—উদ্ধারের কোন উপায় দেখি না।...

আবার সেইসব চিতার নিকট ফিরিয়া আসিলাম।...এইবার প্রকৃত সন্ধ্যার আবির্ভাব হইয়াছে; পাখীদের আকাশভ্রমণ শেষ হইয়াছে; উহারা মন্দিরপ্রাসাদাদির প্রত্যেক কার্ণিসের উপর রাত্রিবাসের জন্য একটা দীর্ঘ রজ্জুর আকারে সারি সারি বসিয়া গিয়াছে—পাখার ঝাপ্‌টাঝাপ্‌টিতে রজ্জুটা যেন স্পন্দিত হইতেছে—আজিকার মত ইহাই উহাদের শেষ ঝাপ্‌টাঝাপ্‌টি। মন্দিরচূড়াগুলা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আর দেখা যাইতেছে না;—কালো-কালো বৃহৎ ঝাউগাছের আকার ধারণ করিয়া পাণ্ডুবর্ণ আকাশের অভিমুখে সমুত্থিত হইয়াছে। ফুল, ফুলের মালা, পত্র তৃণাদির জঞ্জাল টানিয়া-লইয়া আমার নৌকা আবার সেই চিতার নিকট ফিরিয়া আসিল।

একটা স্থূল গন্ধ,—মৃত্যুর গন্ধ, বীভৎস গলিতদ্রব্যের গন্ধ ক্রমশ বাড়িতে লাগিল। ঠিক্ যেখানটায় চিতার ধোঁয়া উঠিতেছে, তাহার নিকটে উপনীত হইবার জন্য আবার আমাকে সেই ধ্যানমগ্ন লোকদিগের পাশ দিয়া—সেই অচলমূর্ত্তি ব্রাহ্মণদিগের ভারে ভারাক্রান্ত অসংখ্য ডিঙীর পাশ দিয়া যাইতে হইল। এই সমস্ত লোক, যাহারা যোগানন্দে আত্মহারা, যাহাদের মুখ ভস্মে আচ্ছন্ন, যাহাদের জ্বলন্ত চক্ষু আমার চক্ষুর উপর নিপতিত—অথচ যাহারা আমাকে দেখিয়াও দেখিতেছে না—ইহাদের গা ঘেঁষিয়া আমার নৌকা চলিতেছে, তবু যেন আমার মনে হইতেছে—আমাদের মধ্যে কি-একটা অনির্দ্দেশ্য দূরত্বের ব্যবধান রহিয়াছে।

শ্মশানের সেই কোণটিতে আমার পৌঁছিতে একটু বেশী বিলম্ব হইল। একটা বৃহৎ চিতা—ধনিলোকের চিতা দাউ-দাউ করিয়া জ্বলিতেছে—এবং তাহা হইতে স্ফুলিঙ্গ ও শিখারাশি প্রবলবেগে ঊর্দ্ধে উঠিতেছে। চিতার মাঝখানে সেই তরুণী, তাহার আর কিছুই দেখা

যাইতেছে না, শুধু দেখা যাইতেছে তাহার শোকম্লান একটি পা—একটি-মাত্র পা; যেন অতিমাত্র যন্ত্রণায়, ঐ পায়ের আঙুলগুলা পরস্পর হইতে অদ্ভুতভাবে ছাড়া-ছাড়া হইয়া রহিয়াছে। চিতা-আলোকের সম্মুখে সেই পা-খানির কৃষ্ণবর্ণ ছায়াচিত্র অতীব পরিস্ফুটভাবে প্রকাশ পাইতেছে।

একটা ভাঙা-দেয়ালের উপরে ঘোম্‌টা-টানা, অদৃশ্যমুখশ্রী চারজন নূতন লোক উবু হইয়া বসিয়া বেশ নির্ব্বিকারচিত্তে—উদাসীন-ভাবে বলিলেও হয়—এই তরুণীকে নিরীক্ষণ করিতেছে। উহারা বোধ হয় তাহার আত্মীয়-স্বজন, একই বংশের লোক—তরুণীর রূপলাবণ্যের অঙ্কুর বোধ হয় উহাঁদের হইতেই নিঃসৃত।...

এই সব লোক—যাহাদের সহিত কাল আবার মিলিত হইবার জন্য আমার ইচ্ছা হইতেছে—ইহাদের যেরূপ বিশ্বাস, তাহাতে মৃত্যু, বিচ্ছেদ, পুনর্মিলন—এই সমস্তের ধারণা কতটা বদ্‌লাইয়া যায়! এই যে তরুণীর আত্মা ইহলোক হইতে অপসৃত হইল, ইহার প্রকৃত আপনত্ব প্রায় কিছুই ছিল না; তা ছাড়া, উহার আত্মীয়দের আত্মা হইতেও উৎপন্ন হয় নাই, কিন্তু হয় ত উহা একটি বহু পুরাতন আত্মা, যুগযুগান্তর হইতে চৈতন্যলাভ করিয়াছে এবং যাত্রাপথে কিছুকালের জন্য উহাদের দুহিতা-রূপে ঐ তরুণদেহ আশ্রয় করিয়া ছিল, এইমাত্র। একটি আত্মা প্রস্থান করিল; কিছুকালের জন্য মুক্তিলাভ করিল, কিংবা চিরকালের জন্য মুক্তিলাভ করিল, তাহা কে বলিতে পারে? আরো কিছুকাল পরে—আবার আসিয়া উহাদের সহিত নিশ্চয়ই মিলিত হইবে,—কিন্তু আরো কিছুকাল পরে, আরো কিছুকাল পরে, যুগান্তরের পরে; এরূপভাবে রূপান্তরিত হইবে, পরিবর্ত্তিত হইবে যে বহুকালের পর পরস্পরের সহিত আবার মিলন হইলেও কেহ কাহাকে পূর্ব্বের সেই লোক বলিয়া চিনিতে পারিবে না—সুতরাং স্নেহমমতাও থাকিবে না, অশ্রুধারাও থাকিবে না। একই অখণ্ডের অংশসকল, যাহা বিযুক্ত হইয়াছিল,

তাহা আবার পরস্পরের নিকটবর্ত্তী হইবে, একপ্রকার আনন্দহীন মোক্ষাবস্থায় উপনীত হইয়া পুনর্ম্মিলিত হইবে।...

সে যাহাই হউক, প্রাচীরের পাথরের উপর বসিয়া দরিদ্র-বসনে অবগুণ্ঠিত যে দুইটি জরাবনত মনুষ্যমূর্ত্তি উপর হইতে অবিচলিতভাবে মৃতশিশুর দাহকার্য্য নিরীক্ষণ করিতেছিল, উহাদের মধ্যে একজন দাঁড়াইয়া উঠিল এবং মুখের অবগুণ্ঠন সরাইয়া, আরো নিকট হইতে ভাল করিয়া দেখিবার জন্য ঝুঁকিয়া দেখিতে লাগিল। সেই তরুণীর চিতার আলোকে ক্ষুদ্র বালকটির মুখশ্রী সম্পূর্ণরূপে আলোকিত হইয়া উঠিল। একজন শীর্ণকায়া বৃদ্ধা যেন এইভাবে জিজ্ঞাসা করিল—"সমস্তটা ভাল করে' পুড়েছে ত ?" স্ত্রীলোকটি খুব প্রাচীনা ; মা অপেক্ষা দিদিমা হওয়াই সম্ভব ;—কখন-কখন নাতিনাত্নী ও পিতামহীর মধ্যে কি-একটা রহস্যময় আকর্ষণ,—একটা অসীম স্নেহের বন্ধন দেখিতে পাওয়া যায়।—"সমস্তটা ভাল করে' পুড়েছে ত ?" তাহার ব্যাকুলনেত্র যেন এই ভাবটি প্রকাশ করিতেছে—"যতটা কাঠের দরকার, অর্থাভাবে তাহা কিনিয়া দিতে পারি নাই ; এখন ভয় হয়, পাছে নির্দ্দয় দাহকেরা, যাহা এখনো চেনা যাইতেছে, সেই সব অদগ্ধ অংশ গঙ্গায় ফেলিয়া দেয়।" আবার সে ঝুঁকিয়া ব্যাকুলভাবে দেখিতে লাগিল—ধনীদের চিতার আলোকে দেখিতে লাগিল। এদিকে দাহক, আর কিছুই অবশিষ্ট নাই ইহা দেখাইবার জন্য, একটা ডাল দিয়া পোড়া-কাঠগুলা নাড়িয়া দিল। তখন সে ইঙ্গিত করিয়া যেন এইভাবে বলিল, "হাঁ, ঠিক্ হয়েছে ; এখন যাও ; এখন ওগুলা গঙ্গায় ফেলিয়া দিতে পার।" কিন্তু তাহার দৃষ্টিতে সেই চিরন্তন মানবহৃদয়ের তীব্র বেদনা দেখিতে পাইলাম, যাহা কি ভারতে, কি অস্মদ্দেশে—সর্ব্বত্রই সমান ;—যাহা আমাদের সাহস কিংবা অস্পষ্ট আশা-ভরসা সত্ত্বেও, সময়কালে আমাদের সকলের নিকটেই দুর্দ্দমনীয় হইয়া উঠে। যাহা এইমাত্র ধ্বংস হইয়া গেল, সেই ক্ষণস্থায়ী ক্ষুদ্রমূর্ত্তিটিকে বোধ হয় উহার দিদিমা ভালবাসিত ;—উহার ক্ষুদ্র মুখখানি,

উহার মুখের ভাবটি, উহার হাসিটি ভালবাসিত; এখনো উহার যথেষ্ট বৈরাগ্যের উদয় হয় নাই, এবং ব্রাহ্মণের নির্ব্বিকারভাব এইবার যেন একটু খর্ব্ব হইল—কেন না, সে কাঁদিতে লাগিল।...

যে-সব ক্ষুদ্রশিশু আমাদের ছাড়িয়া চলিয়া যায়, তাহাদের নেত্রের সেই মধুর দৃষ্টিটি, কিংবা আমাদের পিতামহী প্রভৃতির সেই স্নেহের দৃষ্টিটি কিংবা তাঁহাদের সেই পলিতকেশ আমাদের নিকট আবার ফিরাইয়া দিবে,—এইরূপ কোন ধর্ম্মই কি অঙ্গীকার করিতে সাহস করে? এমন কি, যাহা সর্ব্বাপেক্ষা মধুর, সেই খৃষ্টধর্ম্মও কি এইরূপ অঙ্গীকার করিতে সাহস করে?...

দরিদ্র-চিতাটির শেষ-অঙ্গার ও ভস্মাবশেষগুলা একটা কাঠের হাতা করিয়া উহারা গঙ্গায় ফেলিয়া দিল।

পাশের চিতাটির উপর সেই রূপলাবণ্যসম্পন্না তরুণীর পা—যে পায়ের আঙুলগুলা ছাড়া-ছাড়াভাবে ছিল, সেই পা-খানি অবশেষে ভস্মরাশির মধ্যে খসিয়া পড়িল।

তত্ত্বজ্ঞানীদের গৃহ।

একটি পুরাতন উদ্যানের প্রান্তভাগে একটি সামান্য হিন্দুগৃহ, অত্যন্ত নিম্ন ও কালের চিহ্নে ঈষৎ চিহ্নিত; সব শাদা—চূন্‌কাম-করা; আমার জন্মভূমির সেকেলে বাড়ীর মত ঝিলমিলিগুলা সবুজ। গৃহের ছাদ, শাদা-শাদা কতকগুলা পিল্লার উপর স্থাপিত এবং চারিপার্শ্ব হইতে বারণ্ডার আকারে সম্মুখে অনেকটা বাহির হইয়া আসিয়াছে। বেশ বুঝা যাইতেছে, এখনো আমি সেই চিরন্তন সূর্য্যের দেশেই অবস্থিতি করিতেছি। কিন্তু এই পোড়ো-ধরণের বাগানটির মধ্যে এমন কিছুই নাই, যাহা আমার চোখে বিদেশী কিংবা নিতান্ত অপরিচিত বলিয়া মনে হইতে পারে।

আমাদের উদ্যানেরই মত সেই নিবিড় ছায়া, সরু-সরু পথের দুধারে সেকেলে-ধরণে-বসানো সেই ফুটন্ত গোলাপগাছ।

আমার নিমন্ত্রকেরা দয়ার্দ্র-স্মিতমুখে ও মৃদুমধুর সম্ভাষণে আমাকে অভ্যর্থনা করিলেন। তাঁহাদের মুখশ্রী সুন্দর ও গম্ভীর; কৃষ্ণকুন্তলশোভিত যিশুখৃষ্টের যেন কতকগুলি পিত্তলমূর্ত্তি। তাঁহাদের অতীব মধুর দৃষ্টি আমার উপর নিপতিত হইয়া আবার তখনি যেন ঔৎসুক্যবিহীন হইয়া অন্যত্র—আরো উর্দ্ধে—বোধ হয় সেই সূক্ষ্মশরীরের জগতে ফিরিয়া গেল—যেখানে মৃত্যুর পূর্ব্বেই তাঁহাদের আত্মাপুরুষ কখন-কখন উড়িয়া যায়।

এরূপ শান্তিময়—এরূপ আতিথেয় গৃহ আর কোথাও নাই। যে-কেহ এখানে আসিতে চায়, তাহার জন্যই ইহার দ্বার চির-অবারিত।

তথাপি, কি-এক গভীর ও অনির্দ্দেশ্য ভীতির ভাব আমার মনকে অধিকার করিল। আমি ভয়ে-ভয়ে দ্বারে আঘাত করিলাম। আমি বুঝিয়াছিলাম, ইহাই আমার শেষ-চেষ্টা। যদি এখানে কিছু না পাই, তবে আর কোথাও কিছুই পাইব না।

এই তত্ত্বজ্ঞানীরা ধ্যানও করেন, কাজও করেন এবং অন্য হিন্দুর ন্যায় ইঁহারাও অতীব মধুর ধৈর্য্যসহকারে ভূচর-খেচর উভয়প্রকার জীবেরই অত্যাচার সহ্য করিয়া থাকেন। গাছের ছোট-ছোট কাঠবিড়ালা জান্‌লা দিয়া ইঁহাদের গৃহে প্রবেশ করে; চড়াইপাখী বিশ্রদ্ধভাবে ইঁহাদের ঘরের ছাদে বাসা বাধে। ইঁহাদের গৃহ পাখীতে ভরা।

মাঝের ঘরটিতে শাদা কাপড় দিয়া ঢাকা একটা তক্তাপোষ রহিয়াছে। যাঁহারা এখানে আসিয়া মিলিত হন (অনেকেই আসিয়া থাকেন), তাঁহারা এই তক্তাপোষের উপর চক্রাকারে আসনপিঁড়ি হইয়া বসিয়া আধ্যাত্মিক গুহ্যতত্ত্বসকল নির্ণয় করেন। ইঁহারা সেই সব চিন্তাশীল ব্রাহ্মণ, যাঁহাদের ললাট হয় বৈষ্ণবচিহ্নে, নয় শৈবচিহ্নে অঙ্কিত;—যাঁহারা নগ্নবক্ষে ও নগ্নপদে গমনাগমন করেন; যাঁহাদের কোমরে শুধু একটা মোটা ধুতি

জড়ানো, যাঁহারা সমস্ত তত্ত্ব তন্ন-তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করেন, যাঁহারা সংসারের মোহমায়ায় ভোলেন না। ইঁহারা সব মহাপণ্ডিত,—পার্থিব-বিষয়ের প্রতি নিতান্ত উদাসীন বলিয়া যাঁহাদিগকে রাস্তার মুটে-মজুর বলিয়া ভ্রম হয়, কিন্তু যাঁহারা য়ুরোপের সূক্ষ্মতম ও আধুনিকতম দর্শনগ্রন্থসকল বিচার করিয়া দেখিয়াছেন এবং যাঁহারা প্রশান্তভাবে ও নিঃসংশয়চিত্তে তোমাকে বলিবেন—"তোমাদের দর্শনের যেখানে শেষ, আমাদের দর্শনের সেইখানেই আরম্ভ।"

এই তত্ত্বজ্ঞানীরা—হয় একাকী, নয় সমবেত হইয়া কাজ করেন, ধ্যান করেন। একটা সামান্য মেঝের উপর কতকগুলি সংস্কৃতগ্রন্থ উদ্‌ঘাটিত রহিয়াছে—যাহার মধ্যে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের গূঢ়তত্ত্বসকল নিহিত এবং যে সকল তত্ত্ব আমাদের দর্শন ও ধর্ম্মের বহুসহস্রবৎসর পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছিল। আমাদের জাতির ও আমাদের যুগের লোকদের অপেক্ষা যাঁহাদের দৃষ্টির প্রসর অনন্তগুণে অধিক, সেই পুরাকালের তত্ত্বদর্শিগণ এই সকল অতল-স্পর্শগভীর গ্রন্থের মধ্যে জ্ঞানের চরমতত্ত্বরূপ মহারত্নসকল রাখিয়া গিয়াছেন। যাহা ধারণার অতীত, তাঁহারা প্রায় তাহাকে ধারণার মধ্যে আনিয়াছিলেন; এবং তাঁহাদের রচিত গ্রন্থাদি, যাহা শতশত বৎসর ধরিয়া বিস্মৃতির মধ্যে সুষুপ্ত ছিল, আজ তাহা আমাদের মত ভ্রষ্টবুদ্ধি অধম মনুষ্যের বুদ্ধির অগম্য। তাই, এই সকল তমসাচ্ছন্ন শব্দরাশির মধ্য হইতে তমোরাশি অপসৃত হইয়া যাহাতে অল্পে-অল্পে জ্ঞানরশ্মি আমাদের নিকট প্রকাশিত হয়—আমাদের দৃষ্টির প্রসর বর্দ্ধিত হয়, তজ্জন্য এখনো আমাদের অনেকবৎসরের শিক্ষাদীক্ষা আবশ্যক।

মনে হয়, এই সব গ্রন্থ যদি কেহ এখন বুঝিতে পারেন, তবে এই বারাণসীর তত্ত্বজ্ঞানীরাই। কেন না, ইঁহারাই সেই পরমাশ্চর্য্য মুনিঋষি-দিগের বংশধর—যাঁহারা এই সকল গ্রন্থের রচয়িতা; ইঁহারা সেই একই বংশের লোক,—যাঁহারা পুরুষানুক্রমে শুদ্ধাচারী ছিলেন;—সেই একই

বংশের লোক, যাঁহারা কখনো জীবহত্যা করেন নাই, যাঁহাদের দেহের মাংস অন্যজীবের মাংসে পরিপুষ্ট হয় নাই। সুতরাং ইঁহারের দেহের উপাদান-পদার্থ আমাদের দেহের মত ততটা স্থূল কিংবা অস্বচ্ছ হইবে না। কুলপরম্পরাগত ধ্যানধারণা ও পূজা-অর্চ্চনার ফলে অবশ্যই ইঁহাদের চিত্তবৃত্তি এরূপ সুকুমার হইয়াছে, ইঁহাদের জ্ঞান এরূপ সূক্ষ্ম হইয়াছে যে, তাহা আমাদের ধারণার অতীত। তথাপি ইঁহারা অত্যন্ত বিনয়ের সহিত আমাকে বলিলেন,—"আমরা কিছুই জানি না, কিছুই প্রায় বুঝি না, আমরা শুধু সত্য অন্বেষণ করিতেছি মাত্র।"

একটি রমণী—* য়ুরোপীয় রমণী, পাশ্চত্য মোহাবর্ত্ত হইতে পলাইয়া আসিয়া ইঁহাদের মধ্যে একটা উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছেন। ইঁহার মুখশ্রী এখনো চিত্তাকর্ষক; শুভ্রপলিত কেশ; নগ্ন পদ; ইনি ব্রাহ্মণপত্নীর ন্যায় মিতাচারিণী, এবং সংসার হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া কঠোরব্রত তাপসীর জীবন যাপন করিতেছেন। দুর্গম জ্ঞানমন্দিরের ভীষণ দ্বারটি যাহাতে আমার অন্ধ নয়নের সমক্ষে অল্পে-অল্পে প্রকাশ পায়, তজ্জন্য আমি তাঁহারই শুভ ইচ্ছার উপর নির্ভর করিয়া আছি। কেন না, আমাদের উভয়ের মধ্যে ততটা ব্যবধান নাই; পূর্ব্বে তিনি আমারই স্বজাতীয়া ছিলেন এবং আমার দেশভাষাও তাঁহার নিকট সুপরিচিত।

তথাপি অতীব সন্দিগ্ধচিত্তে আমি তাঁহার নিকট গমন করিলাম। প্রথমেই তাঁকে একটা ফাঁদে ফেলিবার জন্য আর একটি † স্ত্রীলোকের

---

*শ্রীমতী অ্যানী বেসান্ত।

† ইনি শ্রীমতী ব্লাভাজ্‌কি। তিনি যাহাই করুন না কেন, তাঁহাকে তাঁর প্রাপ্য সম্মান না দিলে, তাঁহার প্রতি অন্যায় করা হয়। কতকগুলি ভারতীয় গ্রন্থে যে সকল চমৎকার মতবাদ শতশত বৎসর ধরিয়া প্রসুপ্ত ছিল, তাহার প্রথম প্রকাশক তিনিই। সত্য বটে, তাঁহার শিষ্যেরা পর্য্যন্ত এ কথা বলিতে কুণ্ঠিত হয় নাই যে, স্বমত প্রচার করিতে গিয়া, তাঁহার শেষদশায় এইরূপ একটা মত্ততা

কথা পাড়িলাম—যিনি তাঁহারই পূর্ব্বে এখানে আসিয়াছিলেন, যিনি এই তত্ত্বজ্ঞানী সম্প্রদায়ের মধ্যে দীর্ঘকাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন এবং যাঁহার প্রখ্যাত গ্রন্থাদি পাঠ করিয়াই আমি স্বধর্ম্মে সন্দিহান হইয়াছিলাম। আমি ইঁহার কাছে কথাটা এইজন্য পাড়িলাম, কেন না, আমি শুনিয়াছিলাম, ইঁহারও ধ্রুববিশ্বাস,—তিনি বুজ্‌রুকি দেখাইয়া প্রবঞ্চনা করিতেন। আমি তাঁকে বলিলাম—"আপনি কি মনে করেন না, কাহারও কোন বিষয়ে হৃদ্‌বোধ করাইবার জন্য যদি বুজ্‌রুকি দেখান হয়, তাহা মার্জ্জনীয় ?"

অকপটদৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিয়া তিনি উত্তর করিলেন—"প্রতারণা-প্রবঞ্চনা কোন অবস্থাতেই মার্জ্জনীয় নহে; মিথ্যা-কথা হইতে কখনই ভাল ফল উৎপন্ন হয় না।"

এই কথায়, আমার দীক্ষাগুরুর প্রতি আমার সহসা বিশ্বাস জন্মিল। মুহূর্ত্ত পরেই তিনি আবার বলিলেন—"আমাদের বিশেষ ধর্ম্মমত কি ?... আমাদের কোন বিশেষ ধর্ম্মমত নাই। আমাদের 'থিয়সফিষ্ট' সম্প্রদায়ের মধ্যে (লোকে এই নামে আমাদিগকে অভিহিত করে) বৌদ্ধ আছে, হিন্দু আছে, মুসলমান আছে, ক্যাথলিক্ আছে, পুরাতন সম্প্রদায়ের গোঁড়া লোক আছে, এমন কি, তোমার ধরণের লোকও আছে। আমাদের দলভুক্ত হ'তে তোমার যদি ইচ্ছা হয়..."

—"আপনাদের দলভুক্ত হইতে হইলে কি করা আবশ্যক ?"

"শুধু এই শপথ করিতে হইবে,—জাতি ও বর্ণনির্ব্বিশেষে আমি সকল

উপস্থিত হইয়াছিল যে, কোন কোন লোককে বুজরুকি দেখাইয়াও তিনি আপনার দলে আনিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার এই মানবোচিত চিত্ত-দৌর্ব্বল্যসত্ত্বেও, তত্ত্বপ্রকাশক বলিয়া তাঁহার যে খ্যাতি, তাহার কিছুমাত্র লাঘব হয় না। যে তত্ত্বজ্ঞান পৃথিবীর মত পুরাতন, যাহা ব্যক্তিবিশেষের উপর নির্ভর করে না, তাহার সহিত শ্রীমতীর নাম বিশেষরূপে জড়িত করা ভারী ভুল।

মনুষ্যকেই ভ্রাতা জ্ঞান করিব ; কি রাজা, কি সামান্য একজন মজুর, সকলের প্রতিই সমান ব্যবহার করিব ; সত্যের অন্বেষণে (জড়বাদীর ভাবে নহে) সাধ্যমত প্রবৃত্ত হইব। ইহা ছাড়া আর কিছুই করিতে হইবে না।এখানে আসিবার সময় তোমার যাত্রাপথে আমাদের যে সকল মাদ্রাজি বন্ধুর সহিত তুমি সাক্ষাৎ করিয়াছিলে, তাঁহাদের বৌদ্ধধর্ম্মের দিকেই একটু বেশী ঝোঁক্। আমি জানি, তাঁহাদের আগ্রহহীন ঔদাসীন্যের ভাব তোমার গূঢ়-রহস্যপ্রবণ আত্মাকে প্রতিহত করিয়াছিল। কিন্তু আমরা সেই প্রাচীনকালের গুহ্য ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মেই শান্তি ও আলোক লাভ করিয়াছি। মানুষের পক্ষে যতদূব জানা সম্ভব—সত্যের সেই উচ্চতম ভাব উহারই মধ্যে নিহিত।

"আমাদের খুবই ইচ্ছা, আমরা যে পথ অনুসরণ করিতে চেষ্টা করিতেছি, পথপ্রদর্শক হইয়া তোমাকেও সেই পথে লইয়া যাই। 'দ্বাররক্ষকে'র সেই পুরাতন রূপককাহিনীটি বোধ হয় তুমি জান ; নবদীক্ষার্থীকে ভয় দেখাইবার জন্য ভীষণ রক্ষকসকল, দীক্ষার আরম্ভকালে, দেবালয়ের দ্বারদেশে বিচরণ করে। উহার প্রকৃত তাৎপর্য্য এই—জ্ঞানোদয়ের আরম্ভে, স্বভাবতই নানাপ্রকার বিভীষিকা দেখা যায়। আমাদের বিশ্বাস এই,—মানুষের সমস্ত ব্যক্তিগত অংশ ক্ষণস্থায়ী ও মায়াময়। তোমার মত যে-সব লোকের ব্যক্তিত্বের ভাব অতীব তীব্র, তাহাদের পক্ষে সিদ্ধিলাভ করা বড়ই কঠিন। আমরা আরো অনেক কথা বিশ্বাস করি, যাহা তোমার লৌকিক সংস্কারের সম্পূর্ণ বিপরীত। যে সকল আশা তোমার অজ্ঞাতেও তুমি গূঢ়রূপে এখনো তোমার অন্তরে পোষণ করিতেছ, সেই সকল আশা যদি আমরা তোমার মন হইতে উঠাইয়া লই, তাহা হইলে তুমি কি আমাদিগকে অভিশাপ করিবে না ?"

"না। আশার কথা যদি বলেন, সে পক্ষে আমার আর কি হারাইবার নাই।"

"বেশ, তা হ'লে তুমি আমাদের নিকটে এস।"

প্রভাতমহিমা।

যে সমভূমির উপর দিয়া প্রাচীন গঙ্গা প্রবাহিতা, যে তৃণসঙ্কুল বিস্তীর্ণ কর্দ্দমভূমি নৈশবাষ্পে এখনও কুয়াসাচ্ছন্ন, সেই ভূমির সুদূরপ্রান্ত হইতে সেই অনাদিকালের পুরাতন সূর্য্য উদিত হইয়াছেন। এইরূপ তিনসহস্র বৎসর হইতে প্রতিদিনই তিনি তাঁহার প্রথম পাটল-কিরণ বিকীর্ণ করিতেছেন; বারাণসীর প্রস্তরস্তূপ, রক্তিম মন্দিরচূড়া, চূড়ার স্বর্ণময় অগ্রবিন্দুচয়—সমস্ত পুণ্যনগরী তাঁহার সেই প্রথম-আলোক আগ্রহের সহিত গ্রহণ করিবার জন্য ও প্রাভাতিক মহিমায় বিভূষিত হইবার জন্য প্রতিদিনই অর্দ্ধমণ্ডলাকারে তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইতেছে।

ইহাই এখানকার সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত সময়; ব্রাহ্মণ্যযুগের আরম্ভ হইতেই এই সময়টি অতীব পবিত্র,—পূজা-অর্চ্চনার মুখ্যকাল। বারাণসী যেন সহসা এই সময়েই তাহার সমস্ত জনতা, তাহার সমস্ত কুসুমরাশি, তাহার সমস্ত পুষ্পমাল্য, তাহার সমস্ত পশু-পক্ষী স্বকীয় নদীর বক্ষে ঢালিয়া দেয়।

দিবাকরের উদয়কালে যে-কেহ জাগ্রত হইয়াছে,—কি মনুষ্য কি ইতরপ্রাণী,—ব্রহ্মার জীবমাত্রই ঘাটের সিঁড়ি দিয়া আনন্দে নদীর উপর যেন ভাঙিয়া পড়িতেছে। পুরুষেরা নাবিতেছে;—তাহাদের মুখে প্রহৃষ্ট গম্ভীরভাব; গোলাপী কিংবা হলদে কিংবা লাল শালে গাত্র আচ্ছাদিত। শুভ্রবসনা স্ত্রীলোকেরা নাবিতেছে;—মল্‌মল্‌-বস্ত্রে তাহারা অবগুণ্ঠিত। তাহাদের মসৃণ পিতলের ঘড়া ও ঘটির লোহিত কিংবা পীত আভা চারিদিকে বিকীর্ণ হইতেছে এবং তাহারই পাশে তাহাদের অসংখ্য বলয়, কণ্ঠহার, রজতনূপুর ঝিক্‌মিক্‌ করিতেছে। দিব্য সাজসজ্জা, দিব্য মুখশ্রী—তাহারা যেন নগর-দেবতার মত চলিয়াছে—তাহাদের বাহু ও চরণের বলয়নূপুরাদির মধুর নিক্কণ শুনা যাইতেছে।

প্রত্যেকেই, গঙ্গাদেবীকে পুষ্পমাল্যের উপহার,—কেবলই পুষ্পমাল্যের উপহার দিতেই ব্যস্ত ;—পূর্ব্বপূর্ব্ব দিনের উপহারগুলি—যাহা এখনও জলে ভাসিতেছে—তাহাই যেন যথেষ্ট নহে। জুঁইফুলে-গাঁথা গড়ে-মালা,—দেখিতে আমাদের মহিলাদের গলায় জড়াইবার পালক্-আচ্ছাদনের মত ; অন্যান্য শাদা ফুলের মালায় সোনালি হল্‌দে ও জাফ্রানি হল্‌দে এমনভাবে মিশ্রিত, যাহাতে বিভিন্ন আভার বৈষম্য বেশ ফুটিয়া উঠে ; ভারতরমণীরা তাহাদের ওড়নাতেও এইরূপ রং মিলাইতে ভালবাসে।

গৃহপ্রাসাদাদির সমস্ত 'কার্নিস'-ঝালরের উপর যে-সব পাখীর ঝাঁক দীর্ঘরজ্জুর মত সারি-সারি বসিয়া ঘুমাইতেছিল, তাহারা জাগিয়াছে—কলরবে ও গানে মাতিয়া উঠিয়াছে।

ঘুঘু ও অন্যান্য ক্ষুদ্রপক্ষী স্নানের জন্য, আত্মবিনোদনের জন্য দলে-দলে আসিয়া বিশ্বস্তভাবে এই সব ব্রাহ্মণদের মধ্যে রহিয়াছে ; কেন না, জানে, উহারা কখন জীবহত্যা করে না। সমস্ত দেবতার উদ্দেশে প্রভাত-সঙ্গীত দেবালয় হইতে নিঃসৃত হইতেছে ;—ঝঞ্ঝা-নাদের মত ঢাকঢোলের বাদ্য, শানাইয়ের কাঁদুনি, পবিত্র তূরীধ্বনি শুনা যাইতেছে। উপরে, সমস্ত জালি-কাটা বলভী, মাল্য-ঝালর ও ক্ষুদ্র স্তম্ভসমন্বিত সমস্ত গবাক্ষ, গৃহের সমস্ত ছাদ, বৃদ্ধদের মস্তকরাশিতে আচ্ছন্ন—ইহারা সেই দর্শকবৃন্দ, যাহারা ব্যাধি কিংবা জরাপ্রযুক্ত নীচে নামিতে অসক্ত অথচ যাহারা এই প্রভাত-আলোকে পূজা-অর্চ্চনায় যোগ দিতে অভিলাষী। সূর্য্যের জ্বলন্ত রশ্মিতে উহারা পরিপ্লাবিত।

লোকের হস্তধারণ করিয়া হর্ষোৎফুল্ল নগ্ন শিশুর দল নাবিতেছে। যোগী ও অলসগতি সন্ন্যাসীরা নাবিতেছে। নিরীহ পবিত্র গাভীবৃন্দ নাবিতেছে—প্রত্যেকেই তাহাদিগকে সসম্ভ্রমে পথ ছাড়িয়া দিতেছে এবং তাজা তৃণ ও পুষ্পরাশি তাহাদের সম্মুখে অর্পণ করিতেছে। এই মধুরপ্রকৃতি

পশুরাও সূর্য্যের উদয়োৎসব দেখিতেছে এবং এই সময়ের মাহাত্ম্য যেন বুঝিয়াই তাহাদের নিজের ধরণে পূজার্চ্চনায় প্রবৃত্ত হইয়াছে। মেষ ও ছাগল নাবিতেছে, ব্যস্তভাবে কুকুর নাবিতেছে, বানর নাবিতেছে।

রাত্রির শিশিরে বাতাস যেন শীতে জমাট হইয়া গিয়াছিল, এক্ষণে সূর্য্য—সহস্রকিরণ সূর্য্য সেই বায়ুতে শুভ উত্তাপ আনয়ন করিল। কুলুঙ্গি কিংবা বেদীর আকারে ছোট-ছোট পাথরের গাঁথুনি, সোপানের ধাপে-ধাপে সজ্জিত—কোনটাতে বিষ্ণুর বিগ্রহ, কোনটাতে বহুবাহুবিশিষ্ট গণেশের বিগ্রহ। এই সকল বিগ্রহের গাত্র এখনও শুষ্ককর্দ্দমে লিপ্ত; এবং মনুষ্যভস্মে পরিষিক্ত হইয়া ইহারা অনেকমাস যাবৎ ক্ষুব্ধ নদীর জলগর্ভে নিদ্রিত ছিল। এক্ষণে ইহাদের উপর সূর্য্যরশ্মি পতিত হইয়াছে। এখনও সূর্য্য জ্বলন্ত কিরণ বর্ষণ করিতেছে, তাই লোকেরা বড় বড় ছাতার তলে আশ্রয় লইয়াছে। ছাতাগুলা মাটীতে পোঁতা —দেখিতে বিরাট্ ব্যাঙের ছাতার মত। পবিত্র নগরীর পাদদেশে এইরূপ রাশিরাশি ছাতা উদ্ঘাটিত। এদিকে ঊর্দ্ধদেশে, পুরাতন প্রাসাদগুলা প্রভাতসমাগমে যেন নবযৌবনে উৎফুল্ল হইয়া জাগিয়া উঠিয়াছে। মন্দিরের লোহিত চূড়াসকল আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে, চূড়ার স্বর্ণময় অগ্রভাগ, স্বর্ণময় ত্রিশূল ঝিক্‌মিক্ করিতেছে।

অসংখ্য ডিঙির উপরে এবং নীচের সোপানধাপের উপরে ভক্তেরা তাহাদের পুষ্পমাল্য ও ঘট রাখিয়া কাপড় ছাড়িতে লাগিল। শাদা ও গোলাপী রঙের বস্ত্র, বিবিধ রঙের শাল ইতস্তত ফেলিতে লাগিল, কিংবা বাঁশের উপর ঝুলাইয়া রাখিল। তখন তাঁহাদের দিব্য নগ্নকায় বাহির হইয়া পড়িল—ঘোর কিংবা ফিঁকা পিতলের রং। পুরুষেরা যেমন ছিপ্‌ছিপে, তেম্‌নি পালোয়ানি-ধরণে বলিষ্ঠ; তাহাদের চক্ষু অগ্নিময়। উহারা পূতজলে আকণ্ঠ প্রবেশ করিল। স্ত্রীলোকেরা ততটা চ্যুতবস্ত্র নহে;

তাহাদের বক্ষ ও কটিদেশ একখানা কাপড়ে ঢাকা; তাহারা গঙ্গার জলে শুধু তাহাদের পা ভিজাইতেছে—বলয়াদিবিভূষিত বাহু ভিজাইতেছে। তাহার পর একেবারে নদীর কিনারায় গিয়া ও অবনত হইয়া তাহাদের আলুলিত দীর্ঘকেশ জলের উপর আছড়াইতেছে; বক্ষের উপর দিয়া, স্কন্ধের উপর দিয়া জল গড়াইয়া পড়িতেছে; তাহাতে করিয়া তাহাদের রহস্যপ্রকাশক সূক্ষ্ম বস্ত্রখানি গায়ে একেবারে আঁটিয়া ধরিয়াছে; ঠিক যেন "পক্ষহীন বিজয়লক্ষ্মী"। নগ্নাবস্থা অপেক্ষা এ মূর্ত্তি আরও যেন সুন্দর, আরও যেন চিত্তচাঞ্চল্যকর।

গঙ্গাকে প্রণাম করিয়া পূজার অঞ্জলিস্বরূপ, গঙ্গার বক্ষে পুষ্পগুচ্ছ, পুষ্পমাল্য চারিদিক্ হইতে লোকে অজস্র নিক্ষেপ করিতেছে। ঘটি ভরিয়া, ঘড়া ভরিয়া জল লইতেছে; এবং প্রত্যেকে অঞ্জলি ভরিয়া জল উঠাইয়া পান করিতেছে।

এই সময়ে এইখানে ধর্ম্মভাবের এরূপ সর্ব্বগ্রাসী প্রভাব যে, এই সমস্ত রমণীয় নগ্নতার মেশামিশি ও ঘেঁসাঘেঁসিতেও কোন কুচিন্তার উদ্রেক হইতেছে বলিয়া মনে হয় না। পরস্পরকে কেহই তাকাইয়া দেখিতেছে না; দেখিতেছে শুধু নদীকে, সূর্য্যকে, আলোকের ও প্রভাতের মহিমাকে; সকলেই ভক্তিমুগ্ধ, সকলেই পূজায় মগ্ন।

স্নানের দীর্ঘ অনুষ্ঠান সমাপ্ত হইলে পর, রমণীরা শান্তভাবে জল হইতে উঠিয়া গৃহাভিমুখে চলিল; পুরুষেরা তাহাদের ডিঙির উপরে, তাহাদের পুষ্পমাল্য—তাহাদের দূর্ব্বাগুচ্ছের মধ্যে থাকিয়া পূজার আয়োজন করিতে লাগিল।

আহা! এই অতীতের লোকদিগের দৈনন্দিন জাগরণ কি চমৎকার! প্রতিদিন তাহারা ভগবানের আরাধনার্থে একত্র মিলিত হয়। ভাস্বর আকাশের নীচে, জলের মধ্যে, পুষ্পগুচ্ছ ও পুষ্পমাল্যের মধ্যে, একজন দীনহীন সামান্যলোকেরও একটু স্থান আছে।...পক্ষান্তরে, পাশ্চাত্য যে

আমরা,—লৌহধূমযুগের লোক যে আমরা—আমাদের জাগরণ ধূলিময় মলিন পিপীলিকার হেয় জাগরণ! আমাদের দেশের নিবিড় ও শীতল মেঘরাশির নীচে অবস্থিত আমাদের জনসাধারণ, সুরা ও ঈশ্বর-নিন্দার বিষে জর্জ্জরিত হইয়া প্রাণঘাতী কল্‌কারখানার অভিমুখে ব্যস্তভাবে চলিয়াছে!···

জল হইতে উঠিয়া গৃহাভিমুখে যাইবার সময় রমণীরা তাহাদের শুভ্র ও বিচিত্রবর্ণের বস্ত্রাদি আবার ঠিক্‌ঠাক্ করিয়া পরিয়া লয়; এবং বিশাল প্রস্তরাদির সম্মুখে যখন তাহারা ঘাটের সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতে থাকে, তখন প্রাচীন গ্রীসের উৎকীর্ণ চিত্রাবলী মনে পড়িয়া যায়। তাহাদের কেশপাশ হইতে এখনও জল গড়াইয়া পড়িতেছে; তাহাদের নিবিড় ও আর্দ্র কেশগুচ্ছ, তাহাদের মল্‌মল্‌বস্ত্রের উপর এলাইয়া পড়িয়াছে। প্রত্যেকেরই স্কন্ধের উপর একটি-একটি উজ্জ্বল ধাতুময় কলস; এবং এক-একটি নগ্নবাহু ঊর্দ্ধে উত্তোলন করিবার ইহাই উপলক্ষ্য।

পুরুষেরা সকলেই গঙ্গার উপরে রহিয়াছে; এবং যোগানন্দে নিমগ্ন হইবার পূর্ব্বে, আসনপিঁড়ি হইয়া বসিয়া ধর্ম্মবিহিত সমস্ত প্রসাধনকর্ম্ম সমাধা করিতেছে। শিবের সম্মানার্থ স্বকীয় পিত্তলবর্ণ গাত্র ভস্মরেখায় চিত্রিত করিতেছে এবং ললাটে ভীষণ শৈবচিহ্নের ছাপ রক্তচন্দনে অঙ্কিত করিতেছে।

সেই শ্মশানের কোণটিতে—যেখানে প্রভাতআলোকে চতুষ্পার্শ্বস্থ চিতাধূমকালিম পাথরগুলা দেখা যাইতেছে—সেখানে এখন কোন শবেরই দাহ হইতেছে না। কাপড় দিয়া ঢাকা দুইটা শব ঐখানে পড়িয়া রহিয়াছে; কিন্তু তাহাদের লইয়া কেহই ব্যাপৃত নহে। একটা শব চিতার উপর শয়ান; আর একটি শবের অন্তিমস্নানের অনুষ্ঠান চলিতেছে; তাহারই পাশে সুন্দর বলিষ্ঠ জীবন্ত লোকেরা স্নান করিতেছে। ডিঙির উপর, ঘাটের নীচেকার সিঁড়ির উপর, পূজা—বিপুল জনতার ব্যাপক পূজা আরম্ভ

হইয়াছে। এই সময়ে আর সমস্ত কার্য্যই স্থগিত, এমন কি, চিতাতেও এখন আগুন ধরান হইতেছে না—শবেরা অপেক্ষা করিয়া রহিয়াছে।

সকলেরই মুখে কি-এক অপূর্ব্ব অন্যমনস্কভাব; মুখাবয়বসকল যেন জমাটবদ্ধ, চোখ যেন কিছুই আর দেখিতেছে না! যুবাপুরুষেরা ধ্যানে মগ্ন, হস্তদ্বয় মুখের উপর সংলগ্ন—দুইটি জ্বলন্ত চোখের তারা ছাড়া মুখের আর কিছুই দেখা যাইতেছে না—সে চোখের দৃষ্টি সংসারের পরপারে; জপ-মালায় আচ্ছাদিত সন্ন্যাসিগণ—যাহাদের আত্মা ক্ষণকালের জন্য হৃতচৈতন্য জড়শরীরকে ছাড়িয়া গিয়াছে; ধূসর ভস্মচূর্ণে সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদিত বৃদ্ধগণ—সকলেরই সেই এক ভাব।...

একজন জলের ধারে বসিয়া পূজা-অর্চনা করিতেছে; শাদা-শাদা চোখ; শাক্যসিংহের মূর্ত্তির মত পদ্মাসনবদ্ধ হইয়া মৃগচর্ম্মের উপর আসীন; এই আসনটি সন্ন্যাসীদেরই বিশেষ আসন। দুই পা পরস্পরের উপর আড়া-আড়িভাবে ন্যস্ত, জানু মাটি ছুঁইয়া রহিয়াছে; এবং বামহস্ত—দীর্ঘ অস্থিসার বামহস্ত—দক্ষিণপদ ধরিয়া রহিয়াছে। ইনি একজন বৃদ্ধ। ইঁহার পরিচ্ছদ গায়ে আঁটিয়া ধরিয়াছে—জল গড়াইয়া পড়িতেছে। পরিচ্ছদের রং ফিঁকা গোলাপী নারাঙ্গী—যেন উষার মেঘরাশি।

ইনি নিশ্চল হইয়া পূজা করিতেছেন; ইঁহার ললাটে শৈবচিহ্ন অঙ্কিত; চোখের তারা কাচের মত; ইঁহার সীসা-কালিম মুখ জ্বলন্ত সূর্য্যের দিকে ফেরান রহিয়াছে—জ্বলন্তসূর্য্যের কিরণে মুখ ঝিক্‌মিক্ করিতেছে। মুখে একপ্রকার অপরিসীম আনন্দের ভাব। একজন নগ্নকায় পালোয়ানি-ধরণের বলিষ্ঠযুবক, তাঁহার রক্ষিপদে ব্রতী হইয়া, মধ্যে-মধ্যে এক-এক-অঞ্জলি গঙ্গাজল লইয়া সেই জলে তাঁহার অরুণবর্ণের পরিচ্ছদকে প্লাবিত করিতেছে; এবং সেই বৃদ্ধসন্ন্যাসীর সম্মুখে মৃগচর্ম্মের উপর যে সকল পুষ্পমাল্য রহিয়াছে, সেই সব পুষ্পমাল্যের মলক্ষালন করিবার জন্য তাহার উপর জল ছিটাইয়া দিতেছে—মৃগচর্ম্মসংলগ্ন মৃগের মস্তক ও শৃঙ্গ জলে

ভিজিয়া যাইতেছে। বোধ হয়, তাঁহার ধ্যানকে ঘনাইয়া তুলিবার জন্য, তাঁহার সম্মুখে সামান্য-ধরণের পবিত্র সঙ্গীত চলিতেছে; আর একটু উপরে, দুইজন বালক দুইটা পাথরের নোড়ার উপর বসিয়া প্রফুল্লভাবে মৃদুমৃদু হাসিতেছে; উহাদের মধ্যে একটি বালক, ভোঁ-ভোঁ-শব্দে শঙ্খনাদ করিতেছে; আর একটি, ডুগি বাজাইতেছে; ইহা হইতে একপ্রকার চাপাশব্দ নির্গত হইতেছে। চারিধারে কাকেরা ইতস্তত বসিয়া আছে—মনোযোগসহকারে সন্ন্যাসীকে নিরীক্ষণ করিতেছে। যাহারা গৃহাভিমুখে চলিয়াছে—কি রমণী, কি বালক—তাহারা সকলেই আবার পথ হইতে ফিরিয়া এই সন্ন্যাসীকে প্রণাম করিতেছে। নীরবে শুধু একটু সস্মিত অভিবাদন করিয়া, জোড়হস্তে শুধু প্রণাম করিয়া তাহারা সন্তর্পণে চলিয়া যাইতেছে—পাছে সন্ন্যাসীর ধ্যানভঙ্গ হয়—পূজার ব্যাঘাত হয়। রহস্যময় প্রাসাদঅঞ্চল পর্য্যন্ত গমন করিয়া আমার নৌকা আবার ফিরিয়া আসিল। ফিরিয়া আসিতে একঘণ্টা বিলম্ব হইল। ফিরিয়া-আসিয়া দেখি, সেই বৃদ্ধটি সেইখানেই রহিয়াছে। দীর্ঘনখবিশিষ্ট হস্তের দ্বারা স্বকীয় শীর্ণপদ ধরিয়া রহিয়াছে; তাহার দৃষ্টি সেইরূপ স্থির—আকাশের দিকে, জ্বলন্ত সূর্য্যের দিকে নেত্র উদ্ঘাটিত রহিয়াছে, তবু সেই ঘোলা-চোখ্ ঝল্সিয়া যাইতেছে না। আমি বলিলাম—"বৃদ্ধটি কেমন স্থির হইয়া রহিয়াছে!" ··মাজি আমার দিকে তাকাইল এবং কোন অবোধ শিশুর নিতান্ত সরল উক্তি শুনিয়া লোকে যেমন করিয়া থাকে - সেইরূপ আমার দিকে চাহিয়া সে একটু মৃদুহাস্য করিল।—"ঐ লোকের কথা বল্‌চেন?···কিন্তু···ও যে মৃত!"

কি! ও লোকটা মৃত!···আসল কথা,—আমি লক্ষ্য করি নাই, বালিশের উপর মাথা আট্‌কাইয়া রাখিবার জন্য, থুতির নীচে দিয়া একটা চর্ম্মবন্ধনী গিয়াছে। আমি ইহাও লক্ষ্য করি নাই,—একটা কাক মুখের চারিধারে ও মুখের খুব কাছে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে; যে বলিষ্ঠকায় যুবকটি তাহার গেরুয়া রঙের পরিচ্ছদে ও জুঁইফুলের মালায় জলসেক করিতেছিল,

সে সেই কাককে ভয় দেখাইবার জন্য ক্রমাগত একটুক্‌রা কাপড় নাড়িতেছে।

গতকল্য সন্ধ্যার সময় ইনি মরিয়াছেন; ইহার অন্তর্জলী-অনুষ্ঠান-সমাপনান্তে—যেরূপ যোগাসনে বসিয়া ইনি সমস্ত জীবন কাটাইয়াছেন, এক্ষণে এই পূর্ণ প্রভাতমহিমার মধ্যে ইহাকে সেই যোগাসনের ভঙ্গীতে বসান হইয়াছে। বন্ধনীর দ্বারা বদ্ধ করিয়া ইহার মস্তককে পিছনে একটু হেলাইয়া দেওয়া হইয়াছে,—যাহাতে সূর্য্য ও আকাশ ভাল করিয়া দেখিতে পান।

ইহার দাহ হইবে না, কেননা, যোগীদের দাহ হয় না। যোগীদের পুণ্যজীবনের মাহাত্ম্যে যোগীদের শরীর পূর্ব্ব হইতেই পবিত্র হইয়া আছে। আজ সন্ধ্যাকালে, ইহার মৃতশরীরকে একটা মাটির গাম্‌লার মধ্যে সমাহিত করিয়া গঙ্গায় ভাসাইয়া দেওয়া হইবে। যে ভাগ্যবান পুরুষ পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া—সংসারবন্ধন ছেদন করিয়া, সংসারচক্র হইতে চিরমুক্তি লাভ করিয়াছেন, জীবন ও মৃত্যুর অতলস্পর্শ রসাতল হইতে উদ্ধার পাইয়াছেন, লোকেরা তাঁহাকে প্রফুল্লবদনে অভিনন্দন করিতেছে, অভিবাদন করিতেছে, সাধুবাদ করিতেছে।

একটা কুকুর শবের নিকটে আসিল, তাহার গা শুঁকিল, তাহার পর পুচ্ছ নত করিয়া চলিয়া গেল। তিনটা লালরঙের পাখী আসিয়া তাহারাও শবকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। একটা বানর নাবিয়া আসিল, শবের আর্দ্র পরিচ্ছদের তলদেশ স্পর্শ করিল এবং স্পর্শ করিয়াই এক-দৌড়ে ঘাটের মাথায় উঠিয়া বসিল। সেই রক্ষী যুবকটি ইহাদিগকে কিছুমাত্র নিবারণ করিতেছে না,—সব সহ্য করিতেছে। এদেশের লোকেরা পশুপক্ষীর অত্যাচার অকাতরে সহ্য করিয়া থাকে। সেই নাছোড়বন্দা কাকটা, পচা শবের গন্ধ পাইয়া পুনঃপুন ফিরিয়া আসিতেছে; এবং তাহার কালো ডানা, প্রায় মৃতযোগীর মুখ ঘেঁষিয়া যাইতেছে।

স্বর্ণমন্দিরের নিকটস্থ একজন ব্রহ্মণের গৃহে।

"অলৌকিক কাণ্ড!...এখানকার সন্ন্যাসীরা পূর্ব্বে বোধ হয় অলৌকিক কার্য্যসকল দেখাইতে পারিত, কেহ কেহ হয় ত এখনও দেখাইতে পারে... কিন্তু আমাদের মনীষিরা এই উপায়ে লোকের বিশ্বাস উৎপাদন করা হেয় জ্ঞান করেন।...না,—গভীর ধ্যানধারণাই ভারতীয় পন্থা; ধ্যান-ধারণাই আমাদিগকে সত্যের পথে লইয়া যায়..."

যিনি আমাকে এই কথা বলিলেন, তিনি একজন বৃদ্ধব্রাহ্মণ; তাঁহার "পণ্ডিত" উপাধি। অর্থাৎ তিনি সংস্কৃতভাষায় ও সংস্কৃত দর্শনশাস্ত্রে সুপণ্ডিত। অলৌকিক ব্যাপারের প্রতি সেই নিস্তব্ধ ক্ষুদ্র গৃহের তত্ত্ব-জ্ঞানীদের যেরূপ অবজ্ঞা, ইহারও দেখিলাম সেইরূপ অবজ্ঞা।

সন্ধ্যার সময়, বারাণসীর হৃদয়দেশে তাঁহার পুরাতন গৃহের ছাদের উপর বসিয়া আমরা বাক্যালাপ করিতেছি। ছাদটি ক্ষুদ্র, বিষণ্ণ ও চারিদিকে বদ্ধ; একটা বাহিরের সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতে হয়; একটা সরু রাস্তা হইতে সিঁড়িটা উঠিয়াছে। আমার দোভাষী জাতিতে 'পারিয়া', সুতরাং এখানে তাহার প্রবেশ নিষিদ্ধ; সে বাহিরের সিঁড়ির সর্ব্বোচ্চ ধাপে দাঁড়াইয়া রহিল। যখন সে আমাদের কথা ভাষান্তর করিয়া বুঝাইতেছিল, তখন মনে হইতেছিল, যেন সন্ধ্যার শব্দবাহী নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া দূর হইতে তাহার কণ্ঠস্বর আসিয়া পৌঁছিতেছে! অনুবাদের কার্য্যে মাতিয়া উঠিয়া ভ্রমক্রমে যদি কখন সে দরজার চৌকাঠে পা রাখে, অমনি বৃদ্ধব্রাহ্মণ তাহাকে চিরন্তন লোকাচারের কথা স্মরণ করাইয়া দেন, সেও পিছু হটিয়া যায়। তিনি থিয়সফিষ্টসমাজভুক্ত নহেন,—তাই বর্ণভেদপ্রথার নিয়ম তিনি লঙ্ঘন করেন না।

এই ছাদের উপর হইতে আর কিছুই বড় দেখা যায় না,—দেখা যায় শুধু চতুর্দ্দিকে কতকগুলা জরাজীর্ণ প্রাচীর—যাহার পলস্তরা রৌদ্রে

ফাটিয়া গিয়াছে; আর দেখা যায়, আকাশে কাকের ঝাঁক উড়িয়া বেড়াইতেছে। কিন্তু এই জরাজীর্ণতার মধ্য হইতে, এই সমস্ত ধ্বংসাবশেষের মধ্য হইতে, খুব নিকটেই একটা আশ্চর্য্য জিনিষ মাথা তুলিয়া রহিয়াছে;—স্বর্ণকারের হাতের একটি অতুলনীয় কারুকার্য্য; ইহা অস্তমান সূর্য্যের শেষরশ্মির গতিরোধ করিতেছে, এবং এই সময়ে ইহার উপর যত টিয়াপাখী আসিয়া জড়ো হইয়াছে। ইহা "স্বর্ণমন্দিরের" একটা গম্বুজ।

আমি মধ্যে-মধ্যে এই শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিতের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাই। তাঁহার ধন-ঐশ্বর্য্যের মধ্যে একটি পুস্তকাগার ও শতশতবর্ষ পুরাতন কতকগুলি পুঁথি। বারাণসীর যে অংশটি সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন ও পবিত্র, সেইখানেই তাঁহার গৃহ। একাকারের মহাপ্রবর্ত্তক রেল যেখান দিয়া গিয়াছে, সেই ইতর জঘন্য আধুনিক অঞ্চল হইতে এই স্থানটি বহুদূরে অবস্থিত। ইহার পারিপার্শ্বিক দৃশ্যে কোনই পরিবর্ত্তন ঘটে নাই; সুতরাং এইখানে আসিলে পুরাকালের ভাব মনের মধ্যে জাগিয়া উঠে, বারাণসীর সেই গুহ্যধর্ম্মের রহস্যময় ভাবে চিত্ত পরিপ্লাবিত হয়, চিত্তকে যেন দূর অতীতে পিছাইয়া আনে অনিত্য সংসারকে ক্রমাগত স্মরণ করাইয়া দেয়, এবং চিন্তাপ্রবাহকে সংসারের পরপারে লইয়া যায়। সেই ধবলগৃহের তত্ত্বজ্ঞানীরাও স্বীকার করেন,—কতকগুলি স্থানের বিশেষ মাহাত্ম্য আছে; এরূপ কতকগুলি নগর আছে—যথা বারাণসী, মক্কা, লাসা, জেরুসালেম,—যে সকল নগর আধুনিক সংশয়বাদের আক্রমণসত্ত্বেও, দেবারাধনার ভাবে এরূপ ভরপূর যে, সেখানে পার্থিব মায়াবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া কতকটা অসীমের সান্নিধ্য উপলব্ধি করা যায়। তাঁহারা বলেন,—এমন কি, শুধু মন্দিরাদির বৃহত্ত্ব,—শুধু অনুষ্ঠানাদির আড়ম্বরও কতকটা আত্মার উপর প্রভাব প্রকটিত করে। উহার কিছুই নিষ্ফল নহে।

বারাণসীতে যদৃচ্ছাভ্রমণ।

বিহগকূজনবিখণ্ডিত নিস্তব্ধতার মধ্যে, অতীব নূতন ও ভীষণ আকারে অনন্তের ভাব যেস্থানে আমার মনে প্রবিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছিল, সেই তত্ত্বজ্ঞানীদের গৃহ হইতে চলিয়া আসিবার পর, অনন্তের চিন্তায় আমার মাথা ঘুরিয়া গিয়াছিল। তাই এই পৃথিবীর ক্ষুদ্র মরীচিকার মধ্যে আবার ফিরিয়া-আসা আবশ্যক বোধ করিলাম।

আমার ক্ষুদ্র গৃহ হইতে বাহির হইবার পর হইতে প্রাচ্যদেশের পরীদৃশ্য বরাবর আমার নেত্রসম্মুখে রহিয়াছে, কিন্তু আমার নিকট আর তাহার আকর্ষণ নাই। বিশেষত এই বারাণসীনগরে, পরীদৃশ্যের সহিত কি-যেন একটা অলোকসামান্য রহস্যের ভাব জড়িত; অন্যান্য স্থানেরই মত এই বারাণসী, কিন্তু তবু যেন আর সকল হইতে ভিন্ন।...

অন্যত্র যেরূপ দেখা যায়, এখানেও সেই একই ভারতীয়-ধরণের গলিঘুঁজি রাস্তার গোলকধাঁদা, গৃহের সেই ঝালোর-বিভূষিত গবাক্ষ, সেই স্তম্ভশ্রেণী, সেই সব রংচং; বিশেষত সেই একই ধরণের পাত্‌লা-ওড়না-পরা সুন্দরী রমণীরা পথ দিয়া চলিতেছে; সঙ্কীর্ণ রাস্তার ছায়ার মধ্যে,—এবং উহাদের ধাতুময় নূপুরের উপর, বলয়ের উপর, কণ্ঠমালার উপর, রূপালি-জরির নক্‌সা-কাটা গোলাপী, জর্দা, সবুজ শাড়ীর উপর, কদাচিৎ দুই-একটি পতিত হইতেছে; তখন পুরাতন ধূসর প্রাচীরের মধ্যে, উহাদিগকে জ্যোতির্ম্ময়ী পরীর মত দেখিতে হয় এবং তখন যদি উহারা তোমার উপর দৃষ্টিনিক্ষেপ করে, তোমার মনে হইবে, যেন তাঁহাদের সমস্ত বেশভূষার উজ্জ্বলতা, সমস্ত দেহের লাবণ্যপ্রভা,—তাহাদের নেত্রের সেই অনিচ্ছাকৃত কোমল কটাক্ষের মধ্যে কেন্দ্রীভূত হইয়াছে।...

আবার এখানে যোগীরাও চতুষ্পথের উপর উবু হইয়া বসিয়া আছে দেখিতে পাওয়া যায়; উহারা দেবারাধনা ও মৃত্যুকে সহসা স্মরণ করাইয়া

দেয়; চারিদিকেই পবিত্র শিলাখণ্ডসকল রহিয়াছে—সেই সব গঠনহীন সাঙ্কেতিকচিহ্ন, যাহার উৎপত্তিকালও কেহ জানে না, তাৎপর্য্যও কেহ বুঝে না। উহাদিগকে আর কাহারও স্পর্শ করিবার জো নাই; কতকগুলি বিশেষ বর্ণের লোকেরাই উহাতে হাত দিতে পারে;—তাহারা উহাদিগকে পুষ্পমাল্যে বিভূষিত করে। কতকগুলি দেবতা গরাদের পিছনে কারাবদ্ধ হইয়া দেয়ালের কুলুঙ্গির মধ্যে বাস করিতেছেন। চারিদিকেই প্রস্তরময়-চূড়াবিশিষ্ট মন্দিরসকল মাথা তুলিয়া রহিয়াছে—সেখানে আমার প্রবেশ নিষিদ্ধ। পবিত্র গাভীবৃন্দ—অতীব নিরীহ, অতীব মধুর-প্রকৃতি—প্রভাত হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ইতস্তত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে; যেখানের মানুষের জনতা বেশী—সেই বাজারই তাহাদের প্রিয়স্থান। সকলেরই উহাদিগকে সসম্ভ্রমে পথ ছাড়িয়া দিতে হয়। বানর, আকাশের পাখী, পায়রা, কাক, চড়াই—সবাই মানুষের মধ্যে অসঙ্কোচে খেলাইয়া বেড়াইতেছে, মানুষের গৃহে প্রবেশ করিতেছে, আহারের উদ্দেশে তাহাদের নিকট আসিতেছে—এই দৃশ্যটি আমাদের নিকট বড়ই অদ্ভুত বলিয়া মনে হয়;—এই তপোবনসুলভ সমদৃষ্টি আমাদের পাশ্চাত্যদেশে অপরিজ্ঞাত।

কাঁদুনী-সুরের বাদ্যসহকারে বিবাহের বরযাত্রী চলিয়াছে; আগে-আগে নর্ত্তকের দল, তাহার পাশে-পাশে করতাল ও শানাই-বাদক। বর কনের মুখ জুঁইফুলের ঝালরে ঢাকা; তাহাদের জরীর পাগ্‌ড়ী হইতে উহা অবগুণ্ঠনের ন্যায় ঝুলিয়া রহিয়াছে। কখন-কখন বর-কনে খুবই অল্পবয়স্ক; বরের বয়স বড় জোর ৫ বৎসর, কন্যার বয়স দুই-কিংবা-তিন বৎসর। বর-কন্যা দুইজনে কেমন গম্ভীরভাবে এক পাল্কিতে বসিয়া আছে—দেখিলে হাসি পায়। যে বরের বয়স ১৫।১৬বৎসর, সে ঘোড়ায় চড়িয়া যায়; কিন্তু তাহারও মুখ ফুলের-ঝালরে ঢাকা থাকে। এই ভারতীয় লোকদের এখনও সেই সুখের আদিম অবস্থা—প্রায় শৈশব-অবস্থা বলিলেও

হয়। আধুনিক জগতের সহিত যেন আদপে খাপ খায় না। কিন্তু ইহাদের সূক্ষ্ম চিন্তা-কল্পনা আমাদের চিন্তা-কল্পনাকে ছাড়াইয়া যায়, এবং বিশুদ্ধ ও উন্নততর আধ্যাত্মিক রাজ্যে, উহারা আমাদের মস্তিষ্কহীন অপদার্থ লোকদিগের অপেক্ষা যে কত উচ্চস্থান অধিকার করে, তাহা বলা যায় না; অথচ আমাদের কোন কোন উচ্চপদধারী গণ্ডমূর্খ, উহাদের মুখের উপর চুরুটের ধম ফুৎকার করিতেও কুণ্ঠিত হয় না।...

বারাণসীতে, ধ্যানধারণা পূজা-অর্চ্চনার এমন একটা পুণ্যপ্রভাব চতুর্দ্দিকে বিরাজমান যে, সহজেই অন্তরাত্মা ঊর্দ্ধে উন্নীতহয়,—এই কথা সেই নিস্তব্ধ ক্ষুদ্রগৃহের তত্ত্বজ্ঞানীরা বলিয়াছিলেন; তাঁহাদের কথাটা খুবই সত্য; এখানে প্রথমে যে আইসে, কিছুদিন পরে সে আর সে লোক থাকে না। অথচ এখানকার বিচিত্র পার্থিব মায়াদৃশ্য যেরূপ চিত্ত-বিমোহন, এমন আর কোথাও নহে; এখানকার আকৃতির সৌন্দর্য্য যেরূপ চিত্তচাঞ্চল্যকর—রূপের সৌন্দর্য্য যেরূপ চিত্তলোভন, এমন আর কোথাও নহে; একদিকে পৃথিবীর আহ্বান, অপর দিকে স্বর্গের আহ্বান—এই দুয়ের মধ্যে সংগ্রাম বাধিয়া চিত্ত যেন কেন্দ্রচ্যুত হইয়া পড়ে

সকল দেবালয়েই পুণ্যশঙ্খ নিনাদিত হইতেছে, ঝটিকার রোলে প্রকাণ্ড ঢাক-ঢোল বাজিতেছে; প্রভাত ও সন্ধ্যায়,—লোহিত মন্দির-চূড়ার চারিধারে জলদবৎ পরিব্যাপ্ত কাকদিগের চিরন্তন কা-কা-রবকে আচ্ছন্ন করিয়া পূজার বাদ্যকল্লোল সমুত্থিত হইতেছে।

সেই দুর্গা—সেই ভীষণদর্শনা করালী দেবী কালীরও মন্দির এই পুণ্যনগরীতে প্রতিষ্ঠিত আছে; মন্দিরটি ঘোর রক্তবর্ণ;—শোণিতের বর্ণ;—যে শোণিতপানেও তাঁহার পিপাসার শান্তি হয় না; হতজীবের পূতিগন্ধে সমস্ত মন্দির পরিব্যাপ্ত; মন্দিরের সানে বীভৎস রক্তের দাগ; কেন না, এখনও বলিদান চলিতেছে। ক্ষুদ্র গঠনহীন কালীমূর্ত্তি মন্দির-দালানের ভিতরদিক্‌কার একটা কুলুঙ্গির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত। মূর্ত্তিটি কৃষ্ণবর্ণ,

মনুষ্যভ্রূণের মত অপরিস্ফুট—বড় বড় চোখ; রক্তবস্ত্রের মধ্য হইতে অর্দ্ধেক বাহির হইয়া আছে। এই রক্তের পূতিগন্ধের সহিত আবার বানরের গায়ের অসহ্য দুর্গন্ধ মিশিয়াছে। কতকগুলা চোখ মিট্‌মিট্‌ করিতেছে—চারি কোণ হইতেই আমার দিকে তাকাইয়া আছে; মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করিবামাত্র কতকগুলা নির্লজ্জ দুর্বিনীত জীব লাফ দিয়া আমার কাঁধের উপর আসিয়া বসিল—ছোট-ছোট চটুল শীতল হস্ত আমার চুল ধরিয়া টানিতে লাগিল, আমার আস্তিনের মধ্যে ঢুকিবার চেষ্টা করিতে লাগিল…বন হইতে বাহির হইয়া এই বানরগুলা মন্দিরের মধ্যে আড্ডা গাড়িয়াছে—উহাদিগকে মন্দির হইতে বহিষ্কৃত করিতে কাহারও সাহস হয় না; মন্দির ও মন্দিরসংলগ্ন উদ্যানে উহারা পিল্‌পিল্‌ করিতেছে; সকলেই উহাদিগকে ভক্তি করে; আজ প্রত্যেকেই এই অনধিকার-প্রবেশী ক্ষুদ্র জীবদিগের জন্য ছোলার দানা আনিয়াছে,—উহারা এই স্থানের যথেচ্ছাচারী প্রভু হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

সকলের মধ্যস্থলে স্বর্ণমন্দির; ইহা যেন বারাণসীর হৃদয়দেশ; এই হৃদয়টি অন্ধকেরে গলি-উপগলির জটিলতার মধ্যে সযত্নে রক্ষিত। মন্দিরটি ক্ষুদ্র; এরূপ আচ্ছাদিত যে, উহার কোন অংশই কেহ দেখিতে পায় না; এবং ইহার লোকবিশ্রুত গম্বুজগুলা পাৎলা সোনার পাতে মণ্ডিত—কেবল পার্শ্ববর্ত্তী ছাদের দর্শকদিগের নিকট অথবা গগনবিহারী বিহঙ্গ-দিগের নিকটেই সুপরিচিত। যতই উহার নিকটে যাওয়া যায়, ততই জটিল গোলকধাঁদার মধ্যে আসিয়া পড়া যায়, ক্রমেই উহার পরিসর সঙ্কীর্ণ হইয়া উঠে, সাঙ্কেতিক মূর্ত্তির সংখ্যাবৃদ্ধি হয়। প্রচুর ভগ্নাবশেষ; রাশীকৃত মলা-আবর্জ্জনা; সর্ব্বত্রই বিগ্রহ—একপ্রকার প্রহরিঘরের মধ্যে অবস্থিত; হলদে ফুলের মালা মাটীতে পড়িয়া-পড়িয়া পচিতেছে; ডিম্বের ন্যায় গোলাকার কিংবা লিঙ্গাকারে খোদিত শিলাখণ্ডসকল আধার-পীঠের উপর সংস্থাপিত; এই প্রস্তরগুলা এরূপ পবিত্র যে, উহাদিগের

পাশ ঘেঁষিয়া যাইতেও কেহ সাহস করে না। দোকানে, পিতল কিংবা মার্ব্বেলের পুতুলসকল বিক্রীত হইতেছে;—এখানকার তৈয়ারী বলিয়াই উহাদের বিশেষ মাহাত্ম্য। প্রেতমূর্ত্তি সন্ন্যাসী,—চোখগুলা জ্বলন্ত অঙ্গারের মত—সমস্ত শরীর ভস্মাবৃত, মুখমণ্ডল গুপ্তচিহ্নের দ্বারা অঙ্কিত—শুক্ন কাঠের আগুন জ্বালাইয়া তাহার সম্মুখে উবু হইয়া রাস্তার ছায়ায় বসিয়া আছে। তাহাদের পাশ দিয়া যখন চলিয়া গেলাম, অস্থিসার বাহু ধীরে ধীরে উত্তোলন করিয়া তাহারা আমাকে ইঙ্গিতে আশীর্ব্বাদ করিল।

চারিদিক্ রুদ্ধ চত্বরের মত একটা স্থান—তাহার উপর রাশীকৃত প্রাচীর ও ভগ্নাবশেষ স্থাপিত; ইহাই বলিতে গেলে স্বর্ণমন্দিরের অঙ্গন অথবা আধারপীঠ; কিন্তু ইহা ঠিক মন্দিরের সম্মুখে অবস্থিত নহে; মন্দিরের দ্বারদেশে যাইতে হইলে আবার একটা সঙ্কীর্ণ অন্ধকেরে গলির ভিতর দিয়া যাইতে হয়। এই স্থানটি অতীব পবিত্র, সাধুসন্ন্যাসীরা এখানে নিয়ত বাস করে। এখানকার কোন জিনিষ স্পর্শের দ্বারা কলুষিত না হয়, এইজন্য বিদেশীকে সর্ব্বদাই বিশেষরূপে সতর্ক থাকিতে হয়। এখানে-ওখানে, দেয়ালের মধ্যে খোদিত কুলুঙ্গি রহিয়াছে;—কুলুঙ্গিগুলা জালিকাটা পিতলের কপাটে বদ্ধ—তাহার মধ্যে মসৃণ শিলাখণ্ডসকল সারি-সারি অধিষ্ঠিত, এই শিলাখণ্ডগুলা, জন্ম ও মৃত্যু, এই দুই মহা-রহস্যের সাঙ্কেতিকমূর্ত্তি। বড়-বড় বন্যপশুকে যেরূপ পিঞ্জরে বদ্ধ করিয়া রাখা হয়, সেইরূপ ধাতুময়-স্থূল-গরাদে-বিশিষ্ট পিঞ্জরসকল ভীষণদর্শন বিগ্রহে পরিপূর্ণ; এবং একএকটা ছায়াময় কোণে,—ন্যাকড়াকানি ও হলদে ফুলের মালায় পরিবেষ্টিত ভাঙাচোরা ভীষণ গণেশমূর্ত্তি,—ভক্তবৃন্দের ভক্তিপূর্ণ হস্তের ঘর্ষণে ক্ষয় হইয়া গিয়াছে। শুষ্ক ফুলের মালা মাটীর উপর ছড়ান রহিয়াছে; তাহার সহিত বহুবর্ষসঞ্চিত ধূলারাশি মিশিয়াছে। মধ্যে-মধ্যে পবিত্র গরুদের গোময়ের উপর পা পড়িয়া যায়; এই গাভীবৃন্দ সমস্তদিন ইতস্ততঃ জনতার মধ্যে বিচরণ করিয়া সন্ধ্যার সময় আবার

এইখানে ফিরিয়া আইসে। এই স্থানটি তীর্থযাত্রীদিগেরও একটা আড্ডা। চতুষ্পার্শ্বস্থ তপোবনের ধর্ম্মনিষ্ঠ তপস্বী, দিব্যভাবপরিব্যক্ত সুন্দর মুখশ্রী, অরুণবস্ত্রধারী, শুদ্ধচিত্ত যোগী,—রুদ্রাক্ষ ও কড়ির মালায় সর্ব্বাঙ্গ সমাচ্ছন্ন—ইহারা একটা প্রস্তরময় চতুষ্কমণ্ডপের মধ্যে আশ্রয় লইয়াছে। পুরাকালে, ইহাদেরই জন্য এই সকল মণ্ডপ নির্ম্মিত হয়। ইহাদের চতুষ্পার্শ্বে এখানকার নিত্যনিবাসী ভিক্ষু সন্ন্যাসী, মৃগীরোগগ্রস্ত সন্ন্যাসী,—জ্বরবিকারীর ন্যায় রক্তনেত্র ধরালুণ্ঠিত কঙ্কালমূর্ত্তি, যাহারা ভিক্ষার জন্য লুপ্ত-অঙ্গুলী হস্ত বাড়াইয়া দেয়, সেই সব কুষ্ঠরোগী...এই সকল জড়বৎ অচল ভস্মলিপ্ত ছদ্মবেশী লোক—যাহাদের সমস্ত জীবন যেন চোখের তারার মধ্যেই পুঞ্জীভূত,—ইহারাই মন্দিরের আশপাশে যেন একটা অস্পষ্ট বিভীষিকার ছায়া বিস্তার করিয়া রহিয়াছে; কতকগুলা বৃদ্ধ সন্ন্যাসী, যাহাদের জটাকলাপ স্ত্রীলোকের খোঁপার মত মস্তকের চূড়াদেশে উঁচু করিয়া বাঁধা;—ইহাদের দৃষ্টিপথে একবার যে পতিত হয়, ঐ ভীষণ মূর্ত্তি উপচ্ছায়ার ন্যায় তাহাকে নিয়ত অনুসরণ করে—সে কখনই তাহা ভুলিতে পারে না।

স্বর্ণমন্দিরের মধ্যে কোন বিধর্ম্মী প্রবেশ করিতে পায় না। কিন্তু দ্বারদেশের সম্মুখে, পুরোহিতদিগের একটি সেকেলে-ধরণের গৃহ আছে; এই গৃহ ও স্বর্ণমন্দির—এই উভয়ের মধ্যে একটা সরু গলিপথ। এই পুরোহিতগৃহের উপরে সকলেই অবাধে উঠিতে পারে। এখানে প্রতিদিন প্রাতে ও সন্ধ্যায় মৃত্যুদেবতার নিকট শোকসঙ্গীত হইয়া থাকে; তাহার সঙ্গে প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড ঢাক-ঢোল বাজিতে থাকে। এবং যেখানে বসিয়া তুরীনাদকেরা তূরীনাদ করে, সেই গবাক্ষবারণ্ডাটি এমন জায়গায় অবস্থিত যে, সেখান হইতে মন্দির-গম্বুজের অসীম ঐশ্বর্য্য, খুব নিকট হইতে দেখা যায়। এই মন্দিরের তিনটি গম্বুজ। একটা গম্বুজ কালো-পাথরের—উহা পিরামিড়-আকারে সজ্জিত দেবদেবীর মূর্ত্তিতে পরিপূর্ণ। আর দুইটি

একেবারেই সোনার ;—খোদাই-কাজ-করা পুরু সোনার পাতে গঠিত ; তা, ছাড়া, ইহার একটি অসাধারণত্ব দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয় ;—এই পুরু খাদহীন সোনার পাতের যে উজ্জ্বলতা, তাহা যুগযুগান্তরেও ম্লান হয় নাই। কোন কৃত্রিম উপায়ে কোন সোনার কাজে ঐরূপ উজ্জ্বলতার অনুকরণ করা অসম্ভব। এই সকল সোনার কারুকার্য্যের খোঁচ্-খাঁচের মধ্যে টিয়ারা বাসা বাঁধিয়া সপরিবারে বাস করিতেছে ;—কেহই তাহাদের বাধা দেয় না ; উহা যেন পূর্ব্ব হইতেই একপ্রকার বোঝাপড়া হইয়া আছে। স্বর্ণপুষ্প, স্বর্ণপল্লবের মধ্যে এই সকল অসংখ্য টিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে ; ইহাদের স্বাভাবিক সবুজ রং, সোনার জমির উপর আরও যেন সবুজ দেখাইতেছে।

প্রায় সকল রাস্তাই গঙ্গায় আসিয়া শেষ হইয়াছে ; গঙ্গার ধারে আসিয়া আরও কলাও—আরও পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে ; এই গঙ্গার ধারেই বারাণসীর বিরাট্ মহিমা যেন সহসা আবির্ভূত,—বড়-বড় প্রাসাদ, দীপ্ত আলোকের তরঙ্গলীলা। এই গঙ্গার জন্যই, নগরের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত, জমকাল সোপান প্রস্তুত হইয়াছে—সেই সোপান দিয়া গঙ্গার পূতজলে অবতরণ করা যায় ; এমন কি, যখন জল শুকাইয়া নদীর তল নিম্ন হইয়া পড়ে (যেমন এই সময়ে), নদীর গভীর গর্ভে নিমজ্জিত ভগ্নাবশেষসমূহ যখন বাহির হইয়া পড়ে, তখনও ঐ সোপান দিয়া নদীর জলে নাবা যায়। সোপান-ধাপের স্থানে-স্থানে ছোট-ছোট পাথরের ঘর রহিয়াছে, সেইখানে বিভিন্ন মন্দিরের বিভিন্ন দেবতার ক্ষুদ্রাকার মূর্ত্তিসকল প্রতিষ্ঠিত। প্রতিবর্ষ বর্ষাগমে এই সকল মূর্ত্তি জলের মধ্যে দীর্ঘকাল নিমজ্জিত থাকে এবং জলের বেগকে আট্‌কাইবার জন্য এই সকল ক্ষুদ্র মূর্ত্তি গুরুপিণ্ডাকারে নির্ম্মিত হইয়াছে।

এই নদীই বারাণসীর জীবন—বারাণসীর মাহাত্ম্যের মুখ্যহেতু। কি প্রাসাদ, কি অরণ্য—সকল স্থান হইতেই লোকেরা এই জাহ্নবীর পুণ্যতীরে

মরিবার জন্য আইসে; বৃদ্ধ ও রুগ্ন ব্যক্তিগণ দূর হইতে সপরিবারে এখানে আইসে, উহাদের মৃত্যু হইলে পরিবারস্থ লোকেরা আর ফিরিয়া যায় না। এখানকার লোকসংখ্যা এখনই ত তিনলক্ষ,—এই সংখ্যা আবার বৎসরে বৎসরে আরও বৰ্দ্ধিত হয়; যাহাদের অন্তিমকাল আসন্ন, তাহারা এই স্থানকে আগ্রহের সহিত আকাঙ্ক্ষা করে।...

কাশীধামে মৃত্যু! গঙ্গাতীরে দেহত্যাগ! গঙ্গার জলে মৃতদেহের অন্তিম অবগাহন, গঙ্গাজলে শেষ ভস্মনিক্ষেপ—আহা! সে কি সৌভাগ্যের কথা!...

স্বৈর্য্যনাশ

"মনস্ঃ—সংস্কৃত ভাষায় এই শব্দের অর্থ—এমন একটি পদার্থ যাহা আমাদের চতুর্দ্দিকে বিকীরিত হইতেছে—ব্যাপ্ত হইতেছে—অথচ উহার এমন কোন পৃথক সত্তা নাই যাহা চিরকাল অক্ষুণ্ণভাবে বর্ত্তমান থাকিবে। উহার কোন নির্দ্দিষ্ট সীমা নির্দ্দেশ করা সম্ভব নহে।..."

বিহঙ্গ-পরিসেবিত সেই ক্ষুদ্র গৃহের নীরবতার মধ্যে আমার দীক্ষাদাত্রী আমাকে ঐ কথাগুলি বলিলেন। সাদা কাপড়ে ঢাকা একটা সামান্য তক্তার উপর, মুখামুখী হইয়া আমরা দুজনে উপবিষ্ট।

তাঁর উপদেশে কেমন একটা একগুঁয়েমি ভাব আছে;—কিন্তু সেই উপদেশ একদিকে যেমন অনন্য কঠোর, তেমনি আবার কারুণ্যরসসিক্ত; এই উপদেশের প্রভাবে, আত্মার পৃথক সত্তার ধারণা আমার মন হইতে যেন ক্রমশঃ অপসারিত হইতে লাগিল; যাহাদের আমি ভালবাসি, আমার আত্মীয় স্বজন, অপর লোক, আমি স্বয়ং—সমস্তই ধ্বংস হইতে চলিল; কতকগুলি ক্ষুদ্র অংশ একই সমষ্টি হইতে ক্ষণকালের জন্য বিচ্ছিন্ন হইয়াছে; পরে, কালচক্র যখন আবার আবর্ত্তিত হইবে, তখন ঐ সকল অংশ, সেই অক্ষয় অক্ষুণ্ণ মহাসমষ্টির অতল গর্ভে আবার আসিয়া চিরতরে নিমজ্জিত

হইবে। "একদিন ঈশ্বরের ক্রোড়ে গিয়া আবার তোমরা পুনর্ম্মিলিত হইবে"—বাইবেলের এই অস্পষ্ট ও মধুর আশ্বাস-বাণীর ইহাই সুস্পষ্ট ও বিষাদময় ব্যাখ্যা।

যাহারা আমাদের ভালবাসার জিনিস তাহাদের পৃথক্ সত্তা স্থায়ী হইবে—ইহা একটা মায়া বিভ্রম মাত্র; তাহাদের হাসি, তাহাদের দৃষ্টি, অন্য হইতে যাহা কিছু তাহাদের বিশেষত্ব, তাহাদের অমর আত্মার যে একটু ছায়া আমাদের নিকট প্রতিভাত হয়, আত্মারই মত যাহাকে আমরা নির্ব্বিকার ও অবিনশ্বর বলিতে ইচ্ছা করি—এ সমস্তই মায়া-বিভ্রম। মানব-জীবনসম্বন্ধে খৃষ্টানদের যে ধারণা, এতদিন সেই ধারণাকে আমি প্রাণপণে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছিলাম—আমার মমতাময় মানব-হৃদয়ের নিকট যাহা অতীব বীভৎসজনক বলিয়া মনে হইয়াছিল সেই মতবাদটিকে পরীক্ষারও অযোগ্য বিবেচনা করিয়াছিলাম; অবশেষে, মাদ্রাজে, ঐ মত-বাদকে আমি একেবারেই অগ্রাহ্য করি; অবশ্য মাদ্রাজে, ঐ মতবাদটি বৌদ্ধধর্ম্মের আরও নির্ম্মম নিষ্ঠুর আকারে আমার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু এখন দেখ, যে মতবাদ কোন্ পুরাকালে আমাদের রহস্যময় পূর্ব্বপুরুষেরা পরিব্যক্ত করিয়াছিলেন, আমার দীক্ষাগুরু সেই সমগ্র মতবাদটি একটু একটু করিয়া ক্রমশ আমার উপর চাপাইয়া দিয়াছেন; এবং অনেক অবর্ণনীয় ভয়-আশঙ্কার পর, এখন দেখিতেছি আমার দীক্ষাগুরুর উপদেশের মধ্যে যেটুকু সান্ত্বনা পাওয়া যায় তাহাই অগত্যা আমাকে মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিতে হইবে।

এই উপদেশের ফলে,—তত্ত্বজ্ঞানীদের ধ্যানলব্ধ বিচ্ছেদ-তত্ত্বটি আমার অন্তরের অন্তস্তলে প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। যে সকল প্রিয়জনকে আমি হারাইয়াছি তাহাদের স্মৃতির সহিত এখন আর একটা যাতনাময় জিজ্ঞাসা সংযুক্ত নাই। অবশ্য তাহারা জীবিত আছেন, কিন্তু পীড়নকারী ও মায়াময় আমিত্ব হইতে তাঁহারা প্রায় বিমুক্ত। দূর

ভবিষ্যতে তাঁহাদের সহিত পুনর্ম্মিলিত হইব—কিংবা আরও ঠিক করিয়া বলিতে গেলে—তাঁহাদের সহিত একেবারে মিশিয়া যাইব—এই কল্পনাটি এখন আমি মানিয়া লইয়াছি। এইরূপ যে মিশিয়া যাইব, তাহা মৃত্যুর পরক্ষণেই নহে, কিন্তু হয় ত যুগ-যুগান্তরের পর। তাছাড়া, এই যুগ-যুগান্তর-কালও বিভ্রমাত্মক,—সুতরাং উহার সহিত বর্ত্তমান জন্মের ক্ষণিক জীবনের যতটুকু সম্বন্ধ সেইটুকু কালই আমরা উপলব্ধি করিতে পারি।

আমি জানি, এই সন্ন্যাস বৈরাগ্যের ভাব আমার মন হইতে চলিয়া যাইবে; এই তত্ত্বজ্ঞানীদের গূঢ় প্রভাব হইতে দূরে সরিয়া গেলেই, আবার আমি জীবন পাইব, কিন্তু পূর্ব্বেকার মত নহে; আমার আত্মার অন্তরের মধ্যে যে বীজ উপ্ত হইয়াছে, তাহা অঙ্কুরিত হইয়া আবার আমার জীবনকে আচ্ছন্ন করিবে,—সম্ভবত আবার আমাকে বারাণসীতে ফিরিয়া আনিবে। এতদিন পৃথিবীতে যে কাজ করিয়াছি, যে ভাবে জীবন কাটাইয়াছি, এখন তাহার দীনতা ও ব্যর্থতা উপলব্ধি করিতেছি; রূপ ও রঙে আমি উন্মত্ত ছিলাম, পার্থিব জীবনে যারপরনাই মুগ্ধ ছিলাম; যাহা কিছু ক্ষণভঙ্গুর তাহাকে আটকাইয়া রাখিতে—যাহা কিছু অস্থায়ী তাহাকে ধরিয়া রাখিতে, আমার প্রাণপণ চেষ্টা ছিল।

আজ রাত্রে আমি তত্ত্বজ্ঞানীদের গৃহ হইতে চলিয়া যাইব; উহার বাহ্য আকর্ষণে আমি চিরমুগ্ধ—না জানি আবার কোন্ দিন উহার আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া এখানে আসিব।

লক্ষ্যহীন হইয়া বারাণসী নগরে ইতস্ততঃ পর্য্যটন করিতে করিতে, এইবার দৈবক্রমে নর্ত্তকী ও বেশ্যাদিগের অঞ্চলে আসিয়া পড়িয়াছি। বাড়ীর নীচের তালায় অসংখ্য ছোট ছোট দোকান; সেখানে চুম্‌কিবসানো মল্‌মল, জরির মল্‌মল, বংকরা মল্‌মল বিক্রীত হইতেছে; দোকানীরা এই মাত্র প্রদীপ জ্বালিয়াছে। রাস্তার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সমস্ত বাড়ীর উপরকার তালাগুলি সোহাগ-লালিতা তিমিরাশ্রিতা ললনাদের

বাসস্থান; নৈশ বেশ্যাবৃত্তির জন্য উহারা অত্যুজ্জ্বল বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া, গবাক্ষের সম্মুখে, বারাণ্ডার ধারে বাহার দিয়া বসিয়াছে; পশ্চাদ্ভাগে উহাদের দীপালোকিত ঘরগুলি দেখা যাইতেছে, শিশু-রুচি-সুলভ প্রাচুর্য্য সহকারে অসংখ্য ঝাড়লণ্ঠন কড়িকাঠ হইতে ঝুলিতেছে। ঘরের চুন্‌কাম-করা শাদা দেয়ালে গণেশের চিত্র, হনুমানের চিত্র, কিংবা রক্তাপ্লুতা কালীর চিত্র রহিয়াছে। বেশ্যাদিগের নগ্ন বাহুতে, কর্ণযুগলে, নাসারন্ধ্রে,—বলয়াদি ও বিবিধ রত্নরাজি ঝিক্‌মিক্ করিতেছে। তীব্রগন্ধী পুষ্পমালা বহু-স্তবকে বক্ষের উপর ঝুলিতেছে। প্রভাতে গঙ্গাতীরে যে সকল দুরধিগম্যা ব্রাহ্মণ-কন্যাকে দেখা যায় তাহাদেরই মত ইহাদের একই প্রকার মখমল-কোমল নেত্র, বোধ হয় তাহাদেরই মত একই প্রকার উজ্জ্বল শ্যামল গাত্র,—সহসা বিভ্রম জন্মিতে পারে...

যে প্রস্তর-পীঠের উপর বুদ্ধদেব বসিয়াছিলেন।

যে প্রস্তর-পীঠের উপর বুদ্ধদেব বসিয়াছিলেন সেই পীঠটি দেখাইবার জন্য আমার বন্ধু আমাকে সহরের বাহিরে, পল্লীর মাঠময়দানের দিকে লইয়া গেলেন। পথে যাইতে যাইতে, সেই মেঠো নিস্তব্ধতার মধ্যে আমরা অলৌকিক তত্ত্ব সম্বন্ধে আলাপ করিতে লাগিলাম।

বারাণসীর পল্লীভূমি অতীব নির্জ্জন, প্রশান্ত, এবং গোপজীবন-সুলভ শান্তি-রসাশ্রিত। কতকগুলি যব ও ধান্যের ক্ষেত দেখা যাইতেছে; এখন ফেব্রুয়ারী মাস—ইহার মধ্যেই শস্যাদি পাকিয়াছে, গাছপালা সবুজ হইয়া উঠিয়াছে; এইরূপ না হইলে, কতকটা ফ্রান্‌সের ক্ষেত্রভূমি বলিয়া মনে হইত। রাখালেরা বেণু বাজাইতে বাজাইতে গো মহিষ ও ছাগল চরাইতেছে। বনভূমির কোণে, কতকগুলি পুরাতন পবিত্র শিলাখণ্ড রহিয়াছে,—সেইখান দিয়া যাইবার সময়, কোন ভক্ত কৃষক উহার উপর একটা হল্‌দে ফুলের মালা ফেলিয়া গিয়াছে; এই সকল

শিলাখণ্ড গণেশ ও বিষ্ণুর মূর্ত্তি বলিয়া পূজিত; গঠন-হীন হইলেও এখনও উহাতে গণেশ ও বিষ্ণুর কতকটা সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। সুন্দর-সুন্দর রঙের পাখী,—কাহারও বা ফেরোজা মণির মত নীল-রং, কাহারও বা মরকত মণির মত সবুজ-রং—উহারা বিশ্বস্তভাবে আমাদের খুব কাছে আসিয়া বসিতেছে;—উহারা মানুষকে ভয় করে না, কেননা এখানে কেহই উহাদিগকে হত্যা করে না। এই সমস্ত প্রদেশের উপর মূর্ত্তিমান শান্তিরস যেন স্তব্ধভাবে পক্ষ বিস্তার করিয়া রহিয়াছে।

এখানে ওখানে অট্টালিকা ও সমাধি-মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ স্তূপাকারে অবস্থিত—তাহাতে বৃক্ষের শাখা প্রশাখা ও শিকড় জড়াইয়া রহিয়াছে; উহার উপর ক্ষুদ্র গ্রাম সকল স্থাপিত;—দেবালয় ও সমাধিস্থানের পুরাতন প্রাচীরে এখানকার কুটীর-সকল নির্ম্মিত হইয়াছে।

যে সময়ে বৌদ্ধধর্ম্ম বিস্তার লাভ করে, সেই সময়ে কতকগুলি বৌদ্ধমঠ নির্ম্মিত হইয়াছিল; তাহার পর, দেশের উপর দিয়া যখন মুসলমান ধর্ম্মের প্রচণ্ড স্রোত বহিয়া যায়, তখন ঐ সকল মঠ মস্‌জিদে পরিণত হয়; আবার যখন প্রাচীন ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম আসিয়া দেশকে পুনরধিকার করে, তখন আবার ঐ সকল মস্‌জিদ পরিত্যক্ত হয়। এই সকল পরিত্যক্ত মস্‌জিদ; সন্ন্যাসী যোগী ও যোদ্ধাদিগের এই সকল সমাধি-মন্দির;—সমস্তই, আম্রকানন ও কদলীবনের নীলিম ছায়ায় মিশিয়া গিয়াছে; ধর্ম্মোন্মত্ত প্রত্যেক আক্রমণকারীর ইচ্ছামত, বড়-বড় প্রস্তরখণ্ড কতবার ওলট্‌পালট্ হইয়া গিয়াছে—উহার একদিকে বুদ্ধের পদ্ম এবং অপরদিকে কোরাণের বয়েৎ অঙ্কিত রহিয়াছে। এই সকল প্রশান্ত ধ্বংসাবশেষের উপরে এখনকার কুটীরবাসী লোকেরা প্রাচীন পদ্ধতি-অনুসারে, শিল্প-কর্ম্মে ব্যাপৃত, উহারা রেশমের কোমরবন্দ বুনিতেছে; উহার সূতাগুলা তৃণের উপর প্রসারিত হইয়া কখন কখন সমাধি ভূমির উপর দিয়াও চলিয়া গিয়াছে; উহারা মলমল-কাপড়ে রং করিতেছে;

রং-করিয়া ফাট্‌-ধরা কোন পুরাতন মন্দির-চূড়ার উপর, রদ্দুরে শুকাইতে দিয়াছে।

শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিত, আমাকে যে তীর্থস্থানে লইয়া যাইতেছেন, উহা আরও দূরে অবস্থিত।

পথের মাঝে একটা গরুর গাড়ীর পাশ দিয়া আমরা চলিয়া গেলাম—গরুর গাড়ীটা শিশুতে ভরা,—বৃদ্ধ যাদুকরের মত একজন লোক উহাদিগকে লইয়া যাইতেছে। উহা আমাদের দেশের জুজুর গাড়ী কিম্বা জুজুব বুড়ো মনে করাইয়া দেয়। ছেলে মেয়েতে প্রায় ২০টি শিশু গাদাগাদী করিয়া রহিয়াছে; ফুকর-বিশিষ্ট তক্তা-ঘেরের মধ্য হইতে—চাঁদোয়ার নীচে হইতে—গাড়ীর সর্ব্বাংশ হইতেই উহাদের মাথা দেখা যাইতেছে। উহারা কণ্ঠহার নলক প্রভৃতি অলঙ্কারে বিভূষিত, উৎসবোচিত পরিচ্ছদ ও চুম্‌কি-বসান উচ্চ মুকুটে সজ্জিত; উহাদের বড় বড় চোখ্—কজ্জল-রেখায় অঙ্কিত হওয়ায় আরও বড় দেখাইতেছে;—আমি শুনিলাম, শোভার জন্য নহে কিন্তু পাছে পথিমধ্যে কোন দুষ্ট ডাইনী ঐ নির্দ্দোষী শিশুদের উপর নজর দেয়— তাহা নিবারণ করিবার জন্যই উহারা চোখে কাজল পরিয়াছে। দেখিতে জুজুর মত যে ভাল মানুষটি, গাড়ীটা আস্তে আস্তে হাঁকাইতেছে উহার দীর্ঘ শুভ্র শ্মশ্রু নদীর মত প্রবাহিত, উহার নগ্ন গাত্র,—উত্তর দেশীয় ভল্লুকের ন্যায় শাদা রোমে আচ্ছাদিত। লোকটা শিশুদের লইয়া কোথায় যাইতেছে? বোধহয় শিশুদের কোন একটা উৎসবে;—সেই জন্যই উহারা এই আনন্দের সাজসজ্জায় সজ্জিত এবং পুতুলের ন্যায় অলঙ্কারে বিভূষিত।

এখন আমরা খোলা মাঠের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছি। এখন গাড়ী হইতে নামিয়া, প্রখর রৌদ্রে, একটি অনুর্ব্বর ক্ষুদ্র ভূ-খণ্ডের উপর দিয়া হাঁটিয়া যাইতে হইবে। এই আমাদের গন্তব্য স্থান;—ধ্বংসাবশেষ গুলারই ন্যায় ঘোর-ধূসরবর্ণ কতকগুলা গণ্ডশৈল—তাহারই মধ্যে একটা

চক্রাকৃতি পাথুরে জায়গা; এইখানে একজন রাখাল বাঁশি বাজাইতেছে, আর সেই বংশী-ধ্বনির সঙ্গেসঙ্গে ছাগেরা একপ্রকার সূক্ষ্ম তৃণ চর্ব্বণ করিতেছে। এইখানে কতকগুলা বড় বড় গাছ আছে, দূর হইতে আমাদের ওকগাছ বলিয়া ভ্রম হয়—এই সব গাছের ছায়ার মধ্যে একটা বহু পুরাতন কালো পাথরের পীঠ আছে; আমি ও পণ্ডিত এই প্রস্তর-পীঠের উপর ভক্তিভাবে বসিলাম। দুই সহস্র বৎসরের অধিক হইল, বুদ্ধদের ইহার উপর বসিয়া তাঁহার প্রথম উপদেশ বিবৃত করিয়াছিলেন। কিয়ৎ শতাব্দি হইতে, বৌদ্ধধর্ম্ম এই সমস্ত প্রদেশ হইতে অন্তর্হিত হইয়া, সুদূর প্রাচ্য ভূখণ্ডে বিস্তারলাভ করিয়াছে। এখন এই পুরাকালের পুণ্যভূমিতে ভারতবাসিগণ আর আইসে না। কিন্তু ইহার পরিত্যক্ত অবস্থা সত্ত্বেও, এই প্রস্তর-পীঠটি এখনও বহুসহস্র মনুষ্যের কল্পনার সামগ্রী হইয়া রহিয়াছে। সুদূর চীনে, জাপানের দ্বীপপুঞ্জে, শ্যামের অরণ্যে, দুর্ব্বোধ্য পীত মস্তিষ্কসকল এই ঔপন্যাসিক আসন-পীঠের ধ্যান করিতেছে। কখনও কখনও সেখান হইতে তীর্থ যাত্রীরা পদব্রজে যোজন যোজন পথ অতিক্রম করিয়া, এইখানে আগমন করে এবং নতজানু হইয়া এই পীঠকে চুম্বন করে। এই গোপভূমিসুলভ শান্তির মধ্যে, এই রমণীয় নিস্তব্ধতার মধ্যে, আমি ও পণ্ডিত আমরা দুজনে ব্রাহ্মণ্যিক তত্ত্ব সম্বন্ধে বিশ্রম্ভালাপ করিতেছি।

প্রাচীন ও হৃদয়হীন তত্ত্বজ্ঞানের উদ্দীপক এই পীঠের অনতিদূরে, ক্ষুদ্র পর্ব্বতের ন্যায় গুরুপিণ্ডাকৃতি একটা স্তূপ উঠিয়াছে—এক সময়ে উহা বহুল কারুকার্য্যে ভূষিত ছিল; কিন্তু দুই সহস্র বৎসর পরে এখন উহার খোদাই কাজগুলি ক্ষয় হইয়া গিয়াছে—এবং উহার আপাদ মস্তক, তৃণ ও কণ্টকগুল্মে আচ্ছন্ন হইয়াছে। পুরাতন বারাণসীতে যে বৌদ্ধ-মন্দির সর্ব্বপ্রথমে নির্ম্মিত হয়, ইহাই তাহার ধ্বংসাবশেষ। এই প্রকাণ্ড স্তূপের ভিতর-দেয়াল মনুষ্যপ্রমাণ উচ্চ; ইহার সমস্ত বহিঃপ্রসারিত

অংশগুলি ইহার সমস্ত ক্ষয়গ্রস্ত প্রস্তর, সূক্ষ্ম স্বর্ণপত্রে মণ্ডিত; এবং উহা এই জরাজীর্ণ অবস্থাতেও অপূর্ব্ব ও অভাবনীয় উজ্জ্বলতা ধারণ করিয়া রহিয়াছে। চীনবাসী, অ্যানামাবাসী, ব্রহ্মবাসী তীর্থযাত্রীগণ তাহাদের নিজ নিজ দূর-দেশ হইতে স্বর্ণপত্র আনিয়া উহার গায়ে লাগাইয়া দেয়; এবং যাঁহা তাহাদের চিরধ্যানের বস্তু তাহাকে প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া এইরূপভাবে ভক্তিউপহার প্রদান করা উহারা কর্ত্তব্য জ্ঞান করে। বড়লোকদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইলে যেরূপ তাহাদের নিকট নিজের নাম লিখিয়া পাঠাইতে হয়—এই স্বর্ণপত্রগুলি, এই অবজ্ঞাত উপেক্ষিত পুরাতন পুণ্য-পীঠের হস্তে অর্পিত একপ্রকার "সাক্ষাৎকার-পত্র" বলিলেও চলে।

দিবাবসানে, আবার বারাণসীনগরে ফিরিয়া আসিয়া আমার ভ্রমণ-সহচর তাঁহার এক বন্ধুর বাগানবাটীতে গাড়ী থামাইলেন। ইনিও তাঁহারই ন্যায় জাতিতে ব্রাহ্মণ, দর্শনশাস্ত্রে ও সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত। ফলাদি আহার ও জল পান করিবার জন্য আমাকে তিনি সেইখানে লইয়া গেলেন। (বলা বাহুল্য, একজন ম্লেচ্ছ সঙ্গে আছে বলিয়া, তিনি স্বয়ং খাদ্যপানীয় গ্রহণ পক্ষে বিশেষ সতর্ক ছিলেন।) বাড়ীটি পুরাতন কিন্তু অতীব রমণীয়। ইহার সংলগ্ন একটি উদ্যান আছে—উদ্যানের রাস্তাগুলি একেবারে সোজা, আমাদের অনুকরণে ধারে ধারে চির-হরিৎ তরুরাজি এবং ফ্রান্সের সেকেলে বাগানের মত, ফোয়ারা-বিশিষ্ট জলের চৌবাচ্চা রহিয়াছে; আমাদের দেশের গোলাপাদি ফুলও রহিয়াছে; শীতের প্রভাবে কতকগুলা গাছ পত্রহীন হইলেও,—এই সকল ফুল, এই বায়ুর উত্তাপ, এই সকল হলুদে পাতা দেখিয়া মনে হয় যেন গ্রীষ্মঋতু শেষ হইয়া আসিতেছে, অথবা খর-রৌদ্র শরতের আবির্ভাব হইয়াছে; যেন বৃষ্টির অভাবে এই শরৎ অকালে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে—আলোকের আতিশয্যে বিষণ্ণভাব ধারণ করিয়াছে...

খৃষ্টধর্ম্ম সম্বন্ধে বারাণসীর তত্ত্বজ্ঞানীদের অভিপ্রায়।

বারাণসীর তত্ত্বজ্ঞানীরা বলিলেন :—"যদি তোমরা খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী হও,—তোমরা যাহা পাইয়াছ তাহাই সযত্নে রক্ষা কর। তাহার ওদিকে আর যাইও না। খৃষ্টধর্ম্ম একটি চমৎকার আদর্শ—বহুশতাব্দী হইতে ইহা পাশ্চত্যদিগের ঠিক্ উপযোগী হইয়া রহিয়াছে, এবং ইহার মূলে সত্য অবস্থিত। তোমরা খৃষ্টকে পাইয়া একজন দেব-প্রতিম গুরুকে পাইয়াছ—এমন একটি গুরু যিনি চিরকালই জীবিত আছেন;—কেন না, এ জগতে মৃত বলিয়া কিছুই নাই; তিনি তোমাদের "মুখ্য পথ ও জীবন"; এবং মৃতেরা তাঁহাতে যে আশা স্থাপন করে সে আশা হইতে তাহারা বঞ্চিত হইবে না।

কিন্তু খৃষ্টধর্ম্মের যদি কোন বিশেষ মত, "যে অক্ষর প্রাণঘাতী",—ধর্ম্মগ্রন্থের সেইরূপ কোন আক্ষরিক অংশ যদি তোমাদের যুক্তিবিরুদ্ধ বলিয়া মনে হয়, তাহা হইলে তুমি আমাদের নিকটে আসিও। যদি তোমার নিকট ভক্তির পথ, প্রার্থনার পথ রুদ্ধ হয়, তাহা হইলে আমরা তোমার সম্মুখে সুসূক্ষ্ম জ্ঞানের পথ উদ্‌ঘাটিত করিব; সে পথটি অধিকতর দুরূহ ও অধিকতর কঠোর, কিন্তু কল্পকাল পূর্ণ হইলেই, ঐ উভয় পথই আবার একত্র আসিয়া মিলিত হয় এবং একই গম্যস্থানে লইয়া যায়।"

আরও তাঁহারা বলিলেন :—"প্রার্থনা বোধ হয় ছোট ছোট জাগতিক ঘটনার গতি ফিরাইতে পারে না। কিন্তু আত্মার ক্রমোন্নতি ও শান্তি-লাভের পক্ষে প্রার্থনাই শ্রেষ্ঠ উপায়।

আমরা ইহা বিশ্বাস করি না যে, মহান্ ঈশ্বর,—(এই ঈশ্বরের কথা এখানে সকলেই বর্জ্জন করে) মানুষের প্রার্থনা শোনেন। কিন্তু আমরা যাহারা জীবিত আছি আমাদের চতুর্দ্দিকে, সেই মহান্ ঈশ্বরেরই অংশসমূহ,

পৃথক সত্তায় পরিণত হইয়া, শুভঙ্কর আত্মারূপে সূক্ষ্মজগতে ছড়াইয়া রহিয়াছে !...আর তোমরা খৃষ্টান তোমাদিগকে খৃষ্ট আহ্বান করিতেছেন ; তিনি যে আছেন সে বিষয়ে সন্দেহ করিও না—অন্তত তাঁহার মধ্যে কেহ-না-কেহ অবস্থিতি করিতেছেন—তাঁহার কোন আত্মীয় অবস্থিতি করিতেছেন ; তিনিই তোমার বাক্য শ্রবণ করেন।"

অন্য প্রভাত।

বারাণসীর প্রভাত, সুশীতল ও শিশির-সিক্ত ; এখানে শীতের প্রভাত, কিন্তু আমাদের দক্ষিণ ফ্রান্সে, অক্টোবর মাসে ঋতুকালের যেরূপ মৃদুমধুর ভাব হয়, এখানেও কতকটা সেইরূপ।

নগরের যে দূর উপকণ্ঠে আমি বাস করি, সেখান হইতে প্রতিদিন প্রাতে, নদীর ধারে যখন বেড়াইতে যাই, তখন দেখিতে পাই, পল্লী-গ্রামের ছোট ছোট ব্যবসাদারেরা,—খুব যেন শীত লাগিতেছে এই ভাবে চাদর কিংবা শালে চোখ্ পর্য্যন্ত ঢাকিয়া শহরের দিকে ছুটিতেছে ; লাঠির আগায় ঝুলাইয়া, ক্ষীরের হাঁড়ী, চাউল-পিঠার চুব্ড়ি ময়দার ঝুড়ী,—গঙ্গায় যাহা নিঃক্ষিপ্ত হইবে সেই সব জুঁইফুলের মালা, গাঁদাফুলের মালা, কাঁধে করিয়া চলিয়াছে।

নদীতে নামিবার পূর্ব্বেই, ঘাটের উপরে, একজন সন্ন্যাসীর সম্মুখে আমি দাঁড়াইলাম। সন্ন্যাসীর বয়স ত্রিশবৎসর ; ইনি একটি পুরাতন চতুষ্কমণ্ডপে আড্ডা গাড়িয়াছেন। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ সন্ন্যাসীরা ভূমির উপর যে অগ্নি এতদিন জ্বালাইয়া রাখিয়াছিলেন, সেই অগ্নি তিনিও এখন দিবারাত্রি রক্ষা করিতেছেন। দুই সহস্র বৎসর হইতে এই অগ্নি এই একইস্থানে জ্বলিতেছে। ইনি বৃদ্ধ, মাংসহীন ; ইঁহার দীর্ঘ কেশ মস্তকের চূড়াদেশে স্ত্রীলোকের খোঁপার মত বাঁধা ; নগ্ন দেহ ভস্মলিপ্ত ইঁহার আমার

গলায়, এক ছড়া জুঁইফুলের মালা নিঃক্ষেপ করিলেন, ধ্যানবিহ্বল অতীব মধুর দৃষ্টিতে মুহূর্ত্তকাল আমার দিকে চাহিয়া দেখিলেন, তাহার পর বাহুর দ্বারা একটা ইঙ্গিত করিয়া, আবার ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন। "যদি ইচ্ছা হয়, এইখানে বসে ধ্যান কর।" তাঁহার চির-অবারিত গৃহের সেকেলে ধরণের থামের মধ্য হইতে, নিম্নস্থ গঙ্গার-উপর আমাদের দৃষ্টি নিপতিত হইতেছে—পরপারের বিশাল সমভূমি দেখা-যাইতেছে—সেই মরুভূমি, যাহা এখনও নৈশ বাষ্পজালে আচ্ছন্ন; এবং তাহারই পশ্চাৎ হইতে যাদুকর সূর্য্য ধীরে ধীরে উদিত হইতেছেন! পার্শ্ববর্ত্তী আর একটি চতুষ্কমণ্ডপ, যাহা এই চতুষ্কের উপর ঝুঁকিয়া রহিয়াছে, এবং যেখান হইতে এই চতুষ্কটি দেখা যায় সেইখানে গঙ্গাদেবীর উদ্দেশে, বারাণসীর সমস্ত দেবদেবীর উদ্দেশে, প্রভাত-সঙ্গীত ধ্বনিত হইতেছে; স্তম্ভশ্রেণীর মধ্য হইতে, উদয়াচলের দিকে মুখ করিয়া কতকগুলা দীর্ঘ তূরী বন্যপশুর ন্যায় বিকট গর্জ্জন করিতেছে; এবং এই কর্ণবধির ভীষণ কোলাহলে যোগ দিয়া ঢাক-ঢোল ভিতর হইতে বাজিতেছে।

আমি প্রতিদিন প্রাতে যাহা করিয়া থাকি, আজও সেইরূপ, বারাণসীর দস্তুর অনুসারে নদীতে নামিলাম। এই সময়ে আমার নৌকা আমার জন্য প্রতিদিন অপেক্ষা করিয়া থাকে।

প্রথমে, শ্মশান-ভূমির সম্মুখ দিয়া আমাকে যাইতে হইবে। যদিও কিছু দিন হইতে, এই পবিত্র নগরে মারীভয় দেখা দিয়াছে, তবু একটা বই শব নাই; এই মৃতদেহটি তীরের উপর শয়ান থাকিয়া আ-কটি গঙ্গার জলে নিমজ্জিত রহিয়াছে। কিন্তু আরও কতকগুলা মৃতদেহ আজ রাত্রে নিশ্চয়ই পোড়ান হইয়াছে; কেননা, মাটির উপর কতকগুলা ধূমায়মান চেলাকাঠ, সম্মুখে খানিকটা জল,—মানব-অঙ্গারে সমস্ত কালো হইয়া গিয়াছে, বিষ্ঠা ও গলিত আবর্জ্জনার সহিত ম্লানশুষ্ক পুষ্পমালা সেই জলে ভাসিতেছে। সন্ন্যাসীর সেই মৃতদেহটা বরাবর একইভাবে এইখানে

খাড়া হইয়া রহিয়াছে; বাহুদ্বয় আড়াআড়িভাবে স্থাপিত, মস্তক অবনত, অঙ্গুলীর মধ্যে থুতী রক্ষিত, ধূসর চূর্ণে দেহ আচ্ছন্ন থাকায় মনে হইতেছে যেন গ্রীশ দেশের কোন পিত্তল-প্রতিমূর্ত্তি পৃথিবীতে বেড়াইতে আসিয়াছে; কিন্তু দীর্ঘকেশকলাপ লালরঙ্গে রঞ্জিত এবং মস্তক জুঁইফুলের মুকুটে বিভূষিত।

এই সব ফুলের মধ্যে, এই সব হল্‌দে ফুলের মালার মধ্যে, স্ফীত শবদেহ—জলমগ্ন গরু, মৃত কুক্কুরসকলও ভাসিতেছে এবং গঙ্গার পুরাতন পূতিগন্ধে এই চমৎকার স্বচ্ছ বায়ু পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে; এই পূতিগন্ধ,—গোলাপী প্রভাতের মায়ারাজ্যের মধ্যে, মৃত্যুর ভাবকে আনিয়া বসাইয়াছে ও সযত্নে রক্ষা করিতেছে।

মনে হইতেছে যেন বসন্ত আগতপ্রায়; প্রথমে যখন এখানে আসি, তখন শীতের লক্ষণ সকল দেখা দিয়াছিল, এখন সে সব লক্ষণ আর দেখিতে পাই না। এখন প্রভাতে, একপ্রকার নূতনতর অবসাদ অনুভব করা যায়; মনে হয়, নদীর জলও যেন একটু গরম হইয়াছে; ভারতের সূক্ষ্ম মলমল্-শাড়ী-পরিহিতা, দীর্ঘকুন্তলা স্নান-রতা রমণীগণ গঙ্গার জলে আজকাল একটু বেশীক্ষণ থাকিতেছে। স্নানার্থী ছোট ছোট পাখীর ঝাঁকে নদী আচ্ছন্ন; পায়রা, চড়াই, সকল রঙেরই পাখী দলে দলে থাকিয়া পূজা-রত ব্রাহ্মণদের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িতেছে; তাহাদের চক্‌চকে পিত্তল-ঘটির উপর, তাহাদের ফুলের মালার উপর আসিয়া বসিতেছে; নৌকার সমস্ত কাছির উপর পায়ের নখ বাধাইয়া রহিয়াছে এবং পূর্ণকণ্ঠে গান করিতেছে। পবিত্র গাভীগুলা এখন আরও অলস হইয়া পড়িয়াছে, ঘাটের সিঁড়ির নীচে রদ্দুরে আরামে শুইয়া আছে; এইখানে বালকেরা আসিয়া উহাদিগকে আদর করিতেছে, তাজা ঘাস দিতেছে, সবুজ থাকড়া দিতেছে।

প্রতিদিনের ন্যায় আজও সমস্ত বারাণসী এইখানে উপস্থিত; সমস্ত

নগ্ন-গাত্র লোক, উচ্চবর্ণের সমস্ত পিত্তল-মূর্ত্তি,—তটস্থ বিশাল সোপান-ধাপের উপর, অপূর্ব্ব আতপত্রের ছায়াতলে, যেখানে ষড়্‌ভুজ দেবতারা বাস করে সেই প্রস্তরের চতুষ্কমণ্ডপের মধ্যে, অথবা ভরপুর বন্দ্‌রে, ভাসন্ত তক্তার উপর ও জলের মধ্যে সমবেত হইয়াছে।

শুধু আমিই গঙ্গার উপর, এই সময়ে আরাধনা করিতেছি না, শুধু আমিই স্নান, প্রণতি, জুঁই ও গেঁদা ফুলের নৈবেদ্যদান প্রভৃতি পূজার কোন অনুষ্ঠানই করিতেছি না। প্রত্যেক ডিঙ্গিনৌকার উপর, প্রত্যেক সোপান-ধাপের উপর, প্রতিদিন প্রভাতে এই আনন্দ-উৎসব আরম্ভ হয়; এই ভক্তবৃন্দের মধ্যে আমার কোন স্থান নাই; তাহাদের এরূপ তাচ্ছিল্যভাব, যে, আমার দিকে উহারা একবার চাহিয়াও দেখে না; এখন ভ্রমণের সুবিধা হইয়াছে, ভারতের দ্বার সকলের নিকটেই উন্মুক্ত, পর্য্যটকের বন্যায় বারাণসী এখন পরিপ্লাবিত, কিন্তু এই পর্য্যটকদিগের মধ্যে আমি নগণ্যভাবে চলিয়াছি...আমি প্রথম যখন এখানে আসি, তখন আমি যেরূপ ছিলাম, এখন আর আমি সে-আমি নই; তত্ত্বজ্ঞানীদের গৃহে থাকিয়া, এমন একটি ভাব আমার মনে মুদ্রিত হইয়া গিয়াছে, যাহা কখনই বিলুপ্ত হইবার নহে। আমি "দ্বারদেশের বিভীষিকাগুলা" পার হইয়াছি এবং এক্ষণে শান্তভাবে, আত্মসমর্পণ করিয়া, অভিনব তত্ত্বগুলির ঈষৎ আভাস পাইতেছি। অনেকদিন পর্য্যন্ত অনন্তকালকে আমি উপলব্ধি করিতে পারি নাই, কিন্তু যখন হইতে এই অনন্তকালের মূর্ত্তি, আর এক আকারে, আমার সম্মুখে আবির্ভূত হইল, তখন হইতেই সমস্ত জিনিষেরই ভাব বদলাইয়া গেল,—জীবনের ভাব বদলাইয়া গেল, মৃত্যুরও ভাব বদলাইয়া গেল।

কিন্তু তবু (তত্ত্বজ্ঞানীদের ভাষা অনুসারে) "জাগতিক মায়ায়" এখনও আমি আচ্ছন্ন! সমস্ত পার্থিব ও ক্ষণস্থায়ী বিষয় সম্বন্ধে সন্ন্যাস ও বৈরাগ্যের অঙ্কুর তাঁহারাই আমার অন্তরে নিহিত করিয়াছিলেন।

বারাণসী যেমন একদিকে ধর্ম্মবিষয়ে গুহ্যতন্ত্রী, তেমনি আবার পার্থিব বিষয়ে ইন্দ্রিয়োন্মাদক। বারাণসীর সমস্ত লোক কেবল পূজাঅর্চ্চনা ও মৃত্যুরই চিন্তা করে; ইহা সত্ত্বেও, বারাণসীর সমস্ত পদার্থই যেন নেত্র প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণকে ফাঁদে ফেলিবার জন্য জাল বিস্তার করিয়া রাখিয়াছে। আমি জানি না, এরূপ স্থান আর দ্বিতীয় আছে কিনা। বারাণসী যেমন মানুষকে একদিকে ত্যাগের দিকে,—তেমনি আবার তাহা হইতে দূরে—ভোগের দিকেও সত্বর লইয়া যাইতে সমর্থ। আলোক, বর্ণচ্ছটা, আর্দ্র শাড়ী-পরিহিতা, অর্দ্ধনগ্না মদালসনয়না নবযুবতী—এই সমস্তই ইন্দ্রিয়ের ফাঁদ। পুরাতনা গঙ্গানদীর বরাবর ধারে-ধারে ভারতের অতুলনীয় নারী-রূপের হাট বসিয়াছে…

আমার আদেশের অপেক্ষা না করিয়াই আমার মাঝিমাল্লারা প্রতি-দিনের ন্যায় আজও নৌকাকে আবার উজান বাহিয়া লইয়া গেল। আমরা সেই পুরাতন প্রাসাদ-অঞ্চলের সম্মুখে উপনীত হইলাম। স্থানটি অতীব নির্জ্জন ও ধ্যানচিন্তার অনুকূল…আজ অপরাহ্নে তত্ত্বজ্ঞানীদের সেই ক্ষুদ্র গৃহে আবার প্রত্যাগমন করিব; ভয়-মিশ্রিত একটা মনের টানে আমি সেইখানে যাইতেছি। তাঁহাদের যে উপদেশ প্রথমে আমার চিত্ত আকর্ষণ করিতে পারে নাই, আমার নিকট বীভৎস-ভীষণ বলিয়া মনে হইয়াছিল, এখন তাহাই ক্রমশ আমার মনকে অধিকার করিতেছে; ইহারই মধ্যে তাঁহারা আমার পূর্ব্ব-জীবনের কেন্দ্রটিকে টলাইয়া দিয়াছেন; মনে হয় যেন সেই মহা বিশ্বাত্মার সহিত বিলীন করিবার জন্য, তাঁহাদেরই ন্যায়, আমার অন্তরস্থ ক্ষুদ্র আত্মাটিকেও তাঁহারা ছেদন করিয়াছেন…

তত্ত্বজ্ঞানীরা বলেন:—"যাহা তোমা হইতে ভিন্ন, যাহা তোমার আত্মার বাহিরে অবস্থিত, তাহাই তোমার কামনার বিষয় হইতে পারে; কিন্তু যদি তুমি জানিতে পার যে, তোমার চৈতন্যের অন্তর্গত সমস্ত বিষয় তোমাতেই

রহিয়াছে, এবং সমস্ত বিশ্বের সার বস্তুটি তোমার মধ্যেই অবস্থিত, তখন তোমার সমস্ত কামনা তিরোহিত হয় এবং সমস্ত শৃঙ্খল বিলীন হইয়া যায়।”

“স্বরূপত তুমি ঈশ্বর। এই সত্যটি যদি তোমার হৃদয়ে মুদ্রিত করিতে পার, দেখিবে,—যাহা হইতে সমস্ত দুঃখ যাতনা সমুদ্ভূত হয়, সেই মায়াময় সসীমভাব সমূহ—সেই পৃথক্ সত্তার বাসনা-সকল স্খলিত হইয়া পড়িবে।…”

সেই রহস্যময় পুরাতন প্রাসাদের ধার দিয়া আমরা চলিয়া গেলাম। যাহারা জলের উপর চুল আছ্‌ড়াইয়া—পরে সেই চুল কাঁধের উপর ফেলিয়া দেয়—আর চুল হইতে জল ঝরিয়া পড়ে—সেই সব রমণীদের আর দেখিতে পাইলাম না; ঘাটের সিড়িতে—অন্ধকারের উচ্চ দেয়ালের পাদদেশে, কেহই নাই। কিন্তু হঠাৎ একটা দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইল—রাজপ্রাসাদের নিম্নতলস্থ-গহ্বরের গুরুভার বৃহৎ দ্বার;—এক মৌসমের জন্য, এই গহ্বরটি প্রতিবৎসর নদীর জলে নিমজ্জিত থাকে। সৌর করে উদ্ভাসিত হইয়া, একটি রমণী দ্বারদেশে আসিয়া দাঁড়াইল;—এই সব বিষন্ন প্রকাণ্ড প্রস্তর-রাশির মধ্যে একটি ক্ষুদ্র বিদ্যুন্ময়ী স্বপ্নমূর্ত্তি। পরিধানে রূপালি জরির পাড়ওয়ালা বেগ্‌নি রঙ্গের একখানি শাড়ী—এবং নারাঙ্গী-জর্দ্দা রঙ্গের একটি ওড়্‌না। ওড়নাখানি রোমক-মহিলাদের ন্যায় মস্তকের কেশের উপর ন্যস্ত;—সম্মুখস্থ জনশূন্য সমভূমির দিকে তাকাইয়া না জানি কি দেখিতেছে, এবং চোখ্ ঢাকিবার জন্য নগ্নবাহু উঠাইয়া রহিয়াছে—সেই ভারত-সুলভ বড় বড় চোখ্—যাহার মধ্যে কি একটা অনির্ব্বচনীয় মোহিনী-শক্তি আছে। এই সব বেগ্‌নি ও জর্দ্দারঙের বস্ত্র,—উহার সুন্দর বক্ষদেশ, উহার সুনম্য নিতম্বের রেখা-নিচয় ফুটাইয়া তুলিয়াছে; উহার তরুণ দেহের সহিত সমস্তই বেশ মিশ্ খাইয়াছে…

তত্ত্বজ্ঞানীরা আমাকে বলিয়াছিলেন—“তিনিই আমি, আমিই তিনি,

এবং আমরা ঈশ্বর"...বোধ করি, যেন তাঁহাদের সেই অবিচলিত প্রশান্ত ভাব, আমাকেও আচ্ছন্ন করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

অনেকক্ষণ ধরিয়া আমি উহাকে নিরীক্ষণ করিলাম, আমার মন বিচলিত হইল না, আমার মনে কোন প্রকার আক্ষেপ কিংবা বিষাদের ছায়া পড়িল না; নবযৌবনা ভগিনীর রূপলাবণ্যে যেরূপ গর্ব্ব অনুভব করা যায়, সেইরূপ গর্ব্বভরে আমি তাহাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম; একটা ঘনিষ্ঠতর ভ্রাতৃ-বন্ধনে আমরা পরস্পরের সহিত আবদ্ধ হইলাম; এবং আজিকার প্রভাত, জগতের উপর যে অমেয় উজ্জ্বল মহিমাচ্ছটা বিকীর্ণ করিয়াছে, আমরা উভয়ে মিলিয়া যেন তাহা সম্ভোগ করিতেছি; আমরাই আলোক, আমরাই বহুমুখী প্রকৃতি, আমরাই বিশ্ব-আত্মা। আজিকার এই বিরল মুহূর্ত্তে, আমার সম্বন্ধে এই কথা বলা যাইতে পারে;—"যে সব মায়াময় সসীমভাব হইতে পৃথক সত্তার বাসনাদি উৎপন্ন হয়"—সেই সসীমভাবগুলা স্খলিত হইয়াছে...

অজ্ঞাত বন্ধুদের উদ্দেশে।

আমাকে শপথ করিতে বলায়, আমি সহজ ভাবের একটি শপথ আবৃত্তি করিলাম; তাহার পর, সেই নিস্তব্ধ ক্ষুদ্র গৃহের তত্ত্বজ্ঞানীরা আমাকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করিলেন।

তাঁহারা আমাকে যে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তাহা পুনরাবৃত্তি করিতে আমি চেষ্টা করিব না।

প্রথমতঃ, সূক্ষ্ম জগৎ আমার ভ্রমণ-পথের বাহিরে—এইরূপ লোকের মনে হইতে পারে; অতএব, আমার সহিত সূক্ষ্মজগতে বিচরণ করিতে কেহ সম্মত হইবে,—ইহা কি আমি ভরসা করিতে পারি? আমি জানি, লোকে কেবল আমার ভ্রমণপথের মায়া-দৃশ্য—যে অসংখ্য পদার্থের

উপর আমি চোখ্ বুলাইয়া গিয়াছি, কেবল সেই সব পদার্থের ছায়া-চিত্রই আমার নিকট হইতে প্রত্যাশা করে।

বিশেষতঃ, আমার এই অল্পদিনের শিক্ষাদীক্ষার পর, আমি অন্যকে শিক্ষা দিতে পারিব এ কথা আমি কি করিয়া বিশ্বাস করি? আমি এখন যাহা বলিতে পারিব তাহাতে শুধু অন্যের চিত্তস্থৈর্য্য নাশ হইবে—হয়ত তাহা কাহাকে "দ্বারদেশের বিভীষিকা" পর্য্যন্ত লইয়া যাইবে—তাহার ওদিকে আর নহে।

তাছাড়া, আমি এখনও ভারতকে আবিষ্কার করিতে পারি নাই, যেহেতু বেদকে এখনও আবিষ্কার করিতে পারি নাই; একথা সত্য, কয়েক বৎসর হইতে, আমাদের মধ্যে,—অসম্পূর্ণ হইলেও—ঐ অলৌকিক গ্রন্থের অনুবাদ প্রচারিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

বর্ত্তমান শতাব্দিতে যাঁহাদের সংখ্যা অসংখ্য, আমার সেই সব অজ্ঞাত বন্ধুদের প্রতি আমি শুধু এই কথা বলিতে চাহি;—এই বৈদিক মতের মধ্যে কতটা সান্ত্বনা আছে, তা প্রথম দৃষ্টিতে সহসা উপলব্ধি হয় না।

এবং উহাতে যে সান্ত্বনা পাওয়া যায়; তাহা ঈশ্বর-প্রকাশিত ধর্ম্মাদির সান্ত্বনার ন্যায়, যুক্তির দ্বারা বিনষ্ট হইবার নহে।

এই বেদগ্রন্থ একজনের প্রণীত নহে—ইহা একটি সমস্ত জাতির সঙ্কলিত গ্রন্থ; সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও পরমাশ্চর্য্য বিষয়সমূহের পাশাপাশি, ইহার মধ্যে, অনেক অস্পষ্টতা, অসঙ্গতি ও 'ছেলেমি' কথাও আছে; এই গ্রন্থগুলি অরণ্যের ন্যায় নিবীড় ও রসাতলের ন্যায় অতলস্পর্শ। যাঁহারা নির্জ্জনে বসিয়া অবিচলিতচিত্তে এই গ্রন্থগুলির অনুশীলন করেন, সেই বারাণসীর তত্ত্বজ্ঞানীদের সাহায্যেই বোধ হয় উহার মধ্যে আমরা একটু প্রবেশ লাভ করিতে পারি। তাঁহাদের পূর্ব্বে, এই অতলস্পর্শের দ্বার আর কেহ উদ্ঘাটিত করে নাই; এই সব কথা আমি আর কোথাও শুনি নাই; জীবন ও মৃত্যুর রহস্য সম্বন্ধে, বারাণসীর তত্ত্বজ্ঞানীরা যে উত্তর প্রদান

করেন, তাঁহাতে মানব-জ্ঞানের আকুল জিজ্ঞাসাকেও পরিতৃপ্ত করিতে পারে; এবং পার্থিব অংশ ধ্বংস হইবার পরেও, তোমার নিজ সত্তা প্রায় চিরস্থায়ী হইবে, এই বিষয় সম্বন্ধে এরূপ প্রমাণ সকল তোমার সম্মুখে তাঁহারা স্থাপন করেন যে, সে বিষয়ে তোমার আর কোন সন্দেহ থাকে না।

যাই হোক্, গোলাপ-উদ্যানে অবস্থিত এই ক্ষুদ্র ধবল গৃহটি, অবারিত-দ্বার ও আতিথেয় হইলেও, লঘুহৃদয়ে উহার মধ্যে প্রবেশ করা যায় না; কারণ উহা, প্রধানত সন্ন্যাস ও মৃত্যুর আশ্রম; সেখানকার শান্তির হাওয়া একবার যদি কাহার গায়ে লাগে—যতই অল্প হোক্ না কেন—সে আর সে লোক থাকে না। সেই পূর্ণব্রহ্ম যিনি 'গুহায়িতং' 'গহ্বরেষ্ঠং'; সেই ঈশ্বর —এই অভিব্যক্ত বিশ্বের সহিত যাঁহার কোন সম্বন্ধ নাই; সেই ব্রহ্ম যিনি স্বরূপতঃ অনির্ব্বচনীয়, যিনি চিন্তার অতীত, যাঁহার সম্বন্ধে কিছুই বলা যায় না, এবং যাঁহাকে নিস্তব্ধতাই শুধু প্রকাশ করিতে পারে, তাঁহার একটু দর্শন লাভ করা—ইহা একটা ভীষণ পরীক্ষা।